পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
পাতালকেতু
ডক্টর টিটেনাস
রুপোর টাকা
কঙ্কাল পালিয়েছে
মোমের হাত
অদ্রীশ বর্ধন
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
অদ্রীশ বর্ধন
পাঁচটি রহস্য উপন্যা
অদ্রীশ বর্ধন

পাতালকেতু

ননকের মতো লক্ষ্যভেদী বুলেট এসে ঢুকেছে মাথার ভেতরে দপ করে জ্বলে উঠল লাল স্ফুলিঙ্গ। চল্লিশ গজ। তিরিশ। ভারি সুন্দর একটা কার্বোভাজি ঝোপের মধ্যে থেকে হঠাৎ ছুটে এল তরুণ ডিসপ্যাচ রাইডারের সামনে। একেবেঁকে ছুটতে লাগল পথের ওপর দিয়ে।

বিশ গজ পেছনে রিভলভারধারী-চালক দুহাত তুলে নিল হ্যান্ডেলবারের ওপর থেকে, রিভলভার তুলে লক্ষ্য রাখল বাম বাহুর ওপর এবং একবার মাত্র ট্রিগার টিপল।

তরুণ চালকের দু-হাতে এক ঝটকায় উঠে এল হ্যান্ডেলবারের ওপর থেকে এবং খামচে ধরল শিরদাঁড়ার মাঝখানটা। টাইম ক্যাপ উঠে ষাট-সত্তরের মতো রাস্তার ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে বেরিয়ে গেল তার মোটর সাইকেল, লাফিয়ে উঠল একটা খানা এবং ঘাড় মুচড়ে আছড়ে পড়ল ঘাসফুল-ছাওয়া মাঠে। পরক্ষণেই আর্তনাদ করে পেছনের দুরন্ত চাকার ওপর দাঁড়িয়ে উঠল বিএসএ এবং ধীরে-ধীরে এসে পড়ল মৃত চালকের গায়ে। শেষ কিছুক্ষণ প্রচণ্ড শব্দ, ভয়ানক ঝাঁকুনি এবং তরুণ চালকের পোশাক আর ঘাসফুল দলাই মলাই করার পর আস্তে-আস্তে নীরব হয়ে গেল বি.এস.এ-র তর্জন-গর্জন।

বোঁ করে ঘুরে গেল হত্যাকারী। যেদিকে এসেছিল, সেই দিকে মোটরসাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে দাঁড় করাল রাস্তার পাশে। এক লাথিতে স্ট্যান্ড নামিয়ে টান মেরে দাঁড় করিয়ে দিল ইস্পাতের যন্ত্রদানব। তারপর ধীরপায়ে বুনো ঘাস মাড়িয়ে আর নীলফুল গাছের তলা দিয়ে এসে দাঁড়াল মৃতের পাশে। হাঁটু গেড়ে বসল। টান দিয়ে তুলল লাশের চোখের পাতা। নিষ্প্রাণ তারকা—জীবনের কোনও আলোই আর নেই। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এক হ্যাঁচকায় মৃতের পিঠ থেকে খুলে নিল কালো চামড়ার ডিসপ্যাচ কেস, শার্টের বোতাম খুলে বুকের ভেতর থেকে টেনে বার করল একটা পোড়খাওয়া চামড়ার মানিব্যাগ। মণিবন্ধ থেকে সস্তার রিস্টওয়াচটা এমন টান মেরে খুলে আনল যে দু-জায়গায় লম্বা হয়ে গেল বেনটেক্স স্ট্রেচ ব্রেসলেট।

উঠে দাঁড়াল হত্যাকারী। কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিল ডিসপ্যাচ কেস। রিস্টওয়াচ আর মানিব্যাগটা পকেটে গুঁজতে-গুঁজতে কান পেতে কী যেন শুনল। না, অরণ্য-শব্দ আর বিকল বি. এস. এ থেকে উত্থিত উত্তপ্ত ধাতুর পটপট শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। রাস্তার দিকে এগোল হত্যাকারী। ফিরে চলল যে-পথে এসেছে, ঠিক সেই পথেই—অতি সন্তর্পণে এবং টায়ারের ছাপ বাঁচিয়ে। খানার কাছে নরম মাটির সামনে আরও হুঁশিয়ার হল খুনে-চালক। তারপর এসে দাঁড়াল মোটরসাইকেলের পাশে। একবার শুধু ফিরে তাকাল ঘাসফুল ছাওয়া উপত্যকার দিকে।

মন্দ না! পুলিশের বাঘা-বাঘা কুকুরের ক্ষমতা নেই এ হত্যা-রহস্যের সমাধান করে। এসব ব্যাপারে ঝুঁকি কখনও নিতে নেই। চল্লিশ গজ দূর থেকে গুলি চালাতে সে পারত। কিন্তু সাবধানের মার নেই জেনে এগিয়ে এসেছে আরও বিশ গজ। আর, ঘড়ি-মানিব্যাগ নেওয়াটা হয়েছে সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। বিপথে চালনা করার মোক্ষম 'ফিনিশিং টাচ'।

খুশি হয়ে হ্যাঁচকা টান মেরে 'স্ট্যান্ড' থেকে মোটরসাইকেল নামাল লোকটা, স্মার্ট হাকির মতোই টুক করে উঠে বসল সিটে এবং সবেগে পদাঘাত করল স্টার্টারের

ওপর। খুব আস্তে-আস্তে, কিত চিহ্ন যাতে না পড়ে, সাবধানে গাড়ির গতিবেগ বৃদ্ধি করতে লাগল রহস্যময় চালক এবং অচিরেই অদৃশ্য হয়ে গেল সিরে সড়ক বেয়ে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে ফিরে চলেছে একজন ডিসপ্যাচ রাইডার। হাওয়ার ঝাপটায় আবার প্রকট হয়ে উঠেছে তার দন্তপঙ্‌ক্তি, যেন হাসছে দাঁত খিঁচিয়ে।

হত্যাস্থলের চারদিকে এতক্ষণ যেন শ্বাসরোধ করে দাঁড়িয়েছিল অটবির সারি এবার ধীরে-ধীরে আবার বইতে লাগল শ্বাস-প্রশ্বাস, স্পন্দিত হল তরুণবক্ষ, ধ্বনিত হল মর্মর দীর্ঘশ্বাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বিতল-কাহিনি

কাশ্মীর। শ্রীনগর। রেসিডেন্সি রোড।

সুসজ্জিত একটি হোটেলের চার নম্বর স্যুইটে অলস ভঙ্গিমায় সোফায় গা এলিয়ে বসে দীর্ঘদেহী এক পুরুষ। টানা চোখে স্বপ্নিল আবেশ, সুতীক্ষ্ম নাসায় আর প্রশস্ত ললাটে বুদ্ধিমত্তার ছাপ, পরনে হ্যান্ডলুমের হলুদ-কালো ডোরাকাটা বুশশার্ট আর চারকোল-গ্রে টেরিন ট্রাউজার।

সামনের সানমাইকা আচ্ছাদিত টেবিলে এক কাপ দুধবিহীন কালো কফি আর কাচের প্লেটে কয়েকটি চিকেন স্যান্ডউইচ।

ঠোঁটের প্রান্তে শিথিলভাবে ঝুলছে একটা কাঁচি সিগারেট।

পাঠক নিশ্চয় এবার একে চিনেছেন। কদিন আগে এই মানুষটিই মোমের হাতের বিচিত্র রহস্য উদঘাটন করেছে, প্রতিবেশী ময়না বক্সীর লোমহর্ষক গুপ্তকাহিনি ফাঁস করেছে, বিশ্ববিখ্যাত গুরুত্বপূর্ণ প্রফেসর বিক্রম বক্সীর প্রাণইজ্জত রক্ষা করেছে, আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট 'অপারেশন নটরাজ'-এর নিশ্চিত পঞ্চত্বপ্রাপ্তি রোধ করেছে, চীন ও পাকিস্তানের চক্রান্ত ছিন্নভিন্ন করেছে এবং ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরকে জোরদার করেছে।

হ্যাঁ, এই সেই ভারতবিখ্যাত কৃশলী প্রাইভেট ডিটেকটিভ এবং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কর্ণধার ইন্দ্রনাথ রুদ্র। বাংলার পাঠকসমাজ যার বিচিত্র কীর্তিকলাপ তস্য বন্ধু মৃগাঙ্ক রায়ের লেখনী মারফত পড়ে আসছেন।

আড় হয়ে শুয়ে স্মৃতি রোমন্থন করছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। শ্রীনগর আসার উদ্দেশ্য স্রেফ অবকাশ যাপন। 'অপারেশন নটরাজ' কেসে অশরীরীর মোমের হাত বানাতে গিয়ে যে পরিমাণ ধকল শরীরের ওপর দিয়ে গেছে, তা ইতিপূর্বে আর কোনও তদন্তে যায়নি। মনের ওপরও অত্যাচার কম হয়নি। এত বড় ঝুঁকি মাথা পেতে নিতে হয়েছে। এতটুকু ভুল হলেই যেখানে দেশের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী, সেখানে সে সম্পূর্ণ একা অপরিসীম মনোবলকে সম্বল করে সুষ্ঠু সমাধান করেছে বিপজ্জনক কেসটির।

কিন্তু ভেতরে-ভেতরে নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল ইন্দ্রনাথ। জীবনে এত ক্লান্তি, এত অবসাদ, সে কখনও অনুভব করেনি। সেদিন রাতে নাটকীয়ভাবে ভৌতিক মোমের হাতে মৃত্যুর পর প্রফেসর বিক্রম বক্সী যখন পাঁচ মেগাটন বোমার মতো ফেটে পড়লেন সীমাহীন

ক্রোধে, এবং ওঁর পরেই ইন্দ্রনাথ রুদ্রের লৌহ-স্নায়ুর কাছে হার স্বীকার করলেন, তখন থেকেই প্রফেসরের অন্তরের কন্দরে একান্ত স্নেহচ্ছায়ায় লালিত হতে শুরু হয়েছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্রের নামটি। পরের দিনই প্রফেসর-জায়ার আমন্ত্রণ এসেছে। শুক্তো, বড়ির ঝোল, চালতার অম্বল সহযোগে পর-পর কদিন নিজের ছেলের মতো খাইয়েছেন। একচোখে হেসেছেন, একচোখে কেঁদেছেন। প্রফেসর এবং গৃহিণীর মধ্যে প্রেতিনী ময়না যেটুকু কাটিলের সৃষ্টি করেছিল, আবার তা কংক্রিট হয়ে গেছে ইন্দ্রনাথের মাস্তিক প্রদর্শনীতে। অনাবিল শান্তি ফিরে এসেছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংসারে।

আর মধ্যেচূড় মহলানবীশ? তিনি যাকে সামনে পেয়েছেন, তাকেই বলেছেন ইন্দ্রনাথ রুদ্রের অবিশ্বাস্য কীর্তিকাহিনি এবং সগর্বে প্রচার করেছেন ইন্দ্রনাথ তাঁরই ছাত্র।

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ মিঃ আচাও একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, আই.পি.এস. অফিসারের চাইতেও অনেক ধীমান হতে পারে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এবং ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে আখ্যা দিয়েছেন 'ইন্ডিয়ান শার্লক হোমস।'

শুধু খুশি হতে পারেননি জেনারেল বরকাকতি। ভুরু কুঁচকে নাক তুলে এমন একটা মন্তব্য ত্যাগ করেছেন, যা শুনে আর যাই হোক, ইন্দ্রনাথ রুদ্র বিশেষ উল্লসিত হতে পারেনি। জেনারেল বরকাকতির মতে এটা নাকি নেহাতই একটা 'লোন্‌লি স্টান্ট' এবং অনেক আগেই শক্তি প্রয়োগ করলে একই সমাধানে তিনিও উপনীত হতে পারতেন।

কাকপক্ষীও জানতে পারেনি কত বড় সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পেল ভারতবাসীরা। কিন্তু উল্লাসের বন্যা বয়ে গেল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে। পরপর বেশ কয়েকটা লাঞ্চ, ডিনারে আপ্যায়ন জানানো হল দেশের উজ্জ্বল রত্ন ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে এবং একটি ভোজসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর সামনে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি এমন আভাসও দিলেন যে আগামী স্বাধীনতা দিবসে 'পদ্ম বিভূষণ' খেতাব দিয়ে সম্মানিত করা হবে ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে। সংক্ষেপে, তদন্তকালীন যে পরিশ্রম ইন্দ্রনাথের ওপর দিয়ে গেছে, সাফল্যলাভের পর আদরযত্নের ঠেলায় তার চাইতে কম ধকল সইতে হল না বেচারিকে। প্রাণান্ত হওয়ার উপক্রম। অবশেষে এক সময়ে সব কিছু ঠেলে সরিয়ে আকাশপথে রওনা হল শ্রীনগর অভিমুখে—বিশ্রামের লোভে। মৃগাঙ্ক আর কবিতা-বউদি যখন কলকাতায় নেই, তখন দুটো দিন কাশ্মীর উপত্যকার হিমেল হাওয়াতেই জিরিয়ে নেওয়া যাক শরীর আর মন।

কাল হল সেইটাই। কাজের চাপে যে চিন্তাটি ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেনি, অবসর মুহূর্তে তাই বাসুকির মতো শতফণা বিস্তার করে ছোবল মারতে লাগল বিবেককে। যন্ত্রণাময় এই চিন্তা সেই রূপসীকে নিয়ে, মাতাহারীর মতো যে বিশ্বকুখ্যাত হতে পারত গুপ্তচরীর ভূমিকায়, কিলারের মতো টলিয়ে দিতে পারত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রপ্রধানদের শক্ত আসনও, কিন্তু ক্ষণিকের দুর্বলতায় যে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ রুদ্রের জীবন।

নুরজাহান! নুরজাহান! নুরজাহান!

ইন্দ্রনাথের আর কোনও সন্দেহই নেই। এক সময়ে যে আশঙ্কা ঈশান কোণের

মেঘের মতোই দেখা দিয়েছিল, আজ তা অন্তর গগন ছেয়ে ফেলেছে। নুরজাহান তাকে ভালোবেসেছিল। অভিনয় করতে এসেই ভালোবেসেছিল। মক্ষিরানীর মতো হাসতে-হাসতে ছুরি বসাবার তোড়জোড় করেও শেষরক্ষা করতে পারেনি—হারিকিরি করে নবজীবন দিয়ে গেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে।

দুর্ধর্ষ ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আজ যে বিজয়তিলক তোমার ললাটে শোভিত, তার কৃতিত্ব কি সবটুকুই তোমার প্রাপ্য? সময়ে বিকৃত এক সৈরিণী আপন প্রাণ বলি দিয়ে তোমাকে বসিয়ে দিয়ে গেছে এই উচ্চ আসনে, প্রেমের মূল্য দিয়েছে সে নিজের জীবন আহুতি দিয়ে, পুরস্কার পেয়েছ তুমি। সে ছলনা করেছিল, তুমিও করেছিলে। কিন্তু তার ছলনামায়া কুহকবাষ্পের মতো উবে গেছে তোমার ছলনার কাছে। তাই সে ভালোবেসেছে, আর তুমি অভিনয় করেছ। ইন্দ্রনাথ রুদ্র, নুরজাহান যত পাপিষ্ঠাই হোক, তুমিও কম নির্মম নও।

চোখ বুজে ভাবতে থাকে ইন্দ্রনাথ। এমনিভাবেই দিল্লির এক বিখ্যাত হোটেলে সোফায় এলিয়ে পড়েছিল ইন্দ্রনাথ। জমিয়ার লুটিয়ে পড়েছিল গালিচায়। আর সাচ্চা জরির কাজ করা রেশমের ওড়না সরিয়ে জলতরঙ্গ হাসি হেসে সিরাজীর পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বলেছে আতারিনী নুরজাহান, বখুজি, শরাব?

সচমকে চোখ খুলল ইন্দ্রনাথ। উচ্চগ্রামে বাজতে বাজতে যেন আচমকা ছিঁড়ে গেল সেতারের তার, আর্তনাদ করে উঠল ঘুঙুর।

গীতস্তব্ধ এই ময়ূরমহলে এ কোন ময়ূরী?

টেবিলের ওপাশে বসে মৃদুমৃদু হাসছে এক ডানাকাটা পরী। স্বচ্ছ মুক্তোর মতো অপরূপ দাঁত, গোলাপের মতো রক্তিম নিটোল কপোল আর হস্তীদন্তশুভ্র ললাটের নিচে তমালকালো দুটি চোখ।

সে-চোখ কৌতুকউচ্ছ্বসিত, আনন্দোজ্জ্বসিত।

কে এই রহস্যময়ী? নির্জন স্মৃতিরোমন্থনে কেন এই উৎপাত? রূপ দেখে কাশ্মীরিললনা বলেই মনে হয়, কিন্তু রূপের কাঙাল তো নয় ইন্দ্রনাথ?

'আপনি?' বিরক্তি চাপবার কোনও চেষ্টাই করে না ইন্দ্রনাথ রুদ্র। উত্তরে আরেক দফা হাসল ডানাকাটা পরী। টুংটাং জলতরঙ্গ বাজিয়ে বলল, 'আপনার দিবাস্বপ্ন ভঙ্গ করার জন্য অতীব দুঃখিত। কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার ওপর অর্ডার আছে আপনাকে যেভাবে যেখানেই পাই না কেন, এখুনি নিয়ে যেতে হবে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সুতাল-কাহিনি

'কে আপনি?'

'আমি রোশনী। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের একজন নগণ্য ইনভেস্টিগেটর।'

যেন চাবুক খেয়ে সিধে হয়ে বসল ইন্দ্রনাথ। মিঃ আচাও একটি বিষয়ে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বিভীষণবাহিনীর জাল সারা দেশে বিস্তৃত এবং এত বড় পরাজয়ের

খনি তারা এত সহজে ভুলবে না। সেক্ষেত্রে, খাস শ্রীনগর শহরেও ইন্দ্রনাথ রুদ্রের প্রাণহানির শঙ্কা থাকতে পারে।

কোমরে গোঁজা শীতল অটোমেটিকটা কাপড়ের ওপর দিয়ে স্পর্শ করে নিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে শুধোল ইন্দ্রনাথ, 'আইডেন্টিটি কার্ড?'

'তাও আছে।' মুচকি হেসে ঝকঝকে দাঁতের ওপর রাখা চকচকে ভ্যানিটি ব্যাগে হাত রাখল সুবদনা রূপসীরত্ন।

নিমেষে টান-টান হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গ। চকিতে শ্বাস টেনে তাকাল সুদৃশ্য ব্যাগটির দিকে। মৃত্যু কতদিক থেকে আসতে পারে, তা কি বলা যায়? ঈষৎ অঙ্গুলি হেলনে ভ্যানিটি ব্যাগের চাবি ঘুরে গিয়ে অদৃশ্য নলমুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে মারাত্মক বিষবাষ্প—সায়ানাইড গ্যাস।

কিন্তু সেরকম কিছুই নয়। খট করে খুলে গেল ব্যাগ। ভেতর থেকে বেরোল খুদে রিভলভার নয়, আইডেন্টিটি কার্ড।

সহজ হয়ে বসল ইন্দ্রনাথ। শীতল কফির পেয়ালাটা টেনে নিয়ে বললে, 'কফি আনাই?'

'ধন্যবাদ। এখন নয়, অন্য একদিন।'

এক চোখের ভুরু তুলে তির্যক দৃষ্টি হানল ইন্দ্রনাথ। বলল, 'আমার হদিশ পেলেন কোত্থেকে?'

'সেটা কি খুব কঠিন কাজ?'

'কঠিন না হলেও ঝামেলার কাজ। আমি তো কাউকে ঠিকানা দিয়ে আসিনি! তা ছাড়া, এ হোটেলেও আমি থাকি না। এসেছি কফি খেতে।'

আবার মোহিনী হাসি হাসল রোশনী। বলল, 'এখন অফ সিজন—শ্রীনগরে বাঙালিবাবুদের তাই খুঁজে বার করতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হয় না। আপনি উঠেছেন ডাল লেকে তিন নম্বর ঘাটের রয়াল হাউসবোটে। হাউসবোট থেকেই খবর পেয়েছি, বিকেলে চা না খেয়েই বেরিয়েছেন। শ্রীনগরে মেজাজি খানা খাওয়ার একমাত্র জায়গা হল রেসিডেন্সি রোড। আর রেসিডেন্সি রোডে নামকরা হোটেল আর কটাই বা আছে বলুন?'

'ক্যাপিটাল!' সপ্রশংস চেয়ে বলল ইন্দ্রনাথ। 'এখন বলুন দিকি, কার অর্ডারে আমার পিছনে ধাওয়া করেছেন আপনি?'

'মিস্টার আচাওর অর্ডার।'

'মিস্টার আচাও!'

'হ্যাঁ, পুলিশ সুপার মিস্টার আচাও ট্রাঙ্ককল করেছেন দিল্লি থেকে। টপ সিক্রেট। এক্ষুনি স্টেশনে আনতে হবে আপনাকে। আর দেরি নয়। উঠে পড়ুন।'

উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। বিল মিটিয়ে দিয়ে কাচের সুইংডোর ঠেলে ফুটপাথে এসে দাঁড়াতেই চোখ পড়ল একটা জিপ।

স্মার্ট ভঙ্গিমায় স্টিয়ারিং-এ গিয়ে বসল রোশনী। ইন্দ্রনাথ পাশে। চোখের কোণ দিয়ে দেখা গেল মখমলের মতো কোমল গাল আর রেশমের মতো ফুরফুরে অলকগুচ্ছ।

আর, নাকে ভেসে এল মনমাতানো খোশবাই আতরের সৌরভ।

কে বলবে এ মেয়ে পুলিশের সিক্রেট এজেন্ট? যার সালোয়ার ওড়না, আচার-ব্যবহার, সব কিছুর মধ্যেই বৈভব সুস্পষ্ট, ধনীর আদরিনী দুহিতা বলেই যাকে ভ্রম হয়, পুলিশবাহিনীর বিপদসঙ্কুল কাজে সে যেন বড্ড বেমানান।

ক্ষিপ্রভাবে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বক্সী গোলাম মহম্মদের অর্ধদগ্ধ সিনেমা হাউসের সামনে দিয়ে মোড় বেঁকল রোশনী। বলল, 'আরও দুজন বেরিয়েছে আপনাকে খুঁজতে। প্রত্যেকের কাছেই আছে আপনার ফটো। আমিই লাকি।'

'টপ সিক্রেটটা কি জানা গেছে?'

'উঁহু।'

কয়লারহস্য নয় তো? গত আট মাসের মধ্যে চীনদেশ থেকে কয়লা নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে আসবার সময়ে অজ্ঞাত কারণে আগুন লেগে গেছে চোদ্দটা জাহাজে। শেষ আগুন লেগেছে ব্রিটিশ জাহাজে—হংকং থেকে ভাড়া করা হয়েছিল 'করনা' জাহাজ। কিন্তু চট্টগ্রামের মুখেই রহস্যজনক কারণে আগুন লেগে তলিয়ে গেছে ৮৫০০ টন কয়লা সমেত।

কেউ বলেছে, চীনের কয়লায় নাকি গন্ধকের পরিমাণ বেশি। তাই নিরক্ষীয় অঞ্চলে আসতেই জ্বলে উঠছে আগুন।

পাকিস্তানের ধারণা কিন্তু অন্য। এ 'স্যাবোটেজ' নাকি আমেরিকা আর ভারত সরকারের যোগসাজসের ফল।

কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের কয়লা সঙ্কটের জন্যে সুদূর কাশ্মীর উপত্যকায় কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে কেন?

আশ্চর্য কিছু নয়। হজরতবালের হাঙ্গামাও তো কাশ্মীর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানে পৌঁছেছিল।

সম্বিৎ ফিরল রোশনীর প্রশ্নে।

'একলা কাশ্মীরে দিন কাটছে কী করে আপনার?'

আনকোরা একটা 'কাঁচি' ঠোঁটের কোণে ধরিয়ে নিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল, 'অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'তার মানে, আপনি ব্যাচেলার?'

'বলা বাহুল্য।'

'সেকি! এমন গ্রিক ফিগার নিয়েও?'

কান পর্যন্ত লাল হয়ে ওঠার মতো প্রশংসা। ইন্দ্রনাথ শুধু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, 'একলাই ভালো লাগে। আপনিও তো সেই পথেরই পথিক মনে হচ্ছে?'

'নিরুপায় হয়ে!' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রোশনী।

'আপনি কাশ্মীরি?'

'উঁহু, পাঞ্জাবি। লুধিয়ানায় জন্ম।'

'এ কাজে কদ্দিন?'

'মাস ছয়েক এসে গেছি।'

সশব্দে একটা দোতলা সাদা বাড়ির সামনে ব্রেক কষল রোশনী। সি. বি. আই.-এর হেডকোয়ার্টার। স্বাধীন ভারতের আভ্যন্তরিক গুপ্তচর বাহিনীর কাশ্মীর সেন্টার।

লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ইন্দ্রনাথ। বনেটের সামনে দিয়ে ঘুরে এসে ঝুঁকে পড়ল রোশনীর পাশে। বলল, 'এ ব্যাপারটা মিটে গেলে, দেখা করলে খুশি হব। দুজনের নিঃসঙ্গতাই তাতে ঘুচবে, কী বলেন?'

বলে, আর তাকালো না ইন্দ্রনাথ। দ্রুত পদক্ষেপে প্রবেশ করল ভেতরে—আর্মড গার্ডের পাশ দিয়ে।

সেকশন হেডকোয়ার্টারের চার্জে ছিলেন রত্নেশ্বর ত্রিপাঠি, আই. পি. এস.। নধরকান্তি মানুষ। রাঙা গাল। বুরুশ আঁচড়ানো পরিপাটি কাঁচা-পাকা চুল, হাতের আস্তিন গুটোনো। টাইয়ের নট শিথিল, এবং সব মিলিয়ে একটা ঢিমেতালা ভাব।

ব্যতিক্রম শুধু চোখে। পিঙ্গল তারকায় পারদপিচ্ছিলতা। ইলেকট্রিক চাহনিতে ছুঁচমুখ তীক্ষ্ণতা।

ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে দেখেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক। সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে শুধোলেন, 'কে আনল আপনাকে?'

'রোশনী।'

'স্মার্ট গার্ল। অনেক কথা আছে। তার আগে খবরটা জানিয়ে দিই।'

ইন্টারকম-এর ওপর ঝুঁকে পড়লেন ত্রিপাঠী। সুইচ টিপে বললেন, 'মিস্টার আচাওকে সিগন্যাল পাঠান। পার্সোনাল মেসেজ ফ্রম রত্নেশ্বর ত্রিপাঠি। ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে পাওয়া গেছে। ঠিক আছে?'

সুইচ অফ করে দিয়ে টেবিলের ওপর কনুই রেখে বসলেন ত্রিপাঠি। বললেন, 'গতকাল সকালে লাকু ক্যাম্পে যাওয়ার সময়ে খুন হয়েছে আমাদের ডিসপ্যাচ রাইডার। হপ্তায় একবার যায় সে। সিকিউরিটি ক্যাম্প থেকে লাকু ক্যাম্প। নিয়ে যায় সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট, ইনটেলিজেন্স পেপারস, সৈন্য চলাচল আর ক্যাম্প পজিশন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অর্ডার। প্রত্যেকটি কাগজই টপসিক্রেট। পিছন থেকে গুলি খেয়েছে ডিসপ্যাচ রাইডার—এক গুলিতেই খতম। ডিসপ্যাচ কেস, মানিব্যাগ আর রিস্টওয়াচ উধাও।'

'সুসংবাদ সন্দেহ নেই। কী মনে হয় আপনার? সাধারণ রাহাজানি, না ঘড়ি আর মানিব্যাগ নেওয়ার উদ্দেশ্য শুধু চোখে ধুলো দেওয়া?' শুধোয় ইন্দ্রনাথ।

'আর্মি কোর ইনটেলিজেন্স এখনও মনস্থির করতে পারেনি। তবে অনুমান করছে, আসল উদ্দেশ্য ধোঁকা দেওয়া। সকাল সাতটায় রাহাজানি হলে, তাকে সাধারণ বলা চলে কি? কিন্তু এ নিয়ে ওদের সঙ্গে আপনিই তর্কবিতর্ক করবেন'খন। মিস্টার আচাও তাঁর স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আপনাকে পাঠাতে চান। ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়েছেন উনি। আমাদেরও এক অবস্থা। বলতে লজ্জা নেই, চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেল, অথচ হালে পানি পাচ্ছে না সি. বি. আই., আর কোর ইনটেলিজেন্স। কাগজপত্র যা গেল তা তো গেলই, এখন আমাদের লাকু ক্যাম্পের নিরাপত্তার প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া কোর ইনটেলিজেন্সের ওপর কোনওদিনই ভরসা রাখতে পারেননি সি. বি. আই. ডিরেক্টর। এক্ষেত্রেও সেই একই কথা বলছেন উনি। আপনি শ্রীনগরে হাজির রয়েছেন। তাই ডিফেন্স

মিনিস্টারের তরফ থেকে আপনাকে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছেন মিস্টার আচাও এবং আমি।'

কাঁচির প্যাকেট খুলে এগিয়ে ধরল ইন্দ্রনাথ।

'নো; থ্যাঙ্কস।'

ঠোঁটের কোণে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে নিয়ে প্যাকেটটা পকেটে রাখল ইন্দ্রনাথ। অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'তারপর?'

'মুশকিল হচ্ছে কোরকে নিয়ে। সি. বি. আই এর নাক গলানো তাদের পছন্দ নয়। অথচ লাকু ক্যাম্পের সেফটির জন্য কড়া নোট এসেছে দিল্লি থেকে। সুতরাং, আমাদের ইচ্ছে, আপনি এখুনি রওনা হয়ে পড়ুন। আপনার কাগজপত্র আমি তৈরি রেখেছি। পাশও পেয়েছি। আপনি রিপোর্ট করবেন কর্নেল রাজবালিয়া খেবরের কাছে। সিকিউরিটি ব্রাঞ্চ। খুব কাজের মানুষ। এখন থেকেই এ কেস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কর্নেল। খবর এসেছে, যা করবার তা করেছেন, আর করবার মতো নাকি কিছুই নেই।'

'কী-কী করেছেন? পুরো ঘটনাটাও বলুন।'

টেবিলের ওপর একটা ম্যাপ মেলে ধরলেন ত্রিপাঠী। কাশ্মীর ও জম্মুর মিলিটারি ম্যাপ। পেনসিল দিয়ে দেখালেন লাকু ক্যাম্প কোথায় এবং কোন অঞ্চল থেকে আসতে হয় ডিসপ্যাচ রাইডারকে। বললেন, 'প্রতি বুধবার সকাল সাতটায় কাগজপত্র নিয়ে রওনা হয় একজন স্পেশাল সার্ভিস ডিসপ্যাচ রাইডার। পথে পড়ে এ গ্রামটা—নাম অনন্তগড়। লাকু ক্যাম্পে পৌঁছে কাগজপত্র ডিউটি অফিসারের হাতে তুলে দিয়ে, আবার ফিরে আসে সাড়ে সাতটার সময়। সিধে পথে না গিয়ে নিরাপত্তার খাতিরে তার ওপর অর্ডার ছিল ঘুরপথে ডিসকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার। দূরত্ব মাত্র বারো কিলোমিটার, ধীরে-সুস্থে গেলেও পনেরো মিনিটের বেশি লাগা উচিত নয়। গতকাল এ ভার পড়েছিল কোর অফ সিগনালের করপোরাল হুকুম বরকন্দাজের ওপর। রীতিমতো মজবুত শরীর। [illegible] সাতটা পঁয়তাল্লিশের মধ্যেও যখন ফিরল না সে, তখন খোঁজ নিতে পাঠানো হল আর-একজন রাইডারকে। কিন্তু যেন বেমালুম উবে গেছে লোকটা। হেডকোয়ার্টারেও রিপোর্ট করেনি। সওয়া আটটার সময়ে সিকিউরিটি ব্রাঞ্চ তৎপর হল। নটার মধ্যে বন্ধ করা হল সবকটা রাস্তা। খবর এল সি. বি. আই. আর আর্মি কোর-এ। সার্চ পার্টি বেরিয়ে পড়ল দিকে-দিকে। শেষপর্যন্ত লাশটা আবিষ্কার করল পুলিশ-কুকুর। তাও সন্ধে ছটা নাগাদ। যদিও বা কোনও সূত্র থেকে থাকত, সারাদিনে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাতায়াতের ফলে তার আর চিহ্ন ছিল না।'

ম্যাপটা ইন্দ্রনাথের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে বললেন ত্রিপাঠী, 'এই হল ব্যাপার। যা করবার সবই করা হয়েছে। সজাগ হয়ে গেছে ফ্রন্টিয়ার, এয়ারপোর্ট আর সবকটা ঘাঁটি। রাষ্ট্রপুঞ্জের মিলিটারি অবজার্ভারকেও রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হবে বলে মনে হয় না। শত্রু যদি পেশাদার হয়ে থাকে তো কাগজপত্র গতকালই দুপুর নাগাদ কাশ্মীর ক্রস করে গেছে।'

শুনতে-শুনতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল ইন্দ্রনাথ। ত্রিপাঠী থামতেই বললে, 'তাতো বটেই। সেই জন্যই ভাবছি, এখন আর আমাকে নিয়ে মিস্টার আচাও কী আশা করেন, বলতে পারেন? আমি কোর ইনটেলিজেন্স আর সি. বি. আই. বরং গোড়া থেকেই শুরু

করুক আর-একজন। এ ধরনের কাজ আমি কখনও করিনি। আমার লাইনেই পড়ে না। খামোকা সময় নষ্ট।'

সহানুভূতির হাসি হাসলেন রত্নেশ্বর ত্রিপাঠী, 'সত্যি কথা বলতে কী, মিস্টার আচাওকে আমি সেকথা বলেছি। কিন্তু আমাদের ডিরেক্টর সাহেবের আস্থা আপনার ওপর। তাঁর গোঁ চেপে গেছে আপনাকে দিয়েই ফোর ইনটেলিজেন্সকে একটা জবর শিক্ষা দেওয়াবেন। মিস্টার আচাও বলেছেন, ইন্দ্রনাথ রুদ্র যখন হাজির রয়েছেন কাশ্মীরে, তখন একবার সরেজমিন তদন্ত করে এলেও অনেক কাজ হতে পারে। উনি বলেন, অন্যের চোখে যা অদৃশ্য, ইন্দ্রনাথ রুদ্রের চোখে তা নয়। আপনার মনের গড়নটাই নাকি অন্যরকম, অন্যেরা যা দেখে না আপনি তা দেখেন। আমি জিগ্যেস করেছিলাম কথাটার মানে কী। উনি বললেন, সবকটা ঘাঁটির কড়া পাহারার মধ্যেও যখন এ-কাণ্ড ঘটে গেল, তখন বুঝতে হবে এমন একজন ছদ্মবেশী শত্রু সেখানে রয়েছে যাকে কেউ লক্ষই করছে না। সে হতে পারে মালি, কী পিওন, কী আর্দালি। আমি বলেছিলাম, ফোর ইনটেলিজেন্স যে সে-সম্ভাবনা ভাবেনি, তা নয়, কিন্তু কাজ হয়নি। মিস্টার আচাও বললেন, তবুও দরকার ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে।'

হেসে ফেলল ইন্দ্রনাথ। চোখের সামনে ভেসে উঠল মিঃ আচাওর কুঞ্চিত ললাট আর উদ্বেগ আঁকা ভুরু। বলল, 'অলরাইট। দেখি কী করতে পারি। ফিরে এসে রিপোর্ট দেব কাকে?'

'আমাকে। সি. বি. আই. ডিরেক্টরের ইচ্ছে নয় লোকাল ক্যাম্পকে এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলা হোক। আপনার যা কিছু রিপোর্ট আমি সরাসরি টেলিপ্রিন্টারে দিল্লি পাঠিয়ে দেব। কিন্তু সব সময় হয়তো আমাকে পাবেন না। একজন ডিউটি অফিসারের ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখন দরকার হয় পাবেন তাকে। ও কাজটা ব্রেশনই পারবে। আপনাকে যখন ও ধরে এনেছে তখন মানিয়েও চলতে পারবে। কী বলেন?'

'উত্তম ব্যবস্থা।' বলল ইন্দ্রনাথ।

স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়েছিল জিপটা। চালকবিহীন। রোশনী নেই। কিন্তু এখনও যেন আসন ঘিরে ভুরভুর করছে আতরের হালকা খোশবাই।

রত্নেশ্বর ত্রিপাঠী বলেছিলেন, ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গেলে মিনিট পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। ইন্দ্রনাথ তখন বলেছে, অর্ধেক গতিবেগে দ্বিগুণ সময়ে পৌঁছলেই চলবে এবং কর্নেল রাজবালিয়া খেরকে যেন ফোন করে দেওয়া হয় সাড়ে ন'টার সময় হাজির হবে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

এই ধীরেসুস্থে শহর ছেড়ে বাইরে এসে পড়ল ইন্দ্রনাথ। বেশ কিছুক্ষণ ড্রাইভ করার পর হেডলাইটের আলোয় ঝলমল করে উঠল রাস্তার পাশে দাঁড় করানো সিকিউরিটি ব্রাঞ্চের বোর্ডটা। মোড় নিল ইন্দ্রনাথ, শ দুই গজ যাওয়ার পর দেখা গেল ট্রাফিক পুলিশম্যানকে। এরই খোঁজ করতে বলে দিয়েছিলেন ত্রিপাঠী। বাঁ-দিকের মস্ত গেটের মধ্যে ঢুকতে ইঙ্গিত করল পুলিশম্যান। একটু এগিয়েই থামতে হল প্রথম চেকপয়েন্টে। কেবিনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল শস্ত্র প্রহরী। এক হাতে রাইফেল ধরে অপর হাতে ইন্দ্রনাথের 'পাশ' নিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে ভেতরে ঢুকেই দাঁড়াতে। তাই করল ইন্দ্রনাথ। এবার এল আর-একজন শিখ সৈনিক। 'পাশ'টা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে বোর্ডে ক্লিপ দিয়ে আঁটা একটা ছাপা ফর্মে খুঁটিনাটি লিখে নিল। তারপর উইন্ডশিল্ড নাম্বার

লেখা একটা বড় প্লাস্টিক হাতে তুলে দিয়ে ভেতরে যাওয়ার নির্দেশ দিল। স্টার্ট দিল ইন্দ্রনাথ। কার-পার্কে জিপটা দাঁড় করানোর সঙ্গে-সঙ্গে যেন ভোজবাজির মতো দপ করে জ্বলে উঠল একগোছা আর্ক ল্যাম্প। সামনের গোটা পথটা আর দুপাশের নিচু-নিচু তাঁবু আর বাড়িগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল জোরালো সেই আলোকবন্যায়। যেন দিনের আলো। কাঁকর বিছানো পথে হাঁটতে-হাঁটতে সেই প্রখর আলোয় নিজেকে কেমন যেন দিগম্বর-দিগম্বর মনে হল ইন্দ্রনাথের। একরকম ছুটেই যেন অফিসে পৌঁছে কয়েক লাফে সিঁড়ি টপকে কাচের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ইন্ডিয়ান আর্মি কাশ্মীর সিকিউরিটি ব্রাঞ্চে। আবার তার পাশ পরীক্ষা করল সশস্ত্র মিলিটারি পুলিশ। চেকিং শেষ হলে একজন এম. পি.-র পিছু-পিছু সীমাহীন অফিস দরজা পেরিয়ে সুদীর্ঘ করিডর বরাবর হাঁটতে-হাঁটতে এসে দাঁড়াল একটি দরজার সামনে।

নেমপ্লেটে লেখা : কর্নেল রাজবালিয়া খের।

কাচের প্যানেল বসানো পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ইন্দ্রনাথ। টেবিলের ওপাশে বসে মধ্যবয়েসি এক অফিসার। বাঁশের মতো নীরস, শক্ত, সিধে। কঠিন চোখ। কিন্তু অধরোষ্ঠে অমায়িক হাসি। টেবিলের ওপর রুপোলি ফ্রেমে বাঁধানো ফ্যামিলি ফোটোগ্রাফ। ফুলদানিতে লাল-সাদা গোলাপগুচ্ছ। অ্যাশট্রের ওপর রাখা অর্ধদগ্ধ ত্রিচিনোপলী চুরুট। ঘরময় তাম্রকূটের কড়া গন্ধ।

প্রাথমিক আলাপচারীর পর সিকিউরিটি ব্যবস্থার জন্যে কর্নেলকে অভিনন্দন জানালে ইন্দ্রনাথ। বলল, 'এত চেক আর ডবল চেক পেরিয়ে পঞ্চমবাহিনীর ক্ষমতা নেই এখানকার খবর বাইরে নিয়ে যাওয়ার।'

'তা ঠিক। তবে সি. বি. আই. আর দিল্লি দপ্তর থেকে যদি কিছু ফাঁস হয়ে যায় তো আমরা নিরুপায়।'

এ তো প্রচ্ছন্ন খোঁচা নয়, সরাসরি আক্রমণ। কর্নেল যে বিচক্ষণ চটেছেন সি.বি. আই.-এর হস্তক্ষেপে, তাতে সন্দেহ নেই।

হেসে জবাব দিল ইন্দ্রনাথ, 'তা যা বলেছেন। আচ্ছা, এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে এবার আর কিছু জেনেছেন, মানে মিস্টার ত্রিপাঠী ফোন করার পর নতুন খবর এসেছে?'

'বুলেটটা পাওয়া গেছে। আর্মি বুলেট, নাগরা শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। খুব সম্ভব তিরিশ গজ দূর থেকে ছোড়া হয়েছে, দশ গজ বাদ দেওয়াও যেতে পারে, যোগ করাও যেতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায়, এঁকেবেঁকে না চলে সিধে চলছিল আমাদের ডিসপ্যাচ রাইডার, তা হলে বুঝতে হবে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় ছোড়া হয়েছে বুলেটটা। যেহেতু রাস্তায় ফায়ারিং-এর প্রশ্ন উঠছেই না, সুতরাং নিশ্চয় কোনও গাড়িতে চেপেই পিছু নিয়েছিল হত্যাকারী।'

'সেক্ষেত্রে ড্রাইভিং আয়নায় তাকে নিশ্চয় দেখতে পেত আপনার লোক?'

'খুব সম্ভব পেত।'

'কেউ পিছু নিয়েছে জানাতে পারলে, চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে বিশেষ কোনও নির্দেশ কি আপনার লোকজনদের দেওয়া হয়?'

'হয় বইকী।' মৃদু হেসে বললেন কর্নেল, 'বলা হয় টপ স্পিডে ঝড়ের মতো হাওয়া হয়ে যেতে।'

'আপনার এ লোকটি কত স্পিডে আছাড় খেয়েছে?'

'খুব বেশি নয়। তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। কী বলতে চান, বলুন তো?'

'খুনটি পাকা হাতের কী শৌখিন হাতের, এ বিষয়ে এখনও আপনারা মনস্থির করতে পেরেছেন কি না জানি না। কিন্তু আমি পেরেছি। ধরে নিচ্ছি, আয়নার বুকে পিছনের আততায়ীকে দেখেছিল আপনার লোক, এবং দেখবার পরেও সে স্পিড বাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করেনি। সুতরাং আমরা অনায়াসেই বলতে পারি, পিছনের লোকটিকে সে শত্রু হিসেবে দেখেনি, দেখেছে বন্ধু হিসেবে। তা থেকে আমরা পাচ্ছি কী? না আততায়ী এমন একটা ছদ্মবেশ নিয়েছিল, যা ওই পরিবেশে, এমনকী অত সকালেও, অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে আপনার লোকের কাছে।'

ধীরে ধীরে ভ্রুকুটি ঘনিয়ে উঠছিল কর্নেল বেবরের মসৃণ ললাটে। ইন্দ্রনাথ স্তব্ধ হতেই ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'মিস্টার রুদ্র, আপনি যে পয়েন্টটা বললেন, এ নিয়েও ভেবেছি আমরা। গতকাল দুপুরে ওপর-তলা থেকে জরুরি নির্দেশ আসার সঙ্গে-সঙ্গে সিকিউরিটি কমিটি তৈরি হয়ে গেছে। আর সেই মুহূর্ত থেকে কোনও সম্ভাবনাই বিবেচনা করতে বাকি রাখিনি আমরা মিস্টার রুদ্র', বলে, একহাত তুলে গভীর হতাশার অভিব্যক্তি স্বরূপ আবার ব্লটিং প্যাডের ওপর নামিয়ে আনতে-আনতে বললেন কর্নেল, 'কেসটা সম্বন্ধে আমরা যা ভেবেছি, তা ছাড়াও, মৌলিক কোনও পয়েন্ট যদি কারও মাথায় এসে থাকে তো বলতে হবে, মগজের গ্রে ম্যাটারের দিক দিয়ে তিনি আইনস্টাইনের সমতুল্য। নতুন করে ভাববার, নতুন করে আলোচনা করার মতো কোনও বিষয়ই আর নেই এ কেসে।'

এবার সহানুভূতির হাসি হাসল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল, 'সেক্ষেত্রে আজ রাত্রে আপনার আর সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনাদের আলোচনার পুরো রেকর্ডগুলো যদি আমাকে দেখতে দেন, তা হলে কেসটা সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হতে পারি। আর, আজ রাত্রে আমি হাউসবোটে ফিরতে চাই না।' বলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল ইন্দ্রনাথ : 'বিভীষণবাহিনীর কাছে আমার মাথার দাম এখন অনেক। দয়া করে আপনাদের ক্যান্টিন আর গেস্ট কোয়ার্টার দেখিয়ে দিতে বলবেন কাউকে?'

'নিশ্চয়-নিশ্চয়।' ঘণ্টা টিপে ধরলেন কর্নেল। কামরায় এক ছোকরা প্রবেশ করতেই বললেন, 'ভি. আই. পি. কোয়ার্টারে নিয়ে যাও। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও করবে।' তারপর ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরে : 'খেয়েদেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন। কাগজপত্র বার করে রাখছি। এ অফিসেই পাবেন। অফিসের বাইরে নিয়ে যাওয়া অবশ্য সম্ভব হবে না। তা হলেও আপনার যা-যা দরকার একে বলবেন, এনে দেবে।' হাত বাড়িয়ে দিয়ে : 'ঠিক আছে? কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

গুড নাইট জানিয়ে কাদমহীটি ছোকরার পিছন-পিছন বেরিয়ে এল ইন্দ্রনাথ। সুদীর্ঘ করিডর বরাবর হাঁটতে-হাঁটতে মনটা আবার দমে গেল। জীবনে অনেক বিপজ্জনক মামলার ঝুঁকি মাথা পেতে সে নিয়েছে, কিন্তু এরকম অসহায় কখনও বোধ করেনি। আশার এতটুকু রশ্মি নেই কোথাও। আর্মি ফোর্স ইনটেলিজেন্স আর সি. বি. আই.-এর বাঘা-বাঘা গোয়েন্দারা যেখানে নাজেহাল হয়ে গেছে, সেখানে ওর মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির এ হঠকারিতা

চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। ভি. আই. পি. কোয়ার্টারের নরম গদিতে স্বাচ্ছন্দ্যে শয়ন করে সে-রাত্রে ইন্দ্রনাথ রুদ্র মনে-মনে হিসেব করে নিল, খুব জোর দিন দুয়েক কেসটা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে, পাঞ্জাবনুহিতা তোশনীর নধকান্ত উপভোগ করবে এবং তারপরেই গুটোবে পাততাড়ি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তলাতল-কাহিনি

দু'দিন নয়, চারদিন পরে যখন ভোরের আলো উঠল তিনকো জঙ্গলের মাথায়, দেখা গেল একটা মস্ত অশ্বত্থ গাছের মোটা শাখায় শুয়ে আছে ইন্দ্রনাথ। নজর রয়েছে বনতলের এক টুকরো সবুজ ভূমিখণ্ডের ওপর। বনভূমির চারদিকেই ঘন জঙ্গল। এক দিকের পাইনগাছগুলোর ঋজু সমুন্নত কাণ্ড জ্বলছে মোমবাতির সলিলক রং আলোর মতো। গাছের মাথায় বাতাসে কাঁপা পাতার মর্মরধ্বনি। মানুষের হাতের মতো লম্বা নরম কাঁটায় ভরা ঝুলানো ডালগুলো ভোরের সূর্যের আলোকে সোনার গুঁড়োয় পরিণত হয়েছে।

এই পাইন-বীথিকার পরেই রাস্তা। এবং এই পাইনসারির জন্যেই সবুজ ভূমিখণ্ড থেকে চোখে পড়ে না সড়কটা—যে সড়কে চারদিন আগেই নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়ে গেছে তরুণ ডিসপ্যাচ রাইডার হুকুম বরকোদার।

ইন্দ্রনাথ রুদ্রের আপাদমস্তক বিচিত্র পোশাকে আচ্ছাদিত। হুরীবাহিনীর দুঃসাহসী সৈনিকরাই শত্রু এলাকায় নামবার আগে এ ধরনের পোশাক পরে নেয়। সাদা অঙ্গে সবুজ, বাদামি আর কালোর ছোপ আর ডোরা—গাছের পাতার সঙ্গে মিশে থেকে শত্রুর গোল-গুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর অপরূপ কল। দুহাতও ঢাকা এই একই রঙের পোশাকে। মাথার ওপর একটা 'হুড'। চোখ আর মুখের জন্যে শুধু দুটো ফুটো সেই মুখাবরণে। শত্রুকে ধাঁধা দেওয়ার পক্ষে অভিনব ক্যামোফ্লেজ সন্দেহ নেই। সূর্য উঠলে এ ধাঁধা আরও নিখুঁত হয়ে ওঠে। তখন আরও গাঢ় হয়ে ওঠে ছায়া এবং গাছের ঠিক নিচে দাঁড়িয়েও গাছের ওপরে ঘাপটি মেরে থাকা বিচিত্র উর্দি-পরা মানুষটিকে কেউ দেখতে পায় না।

সিকিউরিটি রাঙে দু-দুটো দিন বেকার নষ্ট হয়েছে। তার চাইতে বেশি কিছু আশাও করেনি ইন্দ্রনাথ। লাভ কিছুই হয়নি, নতুন কোনও তথ্যই আবিষ্কার করতে পারেনি সে। দুর্নামই হয়েছে। একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করার ফলে, একই জেরা নতুন করে শুরু করার ফলে অনেকেরই অপ্রিয় হতে হয়েছে। তৃতীয় দিন সকালে সরে পড়ার মতলব আঁটছে ইন্দ্রনাথ; ভাবছে, যাওয়ার আগে একটা টেলিফোন করে যাওয়া যাক কর্নেলকে, এমনসময়ে স্বয়ং কর্নেলই টেলিফোন করলেন তাকে। বললেন, 'মিস্টার রুদ্র নাকি? ভাবলাম, খবরটা আপনাকে দেওয়া দরকার। কাল শেষরাতের দিকে পুলিশ-কুকুরের শেষ দলটাও ফিরে এসেছে। গোটা জঙ্গলটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজলে সূত্র পাওয়া যাবে বলে আপনি যে থিওরি পেশ করেছিলেন, তারও ইতি হল সেই সঙ্গে। দুঃখিত,' স্বরটা দুঃখিত মনে হল না : 'কিছুই পাওয়া যায়নি। কিসসু না।'

'মিছেই সময় নষ্ট করলাম এখানে।' কর্নেলের মেজাজ খিঁচড়ে দেওয়ার জন্যেই বাঁকা-সুরে বলে ইন্দ্রনাথ, 'দয়া করে আপনার ডিউটি অফিসারকে এদিকে ঘুরে যেতে বলবেন?'

'নিশ্চয় বলব। যা চাইবেন, তাই পাবেন। ভালো কথা মিস্টার রুদ্র, এখানে আর কদ্দিন থাকার প্রোগ্রাম আছে আপনার, জানতে পারলে ভালো হয়। আরও কিছুদিন আপনার সঙ্গ পেলে খুশি হতাম। কিন্তু সমস্যা হয়েছে আপনার ঘরটা নিয়ে। দিল্লী থেকে নাকি একটা বড় পার্টি আসছে দিন কয়েকের মধ্যেই। টপ লেভেল অফিসারস। শুনলাম, আপনার ওখানে ওয়াগার বড় অভাব।'

কর্নেল রাজবাল্লিয়া খেবরের সঙ্গে সুখে ঘরকান্না করার কোনও বাসনাই ছিল না ইন্দ্রনাথের, এবং সেদিনই সকালে বেরিয়ে পড়ার মতলব আঁটছিল সে। তাই কথাটা শুনে টেলিফোনেই অমায়িক হাসি হেসে বললে, 'তা বেশ, তা বেশ, আমি বরং একবার সি. বি. আই. চিফকে টেলিফোন করে নিই। উনি কী বলেন শুনে আপনাকে ফোন করছি।'

'দয়া করে তাই করুন।' একই রকম অমায়িক সুরে জবাব দিলেন কর্নেল, এবং একই সঙ্গে সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখল দুজনে।

ডিউটি অফিসার এলেন মিনিট কয়েকের মধ্যেই। চটপটে ছোকরা। ধূর্ত চোখ। ইন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে গেল ডিউটি রুমে। ছোট্ট ঘর। হুক থেকে ঝুলছে বাইনকুলার, ওয়াটার-প্রুফ, গামবুট এবং আরও কত কী টুকিটাকি জিনিস। রাইটিং টেবিলের ওপর পাতা ডিসকো জঙ্গলের একটা ম্যাপ। একটা জায়গা পেনসিল দিয়ে বর্গক্ষেত্রের আকারে চিহ্নিত করা। ম্যাপটা দেখিয়ে বললেন ডিউটি অফিসার, 'প্রতি বর্গইঞ্চি জায়গা খুঁজে এসেছে আমাদের অ্যালসেশিয়ানের দল। কিচ্ছু পাওয়া যায়নি।'

'আপনি কি বলতে চান, কোথাও এদের চেন টেনেও ধরা হয়নি?'

মাথা চুলকে বললেন ডিউটি অফিসার, 'না; তা অবশ্য বলতে চাই না। দু-একটা খরগোশ নিয়ে দাপাদাপি শুরু করেছিল হতভাগারা। একবার একজোড়া শেয়ালও দেখেছিল। সরিয়ে নিয়ে যেতে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছে আমাদের। খুব সম্ভব জিপসিদের গন্ধও পেয়েছিল কুকুরগুলো।'

'ও।' খুব উৎসাহিত বোধ করল না ইন্দ্রনাথ—'জিপসিদের কোথায় দেখেছিলেন? ম্যাপের ওপর দেখান।'

অঙ্গুলি-নির্দেশ জায়গাটা দেখালেন ডিউটি অফিসার, 'নামগুলো সবই সেকেলে। এই হল কাপ্রিগুজা। আর, এখানেই খুন হয়েছিল আমাদের ডিসপ্যাচ রাইডার। জায়গাটির নাম? লালবনি। এই যে ব্রিজটা টানলাম, এর তলাতেই পড়েছে ডমরুবাগ। যে রাস্তায় খুনটা হয়েছে, তাকে আড়াআড়িভাবে ক্রস করছে এই চন্দ্রনালা।' পকেট থেকে একটা পেন্সিল বার করে ক্রস চিহ্নের ঠিক মাঝে একটা ফুটকি দিয়ে বললেন, 'ফাঁকা জায়গাটা এইখানেই—ব্রিজের কাছে। পুরো শীতকালটা একটা জিপসি দল আড্ডা গেড়েছিল এখানে। গতমাসে গেছে। জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে বটে, কিন্তু ওদের কুকুরের পায়ের গন্ধ এখনও মালকরোক থাকবে।'

কুকুরগুলো দেখল ইন্দ্রনাথ। সবাই যেন নেকড়ের বাচ্চা। তারপর ডিউটি অফিসারকে ধন্যবাদ দিয়ে টুকিটাক কয়েকটা জিনিস নিয়ে উঠে পড়ল নিজের জিপে।

ঝড়ের বেগে ডিসকো জঙ্গলে পৌঁছতে বেশি দেরি হয়নি। আশপাশের গ্রামে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, জিপসিরা সত্যিই ছিল এখানে। ছ'জন পুরুষ, দুজন মেয়ে। গাঁয়ে চুরি-চামারি করেনি, কোনও উৎপাতও করেনি। কবে গেছে? তা কেউ বলতে পারবে

না। কেউ দেখেনি। হঠাৎ একদিন জানা গেল জিপসিরা আর নেই। হপ্তাখানেক হল গেছে। জায়গাটা কিন্তু পছন্দ করেছিল ভালোই। নিরিবিলি।

কুখ্যাত রাস্তাটা ধরেই জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি ঢোকাল ইন্দ্রনাথ। দূর থেকে ব্রিজটা দেখা যেতেই গতি বৃদ্ধি করে সিকি-মাইল থাকতেই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল, নিঃশব্দে গড়িয়ে চলল জিপ এবং ব্রিজের ওপর উঠে ঢালু পথে নামা শুরু হতেই ব্রেক কষে মার্জারের মতো শব্দহীন চরণে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। নির্জন বনভূমির মধ্যে এতখানি হুঁশিয়ারির জন্যে নিজেকে একটু বোকা-বোকাই মনে হয়। তবুও পা টিপে-টিপে ঢুকে পড়ে জঙ্গলের মধ্যে। এই অঞ্চলেরই একটুকরো ফাঁকা জায়গায় ডেরা নিয়েছিল জিপসিরা। সন্ধানী চোখ সেই উন্মুক্ত অংশটুকুই অন্বেষণ করতে থাকে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

বেশি খুঁজতে হয় না। গাছপালার কুঞ্জিপুঞ্জ ভেতরেই রয়েছে একখণ্ড সবুজ তৃণভূমি। কিনারায় দাঁড়িয়ে, ঝোপঝাড় আর গাছপালার অন্তরালে থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে নিল গোটা জমিটার ওপর। তারপর, অতি সন্তর্পণে, অত্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে পা দিল জমিতে। সতর্ক পদক্ষেপে পেরিয়ে এসে দাঁড়াল এদিকের প্রান্তে।

দুটো টেনিস কোর্ট জুড়লে যা হয়, খোলা জায়গাটার মাপও তাই। পুরু গালিচার মতোই ঘন ঘাসের স্তরে ঢাকা। শ্যাওলা ফুলও আছে প্রচুর। কিছু টিউলিপ আর প্যানজি ফুলের স্তবকও শোভা পাচ্ছে কিনারা বরাবর। একধারে রয়েছে একটা নিচু ঢিপি। কাঁটা গোলাপের ঘন ঝোপে আগাগোড়া ঢাকা। অজস্র ফুল ফুটেছে ঝোপটায়। ঝরা-পাপড়ি গড়িয়ে পড়েছে ঢিবির গোড়া পর্যন্ত।

ঝোপটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। তাতেও মন ভরল না। গোটা ঢিবিটাকে একটা পাক দিয়ে এল। হেঁট হয়ে শেকড় পর্যন্ত দেখল তীক্ষ্ণ চোখে। কিন্তু মাটি আর ঝরা পাপড়ি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

শিকারের মতো অনুবীক্ষণ চোখে তন্ন তন্ন করে গোটা মাঠটাকে দেখে নিল ইন্দ্রনাথ। তারপর এসে দাঁড়াল এমন একটা কোণে, যেখান থেকে রাস্তা সবচাইতে কাছে। এখান দিয়ে গাছপালার মধ্যে পথ করে যাওয়া অনেকটা সহজ। এই জন্যেই কি ঘাসজমির ওপর চলাচলের একটা রেখা ফুটে উঠেছে? ঘাসগুলো যেন দোমড়ানো, লোকচলাচলের আবছা চিহ্ন না?

পথটা জিপসিদের পায়ে পায়েও সৃষ্টি হতে পারে। অথবা বনভোজন উৎসাহী তরুণ-তরুণীদের দাপটেও সম্ভব। রাস্তার একদম ধারে দুটো গাছের মাঝ দিয়ে পথটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে।

গুঁড়িদুটো পরীক্ষা করার জন্যেই হেঁট হয়েছিল ইন্দ্রনাথ। ঘ্রাণ নিয়েছিল। তারপর জানু পেতে বসে নখ দিয়ে গুঁড়ির ছাল থেকে তুলে এনেছিল কাদার একটা পাতলা চাপড়া।

কাদার নিচেই গুঁড়ির ওপর একটা সুস্পষ্ট আঁচড় চিহ্ন। গভীর দাগ। বাঁ-হাতে কাদার চাপড়াটা ধরে থুথু ছিটিয়ে ভিজিয়ে নিলে ইন্দ্রনাথ এবং আবার সযত্নে ঢেকে দিল আঁচড়ের দাগটা—যেমন ছিল ঠিক তেমনিভাবে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই শেষ হল গুঁড়ি পরীক্ষা। দেখা গেল, এদিকের গুঁড়িতে রয়েছে সবশুদ্ধ তিনটে আঁচড়ের চিহ্ন আর ওদিকের গুঁড়িতে চারটে।

দ্রুত পদক্ষেপে বনভূমি ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। ঢালু জায়গায় দাঁড় করানো ছিল জীপটা। ব্রেক ছেড়ে দিতেই গড়িয়ে নেমে এল বেশ খানিকটা। এবং ফাঁকা জায়গাটা থেকে বেশ খানিকটা দূরে না আসা পর্যন্ত এঞ্জিন চালু করল না, কারণ সাহসও হল না।

তাই আবার ফিরে এসেছে ইন্দ্রনাথ, এসেছে সেই নির্জন বনতলে। এবার আর ঘাসের ওপর নয়, গাছের ওপর। এসেছে অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত এত প্রচেষ্টা ভস্মে ঘি ঢালার সামিল হবে কি না, সে শঙ্কাটাও মনে আছে। কিছুতেই তাই বাড়ি থাকতে পারেনি।

জিপসি রহস্যটাই ভাবিয়ে তুলেছে ইন্দ্রনাথকে। অথচ এটাকে ঠিক রহস্যও বলা চলে না। সীমাহীন আঁধারের মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে-ঘুরতে এ যেন একফোঁটা আলোকরশ্মি—যা মরীচিকার সামিল।

কুকুরগুলো এ অঞ্চলে চঞ্চল হয়েছিল...ডিউটি অফিসারের মতে এ চঞ্চলতা নাকি জিপসিদের কুকুরের পালেরই রয়ে যাওয়া গন্ধ শুঁকে...প্রায় পুরো শীতকালটাই ওরা ছিল এখানে...গেছে কিছুদিন আগে...। গ্রামবাসীদের কোনও অভিযোগ নেই...কোথাও কোনও উৎপাত কী ছিঁচকে চুরিও দেখা যায়নি...হঠাৎ একদিন রাত ভোর হতেই দেখা গেল উধাও হয়েছে জিপসির দল।

একেই বলে অদৃশ্য সূত্র। অদৃশ্য মানুষের সূত্র। ঘটনার পটভূমিকায় যারা রয়েছে, তারা এতই পরিচিত যে ভুলেও মনে হয় না নাটের গুরু ওরাই। ছজন পুরুষ আর দুজন মেয়ে ছিল জিপসিদের দলে। চোখে ধুলো দেওয়ার মতলব থাকলে জিপসির ছদ্মবেশে সুবিধে কিন্তু অনেক। স্থানীয় ভাষা না জানলেও কিছু এসে যায় না। আর ভাষা না-জানার ফলে তল্লাটের কারও সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে দিব্যি নিজের কাজটি গুছিয়ে যায়।

পুরো শীতকালটা ওরা ছিল এখানে। যখন বরফ পড়েছে মাঠে-ঘাটে, তখনও নড়েনি। কী করেছে এতদিন? গুপ্তঘাঁটি বানায়নি তো? গোপন বিবর গড়েছে ইন্ডিয়ান আর্মির চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে এবং মোক্ষম সুযোগ বুঝে কোপ মারার মতলবে? টপসিক্রেট কাগজপত্র ছিনিয়ে আনার পক্ষে ষড়যন্ত্রটা মন্দ নয়।

কে জানে, হয়তো সবটাই ইন্দ্রনাথের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা, চমকপ্রদ ফ্যানটাসি রচনা। অন্তত এই ধারণা ইন্দ্রনাথের ছিল সেদিন পর্যন্ত। কিন্তু যখনই গাছের গোড়ায় দেখেছে রহস্যজনক আঁচড়-চিহ্ন, তখনই ফ্যানটাসি ফাঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সন্দেহ যুক্তির শেকড় পেয়েছে।

দু-দুটো গাছের গুঁড়িতে আঁচড়-চিহ্ন অত্যন্ত যত্নসহকারে কাদামাটি দিয়ে লেপা। প্রত্যেকটা চিহ্নই রয়েছে বিশেষ উচ্চতায়, যে উচ্চতায় ঠেলে নিয়ে-যাওয়া যে কোনও ধরনের সাইকেলের প্যাডেলের ঘষা লেগেই গাছের ছালে এ আঁচড় লাগা সম্ভব।

হয়তো সমস্তটা অসম্ভব সুখ-কল্পনা। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষীণ এই সূত্রটাই ইন্দ্রনাথ রুদ্রের পক্ষে যথেষ্ট।

একটা সমস্যা তবুও খচখচ করতে থাকে মনের মধ্যে। আবার হানা দেওয়ার সাহস কি হবে বিবরবাসীদের? হয়তো শুধু একবারই তারা ছোঁ মেরেছে বাজপাখির মতো। আর ফিরবে না।

আর যদি তারা দুরন্ত দুঃসাহসী হয়, তবে নিজেদের নিরাপত্তা তুচ্ছ করে আবার বেরিয়ে আসবে গোপন কন্দর ছেড়ে।

অনুমিতিটা রাকেশ ত্রিপাঠীর কাছে ছাড়া আর কারও কাছে বলেনি ইন্দ্রনাথ। গোপনীয়তা ও হুঁশিয়ার ছিল যেমনই। সব শুনে গম্ভীর থাকতে বলেছে ইন্দ্রনাথকে। ত্রিপাঠী সঙ্গে-সঙ্গে লাড়ু ক্যাম্পকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন সর্বতোভাবে ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে সাহায্য করার জন্যে। কর্নেল দেবকে বিদায় জানিয়ে শ্রীনগরে আর ফেরেনি ইন্দ্রনাথ। আশ্রয় নিয়েছে সি. বি. আই.-এর এক সুরক্ষিত ঘাঁটিতে—বাইরে থেকে যাকে দেখে গুপ্তচর কেন্দ্র বলে মনে হয় না—মনে হয় অতি সাধারণ এক গেরস্তবাড়ি। এই ঘাঁটি থেকেই ক্যামেফ্লেজ পোশাক পেয়েছে সে, পেয়েছে চারজন সি. বি. আই. জোয়ানকে শাগরেদরূপে। চারজনই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এসেছে—সর্বতোভাবে ইন্দ্রনাথ রুদ্রের নির্দেশ পালন করে শত্রুনিপাত করতেই হবে এবং তাহলেই একই সঙ্গে দর্পচূর্ণ হবে আর্মি কোর ইনটেলিজেন্সের, গৌরব বৃদ্ধি পাবে সি. বি. আই.-এর।

আখরোট শাখায় শুয়ে নিজের মনেই হাসল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। যুদ্ধ শুধু বাইরে নয়, যুদ্ধ ভেতরে। দুটো দলেরই উদ্দেশ্য এক—শত্রু উচ্ছেদ। অথচ নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে কী বিপুল উদ্যমশক্তিরই না অপচয় করছে। নিজেদের মধ্যে আগুন ছোড়াছুড়ি না করে যদি শত্রুর দিকেই তা যুগপৎ নিক্ষিপ্ত হতো, তাহলে পঞ্চমবাহিনীর অস্তিত্ব কোনকালে মুছে যেত ভারতের বুক থেকে।

সাড়ে ছটা বাজে। প্রাতরাশ খাবার সময় হল। সন্তর্পণে ইন্দ্রনাথের ডান হাত বিচিত্র পোশাকের পকেট হাতড়াতে লাগল এবং তারপরেই উঠে এল মুখের জায়গায় শুড়ের ওপর কাটা ফাঁকটুকুর সামনে। রয়ে-সয়ে অনেকক্ষণ ধরে চুষল গ্লুকোজ ট্যাবলেটটা। তারপর আর-একটা। চোখ কিন্তু সরল না উন্মুক্ত তৃণভূমির ওপর থেকে। লাল কাঠবেড়ালিটা অনেকক্ষণ থেকেই খেলা জুড়েছে ঢিবির আশেপাশে, কুটকুট করে খাচ্ছে ছোট ছোট শেকড়। অবশেষে ঢিবির তলায় এসে দু-থাবার মধ্যে নতুন একটা খাবার ধরে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাই নিয়ে। ঘন ঘাসের মধ্যে ছটোপাটি করছিল একজোড়া বুনো পায়রা। বনভূমির নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হচ্ছিল কেবল ওদেরই প্রেমকূজনে। একটা কাঁটাঝোপের ওপর বাসা নির্মাণ করার জন্যে টুকিটাকি বস্তু সংগ্রহে নিদারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল একজোড়া চড়ুই। গোলাপঝোপের ওপর ঐকতানে শুরু করে দিল মধুমক্ষিকার দল। মনে ক্রমশ ভারী হচ্ছে ওরা। নিশপিশ দূরে থেকে ডালপাতার আড়ালে আখরোট শাখায় শুয়ে সমস্তই স্পষ্ট দেখতে পেল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এ যেন ঠাকুরমার ঝুলি থেকে আহরণ করা একটা অপরূপ দৃশ্য। দীর্ঘ সমুন্নত বৃক্ষের শির ছুঁইয়ে অরুণকিরণ স্বর্ণধারার মতো ঝরে পড়ছে আশ্চর্য সবুজ ঘাসজমির ওপর, নাচছে ভোমরা, গাইছে পাখি, আনন্দের হিল্লোলে হিল্লোলিত সতেজ ঘাসগুলিও। রাত সাড়ে চারটে থেকে গাছে উঠে ঘাপটি মেরে বসে আছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। রাতের অন্ধকার মিলিয়ে গেলে ভোর যে এমন অপরূপ হয়ে দেখা দেয়, তা এর আগে কখনও এমনভাবে প্রত্যক্ষ করেনি সে।

বিহঙ্গকুলের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। হতভাগারা ঝটাপটি করতে-করতে ইন্দ্রনাথের মাথায় এসে বসলেই কেলেঙ্কারি।

বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেতটা সর্বপ্রথম এল পায়রাদের কাছ থেকে। আচম্বিতে প্রচণ্ড

পাখা-ঝটপটানির শব্দ তুলে ভূমি ছেড়ে সবাই আশ্রয় নিল গাছের ডালে। তারপর বাকি পাখিরাও তৃণভূমি ছেড়ে সম্পটি দিল গাছ লক্ষ করে, সবশেষে কাঠবেড়ালির দল।

নীরব হয়ে গেল বনভূমি। গোলাপকুঞ্জের ওপর গুনগুন ভ্রমর-সঙ্গীত ছাড়া আর কোনও শব্দই নেই তৃণভূমিতে। নৈঃশব্দ্য। আশ্চর্য শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ্য।

ব্যাপার কী? কীসের জন্যে এই বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেত? কী দেখে ভয় পেল নিরীহ পায়রা, পাখি আর কাঠবেড়ালির দল?

ধীরে ধীরে উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল ইন্দ্রনাথ রুদ্রের হৃদপিণ্ড। দূরবিনের মতো তীক্ষ্ণ চোখদুটো তৃণভূমির প্রতি বর্গইঞ্চি স্থান খুঁটিয়ে দেখতে লাগল অস্বাভাবিক কোনও সূত্রের আশায়।

আর, তার পরেই ধড়াস করে উঠল বুকটা।

গোলাপঝোপের মধ্যে কী যেন নড়ছে না?

নড়াটা অত্যন্ত সামান্য, এত অল্প যে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। অথচ তা অসাধারণ। ধীরে ধীরে, ইঞ্চি-ইঞ্চি করে, একটি মাত্র কাঁটাবৃন্ত উঠে আসছে ওপরকার শাখার মাথা ছাড়িয়ে। অস্বাভাবিক রকমের সিধে আর মোটা একটা গোলাপবৃন্ত।

আস্তে-আস্তে উঠে আসতে লাগল বোঁটাটা। ঝোপের ফুটখানেক ওপরে না-ওঠা পর্যন্ত অব্যাহত রইল ঊর্ধ্বগতি। তারপরেই দাঁড়িয়ে গেল।

বোঁটাটার ডগায় একটি মাত্র লাল গোলাপ। ঝোপের ফুটখানেক ওপরে উঠে থাকার জন্যেই বুঝি অস্বাভাবিক লাগছিল গোলাপটা—তা নইলে কিছুই বোঝাবার উপায় নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, এ আর এমন আশ্চর্য কী। সিধে ডাঁটার ওপর একটা লাল গোলাপ। প্রকৃতির সৃষ্টিতে কত বৈচিত্র্য আছে—এও তার মধ্যে একটা, তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু এমন সুন্দর গোলাপটির মধ্যেই এবার ঘটল এক অকল্পনীয় পরিবর্তন। আচম্বিতে, অত্যন্ত ধীরে-ধীরে, নিঃশব্দে পাপড়িগুলো কাঁপতে লাগল, আস্তে-আস্তে খুলে যেতে লাগল এবং ঝুলে পড়তে লাগল বাইরের দিকে। হলুদ গর্ভকেশর ঘটিতে সরে গেল পাশে।

আর সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ল আধুলির মতো বড় কাচের লেন্সের ওপর।

মনে হল, লেন্সটা যেন সিধে তাকিয়ে রয়েছে ইন্দ্রনাথের পানেই। কিন্তু পরক্ষণেই আস্তে-আস্তে বোঁটার ওপর ঘুরে যেতে লাগল অবিশ্বাস্য এই গোলাপ-চক্ষু। অত্যন্ত ধীরে-ধীরে পুরো একটা পাক নিয়ে, সমস্ত তৃণভূমিটা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে, আবার ফিরে তাকাল ইন্দ্রনাথের পানে।

অবশেষে যেন নিশ্চিন্ত হয়েই আবার পাপড়ি আর গর্ভকেশরগুলো উঠে এসে ঢেকে দিল কাচ-চক্ষু, এবং ধীরে-ধীরে নজরে আসে না এমনি গতিতে নেমে গেল বিচ্ছিন্ন বোঁটাটা—মিশে এক হয়ে গেল অন্যান্য বৃন্তের সঙ্গে।

নিশ্বাস বন্ধ করে এতক্ষণ পড়েছিল ইন্দ্রনাথ। এবার যেন ছিপি-খোলা সোডার বোতলের মতোই পাঁজর খালি করে ফেলল। কষ্টের জন্যে চোখ মুদে অক্ষিস্নায়ুগুলোকেও একটু বিশ্রাম দিলে।

জিপসি। গোলাপবৃন্তের পেরিস্কোপ ঢাকা রঙ সাধারণ জিপসির মাথা থেকে বেরোয় না। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান, ব্রিটিশ, আমেরিকান, রাশিয়ান গুপ্তচরবাহিনীও যা ভাবতে

পারেনি, যে-কৌশল কল্পনাতেও আনতে পারেনি—কাশ্মীরের এই অখ্যাত তৃণভূমির পাতালপুরীতে তা সৃষ্টি করে গেছে কয়েকজন জিপসি। ঘাসে-ছাওয়া মাটির ঢিবির নিচে গর্ভগৃহ থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে গোলাপের ছদ্মবেশ পরানো অভিনব যন্ত্রচক্ষু। পেরিস্কোপ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুপ্তচরও যা পারেনি, তা সম্ভব হয়েছে চীন আর পাকিস্তানের চক্রান্তে!

ভয়ের হিমশীতল স্রোত ইন্দ্রনাথের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যায়। অনুমানটা তাহলে সঠিক! কিন্তু এর পরের দৃশ্যটা কী?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ মহাতল-কাহিনি

মাটির ঢিবির দিক থেকে এবার ভেসে এল একটা শব্দ।

অদ্ভুত শব্দ। যেন অতি উচ্চগ্রামে গুনগুন করছে অগুন্তি ভোমরা। অতি তীব্র এবং সেই জন্যেই প্রায়-অশ্রুত পাতাল ভ্রমর-গুঞ্জনের সেই অপার্থিব চাপা শব্দটা জাগ্রত হল নিরীহদর্শন গোলাপকুঞ্জের তলা থেকে।

ইলেকট্রিক মোটর চলার শব্দ। পুরোদমে চলছে মোটর।

আচম্বিতে ঈষৎ কেঁপে উঠল গোটা গোলাপের ঝাড়টা। সদলবলে শূন্যে উঠে পড়ল মধুমক্ষিকাবাহিনী। কিছুক্ষণ ভেসে থাকার পর আবার নেমে এল গোলাপঝাড়ে।

খুব ধীরে-ধীরে যেন বসুমতীর বুকে একটা চিড় দেখা দিয়েছে না সবুজ ধরিত্রীতে? গোলাপঝাড়ের ঠিক মাঝ বরাবর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ফাটলটা। ক্রমশ আরও চওড়া হয়ে যাচ্ছে। মসৃণ গতিতে যেন উন্মোচিত হচ্ছে নাগলোকের পাতাল-বিবর।

এবার হুবহু দু-পাল্লা দরজার মতোই গোলাপঝাড়ের দুপাশ খুলে যাচ্ছে দুদিকে। গাঢ় তমিস্রাচ্ছাদিত রন্ধ্রলোক আরও প্রকট হয়ে উঠছে। পাল্লার ভেতরের দিকে ঝুলছে গোলাপের শেকড় এবং শেকড় সমেত, গোলাপ সমেত ভূগর্ভ পুরীর সিং-দরজার বিশাল পাল্লা খুলে যাচ্ছে ধীরে-ধীরে।

আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কলকব্জার অতিতীব্র ভ্রমরগুঞ্জন। ঈষৎ বেঁকানো পাল্লা দুটোর কিনারা ঝিকমিক করছে সূর্যালোকে। ধাতু। চকচকে ধাতুর দরজা। তার ওপরে সযত্নে বর্ধিত গোলাপঝাড়।

শাবাশ বিভীষণবাহিনী! শাবাশ তোমাদের শয়তানি বুদ্ধি!

দু-ফালি হয়ে খুলে গেছে ধাতুর দরজা। দুপাশে খাড়া হয়ে রয়েছে দ্বিধাবিভক্ত গোলাপকুঞ্জ। নির্বিকার অলিকুল নিশ্চিন্ত মনে তখনও মধু আহরণে ব্যস্ত।

সূর্যের আলোয় এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মাটির তলায় পুরু কংক্রিট স্তর। যেন ভূগর্ভপ্রোথিত অতিকায় ডিম—যার ওপরটা হঠাৎ দুভাগ হয়ে গেছে ডাকিনী-মন্ত্রে।

রুদ্ধ দরজার মাঝে কালো আঁধার পাতলা হয়ে এসেছে ওপরের দিনের আলোয় আর ভেতরের ইলেকট্রিক আলোয়। মোটর চলার ক্রুদ্ধ গর্জন থেমে গেছে। ঝিকিমিকি বিদ্যুৎবাতি আড়াল করে এবার বিবর-মুখে আবির্ভূত হল একটা মাথা আর একজোড়া কাঁধ। উঠে আসছে মাথাটা।

চিতাবাঘের মতো নিঃশব্দ গতিতে সজাগ চাহনি মেলে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে

ডিউটি ডিসপ্যাচ রাইডারের বদলে আমাকে খুব খুশি মনেই পাঠাচ্ছেন কর্নেল বেকার। খুশিটি তিনি মুখেও প্রকাশ করছেন। সুতরাং এ অবস্থায় এর বেশি আর কিছু জানার অধিকার তাঁর নেই। তা ছাড়া, এ নিয়ে মাথা ঘামানোরও আর ইচ্ছে নেই ভদ্রলোকের। ফাইল ক্লোজ করে অন্য প্রসঙ্গ ভাবছেন। যা বলি শুনুন। লক্ষ্মীমেয়ের মতো টেলিপ্রিন্টারে রিপোর্টটা মিস্টার আচাওকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন—'

'গোল্লায় যাক আপনার মিস্টার আচাও! গোল্লায় যাক আপনার সি. বি. আই.।' হিস্টিরিয়া রোগিনীর মতো চেঁচিয়ে উঠেছে রোশনী : 'একি ছেলেখেলা হচ্ছে? প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা?'

বিরক্তি আর চাপতে পারে না ইন্দ্রনাথ। খেঁকিয়ে উঠে বলে, 'হয়েছে-হয়েছে, অনেক হয়েছে! এখুনি টেলিপ্রিন্টারে পাঠিয়ে দিন রিপোর্টটা। দিস ইজ মাই অর্ডার।'

আরক্ত মুখে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে হাল ছেড়ে দিল রোশনী। বললে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে—আর হুকুম জাহির করতে হবে না। যা করবার আমি করছি। কিন্তু সাবধানে থাকবেন। চোট না লাগে। গুড লাক।'

'এই তো লক্ষ্মীমেয়ের মতো কথা। কাল রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন রইল। কাশ্মীর গ্রিলই ভালো, কেমন? ওখানে বেহালাটা বাজায় ভালো। ট্রাউট মাছের ফ্রাইটাও ভারি মুখরোচক। রাজি?'

'রাজি।'

'অযথা ভাববেন না। আমি যমেরও অরুচি। গুডনাইট।'

'নাইট।'

রাতে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত গোটা প্ল্যানটাকে মনে-মনে ঘষে-মেজে ঝকঝকে তকতকে করে তুলল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ডিউটি বুঝিয়ে দিলে সি. বি. আই.-এর চার জোয়ানকে। সবশেষে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিরাট একটা চিঠি লিখল প্রিয়বন্ধু মৃগাঙ্ক রায় এবং কবিতা-বউদিকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : পাতাল-কাহিনি

আর-একটি সুন্দর সকাল।

বিরাট প্রাসাদের স্তম্ভসারির মতো বহু উঁচুতে উঠে গেছে গাছগুলোর ঋজু উন্নত সুন্দর গুঁড়ি। মাথার ওপর ডালে-ডালে জড়াজড়ি হয়ে যে পাতার গম্বুজ তৈরি হয়েছে, তার সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়েছে সোনার আগুন, সোনালি সূর্যের আলো এক অদৃশ্য ভাস্করও যেন খোদাই করেছে অদ্ভুত উন্নত গাছগুলো। মাটি ছেয়ে গেছে ঝরা পাতা, পচা ফল আর ডালপালায়। এখানে-ওখানে তারার মতো ফুটে রয়েছে উজ্জ্বল রঙিন ফুল। মাটির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রজাপতি। ডানায় তাদের অপূর্ব বর্ণসুষমা—উজ্জ্বল মখমল কালোর সঙ্গে ইস্পাত-নীল, লাল, সোনালি আর রুপোলি রং। এ যেন অদ্ভুত অজানা প্রকৃতির নানা গোপন রহস্যে ভরা এক নিবিড় পুরী।

অনাহুত আগন্তুকের মতো এই রহস্যময় প্রায়ান্ধকার অরণ্যপুরীতেই হানা দেওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। বেশ জাঁকিয়ে বসেছে বি. এস. এ. মোটরসাইকেলের ওপর। অনতিকাল পরেই স্টিয়ারিংয়ে চেপেই শুরু হবে তার দুঃসাহসিক অভিযান—জীবন আর মৃত্যুর জুয়োখেলা। পরিণামটা কী, তা ইন্দ্রনাথ নিজেও জানে না। স্বেচ্ছায় এতবড় বিপদের ঝুঁকি কখনও মাথা পেতে নেয়নি সে। কিন্তু আশ্চর্য! বিপদ আসন্ন জেনেই বুঝি আরও ধীর-স্থির-শান্ত হয়ে গেছে তার স্নায়ু।

সিগন্যাল কোরের করপোরাল ইন্দ্রনাথের হাতে তুলে দিলে শূন্য ডিসপ্যাচ কেসটা। বললে, 'আপনাকে দেখে স্যার মনে হচ্ছে জন্ম থেকেই ইন্ডিয়ান আর্মির ডিসপ্যাচ রাইডার। চুলটা অবশ্য একটু কাটলে ভালো হতো। কিন্তু ইউনিফর্মটা যা মানিয়েছে না, খাসা! বাইকটা কীরকম লাগছে, স্যার?'

'বাইক তো নয়, যেন পক্ষীরাজ! এমন ফাঁকা রাস্তায় কতদিন যে চালাইনি!'

ঘড়ির দিকে তাকাল করপোরাল। সিগন্যাল দেওয়ার সময় হয়েছে। চোখ তুলে বললে, 'সাতটা বাজতে আর দেরি নেই। ও. কে.!'

বুড়ো আঙুলের ইঙ্গিত পেতেই গগলসটা টেনে চোখের ওপর নামিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ। হাত নেড়ে করপোরালকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বুটের ঠোক্কর দিয়ে স্টার্ট দিল ইঞ্জিনে এবং কাঁকরবিছানো পথের ওপর দিয়ে সবেগে ঘুরে গিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল মেন গেটের মধ্যে দিয়ে।

পেরিয়ে গেল জলুসবাগ। দেখতে-দেখতে পেছনে পড়ে রইল অনন্তনাগ আর দৌলতপুর। এবার ডানদিকে মোড় নিতে হবে—নিলেই পড়বে খুনের রাস্তা। থামতেমের ওপর বাইক দাঁড় করিয়ে আর-একবার ২৫ কোল্টের লম্বা নলচেটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে ইন্দ্রনাথ। শার্টের বোতাম খুলে ফাঁক দিয়ে বেল্টে গুঁজে রাখল রিভলভারটা। এবার রওনা হওয়া যাক। ওয়ান টু থ্রি...!

চকিত ক্ষিপ্রতায় মোড় ঘুরল ইন্দ্রনাথ এবং নিমেষে গতিবেগ বৃদ্ধি করল ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলে। বহু দূর দেখা যাচ্ছে সুড়ঙ্গটা। পাহাড়ের বুক চিরে সুদীর্ঘ টানেল। দ্রুত মুখব্যাদান করে ইন্দ্রনাথকে গিলে ফেলল সুড়ঙ্গ। কানে তালা লাগার উপক্রম হল এঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দে...যেন মুহুর্মুহু কামান দাগার শব্দ। মিনিট খানেকের জন্যে সুড়ঙ্গপথের স্যাঁতসেঁতে শীতল হাওয়ার ঝাপটা লাগল মুখের ওপর। পরক্ষণেই আবার সূর্যালোক—টানেল-মুখ ছোট হয়ে যাচ্ছে পিছনে। ওই তো চশমবাগের সড়ক। ক্রস করেছে লালবানিতে। চোখের সামনে দিগন্তবিস্তৃত পিচঢালা পথ যেন তৈলসিক্ত ঔজ্জ্বল্যে জ্বলছে সোনালি আলোয়। মাইল দুয়েক পথ জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। পাতা আর শিশিরের মিষ্টি সৌরভ। গতিবেগ চল্লিশে কমিয়ে আনল ইন্দ্রনাথ। পিছনের ঝাঁকুনিতে থরথর করে কেঁপে উঠল বাঁহাতের ড্রাইভিং দর্পণ। আয়নার বুকে দ্রুত অপসৃয়মান বৃক্ষসারি আর সীমাহীন ফিতে সড়ক ছাড়া আর কোনও প্রতিবিম্ব নেই। জনশূন্য পথ। হত্যাকারীর চিহ্নমাত্র নেই।

তবে কি ভয় পেয়ে পাতালপুরীতেই ঘাপটি মেরে রয়েছে হত্যাকারী? হয়তো আগে থেকেই চর মারফত খবর পৌঁছে গেছে ভূগর্ভ ঘাঁটিতে, তাই আজ বিবর মধ্যেই আশ্রয় নিচ্ছে পাতালকেতু!

ওকি! ওকি! ওই তো একটা কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে না? পেটমোটা কনভেক্স

গ্লাসের ঠিক কেন্দ্রে একটিমাত্র ফুটকি...দেখতে-দেখতে তা পরিণত হল মাছিতে...মাছি ভীমরুলে...এবং ভীমরুল গুবরে পোকায়। এবার স্পষ্ট দেখা গেল একটা ইস্পাতের হেলমেট ঝুঁকে পড়েছে হ্যান্ডেলবারের ওপর। দুটো মস্ত কালো খাপ আঁকড়ে রয়েছে হ্যান্ডলগ্রিপ।

সর্বনাশ! এ যে দেখছি উল্কার মতো ছুটে আসছে! দর্পণের বুক থেকে চকিতে ইন্দ্রনাথের চোখ ঘুরে গেল সামনে বিস্তৃত পথের ওপর...পরক্ষণেই ফিরে এল কনভেক্স গ্লাসের ওপর। খুনেটার ডানহাত রিভলভারটা তুলে নিচ্ছে...

গতি কমিয়ে আনল ইন্দ্রনাথ দ্রুত—পঁয়তিরিশ, তিরিশ, কুড়ি। মসৃণ ধাতুর মতো ঝিকমিক করছে সামনের পিচঢালা পথ। আততায়ীর ডান হাতটা আর হ্যান্ডেলবার ধরে নেই। লৌহশিরস্ত্রাণের নিচে বিশাল দুটো গগল্‌সের কাচ সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে দু-খাবলা অঙ্গারের মতো।

সময় হয়েছে। ভয়ানক জোরে ব্রেক কষল ইন্দ্রনাথ এবং চক্ষের নিমেষে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে রাস্তার ওপর পিছলিয়ে বোঁ করে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল বি.এস.এ.-কে। সঙ্গে-সঙ্গে নীরব করে দিল ইঞ্জিন।

এমন আকস্মিক ক্ষিপ্রতা সত্ত্বেও দেরি করে ফেলেছিল ইন্দ্রনাথ। উপর্যুপরি দুবার গর্জে উঠল হত্যাকারীর আগ্নেয়াস্ত্র। একটা বুলেট ইন্দ্রনাথের উরুর পাশ দিয়ে গেঁথে গেল সিটের স্প্রিংয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কোল্ট রিভলভার।

টলমল করে উঠল মাত্র একবার। হত্যাকারীর মোটরবাইক। যেন অদৃশ্য দড়ির ফাঁস বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে হ্যাঁচকা টানে রাস্তার ওপর থেকে তুলে নিয়ে গেল বহুবান সমেত খুনে চালককে। এলোমেলো ভাবে সড়ক বেয়ে ছুটতে-ছুটতে একলাফে টপকে গেল পাশের খানা এবং পরক্ষণেই প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ল একটা পাইন গাছের গুঁড়ির ওপর। মুহূর্তের জন্যে গুঁড়ির গায়ে লেগে রইল বাইক আর চালক। তারপরেই ঝনঝন শব্দে গড়িয়ে পড়ল ঘাসের ওপর।

বাইক থেকে নেমে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। ধীর পদে গিয়ে দাঁড়াল ধোঁয়া-ওঠা দোমড়ানো ইস্পাত আর বিকৃতভাবে মোচড়ানো দেহটার পাশে। নাড়ি দেখবার আর দরকার হল না। বুলেট যেখানেই লাগুক না কেন, ক্র্যাশ হেলমেটটা ডিমের খোলার মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে।

ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। কোল্টটা আবার গুঁজে রাখল শার্টের ভেতরে বেল্টের ফাঁকে। কপাল ভালো তার। আততায়ীর বুলেট আর একচুল এদিক দিয়ে গেলেই...!

বি.এস.এ.-র ওপর লাফিয়ে বসল ইন্দ্রনাথ এবং দ্রুতবেগে ফিরে চলল লালবাদির দিকে।

জঙ্গলের মধ্যে আঁচড় কাটা একটা গাছের গুঁড়ির গায়ে বি.এস.এ. ঠেস দিয়ে দাঁড়াল খোলা মাঠটার কিনারায়। মাথার ওপর ঝাঁকড়া আখরোট গাছ। তাই জায়গাটা একটু ঘুপসি। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে যতদূর সম্ভব নকল করবার চেষ্টা করল সেই বিচিত্র শিস-ধ্বনির। যেন খুশি-মনে গান গেয়ে উঠল বনের পাখি। হত্যাকারীর সঙ্কেত।

একবারই শিস দিল ইন্দ্রনাথ। তারপর দুরু-দুরু বুকে শুরু হল প্রতীক্ষা। তবে কি ভুল হল শিসের সুরে?

ঠিক তখুনি কেঁপে উঠল গোলাপঝাড়। আরম্ভ হল উচ্চগ্রামের তীক্ষ্ণ তীব্র গোঁ-গোঁ গজরানি। মোটর চলছে!

কোল্টের ইঞ্চিখানেকের মধ্যে বেল্টের ফাঁকে বুড়ো আঙুল আটকে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। আর খুনখারাপি করার ইচ্ছে তার নেই। অনুচর দুজনকে সশস্ত্র বলে তো মনে হয়নি। কাজেই কী প্রয়োজন অযথা রক্তপাতের।

বাঁকানো দরজার পাল্লাদুটো দু-হাট হয়ে খুলে গেছে। ফাঁক দিয়ে প্রথমে বেরিয়ে এল একজন—তার পায়ে সেই অদ্ভুতদর্শন বিচিত্র সাইজের জুতো। তারপর আর-একজন।

চ্যাটালো জুতো! ধড়াস করে উঠল ইন্দ্রনাথের বুক। জুতোর কথাটা একদম মনেই ছিল না! নিশ্চয় ঝোপের মধ্যে কোথাও লুকোনো আছে জুতো জোড়া। আহাম্মক কোথাকার। দেখে ফেলল নাকি ওরা?

মন্থর চরণে হিসেব করে পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে এল দুই পাতালবাসী। একজন পীতমানব, অপরজন কৃষ্ণকায়। বিশ ফুট দূরে এসে কী যেন বলল কৃষ্ণমূর্তি। শব্দটা খাঁটি উর্দু, কিন্তু নিঃসন্দেহে সাঙ্কেতিক। তা না হলে বোধগম্য হবে না কেন? জবাব দিল না ইন্দ্রনাথ।

উত্তর না পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল দুই মূর্তি। বিস্ময়চকিত চোখে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথের পানে। সম্ভবত সাঙ্কেতিক প্রত্যুত্তরের আশায়।

বিপদ ঘনিয়ে আসছে। চক্ষের পলকে রিভলভারটা টেনে নিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে গর্জে উঠল, 'হ্যান্ডস্ আপ!'

কোল্টের নলচে দিয়ে হাত ওপরে তোলার ইঙ্গিত করে ইন্দ্রনাথ। সঙ্গে-সঙ্গে পুরোধা ব্যক্তি উচ্চস্বরে কী হুকুম দিয়েই ধেয়ে আসে সামনে। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি ছুটে যায় পাতালপুরীর দিকে।

গাছের আড়াল থেকে দড়াম করে ধমক দিয়ে উঠল একটা রাইফেল এবং ডান পা মুচড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পলায়মান হলদে মানুষ। এদিক সেদিক থেকে ছুটে আসছে সি. বি. আই.-এর চার জোয়ান।

এদিকে নওজোয়ান ইন্দ্রনাথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রথমজন। কোল্টের নলচে সমেত প্রচণ্ড বেগে লোকটার পেটে ঘুসি মারে ইন্দ্রনাথ। লাগল ঠিকই, কিন্তু তারপরেই মাথার ওপর যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল। একসঙ্গে দুজনেই গড়িয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। ইন্দ্রনাথের চোখ লক্ষ্য করে চকিতে এগিয়ে এল আঙুলের নখ। চক্ষের পলকে পাশে সরে গেল ইন্দ্রনাথ এবং সঙ্গে-সঙ্গে মোক্ষম একটা আপারকাট ঘুসিতে ছিটকে পড়ল জমির ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত দেহের ওপর লাফিয়ে পড়ল পাতালবাসী এবং ডান হাতের কবজি মুচড়ে ধরে রিভলভারের নলচের মুখ আস্তে আস্তে প্রচণ্ড শক্তিতে ফিরিয়ে দিতে লাগল ইন্দ্রনাথের দিকে।

আর খুন করার ইচ্ছে না বলেই সেফটি ক্যাচটা তুলে রেখেছিল ইন্দ্রনাথ। প্রাণপণ চেষ্টায় বুড়ো আঙুলটা সরিয়ে আনতে লাগল সেফটি ক্যাচের দিকে।

তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড লাথি এসে পড়ল মাথার পাশে। মাথা ঘুরে গেল। অবশ হাত

থেকে খসে পড়ল রিভলভারটা। লালচে কুয়াশার মধ্যে দেখল কোল্টের মৃত্যুমুখী নলচে অব্যর্থ নিশানায় স্থির হয়ে গেল তার খুলি টিপ করে।

মৃত্যু—এবার মৃত্যু! দয়া করতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে চলেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। কিন্তু একি!

আচম্বিতে উধাও হল কোল্টের কালো নলচে। দেহের ওপর থেকে সরে গেল লোকটার গুরুভার দেহ। টলতে-টলতে হাঁটুর ওপর উঠে বসল ইন্দ্রনাথ। তারপর দাঁড়াল সিধে হয়ে। পায়ের কাছেই চিৎপাত হয়ে পড়ে রয়েছে মুখোশ লোকটা। নিশ্চল—নিস্পন্দ।

আশেপাশে তাকাল ইন্দ্রনাথ। সি. বি. আই.-এর চার জোয়ান দাঁড়িয়ে দল বেঁধে। স্ট্র্যাপ খুলে এ্যাশ হেলমেটটা হাতে নিয়ে মাথার পাশটা রগড়াতে-রগড়াতে বলল ইন্দ্রনাথ ঃ 'শাবাশ! কাজটা কার?'

কেউ জবাব দিল না। চারজনেই কেমন জানি বিমূঢ়।

ইন্দ্রনাথ নিজেও থাবড়ে গেল। লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে শুধোলে, 'ব্যাপার কী?'

হঠাৎ চোখে পড়ল দলবদ্ধ চার ব্যক্তির পিছনে কী যেন একটা নড়ছে। দেখা গেল আর-একটা বাড়তি পা। মেয়েলি পা।

অট্টহাস্য করে ওঠে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। আর কষ্টে হাসি চাপে চার জোয়ান। পেছন থেকে সামনে এসে দাঁড়ায় সুন্দরী রোশনী। পরনে তার বাদামি শার্ট আর কালো জিনস। এক হাতে ২২ টার্গেট পিস্তল।

পিস্তলটি কোমরের বেল্টে গুঁজতে-গুঁজতে ইন্দ্রনাথের সামনে এসে দাঁড়াল রোশনী। বললে, 'দোষটা এদের নয়, আমার। আপনাকে একলা ছেড়ে দিতে মন চাইল না তাই এলাম। আর এসেছিলাম বলেই এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন। পাছে আপনার গায়ে গুলি লাগে, এই ভয়ে তো কেউ গুলিই করছিল না।'

চেপে চোখ রেখে মৃদু হাসল ইন্দ্রনাথ ঃ 'না এলে আজ রাতের খানাটাই বরবাদ হয়ে যেত, সেই ভয়েই আসা, তাই কিনা?'

বলেই চার জোয়ানের দিকে ফিরে বললে নীরস স্বরে ঃ 'একজন মোটরসাইকেল নিয়ে চলে যান। কর্নেল থেবরাকে পুরো রিপোর্টটা দিয়ে আসুন। বলবেন, ওঁরা না আসা পর্যন্ত আমরা মাটির নিচে নামতে পারছি না। জনাদুয়েক অ্যান্টি-স্যাবোটেজ এক্সপার্ট যেন আনেন। বাকি তিনজন থাকতে পারেন দরজার মুখেই। ঠিক আছে?'

এক হাত রোশনীর দিকে বাড়িয়ে বলল ইন্দ্রনাথ রুদ্র ঃ 'আর আপনি আসুন আমার সঙ্গে—ভালো টিউলিপের সন্ধান দেব।'

'এটাও কি আপনার অর্ডার?'

'নিশ্চয়ই।'

ডক্টর টিটেনাস

বুদ্ধদেব আর বৈজয়ন্তী—এদেরকে নিয়ে এই গল্প।

রাজযোটক মিল বলতে যা বোঝায়, এই দুজনও তাই। বুদ্ধদেব যেন ময়ূর ছাড়া কার্তিক; শুধু কার্তিক নয়—লোহার কার্তিক। অমন পেটাই স্বাস্থ্য বড় একটা দেখা যায় না। তার নাক, মুখ, চোখের গড়ন দেখলে মনে হয় যেন রামায়ণ মহাভারতের কোনও বীর্যবান চরিত্র। নতুন করে জন্ম নিয়েছে বহু সহস্র বৎসর পরে।

বৈজয়ন্তীমালাকে বিধাতা সেইভাবেই গড়েছিলেন। অমন একজন সুদর্শন ডানপিটের উপযুক্ত সঙ্গিনী হওয়ার যাবতীয় গুণপনা নিয়েই ধরায় জন্ম নিয়েছিল বৈজয়ন্তী। সেইসঙ্গে ছিল রূপের আগুন।

রোমাঞ্চকর এ কাহিনি সেই বুদ্ধদেব আর বৈজয়ন্তীকে নিয়ে।

বুদ্ধদেব বলল—"বিজু, সাতমহলা প্রাসাদ কাকে বলে এবার দেখবে।"

"কেন, আমি কি আলেখলা?" বড়-বড় চোখ ঘুরিয়ে বলল বৈজয়ন্তী।

"আমি তা বলিনি। ঠাকুরদা অনেক শখ করে পাহাড়ের ওপর প্রাসাদ হাঁকিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, নিরিবিলিতে বসে প্রকৃতির পুজো করা।"

"উনি বুঝি কবি ছিলেন?"

"অন্তরে।"

"নাতিকে দেখে তো তা মনে হয় না,"—অপাঙ্গে চাইল বৈজয়ন্তী।

"নাতবউকে দেখে তো মনে হয়," বৈজয়ন্তীর চিবুক তুলে বলল বুদ্ধদেব।

"মূর্তিমতী কবিতা তুমি। আমি যদি হই শুষ্ক গ্রন্থ, তুমি সেই গ্রন্থের কবিতা। আমি যদি হই দারুময় বীণা, তুমি সেই বীণার ঝঙ্কার। আমি যদি হই নীরস তরুবর, তুমি তার মর্মরধ্বনি। আমি যদি হই—"

"থাক," গাঢ়কণ্ঠে বলল বৈজয়ন্তী। "তোমার সাতমহলা প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে।"

ট্যাক্সির জানলা দিয়ে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বুদ্ধদেব। পাকদণ্ডী বেয়ে ওপরে উঠছে ট্যাক্সি। রাস্তার প্রান্তে দেখা যাচ্ছে সেকেলে কেল্লা প্যাটার্নের অতিকায় একটা অট্টালিকা। দুর্গপ্রাকারের মতো খাঁজকাটা পাঁচিলে ঘেরা। নীল আকাশের বুকে একটা বেমানান কৃষ্ণবিন্দু।

একদৃষ্টে চেয়ে রইল বুদ্ধদেব। অনেক ইতিহাস, অনেক স্মৃতি, অনেক কাহিনি বিজড়িত ওই চৌধুরীভবনের বর্তমান দেবী চৌধুরানী ওর ঠাকুরমা।

চৌধুরীভবনের বহু বছরের ঐতিহ্য একাই বহন করে নিয়ে চলেছেন বিধবা ঠাকুরমা। দেবী চৌধুরানীর মতোই দাপট তাঁর। চৌধুরীদের সে রাজত্ব আর নেই। কিন্তু যা আছে তা নিয়েও সাতপুরুষ বসে খাওয়া যায়। যক্ষের মতো সেই বিপুল ধনভাণ্ডার আগলাচ্ছেন দেবী চৌধুরানী পিতামহী।

বুদ্ধদেব কিন্তু পায়ের ওপর পা তুলে আলেস্য আর আয়েশের জীবনকে বেছে

নিতে পারেনি। বিদেশে উচ্চশিক্ষায় গিয়েছিল আর দেশে ফেরেনি। ইউরোপ, আমেরিকার হেন শহর নেই যেখানে সে যায়নি। সবাই জেনেছিল, সে ভারত সরকারের একজন দুঁদে ডিপ্লোম্যাট। কিন্তু কী ধরনের ডিপ্লোম্যাট, তা কেউ আঁচ করতেও পারেনি।

কর্মজীবনের এই সিক্রেট নিয়েই দেশে ফিরে এসেছে বুদ্ধদেব। ভারত সরকারের স্বার্থে জীবন বিপন্ন করে অনেক গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করেছে সে। প্রাণ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই সে এ কাজে নেমেছিল। প্রাণ নিতেও কুণ্ঠা ছিল না কোনওদিন। একান্ত গোপনীয় এ কাজের নিয়মই যে তাই।

জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে একাদিক্রমে অনেকগুলি বছর দেশসেবা করে এবার ক্লান্ত হয়েছে বুদ্ধদেব। আর নয়। এবার বউ নিয়ে, বিল্ডিং বিজনেসের নিরীহ চাকরি নিয়ে আর বোম্বাইয়ে মালাবার হিলের একটা ফ্ল্যাট নিয়ে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করবে সে।

বৈজয়ন্তীকে পেয়েছে রোমে। ইউরোপীয় উগ্রতার মাঝে বাংলার শ্যামল কোমলতা ওকে মুগ্ধ করেছিল। ঘরবিমুখ বুদ্ধদেবের অন্তরে ঘর বাঁধার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল।

তারপর? বিয়ে করে দেশে ফিরে এল দুজনে। চাকরিতে ইস্তফা দিল বুদ্ধদেব। বৈজয়ন্তীও জানল না কী বিপজ্জনক কর্মজীবন থেকে নিজের অজান্তেই সরিয়ে নিয়ে এল ডানপিটে স্বামীদেবতাকে।

এয়ারপোর্ট থেকে ওরা গিয়ে চলেছে চৌধুরী-ভবনে। কিছুদিন পরে যাবে বোম্বাইতে—নতুন কাজে যোগদান করতে। কিন্তু..

বুদ্ধদেবের মনে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তো নেই। এয়ারপোর্টে নামতেই মেসেজ পেয়েছে সে। গুপ্ত সংবাদ। চিরকুটটা গুঁজে দিয়েই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে 'ওস্তাদে'র চর।

কর্মজীবনে 'বস'কে ও 'ওস্তাদ' বলেই ডেকেছে। ওস্তাদ নামেই তিনি পরিচিত, দেশেবিদেশে বুদ্ধদেবের মতোই আরও অনেক সিক্রেট এজেন্টের কাছে। ওস্তাদ মানুষটি মিষ্টভাষী, কিন্তু মমতাহীন আবেগহীন যন্ত্রদানব বললেই মানায় তাঁকে।

সেই ওস্তাদ ডেকে পাঠিয়েছেন হেডকোয়ার্টারে—আজই বেলা দুটোর সময়ে।

নতুন কাজ? কিন্তু আর তো কোনও দায়-দায়িত্ব নেই বুদ্ধদেবের। তবুও তলব যখন পড়েছে, সে যাবে। হয়তো বহু অপারেশনের সাকসেসফুল নায়ক বুদ্ধদেবকে সাক্ষাতে অভিনন্দন জানানোর জন্যেই এই আহ্বান।

কিন্তু সেন্টিমেন্টবর্জিত ওস্তাদকে সে চেনে। কিছু একটা আছে। সেটা কী?

বৈজয়ন্তী ওর মুখের দিকে চেয়েছিল। এখন শুধোলো মৃদুকণ্ঠে—"তোমার কী হয়েছে গো? কথা বলছ না কেন?"

"এমনি ভাবছি।" নায়কোচিত হাসি হাসল বুদ্ধদেব। "অনেকদিন পর ফিরছি তো।"

"এয়ারপোর্টে নামবার আগে কত হাসছিলে, তারপর থেকেই গম্ভীর হয়ে গেছ। বলো না গো, কী হয়েছে তোমার?"

"দূর পাগলি! চলো, এসে গেছি।"

সুবিশাল হলঘরে বসেছিলেন চৌধুরী পরিবারের সবাই। বুদ্ধদেবের মামা, মামিমা আর মামাতো বোন। ঠাকুরমা ওঁদের মধ্যে নেই।

আলাপ করিয়ে দিল বুদ্ধদেব। ওঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন বৈজয়ন্তীর পানে। রোম থেকে বউ নিয়ে এসেছে বুদ্ধদেব—ভেবেছিলেন না জানি কী মেয়েই হবে। হাতে মাথা কাটবে। কিন্তু কই, এ মেয়ের অঙ্গে তো গাউন নেই, ঠোঁটে লিপস্টিক নেই, মুখে সিগারেট নেই। এ-যে বাংলার বধূ, মুখে তার মধু, নয়নে নীরব ভাষা...ছাপা শাড়ির মধ্যে না আছে বিলাসিতা, না আছে চালিয়াতি। প্রসাধনবর্জিত মিষ্টি মুখটিতে না আছে রঙের বাহার, না আছে হিরেমোতির জেল্লা। মাথায় ছোট্ট ঘোমটা দিয়ে মামা-মামির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল বৈজয়ন্তী। সঙ্গে-সঙ্গে কোমল হয়ে এল মামিমার চোয়ালের প্রস্তর কঠোরতা।

শুধোলেন—"পথে কষ্ট হয়নি তো, মা?"

নীরবে সলজ্জে মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল বৈজয়ন্তী—একদম না। তারপর ঝুপ করে মামাতো বোনের পাশে বসে পড়ে—"আপনার নাম কী ভাই?"

"সাবিত্রী," জবাব দিল হতচকিত সাবিত্রী।

বুদ্ধদেব বললে—"ঠাকুমাকে দেখছি না কেন?"

"ওই তো ওখানে," অঙ্গুলি সংকেতে মামা দেখালেন হলঘরের দক্ষিণ কোণ। সেদিকে ফার্নিচার সাজিয়ে যেন ঘরের মধ্যে আর একটা ঘর সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকী বইয়ের আলমারিগুলোর পিছন দিক এদিকে ফেরানো। অদ্ভুত।

এগিয়ে গেল বুদ্ধদেব। পাশে বৈজয়ন্তী। বিচিত্র গণ্ডির মধ্যে লাল ভেলভেট মোড়া খাঁটি রুপোর সিংহাসনে বসে এক বৃদ্ধা। সিধে মেরুদণ্ড। দৃঢ় মুখের পেশি। কঠোর মেজাজের মণিকা।

বুদ্ধদেব লাফিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধাকে—"ঠাকুমা!"

কোমল হল বৃদ্ধার চক্ষু—পলকহীন চোখে চেয়ে রইলেন বৈজয়ন্তীর পানে।

প্রণাম করল বৈজয়ন্তী।

চিবুক ধরে মুখটি তুলে স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন ঠাকুরমা—"থাক-থাক, ভাই। নাতবউ, বুদ্ধ তোমার নাম রেখেছে কী?"

"ঠাকুমা!" তর্জনী তুলে কপট রোষ দেখাল বুদ্ধদেব।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল বৈজয়ন্তী।

"বিজু, তাই না," কৌতুক তরলিত চোখে বললেন ঠাকুরমা।

এবার অবাক হওয়ার পালা বৈজয়ন্তীর—"আপনি কী করে জানলেন?"

"তুমি যে ভাই আমার সতিন, তাই জেনেছি," বাঁধানো দাঁতে সৌম্য হাসি হেসে বললেন ঠাকুরমা, "বুদ্ধ বউকে নিয়ে তোর ঘরে চলে যা। সাগর পেরিয়ে এসেছিস, একটু জিরিয়ে নে। তারপর—"

"তারপর আমাকে একটু বেরোতে হবে ঠাকুমা।"

"এই তো এলি, এর মধ্যে—"

"ইন্ডিয়ায় এলাম এত বছর পরে, বুঝতেই পারছ। নাতবউ চেয়েছিলে, নাতবউ এনে দিয়েছি। আমার আর দরকার আছে কি?"

"পাজি, পাজি—আর হ্যাঁ, এই দুলজোড়া নিয়ে যা। তোর ঠাকুর্দার দুল। নাতবউকে পরিয়ে দিস।"

দুল আর বৈজয়ন্তীকে নিয়ে গেল বুদ্ধদেব। হলঘর থেকে চওড়া মর্মর সোপান উঠেছে দোতলায়। আর একটা ঘোরানো সিঁড়ি রয়েছে বাঁ-দিকে। মার্বেল সিঁড়ি মাড়িয়েই সটান ওপরে এল বুদ্ধদেব। কৌতূহলী চোখ মর্মরমূর্তি আর চৈনিক পোর্সিলেনের বিবিধ দৈত্যদানব দেখতে-দেখতে স্বামীর কক্ষে পৌঁছল বৈজয়ন্তী। ঘরে ঢুকেই বুদ্ধদেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর চওড়া বুকে দু'হাত রেখে শুধাল নীল আকাশের মতো দুই চোখ মেলে—"কোথায় যাচ্ছ গো?"

চোখে চোখ রেখে বলল বুদ্ধদেব—"কাজে।"

"কী কাজে?"

"বোম্বাই অফিসে মেসেজ পাঠাতে হবে, ফ্ল্যাটটা রেডি আছে কি না খবর নিতে হবে।"

শুধু চেয়ে রইল বৈজয়ন্তী। জবাব দিল না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এল বুদ্ধদেব।

বৈজয়ন্তীকে নিয়ে জমজমাট আসর বসেছে হলঘরে। আসর জমিয়েছেন মামাবাবু একাই। ভদ্রলোক কথাও বলতে পারেন বটে। ঠোঁট টেপা মানুষ নন। কথা বলতে ভালোবাসেন।

কম কথার মানুষ ওঁর স্ত্রী এবং কন্যা। চাপা ঠোঁটের গড়ন। গায়ে পড়ে কথা না বললে কথা বলতে চান না।

এঁদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ব্যক্তিত্ব ধরেন ঠাকুরমা। বংশের বহু বছরের সঞ্চিত কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের একমাত্র ধারক ও বাহক তিনি একাই। মাথাভরা সাদা চুল, অথচ বুদ্ধি-উজ্জ্বল দুই চোখ। মুখের চামড়া যতটা জরা অঙ্কিত হওয়া উচিত ছিল, ততটা নয়। অপ্রয়োজনে একটি কথাও বলেন না। যেটুকু বলেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ।

বুদ্ধিমতী বৈজয়ন্তীর মনের ক্যামেরায় একটির-পর-একটি ফটো উঠছিল। এ ফটো চরিত্রের ফটো, স্বভাবের ফটো, মানুষের ভেতরের ফটো।

যেমন, মামাবাবু। রামকৃষ্ণ সান্যাল সম্বন্ধে উড়োজাহাজে বসেই স্বামীর মুখে শুনেছিল বৈজয়ন্তী। ভদ্রলোক সপরিবারে আছেন চৌধুরী পরিবারে ঠাকুরমার আমন্ত্রণেই। এঁর লোভ চক্ষু এস্টেটের চা বাগানগুলির ওপর। মনে-মনে আশা, ঠাকুরমা তাঁর উইলে একটু কৃপা তাঁকে করবেন। ভদ্রলোক যে নিষ্কর্মা নন, তা প্রমাণ করবার জন্যেই যেন ইনিওরেন্সের দালালি করেন। উঁচু মহলে যোগাযোগের ফলে দু'পয়সা আসে হাতে।

আর মামিমা মোক্ষদা দেবী? খাঁটি বাঙালি গৃহিণী। লাল পাড় শাড়ি আর

সাদা ব্লাউজ তাঁর অতি প্রিয় পরিচ্ছদ। কিন্তু কমকথার মানুষ। মনখোলা মানুষ নন মোটেই।

সাবিত্রী লাইব্রেরি আর পলিটিকাল পার্টি নিয়ে ব্যস্ত। বয়স তিরিশ পেরিয়েছে। দেখতেই সুশ্রী। কিন্তু চাপা প্রকৃতির মেয়ে বলে এবং কিছুটা পুরুষবিদ্বেষী বলে আজও বিয়ের পিঁড়িতে বসেনি।

আসরে বসে নানান কথার ফাঁকে-ফাঁকে অনেক আগে শোনা চরিত্রগুলোকেই মনে-মনে উপভোগ করছিল বৈজয়ন্তী। এতবড় বাড়ি। কিন্তু প্রাণীগুলো যেন খাপছাড়া। বিশাল দুর্গ-অট্টালিকার প্রাণ বলতে ওই একজনই—ঠাকুরমা। তাঁর নীরব উপস্থিতির জন্যেই বুঝি এই পাথরের কেল্লায় একটা জীবন্ত সত্তা রয়েছে। অনেক ইতিহাস, অনেক কাহিনি, অনেক স্মৃতির মূক সাক্ষী এই কেল্লাবাড়ির যা কিছু মুখরতা যেন এই অশীতিপর বৃদ্ধা ঠাকুমার মধ্যেই বিধৃত রয়েছে।

গোড়াগোড়ায় দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যই দেখল বুদ্ধদেব। তারপর ধীর পদক্ষেপে এসে বসল ঠাকুরমার পাশে।

"এসেছিস? কাজ হল, না আবার বেরুবি?"

দুই হাত মাথার পিছনে রেখে আড়মোড়া ভেঙে বলল বুদ্ধদেব—"আর না। এবার একটানা বিশ্রাম।"

ঠিক এই সময়ে যেন ব্যঙ্গ করেই বেজে উঠল টেলিফোন যন্ত্র।

মামাবাবু রিসিভার তুললেন। পরক্ষণেই চোখের ইঙ্গিতে ডাকলেন ভাগ্নেকে। "ট্রাঙ্ককল।"

রিসিভার ধরল বুদ্ধদেব—"হ্যালো কে? বস? কী ব্যাপার?"

বুদ্ধদেবের উদ্বিগ্ন মুখচ্ছবি দেখে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল বৈজয়ন্তী। বুদ্ধদেব ইঙ্গিতে ওকে আরও কাছে ডাকল। স্পষ্ট শুনতে পেল বৈজয়ন্তী তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসা কথাগুলো।

"বুদ্ধদেব, ভীষণ বিপদে পড়েছি।"

"কী বিপদ?"

"অফিসিয়াল কিছু নয়। এলিফ্যান্টা কেভস গিয়েছিলাম আমার স্পিডবোট নিয়ে উইক এন্ডে। পা পিছলে পড়ে গিয়ে ঊরুর হাড় ভেঙেছে। এদিকে স্পিডবোটও জেটিতে ধাক্কা মেরে ভেঙে তুবড়ে একাকার হয়ে গিয়েছে। চোট লেগেছে ইঞ্জিনে।"

"তাই নাকি?"

"স্পিডবোট ফেলে চলে এসেছি স্টিমারে। কিন্তু তোমাকে এখুনি না হলে তো চলছে না। স্পিডবোট ইঞ্জিনের খবর তুমি যেরকম রাখো, সেরকম আর কেউ রাখে না। এলিফ্যান্টা কেভস থেকে ওটাকে উদ্ধার করে আনতে হবে আর ব্যবস্থাটা দিনকয়েক ঠেকা দিতে হবে। নইলে খাতখাড়া হবে লাখ পাঁচেক টাকা। না, না, আমি তোমায় এখুনি জয়েন করতে বলছি না। কিন্তু নিমন্ত্রণ থেকেই তুমি ফের চলে যেও।"

"আমি...আমি," অসহায় চোখে বউয়ের পানে তাকাল বুদ্ধদেব।

বৈজয়ন্তী বললে—"আমি বোম্বাই যাব তোমার সঙ্গে।"

বুদ্ধদেব বলল—"ওয়াইফকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"কী দরকার? তিনি রয়েছেন, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে—শুধু-শুধু এই ঝামেলার মধ্যে তাঁকে টেনে এনো না। একা এসো—আজকের ফ্লাইটেই।"

ঢোঁক গিলে বলল বুদ্ধদেব—"ও-কে, বস।"

"সো নাইস।" খট করে লাইন কেটে গেল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল বুদ্ধদেব—"শুনলে সব?"

"শুনলাম," শুকনো মুখে বলল বৈজয়ন্তী। "ফ্লাইট ক'টায়?"

"রাত নটায়।"

দুর্ঘটনাটা ঘটল সন্ধে সাতটা নাগাদ।

বুদ্ধদেবের সুটকেস গুছিয়ে দিচ্ছে বৈজয়ন্তী। বুদ্ধদেবের রাইটিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—"তোমার হাতখরচের জন্যে শ-পাঁচেক টাকা রাখলে চলবে?"

"টাকার কোনও দরকার নেই।"

"ও বাবা! মুখ যে অন্ধকার দেখছি।"

বৈজয়ন্তী জবাব দিল না। মন ওর সত্যিই খারাপ। প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যের মতো অট্টালিকায় এই দুর্গ অট্টালিকায় নবাগতা সে—প্রথম রাত্রেই উধাও হচ্ছে স্বামী। দিনগুলো কাটবে কী করে?

বুদ্ধদেব মুচকি হেসে বলল—"সখী, এই রইল পাঁচশো টাকার ট্রাভেলার্স চেক।"

"বলছি না দরকার নেই। টাকা নিয়ে আমি কী করব?..."

"রাখলেও কোনও ক্ষতি নেই," ট্রাভেলার্স চেকে সই করতে-করতে বললে বুদ্ধদেব।

ঠিক এই সময়ে ধপাস করে কেমন যেন একটা শব্দ হল নিচের হল ঘরে। কে যেন পড়ে গেল। কেমন গোঙানি শোনা গেল সঙ্গে-সঙ্গে। পরক্ষণেই হাউমাউ করে উঠল মেজকলা মামি—"একী দিদিভাই! ওগো তুমি কোথায় গেলে?..."

কলম, চেক ফেলে ছিটকে বেরিয়ে গেল বুদ্ধদেব। পিছন-পিছন এল বৈজয়ন্তী। ওপর থেকেই দেখা গেল হলঘরের পাথরের সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়েছেন ঠাকুরমা। কোমরে লেগেছে বোধহয়। যন্ত্রণাবিকৃতমুখে ওঠবার চেষ্টা করছেন।

দুপদাপ করে নেমে এল বুদ্ধদেব-বৈজয়ন্তী। নামতে-নামতেই দেখল, পতনের কারণ। পাথরের সিঁড়িতে কে যেন সাবানজল ফেলে গিয়েছে।

সিঁড়ির গোড়ায় ততক্ষণে মামাবাবু ও সাবিত্রী এসে দাঁড়িয়েছেন মামির পাশে। সকলেই উদ্বিগ্ন। বিবিধ প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন ঠাকুরমা।

বুদ্ধদেব কণ্ঠনালায় শুধোল—"সাবানজলে পা পিছলেছে ঠাকুমার। কে ফেলেছে?"

গালে আঙুল দিয়ে বললেন মামি—"ওমা! তাই তো বটে। এ নিশ্চয় সুন্দরীর কাণ্ড! কাজের ছিরিছাঁদও নেই।"

"সুন্দরী কে?"

"ঠিকে লোক। ঘরদোর মুছে দিয়ে যায়।" চারপাশের অশান্তির মধ্যে শান্তস্বরে বললেন ঠাকুরমা—"বুদ্ধ হাড় ভেঙেছে বলে মনে হয় না। ডক্টর ভাদুড়িকে খবর দে। আর আমাকে ওপরে নিয়ে চল।"

অবলীলাক্রমে কন্দ্রমকে দু-বাহুর মধ্যে তুলে নিয়ে বুদ্ধদেব এগোল। মামাবাবু ছুটলেন টেলিফোনে ডাক্তারকে খবর দিতে। সেই ফাঁকে গলা চড়িয়ে আর একপ্রস্থ চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন মামিমা—"সুন্দরী কোথায়? এত কাণ্ড হয়ে গেল, তার সাড়া পাচ্ছি না কেন?"

দোতলার বারান্দায় ঝাঁটা হাতে আবির্ভূত হল এক প্রৌঢ়া বিধবা। দেখে কিন্তু ঝি-শ্রেণীর মনে হল না। যেন ভদ্র গেরস্থ ঘরের ভাগ্যহীনা কেউ।

"হয়েছে কী? ডাকাত পড়েছে নাকি? এই তো আমি।" দুঃখের আঁচে শুকিয়ে যাওয়া নীরস কণ্ঠস্বর।

"কোথায় ছিলে তুমি?"

"এই তো দাদাবাবুর ঘর ঝাঁট দিচ্ছি।"

"দাদাবাবুর ঘর ঝাঁট দিচ্ছি!" মুখ ভেংচে উঠলেন মামি—"সিঁড়িতে সাবানজল ফেলেছ কেন?"

"ইচ্ছে করে ফেলেছি নাকি?" বলতে-বলতে ঝাঁটা হাতে নিয়ে ফের ঢুকে গেল বুদ্ধদেবের ঘরে।

এয়ারপোর্টের পথে ফাঁস হল বুদ্ধদেবের গুপ্ত কাহিনি।

বাড়ির গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল দু-জনে। ফেরার পথে বৈজয়ন্তী ড্রাইভ করে ফিরবে।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল বৈজয়ন্তী। নিশ্চুপ।

আড়চোখে তাকিয়ে বুদ্ধদেব বললে—"প্রিয়তমে, বচনের ভাণ্ডার কি আজ শূন্য?"

আয়তচোখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না বৈজয়ন্তীর। বুদ্ধদেব হালকা সুরে বললে—"দিনসাতেকের তো মামলা। কালাপানি পেরোলে না হয় ভাবনার কথা ছিল। যাচ্ছি তো বোম্বাই।"

চোখ তুলে বলল বৈজয়ন্তী—"আর মিথ্যে বলবে?"

"মিথ্যে?"

"কালাপানিই তো পেরোচ্ছ।"

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল বুদ্ধদেব। চেয়ে রইল সামনে।

বৈজয়ন্তী বললে—"আমি জানি কোথায় যাচ্ছ তুমি। আগে ডালাস, তারপর মেক্সিকো।"

"কে বলল?"

"তুমি।"

"আমি?"

"মুখে বলোনি। বলবেই বা কেন। বউকে ভালোবাসলে তো বলবে।"

"কী করে জানলে?" নীরস স্বর বুদ্ধদেবের।

ঈষৎ স্ফুরিত হল বৈজয়ন্তীর অধরোষ্ঠ—"ঠাকুমা পড়ে গেলেন যখন, তখন পড়ি কি মরি করে ছুটেছিলে মনে পড়ে? আমি তোমার পিছনে ছিলাম। দেখলাম তাড়াতাড়িতে

তুমি টেবিলের ড্রয়ার বন্ধ করতে ভুলে গেলে। হাওয়ায় একটা সাদা কাগজ উড়ে এসে পড়ল মেঝেতে। কাগজটা তুলে ড্রয়ারে রাখতে গিয়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে কোথায়-কোথায় যাচ্ছ। তোমার হাতে লেখা।"

চুপ করে রইল বুদ্ধদেব। বৈজয়ন্তী ঠোঁট মেরে বললে—"আমি তোমার সেরকম বউ নই যে স্বামীর বিদেশ যাত্রায় বাধা দেব। এ তো গর্বের কথা, আনন্দের কথা। কিন্তু কোথায় যাচ্ছ তা জানার অধিকার নিশ্চয় আছে।"

"এক্ষেত্রে নেই।" সংক্ষিপ্ত জবাব বুদ্ধদেবের।

আহতকণ্ঠে বৈজয়ন্তী বললে—"কেন নেই? যাচ্ছ কাজ নিয়ে। অ-কাজ নিয়ে নয় নিশ্চয়।"

"দুটোর মাঝামাঝি একটা কিছু বলতে পারো।" স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে সোজা সামনে তাকিয়ে অদ্ভুত সুরে বললে বুদ্ধদেব।

"ডার্লিং, হেঁয়ালি করছ কেন?"

এবার পাশে তাকাল বুদ্ধদেব। মিঠে হেসে বলল—"ডিয়ার, হেঁয়ালি আর করব না। কারণ, আমি যাচ্ছি না।"

সহর্ষে বললে বৈজয়ন্তী—"আমি জেনে ফেলেছি বলে?"

"হ্যাঁ। এ কাজ এমনই কাজ যা শুরুর আগে জানাজানি হওয়া মানেই প্রাণ নিয়ে টানাটানি।"

"ডার্লিং।"

"বিন্তু, তুমি জেনে ফেলেছ কোথায় যাচ্ছি আমি। এখন আমার যাওয়া মানে প্রাণটা তোমার হাতে সঁপে যাওয়া।"

অশ্রু টলমল করে উঠল বৈজয়ন্তীর চোখে—"ঠিকই তো, আমি যে চাইনি।"

আবার সেইরকম হাসল বুদ্ধদেব—"রোম ঘুরে এসেও সেন্টিমেন্টাল রয়ে গেল আমার বিজুরানি।"

"থাক, থাক—"

"বিজু, আমি যখন যাচ্ছি না, তখন আমার গুপ্ত কথা বলতে বাধা নেই তোমাকে। চোখ মোছো, শোনো।" জলভরা চোখ তুলে তাকাল বৈজয়ন্তী। "এ কাজ আমার নয়। তবুও আমাকেই করতে হবে। কেননা, আমি ছাড়া আর কেউ তা পারবে না।"

"কাজটা কীসের?"

"নারকোটিক্স সংক্রান্ত। অর্থাৎ এল.এস.ডি. থেকে শুরু করে আফিং চরস মর্ফিন হিরোয়েনের চালান আমদানি চলছে এ দেশে বাইরে থেকে। খুবই বিপজ্জনক। আমার কাজ ছিল পলিটিক্যাল সিক্রেট নিয়ে—নারকোটিক্স আমার এক্তিয়ার বহির্ভূত। তবুও এই নোংরা আর ডেঞ্জারাস দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে।"

"কেন? বউ নিয়ে দেশে পা দিতে না দিতেই কেন তুমি যাবে? প্রাণ কি সস্তা?"

"বললাম তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই। খুলেই বলছি তোমাকে।

"এই শহরেই এমন একজন ব্যক্তি আছে, যে আন্তর্জাতিক চোরাকারবারের স্পাই। উঁচু মহলের লোক সে। পুলিশ, আবগারী এবং বহু সরকারি দপ্তরে তার প্রভাব আছে। তাই যতবার এদিক থেকে গোপনে জাল ফেলার আয়োজন হয়েছে, স্মাগলড নারকোটিক্স

সমেত স্মাগলারদের হাতেনাতে ধরার প্ল্যান হয়েছে, ততবারই এই লোকটা আগেভাগে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে ওদের। কুখ্যাত এই গ্যাং-টার আসল মাথা অর্থাৎ চাঁই থাকে মেক্সিকোতে। ছদ্মনামে অন্য একটা ব্যাপারে সাংকেতিক এই লোকটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল মেক্সিকো থাকবার সময়ে। নাম তার লিটল টনি। ওটা ওর ডাক নাম। আমাকে সে জানে অপরাধী মহলের একজন দাগাবাজ হিসেবে। তার বেশি কিছু নয়। সুতরাং আমি যদি মেক্সিকো যেতাম, আগেকার নামে তার সঙ্গে দেখা করতাম, কথায় কথায় এই শহরের স্পাই র‍্যাকেটটার একটা-না-একটা হদিশ পেতামই। নাম না পাই, টেলিফোন নাম্বার পেতাম, অথবা ঠিকানা, অথবা অন্য কিছু। বাকিটুকু এখানে তদন্ত করে বার করে নেওয়া যেত। দফারফা হতো স্পাইয়ের।"

ঢোঁক গিলে বললে বৈজয়ন্তী—"এই কথা। তা এতে তোমার প্রাণ যাবে কেন বুঝলাম না।"

ম্লান হেসে বললে বুদ্ধদেব—"বিজু, এরা বড় ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল। যে মুহূর্তে জানাজানি হয়ে যাবে আমি মেক্সিকো গিয়েছি—খবর চলে যাবে লিটল টনির কাছে। লিটল টনি আমার ভাঁড়ানো নামের আড়ালে আসল নাম জানবে। সঙ্গে-সঙ্গে সঁপে দেবে জল্লাদের হাতে। বিধবা হতে হবে তোমাকে।"

শিউরে উঠল বৈজয়ন্তী—"আমি কাউকে বলব না।"

চুপ করে রইল বুদ্ধদেব। ঝকঝকে গাড়ি যেন উড়ে চলল পিচের রাস্তা বেয়ে।

"ডার্লিং, প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনির এই খেলায় কে তোমায় মোতায়েন করল বলবে? তোমার বোম্বাই বস্?"

"না। ওটা মিথ্যে টেলিফোন। এয়ারপোর্টে নামতেই একজন ফেজটুপি মাথায় মুসলমানের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল মনে পড়ে? নাম তার গোলাম কিবরিয়া। হাতে চিরকুট গুঁজে দিয়ে সরে গিয়েছিল সে। তাতেই জানলাম জরুরি তলব করেছেন ওস্তাদ।"

"ওস্তাদ!"

"আমরা ওই নামেই ডাকি ওকে। সারা পৃথিবী জুড়ে এঁর এজেন্টরা কাজ করছে নানারকমের টপ সিক্রেট নিয়ে। আমি ছিলাম তাদেরই একজন। দেখা করতে গিয়ে শুনলাম যদিও চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি, তবুও দেশের স্বার্থে আমাকে এখুনি রওনা হতে হবে। কোথায় যাচ্ছি তা গোপন রাখার জন্যেই গোলাম কিবরিয়া মিথ্যে ফোন করেছিল। বোম্বাই বস্-এর দুর্ঘটনাটা স্রেফ বানানো গল্প।"

"ও," আবার ঠোঁট ফুলল বৈজয়ন্তীর। "তা বেশ, যাও না। অত গোপন করার আর তো দরকার নেই। আমি কাউকে বলব না।"

"না, আর হয় না।"

"কেন হয় না? এত অবিশ্বাস আমাকে?"

"মিছে অভিমান করছ বিজু। আসল কথাটা তা হলে শোনো। ওস্তাদ আঁচ করতে পেরেছেন, এ শহরের স্পাইটি কে।"

"কে ডার্লিং?"

আবার সেইরকম মোলায়েম হাসল বুদ্ধদেব—"তুমিও তাকে দেখেছ। চৌধুরীভবনে

নিত্য যাতায়াত তাঁর। তিনি আসেন সাবিত্রীর মানসিক চিকিৎসার অজুহাতে। সাবিত্রীর মন আর-পাঁচটা মেয়ের মতো সুস্থ নয় তা নিশ্চয় ধরে ফেলেছ। দুনিয়ার কোনও পুরুষকে ওর পছন্দ নয়—পছন্দ কেবল এই লোকটিকে—কারণ মিষ্টি কথায় মেয়েদের মন জয় করতে সিদ্ধহস্ত তিনি। ভদ্রলোক রোজ আসেন। চৌধুরী বাড়ির সকলের সঙ্গে ঘরোয়া প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করেন, বাকি সময়টা মামার সঙ্গে দাবার ছক পেতে বসেন। অসাধারণ দাবা খেলোয়াড় ইনি।"

"কে গো? কার কথা বলছ?"

তীব্র শব্দে হর্ন বাজিয়ে পাশ দিয়ে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল একটা প্লিমাউথ।

"ডক্টর ভাদুড়ি," বলল বুদ্ধদেব।

"ডক্টর ভাদুড়ি!" যেন বিষম খেল বৈজয়ন্তী। ডক্টর ভাদুড়িকে সে চেনে বই কি। ঠাকুরমার পা মচকে যাওয়ার পর এই ভদ্রলোকই এসেছিলেন। রাঙা চেহারা, মাথার চুল বুরুশ দিয়ে চেপে আঁচড়ানো। খাঁড়ার মতো নাকের নিচে পাতলা ঠোঁটে সুন্দর হাসিটিই যেন মানুষটার সবচেয়ে বড় সম্পদ। এমন হাসি যে হাসতে পারে, তাকে ভালো না-বেসে পারা যায় না। কথা বলার ভঙ্গিমাটাও খুব ধীর, স্থির। চাঞ্চল্য, উত্তেজনা, অস্থিরতা যেন তার কুষ্ঠিতে লেখেনি।

ডক্টর ভাদুড়ি! চৌধুরী পরিবারের গৃহচিকিৎসক ডক্টর ভাদুড়ি। তিনিই এই কূট চক্রান্তের মহানায়ক?

"অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, না?" বলল বুদ্ধদেব। "আমি মেক্সিকো গেলেই কিন্তু যাচাই করা যেত ওস্তাদের এই অবিশ্বাস্য অনুমানকে। কিন্তু তা আর হল না।"

"না, তুমি যাও।" শক্ত গলায় বলল বৈজয়ন্তী। "আমি বলব না ডক্টর ভাদুড়িকে।"

চুপ করে রইল বুদ্ধদেব। তারপর বলল—"ডাক্তারকে তুমি চেনো না। তা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলাও একটা বিদ্যে। সে-বিদ্যে তোমার জানা নেই।"

"ভুল। মেয়েরা জন্মইস্তক মিথ্যেবাদী হয়।"

হেসে ফেলল বুদ্ধদেব—"অভিনয়?"

"সেটাও মেয়েদের সহজাত।"

"একটা মিথ্যে ঢাকতে গেলে অনর্গল মিথ্যে বলে যেতে হয়। মুখে-মুখে গল্প বানাতে হয়। বিজু, আমি সে বিদ্যেতে ট্রেনিং নিয়েছি। তুমি—"

"তোমার প্রাণহানি রোধ করার জন্যে যে-কোনও মিথ্যে বলতে আমি পারব। ওগো, তুমি যাও, যাও, যাও। যদি না যাও, তা হলে আমার মাথা খাও।"

"একী! এ যে একেবারে গেঁইয়া মেয়েদের ডায়ালগ।"

"গেঁইয়াই তো। সব মেয়েরাই অন্তরে গেঁইয়া—ছলনার জায়গায় সবাই এক—তফাত শুধু বাইরের চাকচিক্যের, প্রলেপের, প্রসাধনের, শিক্ষার ও সংস্কারের।"

"তা হলে?"

"তুমি যাও।"

"তুমি?"

"আমি?" আঙুল কামড়ে ধরে কি যেন ভাবল বৈজয়ন্তী। বলল—"আমি বোম্বাই

চলে যাই কাল সকালের ফ্লাইটে দিনসাতেকের জন্যে। না, তোমার নতুন ফ্ল্যাটে নয়—উত্তর বঙ্গের বান্দরার বাড়িতে। তা হলেই আমাকে মিথ্যে বলতেও হবে না। তোমার গতিবিধিও ফাঁস হবে না। কীরকম বুদ্ধি দিলাম?"

"চমৎকার!" বৈজয়ন্তীর গাল টিপে দিয়ে বলল বুদ্ধদেব।

কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল।

ক্যালকন হাঁকিয়ে বাড়ি ফিরে এসে তরতর করে ওপরে উঠল বৈজয়ন্তী। ঘরে ঢুকে দেখল ঝাঁটা হাতে মেঝে পরিষ্কার করছে সুন্দরী। বৈজয়ন্তীকে দেখেই ঝকঝকে দাঁত বের করে হেসে বলল—"কিগো বউদিরানি, দাদাবাবু চইলে গেলেন?"

"হ্যাঁ।"

"মেক্সিকো কদ্দুর বউদিরানি?"

হৃদপিণ্ডটা বুঝি ক্ষণেকের জন্যে ধুকপুক করতেও ভুলে গেল বুকের খাঁচায়। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল বৈজয়ন্তী। দুজনে দুজনের পানে তাকিয়ে। সুন্দরী হাসছে। বৈজয়ন্তী হাসতেও ভুলে গেছে।

পরক্ষণেই বলল শান্তগলায়—"মেক্সিকো যায়নি তোমার দাদাবাবু। বোম্বাই গেছে।"

হি-হি করে হেসে উঠল সুন্দরী—"আমি যে নিজের চোখে দেখলাম গো।"

দুর্নিবার কৌতূহলে শুধোল বৈজয়ন্তী—"কী দেখলে?"

"উড়োজাহাজের টিকিট।"

"উড়োজাহাজের টিকিট!"

"হি হি হি। বউদিরানি, আমি মুখ্যু নইগো। ঝি-গিরি করি পেটের দায়ে—ইংরেজি পড়তে জানি। আর-এক বাবুর বাড়িতে যে উড়োজাহাজের টিকিট দেখেছি। কোথা লেখা থাকে জায়গাটার নাম।"

বুকের যন্ত্রটা হঠাৎ এত উত্তাল হয়ে উঠল কেন? অতিকষ্টে মুখচ্ছবি প্রশান্ত রেখে বলল বৈজয়ন্তী—"সুন্দরী, উড়োজাহাজের টিকিট তুমি কোথায় দেখলে?"

"ঠাকমা পড়ে গেলেন, আপনারা দৌড়ে গেলেন, আমি ঘরে ঢুকে দেখি এইটা খোলা।" ড্রয়ার দেখিয়ে বলল সুন্দরী, "বন্ধ করতে গিয়ে দেখি উড়োজাহাজের টিকিট।"

স্তম্ভিত বৈজয়ন্তী। স্ত্রী হয়েও সে দেখেনি ড্রয়ারের কোথায় কাগজপত্র রেখেছিল বুদ্ধদেব। কিন্তু সুন্দরী দেখেছে! দেখাটা কি নেহাতই অকস্মাৎ, না সেধে মনে করে দেখা—তা কে বলবে? যুগপৎ দুটো সন্দেহ উঁকি দিল বৈজয়ন্তীর মনে। সুন্দরীর হাতটান থাকতে পারে—ঘরে কেউ নেই দেখে খোলা ড্রয়ার ঘেঁটে দেখতে গিয়েছিল টাকাপয়সা পাওয়া যায় কিনা। অথবা—এইটাই সবচাইতে সর্বনাশা সন্দেহ—অথবা সুন্দরী স্পাইয়ের কাজ করছে। গুরুর ভাদুড়ির টাকা খেয়ে...

না, না, না, অতটা হয়তো সম্ভব নয়। নিছক কৌতূহলেই ড্রয়ার ঘেঁটেছিল সুন্দরী। যদি তাই হয়, তা হলে বিষে বিষক্ষয় করতে হবে। অর্থাৎ, টাকার লোভ দেখিয়ে মুখবন্ধ করতে হবে সুন্দরীর।

হাসল বৈজয়ন্তী। বলল—"সুন্দরী, তোমার দেশ কোথায়?"

"গোবিন্দপুর।"

"গোবিন্দপুর!" চোখ বড়-বড় করে বলল বৈজয়ন্তী। "গোবিন্দপুরে তো আমার মামার বাড়ি।" কথাটা বলাবাহুল্য, সম্পূর্ণ মিথ্যে।

"তাই নাকি গো? কী নাম তোমার মায়ের?"

"শকুন্তলা।"

"শকুন্তলা...শকুন্তলা—"

"মনে পড়ছে না তো? কী করে পড়বে, মা কি দেশে কোনওদিন ছিল? বোম্বাইতে কাটিয়েছে সারাটা জীবন। তা বেশ, তুমি যখন আমার মামার বাড়ির মানুষ, তখন তোমাকে মাসি বলব। কেমন?"

সুন্দরীর তখন হাসি দেখে কে। রাজবাড়ির বউয়ের মাসি হওয়া তো ভাগ্যের কথা।

"মাসি, তোমাকে একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে।"

"বলোগো বাছা।" এক ধাপ এগিয়ে এল সুন্দরী।

'বাছা' সম্বোধনটা শুনেও শুনল না বৈজয়ন্তী। বলল—"তোমার জামাই গোপন কাজে মেক্সিকো গেছে। অনেক টাকা লাভ হবে যদি কথাটা গোপন থাকে। জানাজানি হয়ে গেলে হবে লোকসান। বুঝেছ?"

"তা আর বুঝবনি।"

"তুমি কাউকে বোলো না ও কোথায় গেছে। ফিরে এলে ওর লাভের টাকা থেকে তোমাকে অনেক টাকা দেব, কেমন!"

চকচক করে উঠল সুন্দরী দুই চোখ। ধূর্ত চোখ। বলল মিটিমিটি হেসে—"বেশ তো, বলবনি কাউকে।" একটু থেমে—"তোমার ওই দুলটা কীসের গো বাছা? দামি পাথর?"

"নীলকান্ত মণির।" বলল বৈজয়ন্তী।

জুলজুল করে চেয়ে রইল সুন্দরী—"একবার দেখতে দেবে?"

খটকা লাগল বৈজয়ন্তীর মনে। অর্থের প্রলোভন দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান অলঙ্কার দেখতে চায় কেন সুন্দরী?

কানে হাত না-দিয়েই বলল বৈজয়ন্তী—"এ-দুল চৌধুরীবংশের সম্পত্তি, মাসি। ঠাকুমার কাছ থেকে পেয়েছে আমার স্বামী, তার কাছ থেকে পেয়েছি আমি।"

নির্নিমেষে চেয়ে রইল সুন্দরী—"কাল একটা বিয়ের নেমন্তন্ন আছে। কী সুন্দর দুল!"

বিধবার এত শখ! কীরকম বিধবা গো তুমি? বৈজয়ন্তীর ইচ্ছে হল মনের কথাটা মুখে প্রকাশ করে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, দুল পরে নেমন্তন্ন রাখতে যাওয়াটা একটা অছিলা। আসলে সুন্দরী দুলজোড়া চাইছে অন্য কারণে। বুদ্ধদেবের মেক্সিকো রওনা হওয়ার গোপন সংবাদ রাখার ঘুষ!

সাদা কথায়, ব্ল্যাকমেলিং!

নিজের গাল চড়াতে ইচ্ছে হল বৈজয়ন্তীর। ইস! এত বোকা সে! ব্ল্যাকমেলিংয়ের পথ সে-ই তো দেখিয়েছে লোভী সুন্দরীকে।

সুন্দরী চেয়ে আছে লোভাতুর চোখে। বৈজয়ন্তীর দ্বিধা দেখে কাছে এসে শুধু বললে—"দাদাবাবু মেক্সিকো থেকে অমন কত দুল তোমাকে এনে দেবে, বাছা। দাও না দুলজোড়া আমাকে পরতে।"

ইঙ্গিতটা অতি সুস্পষ্ট। দুলজোড়া পরতে না দিলে দাদাবাবুর মেক্সিকো যাত্রার সংবাদও আর গোপন থাকবে না। লাভের টাকায় দুল কেনাও শিকেয় উঠবে।

পাকা অভিনেত্রীর মতই হেসে উঠল বৈজয়ন্তী—"এত শখ তোমার। এই নাও।" দুই কানের লতি থেকে খাঁটি নীলকান্ত মণির দুলজোড়া খুলে টেবিলের কোণে রাখল বৈজয়ন্তী। ছোঁ মেরে তুলে নিল সুন্দরী। "এ বাড়ির কাউকে দেখিও না যেন।" বলল বৈজয়ন্তী।

গণ্ডগোলের সূত্রপাত এরপর থেকেই।

বাথরুমে গিয়েছিল বৈজয়ন্তী। সুন্দরী ঝাঁটা হাতে ঘর পরিষ্কারে ব্যস্ত। হঠাৎ মামিমার চিৎকার শোনা গেল ঘরের মধ্যে—"সুন্দরী, এ দুল তুমি কোথায় পেলে?"

কোনও সাড়া নেই। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল বৈজয়ন্তী। দেখল, মামিমার রুদ্র মূর্তির সামনে শক্ত কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী। দুই কানে টিল টিল করে দুলছে আর নীলদ্যুতি বিকিরণ করছে নীলকান্ত মণির দুলজোড়া।

আবার বাজখাঁই চিৎকার করল মামিমা—"চুপ করে রইলে কেন? কোথায় পেলে তুমি এ দুল? এত হাতটান তোমার ভালো নয় তো বাছা।"

এইবার মুখ খুলল সুন্দরী—"ভদ্দরঘরের মানুষকে চোর বলবেন না বলছি।"

"না, বলবে না!" এবার বৈজয়ন্তীর দিকে ফিরে—"গয়নাগাটি এমনিভাবে ফেলে-ছড়িয়ে বাথরুমে যেও না। আমি না এসে পড়লে—"

বৈজয়ন্তী কিছু বলবার আগেই তেড়ে উঠল সুন্দরী—"ফেলে-ছড়িয়ে যাবে কেন? আমাকে দিয়েছে বউদিরানি। ওর মা যে আমার গঙ্গাজলের সই গো—এ-গাঁয়ের মানুষ। আমি তো ওর মাসি হই।"

"কী!" যেন এক বিরাট ধাক্কা খেল মামিমা।

প্রমাদ গনল বৈজয়ন্তী। সর্বনাশ করল সুন্দরী। বলল তাড়াতাড়ি—"কথাটা সত্যি, মামিমা।" কাঁচা মিথ্যে বলতে একটুও আটকাল না ওর মুখে। ও যে কথা দিয়েছে বুদ্ধদেবকে। মিথ্যের ফুলঝুরি ছোটাবে—কাকপক্ষীকেও জানতে দেবে না স্বামী কোথায় গেছে।

"সুন্দরী তোমার মায়ের সই! সুন্দরী তোমার মাসি। সুন্দরীকে তুমি দুলজোড়া দিয়েছ!"

"হ্যাঁ," এক অক্ষরে জবাব দিল বৈজয়ন্তী।

যেন খাবি খেল মামিমা। মুখে কথা ফুটল না।

বৈজয়ন্তী বললে—"মামিমা একটা কথা রাখতে হবে আপনাকে।"

জবাব দিল না মামিমা।

কণ্ঠে অনুনয় ঢেলে বলল বৈজয়ন্তী—"ঠাকুরমার কানে কথাটা তুলবেন না। কাউকে বলবেন না। সুন্দরী দুল ফিরিয়ে দেবে পরশুদিন।"

মামিমার গলায় কণ্ঠা বারদুয়েক ওঠানামা করল কেবল—স্বর ফুটল না।

এগিয়ে এসে বৈজয়ন্তী মামিমার দুহাত জড়িয়ে ধরে বললে—"কথা দিন মামিমা। কাউকে বলবেন না। দুল তো ও ফিরিয়ে দেবে। কথা না দিলে ছাড়ব না আপনাকে।" শেষের দিকে স্বর একটু তীক্ষ্ণ হল বৈজয়ন্তীর।

চকিতে চোখ তুলে বলল মামিমা—"ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

কিন্তু ঠিক রইল না।

পাঁচ মিনিটও গেল না। ঘরে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং দেবী চৌধুরাণী। সাদা পাথরের মতো মুখ। দুই চোখও বুঝি পাথরখচিত।

সুন্দরীর অদৃশ্য হওয়া দেখেই বৈজয়ন্তী বুঝল, জল আরও গড়াবে।

"নাতবউ!" পাথর-কঠিন গলা ঠাকুরমার।

"ঠাকুমা!"

"দুলজোড়া তুমি সুন্দরীকে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ, ঠাকুমা।"

"বাড়ির দাসীকে এ-বংশের স্মৃতি বিলিয়ে দেওয়ার অধিকার তোমার নেই নাতবউ।"

এর চাইতে চাবুকের জ্বালাও বুঝি সওয়া যায়।

বৈজয়ন্তী না হেসে শুধু বললে—"কিন্তু দুলজোড়া এখন আমার। দেওয়ার অধিকারও আমার।"

"নাতবউ, এ দুল আমার স্বামী প্যারিস থেকে এনে দিয়েছিলেন আমাকে। অর্থমূল্যের চাইতেও অনেক বেশি মূল্য পুরোনো স্মৃতির—তা কি তোমার জানা নেই?"

কথার শ্লেষ যেন বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দিল বৈজয়ন্তীর সর্বাঙ্গে। মামিমা সবই বলেছে তাহলে। এ বাড়ির নাতবউ—এ বাড়ির দাসীর বোনঝি—তাও ফলাও করে লাগিয়েছে ঠাকুরমাকে। দাসীর বোনঝি স্মৃতির কদর রাখবে না—এইটাই তো স্বাভাবিক।

মুখ লাল করে বলল বৈজয়ন্তী—"দুল পরশুদিন ফেরত পাচ্ছি।"

"সুন্দরী," বৈজয়ন্তীর কথার জবাব দিলেন না ঠাকুরমা। "দুলজোড়া আমাকে দাও।"

"আমি..."

"আমার হাতে দাও।"

"বউদিরানি আমাকে—"

"আমার হাতে দাও।"

যন্ত্রচালিতের মতো দুল খুলে ঠাকুরমার প্রসারিত হাতে ফেলে দিল সুন্দরী।

অবিচলকণ্ঠে বললেন ঠাকুরমা—"মামাবাবুর কাছে তোমার পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে যেও। তোমাকে আর এ বাড়িতে যেন না দেখি।"

ঘরের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বৈজয়ন্তী আর সুন্দরী। দু-জনেরই মুখে আষাঢ়ের ঘনঘটা।

বৈজয়ন্তী দ্রুত ভাবছিল। কাল থেকে সুন্দরীর সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। চোখে-চোখে থাকলে মুখ বন্ধ করে রাখা যেত সুন্দরীর। চোখের আড়ালে গিয়ে কী কাণ্ডই না করে বসে! বিশেষ করে আজকের এই চেঁচামেচির পর গায়ের জ্বালায় ও যদি ডাক্তারকে সব ফাঁস করে দেয়!

ভাবতেই কুলকুল করে ঘামতে লাগল বৈজয়ন্তী। আজকের কেলেঙ্কারি ডাক্তার জানবেই। সাবিত্রীই ফাঁস করে দেবে। বাড়ির নতুন বউ যে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক— মুখরোচক এই সংবাদটি ফলাও করে বলা হবে তাঁকে। শুনেই সন্দেহ হবে তাঁর। তারপর—

"শুনলে তো বাছা," সুন্দরীর কথায় সম্বিৎ ফিরল বৈজয়ন্তীর। "কাটকেটে কথাগুলো শুনলে? একেই বলে বউকাঁটকি শাশুড়ি—"

"সুন্দরী," চট করে দরজা দিয়ে উঁকি মেরে এসে বসলে বৈজয়ন্তী। "তুমি থাকো কোথায়?"

"কেন?"

"আমার জন্যেই তোমার চাকরি গেল। আমি তোমায় খুশি করে দেব। কত টাকা পেলে তুমি খুশি হবে বলো?"

সুন্দরীর কুতকুতে চোখদুটিতে লোভ চকচক করে উঠল। একটু ভাবল। তারপর বলল—"পাঁচশো।"

চমকে উঠল বৈজয়ন্তী। ঠিক ওই পরিমাণ টাকার চেক স্বামীদেবতা লিখে দিয়ে গেছে। সে-চেক রয়েছে টেবিলের ড্রয়ারে।

এর মানে একটাই। সুন্দরী ওদের অসাক্ষাতে ভুয়ার হাতড়েছিল। চেকটাও দেখেছে।

সুন্দরীর লোভাতুর চোখের দিকে চেয়ে শান্তগলায় বললে—"তাই পাবে। কালকেই নগদ টাকা আমি পৌঁছে দিয়ে আসব। কিন্তু একটা কথা রাখতেই হবে।"

"কী?"

"সাতদিনের জন্যে বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে।"

"কেন গো?"

"দরকার আছে। যদি থাকো, পরে তোমায় আরও টাকা দেব।"

আরও টাকা। সুন্দরীর কপাল কি আজ আলিবাবার গুহার মতোই চিচিংফাঁক হল? একটুও না ভেবে তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল সুন্দরী। একগাল হেসে বললে—"বেশ, বাছা, বেশ। তাই হবে। আমার বোন অনেকদিন থেকে বলছে—না হয় দিনসাতেক ওর কাছেই থেকে আসব।"

"কোথায় থাকে সে?"

নাম বলল সুন্দরী। জায়গাটা মাইল পঞ্চাশ দূরে। "তোমার এখনকার ঠিকানাটা বলো। তাড়াতাড়ি।"

বলল সুন্দরী। লিখে নিল বৈজয়ন্তী।

নাটক জমল সেই রাত্তিরেই। মিথ্যের নাটক।

বৈজয়ন্তীর আশঙ্কাই সত্য হল। ডাক্তার আসতে-না-আসতেই সাতকাহন কাহিনি

শুনিয়ে দিল সাবিত্রী। অথচ এই ভয় করেই একই সময়ে একাকী তার সঙ্গে দেখা করেছিল বৈজয়ন্তী। কথা আদায় করেছিল, সন্ধ্যা-আসরে যেন এ নিয়ে আলোচনা না হয়। মামাবাবুও কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলোচনা হল রীতিমতো নাটকীয়ভাবে।

কাশ্মীরি কার্পেটের ওপর চক্রাকারে সাজানো আরামকেদারা। এ জাতীয় আরামকেদারা ইদানীং আর তৈরি হয় না। বিদেশ থেকে আমদানি করা মখমল দিয়ে মোড়া। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিপুল; আর কুশন তো নয়, যেন তাল-তাল মাখন।

এ হেন সোফাকোচে গোল হয়ে বসেছেন চৌধুরী বাড়ির সবাই। সান্ধ্য আড্ডায় হাজির হয়েছেন ডক্টর শিশির ভাদুড়ি। লাল-লাল চেহারা, চোখা চোখা কথা আর মিষ্টি-মিষ্টি হাসি দিয়ে একাই মাতিয়ে রেখেছেন আসর।

দেবী চৌধুরানী ঠাকুরমা নিশ্চুপ দেহে বসে শুনছিলেন সাড়ে বত্রিশভাজা আলোচনা। মুখে রা নেই। চোখে সীমাহীন স্নিগ্ধতা। বৈজয়ন্তীর মনে হল যেন একটা নামি আর্টিস্টের পেন্টিং দেখছে। সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো নিখুঁত একটা চিত্র। সুখশান্তি উথলে উঠছে বৃদ্ধার চোখে মুখে।

না। কিছুক্ষণ আগেকার বিশ্রী কাণ্ডকারখানার লেশমাত্র নেই ওঁর আশ্চর্য প্রশান্ত চোখে মুখে। হিমালয়প্রতিম স্থৈর্য, ধৈর্য, সহিষ্ণুতার সজীব প্রতিমূর্তি যেন তিনি।

ছন্দপতন ঘটাল সাবিত্রী।

ডক্টর ভাদুড়ি তখন লস্ট আটলান্টার পুনরাবিষ্কার নিয়ে খোশগল্প জুড়েছেন মামাবাবুর সঙ্গে। সাগরগর্ভে সমাহিত পুরাকালের বিস্ময়কর সভ্যতা নিয়ে কত অলীক উপন্যাসই না রচিত হয়েছে। যেমন, ক্যাপ্টেন নিমোর নটিলাসে বন্দি প্রফেসর আরোনার অবাস্তব কাহিনি।

বৈজয়ন্তী শুনছিল আর লক্ষ করছিল সাবিত্রীর মুখভাব। মেয়ে হয়ে জন্মে সে মেয়েদের মনের কথা আঁচ করতে পারে বইকী। সাবিত্রী চাইছে ডক্টর ভাদুড়ি, যিনি কিনা তার পিতার সমবয়েসি, তার সঙ্গে কথা বলুক। কিন্তু ডঃ ভাদুড়ির খেয়াল নেই সেদিকে। তিনি চৌকস আড্ডাবাজ। আড্ডা নিয়েই ব্যস্ত। কে বলবে ক্রুর চক্রান্তের খলনায়ক ইনি। ফি-বছর সরকারের চারশো কোটি বিদেশি মুদ্রা লোকসানের অন্যতম হেতু তিনি। সারা পশ্চিম উপকূল বরাবর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ব্যাপক হারে স্মাগলিংয়ের গোপন শরিক ইনি।

আশ্চর্য! বাইরে শশধর, ভেতরে বিষধর!

লস্ট আটলান্টার মুখরোচক কাহিনি থেকে আড্ডার প্রবাহ সরে এসেছে মাদক-দ্রব্যের নোংরামিতে। পরমোৎসাহে ডঃ ভাদুড়ি বর্ণনা করছেন এল.এস.ডি. জাতীয় বস্তুগুলো কীভাবে এ দেশের শতকরা তিরিশ ভাগ ছাত্রের মানসিক বিপর্যয় ডেকে আনছে। মাদকদ্রব্যের বড়ি কালসাপের যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয় বলে যুগযন্ত্রণা ভুলতে ছাত্রসমাজ ভক্ত হয়েছে মাদকদ্রব্যের—

স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনছে বৈজয়ন্তী। আর ভাবছে, বুদ্ধদেব ভুল করেননি তো? মাদকদ্রব্যের কুফল বর্ণনা করতে যিনি আবেগে উত্তেজনায় অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছেন, মাদকদ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁকে কি মানায়?

ঠিক এমনি সময়ে দুম করে যেন ফেটে পড়ল সাবিত্রী।

"বাবা।"

নিমেষে স্তব্ধ হলেন ডঃ ভাদুড়ি। মামাবাবু চোখ তুললেন—"কী হল?"

"ডঃ ভাদুড়িকে আজকের কথা কিছু বলেছ?"

সতর্ক হলেন মামাবাবু—"সে হবে'খন।"

"মাদকদ্রব্যের কেলেঙ্কারি কি ঘরের কেলেঙ্কারিকে ছাড়িয়ে গেল?"

কাঁপরে পড়লেন মামাবাবু। আড়চোখে দেখলেন অন্যান্যের মুখের অবস্থা। বৈজয়ন্তী পাথর। দেবী চৌধুরাণী ভাবলেশহীন। সাবিত্রীর মা উন্মুখ।

ডঃ ভাদুড়ি কৌতূহলী চোখে নিরীক্ষণ করলেন সারি-সারি মুখে ভাবের লুকোচুরি। তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বললেন—"কেলেঙ্কারি! কাকে নিয়ে?"

সোজা প্রশ্ন। আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বৈজয়ন্তী বেশ বুঝল, শুধু তার উপস্থিতির জন্যেই এতক্ষণে প্রসঙ্গটা ওঠেনি। ডাঃ ভাদুড়ি শুধু চিকিৎসক নন, ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। সুতরাং তিনি জানবেনই।

রামকৃষ্ণ সান্যাল কথা ঘোরানোর চেষ্টা করলেন হাসি মস্করা করে। ডঃ ভাদুড়ি তাঁর বন্ধুস্থানীয়। তাই টিটকিরি দিয়ে বললেন—"আপনার নামটা টিটেনাস না রেখে ট্যাংরা রাখলে ভালো করতাম। ট্যাংরার কাঁটা আপনি, ঢুকলে আর বেরোতে চান না।"

অট্টহেসে বললেন ডঃ ভাদুড়ি—"যা খুশি আপনার।" বৈজয়ন্তীর দিকে ফিরে বললেন—"ভয় নেই, আমি টিটেনাসের জীবাণু পকেটে নিয়ে ঘুরি না। মিঃ সান্যালের ধারণা আমি যখন রোগকে তাড়া করি তখন ধনুষ্টঙ্কার রুগির মতই রোগ বেচারি বেঁকে-চুরে চম্পট দেয় রুগিকে ছেড়ে। তাই আমার নাম ডাঃ টিটেনাস। ইট ইজ এ কমপ্লিমেন্ট, ম্যাডাম।"

বৈজয়ন্তীর মুখেও হাসির রেখা দেখা গেল। বলল—"তা তো বটেই।"

লঘু পরিহাসে সাবিত্রীর অপকর্ম বানচাল হওয়ার উপক্রম হয়েছে দেখা গেল। সাবিত্রীও সেটা বুঝল। কিন্তু মেয়েরা যখন ঈর্ষাবিষে জ্বলে, তখন তারা আর মানবী থাকে না, দানবী হয়।

সুতরাং তীক্ষ্ণকণ্ঠে হালকা আবহাওয়াকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বলল সাবিত্রী—"সুন্দরীর চাকরি গেছে শুনেছেন, ডাঃ ভাদুড়ি?"

আবার হাসি মিলিয়ে গেল টিটেনাস ভাদুড়ির মুখ থেকে। টলটলে পারার মতো পিচ্ছিল আর নিরেট দুই চোখে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন মৃদু তিরস্কারের সুরে—"সুন্দরী একজন ঝি। তার চাকরি কেন গেল, সেটা জানা কি আমার বিশেষ দরকার?"

ভর্ৎসনা বল্লমের মতই আঘাত করল সাবিত্রীকে। হিস্টিরিয়ার ছোঁয়া লাগল যেন স্বরের তীক্ষ্ণতায়। বলল অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে—"না। তা জানার দরকার নেই। কিন্তু বাড়ির নতুন বউ যখন বংশের নীলকান্তমণিকে তুলে দেয় ঝিয়ের হাতে, যখন সে ঝি-কে মাসি বলে ডাকে, তখন তা জানার দরকার হয় বইকী!"

ইলেকট্রিক শক খেলে যা হয়, ঠিক তেমনিভাবে মুহূর্তের জন্যে যেন ধাক্কা খেলেন ডাঃ ভাদুড়ি। আশ্চর্য-সুন্দর চোখদুটিতে প্রচণ্ড প্রশ্ন বিছিয়ে চাইলেন বৈজয়ন্তীর পানে। নীরবে যেন জানতে চাইলেন—ব্যাপার কী? শুনছি কী এসব? চৌধুরী পরিবারের বউ

সামান্য ঝিয়ের সমগোত্রীয়া?

কিন্তু বুদ্ধিমান পুরুষের বড় লক্ষণ হল প্রকৃত মুহূর্তে বুদ্ধির যথা ব্যবহার। এ-ক্ষেত্রেও তিনি সহসা মৌন হয়ে গেলেন। আর একটি প্রশ্নও করলেন না।

উঠে দাঁড়ালেন রামকৃষ্ণ সান্যাল। "জাহাজি সিগারেট পেয়েছি এক প্যাকেট। চলবে নাকি?"

ইঙ্গিতটা বুঝলেন ডাঃ ভাদুড়ি। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন সকৌতুকে—"কোকেনের গুঁড়ো মেশানো নেই তো?"

"টিটেনাসকে কোকেন দিয়েও ঘায়েল করা যাবে কি?" বলে রামকৃষ্ণ সান্যাল এগোলেন বাগানের দরজার দিকে।

থ হয়ে বসে রইল বৈজয়ন্তী।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এলেন দুজনে। ডাঃ ভাদুড়ি সোজা এলেন বৈজয়ন্তীর সামনে। দুই চোখে গাম্ভীর্যের লেশমাত্র নেই। হাসি আছে, সহানুভূতি আছে, আপন করে নেওয়ার স্বাদ আছে।

বললেন মিছরির মিহি-মসৃণ গলায়—"ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে মিনিট কয়েক কথা বলতে চাই।" বলে হাতের ইঙ্গিতে দেখালেন ঘরের কোণে রাখা খাবার টেবিলের দিকে।

মনে-মনে প্রমাদ গুনল বৈজয়ন্তী। শুরু হল পরীক্ষা। বাঘে-সেউলে লড়াই আরম্ভ হল বলে। ডাঃ টিটেনাস! কী ভীষণ নাম! ডাঃ টিটেনাসের টংকার শুনতে আর বুঝি দেরি নেই! বুদ্ধ! বুদ্ধ! তুমি ভেব না—তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে দেব না কাউকে—!

উঠে দাঁড়াল বৈজয়ন্তী। পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়াল নিভৃত কোণটিতে। পেছনে না তাকিয়েও উপলব্ধি করল জোড়া-জোড়া চাহনি নিবদ্ধ তার ওপর। এক-একজনের চাহনিতে এক-একরকম ভাব পরিস্ফুট। বৃদ্ধার চাহনি দুর্বোধ্য। মামিমার চাহনিতে উল্লাস। সাবিত্রীর চাহনিতে বিদ্বেষ। মামাবাবুর চাহনিতে ধাঁধা।

তাই বৈজয়ন্তীর মতো বিদুষী মেয়েকে জেরা করার ভারটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন একজনের ওপর যিনি এ বাড়ির কেউ নন, অথচ যাঁকে এ বাড়ির সবাই ভালোবাসে, বিশ্বাস করে।

কিন্তু কেউ জানে না তিনি বাইরে শঙ্কর, ভেতরে বিষধর।

খাবার টেবিলে মুখোমুখি বসল দুজনে। ডাঃ ভাদুড়ি গভীর স্নেহ নিয়ে চেয়ে আছেন। আর বৈজয়ন্তী গভীর প্রত্যয় নিয়ে সময় গুনছে।

মৃদুকণ্ঠে শুধোলেন ডক্টর—"ম্যাডাম, কী ব্যাপার বলুন তো?"

কী সুরে কথার জবাব দেবে, তা মনে-মনে ঠিক করে নিয়েছিল বৈজয়ন্তী। প্যানপ্যানানি দেখালে চলবে না। কী ধাতু দিয়ে গড়া বৈজয়ন্তী চৌধুরী তার নমুনা দেখানোর সময় এসেছে।

তাই ভাদুড়ি ডাক্তারের মিষ্টি প্রশ্নের জবাব গেল ঝাঁঝালো সুরে—"কী ব্যাপার জানতে চান বলুন।"

স্নেহকোমল হাসলেন ডাক্তার। রাগ করলেন না। শুধু চেয়ে রইলেন ক্ষমাসুন্দর চোখে। মোলায়েম হাসিটুকু লেগে রইল গোলাপের পাপড়িতে শিশিরের বিন্দুর মতো তাঁর পাতলা ঠোঁটের কোণে।

শুধু চেয়ে থাকা—আর কিছু নয়। কিন্তু কাজ হল তাইতে। ডাক্তার পোড়-খাওয়া মানুষ। মানুষের চরিত্র গুলে খাওয়া মানুষ। তিনি জানেন বৈজয়ন্তীর স্নায়ুমণ্ডলীর উৎকণ্ঠিত অবস্থা। এ পরিস্থিতিতে অধিক কথায় নার্ভ তিড়বিড়িয়ে ওঠে।

তাই যেন মন দিয়ে বৈজয়ন্তীর মনস্পর্শ করলেন ডাক্তার। হাসিমুখে চেয়ে যেন নীরব ভাষায় বললেন—"ভয় কি? আমি আছি তো।"

মুহূর্তের জন্যে বৈজয়ন্তীর মনে হল, সে ভুল করছে, যে মানুষটা বলে কম, বোঝে বেশি, তাকে শত্রু মনে করে এই শত্রুপুরীতে সে ভুল করছে।

পরক্ষণেই চমকে উঠল বৈজয়ন্তী। এ কী কথা ভাবছে সে? শ্বশুরবাড়ি শত্রুপুরী, আর শত্রু হল মিত্র? উদ্ভট এ-চিন্তাধারা কে ঢোকাল তার মগজে?

ডাক্তার তখনও টলটলে চোখে চেয়ে আছেন। চোখ যেন তাঁর কথা বলছে।

চোখ কথা বলছে। অদ্ভুত ভাবনা বৈজয়ন্তীর মাথায় আসছে। অকস্মাৎ একটা ভয়ানক সন্দেহ উঁকি দিল বৈজয়ন্তীর মগজে।

ডাঃ ভাদুড়ি সম্মোহন-বিদ্যায় বিদ্বান নয় তো? উনি প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বৈজয়ন্তীকে হিপনোটাইজ করছেন না তো? চিন্তাচালনা বা টেলিপ্যাথি দিয়ে ওঁর চিন্তা প্রক্ষেপ করছেন না তো বৈজয়ন্তীর স্নায়ু মগজে?

কুটিল সন্দেহটা মনের কোণ থেকে লাফিয়ে উঠে যেন আরও কয়েকটা কথা মনে করিয়ে দিল বৈজয়ন্তীকে। এ গৃহে ডাক্তারের নিত্য আগমন ঘটে সাবিত্রীর চিকিৎসার জন্যে। মনের চিকিৎসা। মনের রোগ তাড়াতে হলে সম্মোহন-বিদ্যে জানা দরকার। ডাক্তার কি সেই বিদ্যেই প্রয়োগ করছেন তার ওপর?

এইবার ভয় পেল বৈজয়ন্তী। হিপনোটিজম এমনই একটা মনের শক্তি যা দুর্জনের মধ্যে আশ্রিত হলে অপব্যবহার হবেই। ডক্টর যে ব্যবসা ফেঁদেছেন, তাতে হিপনোটিজম লাভজনক তো বটেই। বৃদ্ধদেব বলে গেছে, থানা-পুলিশ অফিস-আদালত—সব নাকি রহস্যময় স্মাগলার এজেন্টের হাতের মুঠোয়। একমাত্র হিপনোটিজমেই তা সম্ভব।

শুধু একটা নিমেষ ফেলতে যেটুকু সময়। সেইটুকু সময়ের মধ্যে যা ভাববার ভেবে নিল বৈজয়ন্তী। সেইসঙ্গে মনে পড়ল সেভেনটির সাহেবের সেই আশ্বাসবাণী—ভয় নেই! সম্মোহিত হওয়ার ইচ্ছে না থাকলে মন দিয়ে রুখে দাঁড়াও—নাকের জলে চোখের জলে হবে সম্মোহক।

সুতরাং রুখে দাঁড়াল বৈজয়ন্তী।

হেসে, চোখে চোখ রেখে বলল—"মাপ করবেন আমার রুক্ষতার জন্যে। তিলকে তাল করার চেষ্টা চললে ধৈর্যরক্ষা করা কঠিন হয় বইকী।"

"তা তো বটেই," যেন নিক্তি দিয়ে ওজন করে শব্দক'টা বললেন ডাক্তার। চাহনি কিন্তু নিবদ্ধ রইল বৈজয়ন্তীর চোখের ওপর।

ইউরোপ-ঘোরা ডাকসাইটে মেয়ে বৈজয়ন্তীও সমানে চেয়ে রইল চোখের মধ্যে।

বলল—"সুন্দরী দুলটা ধার নিয়েছিল মাত্র দুদিনের জন্যে। বোনঝির কাছে এটুকু দাবি এঁদের কাছে অলৌকিক হতে পারে, আমার কাছে নয়।" অম্লানবদনে মিথ্যে বলছে বৈজয়ন্তী।

"কিন্তু সমস্যা তো তা নিয়ে নয়," সহজস্বরে বললেন ডাক্তার। "এ বাড়ির অভিজাত্য আঘাত পেয়েছে।"

"অভিজাত্যের চাইতে মানুষ নিশ্চয় বড়?" শাণিত তলোয়ারের মতো ঠোঁট বেঁকিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে জবাবটা ছুড়ে মারল বৈজয়ন্তী। "এটা ফিউডাল যুগ নয়। ঝিয়ের বোনঝি হওয়াটাও অপরাধ নয়। রক্তের রং লাল—নীল নয়। নীল রক্তের যুগ এখন গত।"

সপ্রশংস চোখে চেয়েছিলেন ডাক্তার। মুখ খুলেছে বৈজয়ন্তী। নববধূর ব্রীড়ানম্র চাহনি পরিত্যাগ করেছে। এ সেই বৈজয়ন্তী, স্বদেশে-বিদেশে ডিবেটিং ক্লাবে যে উঠে দাঁড়ালে প্রমাদ গণত পুরুষ-বন্ধুরা, ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যেত মেয়ে-বান্ধবীরা। বৃদ্ধদেব যাকে অর্ধাঙ্গিনী করেছে, সে-যে কী ধাতু দিয়ে নির্মিত, তা এরা জানুক।

লোহায়-লোহায় ঠক্কর লাগল যেন। তারিফভরা চোখে তাকিয়ে সতর্ক কণ্ঠে বললেন ডাক্তার—"বাঃ, বেশ গুছিয়ে কথা বলেন তো। আপনার সঙ্গে আমিও একমত। এ অভিজাত্য মেকি অভিজাত্য। কিন্তু এঁরা সেজন্যেও ক্ষুব্ধ নন, ক্ষুব্ধ অন্য কারণে।"

"যথা?"

"বৃদ্ধদেবের চিঠিতে আপনার বংশ-পরিচয় লেখা ছিল। আপনি এ-বাড়িতে আসার অনেক আগে থেকেই জানতাম আপনার মাতৃপরিচয়।"

"তাতে এমন কথা নিশ্চয় লেখা ছিল না যে আমি সুন্দরীর বোনঝি নই?"

"না, ছিল না।"

রাগের সুরে বললে বৈজয়ন্তী—"অর্থাৎ, আমি মিথ্যে বলছি?"

ফাঁদে পা না-দিয়ে বললেন ডাক্তার—"সুন্দরী যাওয়ার সময়ে এঁদের বলে গেছে, গোবিন্দপুরে তার দেশ। আপনার মা-ও গোবিন্দপুরের মেয়ে।"

"সুতরাং গাঁ-সুবাদে মাসি বলা যায় নিশ্চয়!"

"যায়। কিন্তু গোবিন্দপুরে আপনার মা কোনওকালেই ছিলেন না।"

চেয়ে রইল বৈজয়ন্তী—"আপনি কি মিথ্যেবাদী বলার জন্যেই আমাকে ডেকে আনালেন?"

"বৃদ্ধদেবের একটা চিঠিতে স্পষ্ট লেখা ছিল, আপনার মাতুলবংশ কলম্বো থেকে সোজাই এসেছেন। নামে তাঁরা বাঙালি, বাংলার মাটির সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগ নেই।"

মুখ লাল হয়ে গেল বৈজয়ন্তীর। কথাটা সত্যি। বাবা ছিলেন মস্ত পণ্ডিতবিদ। সারা পৃথিবী জুড়ে ছিল তাঁর অধ্যাপনা-ক্ষেত্র। ভিজিটিং লেকচারার হিসেবে ইউরোপ আমেরিকা হরদম যেতে হয়েছে তাঁকে। পৃথিবীর দুই গোলার্ধেই ছিল তাঁর নামডাক। কলম্বো ছিল তাঁর স্থায়ী নিবাস। সেই কারণেই একমাত্র মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন রোমে।

বুদ্ধদেবের ওপর ভীষণ রাগ হয়ে গেল বৈজয়ন্তীর। কী দরকার ছিল সাপু বউয়ের অত বংশপরিচয় দেওয়ার? অবশ্য না দিয়েও পার পেত কি? যা দক্ষশীল পরিবার। অস্থিকুঁড়ের মেয়ে যে নয় বৈজয়ন্তী, তা জানানোর জন্যে তাই উঠে-পড়ে লেগেছিল বুদ্ধদেব

এখন? এখন তো ধরা পড়ে গেল ওর নিজের জলজ্যান্ত মিথ্যেটা। ধরা পড়ল খোদ বাঘের কাছে।

বাঘের মুখে কিন্তু তখন সেই হাসি। চোখে সেই সম্মোহনী দৃষ্টি।

আচম্বিতে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন বাঘ—"ওস্তাদকে চেনেন?"

হৃদপিণ্ডটা ইস্পাত দিয়ে তৈরি হলে এরকমভাবে লাফিয়ে উঠত না নিশ্চয়। কিন্তু মানুষের হৃদপিণ্ড আচমকা ধাক্কা খেলে ধড়ফড় করবে বইকি। বেচারি বৈজয়ন্তীর হৃৎটাও যেন ডবল ডিগবাজি খেয়ে এসে ঠেকল কণ্ঠার কাছে।

সেকেণ্ড কয়েক দুজনেই দুজনের পানে চেয়ে রইল নিমেষহীন চোখে।

ডাক্তার যেন মাপতে চাইছেন বৈজয়ন্তীর মিথ্যের বহর। আর বৈজয়ন্তী মাপতে চাইছে ডাক্তারের জ্ঞানের বহর। কতখানি জানেন ভদ্রলোক? ওস্তাদের নাম অত্যন্ত গোপন নাম। সে-নাম তিনি জানেন এবং অরক্ষিত মুহূর্তে নামটি প্রাণ করে ছুড়ে দিয়ে দেখতে চাইছেন বৈজয়ন্তীর ওপর তার প্রতিক্রিয়া।

"ওস্তাদ? সে কে?"

সেন্টিমিটার দিয়ে মাপা ছোট্ট হাসি হেসে বললেন ডাক্তার—"বুদ্ধদেবের বর্তমান ঠিকানাটা ওস্তাদের কাছে পেলে—"

"কে ওস্তাদ? কার কথা বলছেন আপনি? তাছাড়া ওর ঠিকানা আপনারা কি জানেন না? বোম্বাইয়ের—"

"বোম্বাই গেছে ও?"

থ হয়ে রইল বৈজয়ন্তী।

আর বাঘের চোখে যেন টিমটিম করে জ্বলতে লাগল কৌতুকের আলো।

কতটুকু জানেন ডাক্তার? কানাডা গেছে বুদ্ধদেব, তা জানেন না নিশ্চয়। কিন্তু বোম্বাই সে যায়নি, তা আঁচ করেছেন।

অর্থাৎ, সুন্দরীর সঙ্গে যোগাযোগ নেই ডাক্তারের। থাকলে এতক্ষণে জেনে ফেলতেন বুদ্ধদেব কোথায় গেছে প্রাণটাকে বউয়ের মুঠোয় রেখে...

বাঘের চোখ চেয়ে আছে তার পানে। টিমটিম করে সেখানে জ্বলছে কৌতুকের রোশনাই, বিদ্রূপের বহ্নি।

হুঁশিয়ার হল বৈজয়ন্তী। পদক্ষেপে একটু ভুল হলেই, একটা বেচাল কথা মুখ দিয়ে বেরোলেই প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে হবে না স্বামীদেবতাকে।

বুদ্ধদেব ঠিকই বলেছে। ডঃ বিশ্বজিৎ ভাদুড়ি অতিশয় সাংঘাতিক লোক। গুপ্তচরের সব গুপ্তগুণই তাঁর আছে।

বুদ্ধদেবের গতিবিধি তাঁকে সন্দিগ্ধ করেছে। হয়তো তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে বৈজয়ন্তীর মিথ্যাকথন।

হয়তো ধুরন্ধর মস্তিষ্কে মিথ্যাবচনের প্রকৃত উদ্দেশ্যটুকুও অঙ্কুরিত হয়েছে।

মিথ্যা দিয়ে কিছু গোপন করার চেষ্টা করছে নতুন বউ, তা আঁচ করেছেন কি ভদ্রলোক?

পরের প্রশ্নেই জানা গেল, তথ্য বন্দুর গড়িয়েছে।

ডক্টর টিটেনাস মোলায়েম হেসে বললেন—"সুন্দরীর মুখ বন্ধ করছিলেন না তো?"

বৈজয়ন্তী ততোধিক মোলায়েম হাসল। হাসল বটে, কিন্তু কী কষ্টে যে হাসতে হল, তা শুধু সে-ই জানে। ডাক্তার ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছেন। বৈজয়ন্তীর মিথ্যার আড়ালে যে সত্যিটা রয়েছে, সেইদিকেই ঝুঁকেছেন। টেলিপ্যাথি নাকি?

তাই গলাটা শুকিয়ে এল বৈজয়ন্তীর। ধক করে উঠল হৃদযন্ত্রটা। শিরশির করল শিরদাঁড়া।

তবুও মায়াবিনী হাসি হাসল। কালোহীরের ঝিলিক চমকাল ডাগর-ডাগর চোখে। বলল সেই সুরে যে সুর দিয়ে মিথ্যার মহাকাব্য রচিত হয়েছে যুগ-যুগ ধরে ক্লিওপেট্রা-হেলেন-পদ্মিনীদের কণ্ঠে।

"কী জাতীয় মুখ বন্ধ আপনি আশা করছেন, ডক্টর টিটেনাস?" যেন বেহালার তারে ছড়ির টান দিল বৈজয়ন্তী।

"ডক্টর টিটেনাস!" পুনরাবৃত্তি করলেন ডক্টর টিটেনাস এবং পরক্ষণেই উচ্চগ্রামে অট্টহাস্য করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিলেন উৎকণ্ঠা-টলটলে আবহাওয়াকে।

ঠিক সেইসময়ে গমগম করে ধ্বনিত হল পিয়ানোর তারগুলো।

চকিত চাহনি নিক্ষেপ করে বিস্মিত হল বৈজয়ন্তী।

বিশাল পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসেছে সাবিত্রী। শুধু বসে ক্ষান্ত হয়নি, রিডগুলোকে আক্রমণ করেছে। পরিণামে যে সুরের ঢেউ হাইড্রোজেন বোমায় বিস্ফারিত হল ঘরের মধ্যে, তার মধ্যে মিষ্টত্ব নেই, সুরের জাদু নেই, গানের গমক নেই—আছে প্রচণ্ড রোষ, অস্থিরতা, উদ্বেগ।

হ্যাঁ। প্রচণ্ড রোষ, অস্থিরতা, উদ্বেগ। সুর এমনই জিনিস। অন্ধকে চন্দ্র দর্শন করায়, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়। হর্ষ, উদ্বেগ, ক্লেশ, বিষাদকে মুহূর্তে মূর্ত করে।

সাবিত্রীরও হয়েছে তাই। ঈর্ষাকাতর, মনোবিকারগ্রস্ত সাবিত্রী তার মনের মানুষকে সুন্দরী বৈজয়ন্তীর মুখোমুখি বসে থাকতে দেখেছে। অস্থির হয়েছে। চঞ্চল হয়েছে। উদ্বিগ্ন হয়েছে। উৎকণ্ঠিত হয়েছে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছে। ওদের ঘনিষ্ঠ আলাপ পণ্ড করার ঐকান্তিক বাসনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পিয়ানোর সারি-সারি রিডের ওপর।

এবং পিয়ানোই ধরিয়ে দিয়েছে ওকে। নিমেষমধ্যে উন্মোচিত করেছে ওর মনের চেহারা।

হীনমন্যতার কুৎসিত রূপ চক্ষের পলকে কানের মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে ঘরসুদ্ধ প্রত্যেকের।

এমনকী ডক্টর টিটেনাসেরও।

কাশ্মীরি গালচের ওপর ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন ডক্টর ভাদুড়ি। কৌতুক-উদ্ভাসিত চোখে অনিমেষে চেয়ে রইলেন সাবিত্রীর পানে।

সাবিত্রী তখন ঝুঁকে পড়েছে পিয়ানোর ওপর। প্রথম আক্রমণের উন্মাদনা থিতিয়ে এসেছে। কুশলী হাতে রিডগুলোর ওপর তুফান সৃষ্টি করেছে সে সুরের সাগরে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে।

পবিত্র বাজনা নয়। কিন্তু বড় চড়া সুর। যে সুর বুকের ভেতরে মোচড় সৃষ্টি করতে পারে, সূক্ষ্ম দেহেও অনুরণন সৃষ্টি করতে পারে—এ সুর সে সুর নয়।

শাড়ির খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বৈজয়ন্তীও উঠে এসেছিল। শুনছিল কান দিয়ে, ভাবছিল মন দিয়ে। এ ভাবনা পতিদেবতার নিরাপত্তা নিয়ে। চৌধুরী ভবন ছেড়ে বোম্বাই যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল বৈজয়ন্তী। সে পরিকল্পনা এখন মুলতুবি রইল। এ গৃহ ছেড়ে কোথাও যাওয়া এখন সম্ভব নয়। বড় ভয়ানক সন্দেহ দেখা দিয়েছে ডক্টর টিটেনাসের ভয়ানক মস্তিষ্কে। তিনি আঁচ করেছেন, সুন্দরী নিশ্চয় কোনও গুপ্তসংবাদ জেনেছে, তাই তার মুখে কুলুপ এঁটে রাখার উদ্দেশেই বুলডোজার দিতে গিয়েছিল বৈজয়ন্তী।

ডক্টর টিটেনাস এরপর কী করবেন? বৈজয়ন্তীর মুখ বন্ধ। সুন্দরীর মুখ খুলতে চেষ্টা করবেন নিশ্চয়। নিশ্চয় সুন্দরীর বাড়িতেও হানা দেবেন...?

ঘেমে উঠল বৈজয়ন্তী।

কিন্তু অভিনয়ে কোনও ত্রুটি রাখল না।

সাবিত্রীর সংগীত-লহরী স্তব্ধ হওয়ার পর সশব্দে করতালি দিলেন ডাঃ ভাদুড়ি। সপ্রশংস চোখে বললেন—"শাবাশ সাবিত্রী! অনেক পিয়ানো শুনেছি, কিন্তু এমনটি কখনও শুনিনি।"

খোশামোদ। নিছক তোষামোদ। ক্ষিপ্ত সাবিত্রীর উত্তেজিত স্নায়ুকে শান্ত করার প্রচেষ্টা। কিন্তু কাজ হল। নিমেষে সাবিত্রীর বেঁকা ভুরু সরল হল, কোমল হল অধরভঙ্গিমা। বলল—"রিয়ালি?"

"রিয়্যালি।"

সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো রুপোলি ছবির মতো দেবী চৌধুরাণী ঠাকুরমা এতক্ষণে যেন প্রাণবন্ত হলেন। বললেন ধীরকণ্ঠে—"নাতবউ, তুমি তো শুনেছি পিয়ানো বাজাতে; শোনাও না।"

প্রমাদ গণল বৈজয়ন্তী। মনে-মনে প্ল্যান করছিল মাথাধরার অছিলা করে চম্পট দেবে আসর ছেড়ে। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে যাবে সুন্দরীর বাড়ি। আজ রাতেই তাকে সরে যেতে বলবে অন্য কোথাও। ডাঃ ভাদুড়ি আসার আগেই—

কিন্তু পিয়ানোর বাজানোর আমন্ত্রণ এল স্বয়ং ঠাকুরমার তরফ থেকে—যাঁর কথা ঠেলবার সাধ্য নেই বৈজয়ন্তীর—বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে।

কারণ আর কিছুই নয়। সন্দেহ আরও তীব্র হবে টিটেনাস ডাক্তারের।

এমনসময়ে বলে উঠলেন মামাবাবু—"শুধু পিয়ানো কেন। বৈজয়ন্তী তো শুনেছি

দাবা খেলাতেও মাস্টার।"

দুই চোখ কপালে তুলে বললেন ডাক্তার—"রিয়্যালি?"

সর্বনাশ! বুদ্ধদেব করেছে কী! স্ত্রী-প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হয়ে কোনও তথ্যই জানাতে বাকি রাখেনি। বৈজয়ন্তী দাবা জানে বইকী। বাবা অবশ্যই মহাপণ্ডিত ছিলেন। অবসর বিনোদন করতেন দাবার ছকের সামনে বসে। শৈশব থেকে বৈজয়ন্তী ট্রেনিং পেয়েছে দাবার চালে। তারপর যথারীতি গুরুমারা বিদ্যে আয়ত্ত করেছে। অর্থাৎ, পিতৃদেবকেও বড়ের টিপুনি দিয়ে কিস্তিমাত করেছে কতবার।

হ্যাঁ। বৈজয়ন্তী জানে দাবার আড়াই প্যাঁচ এবং আরও অনেক মোক্ষম মারণ প্যাঁচ। সে খেলা যথাসময়ে খেলা যাবে। চৌধুরী বাড়ির বউ যে আর-পাঁচটা মেয়ের মতো নয়, সে পরিচয় দেওয়া যাবে স্বামীদেবতা ফিরে এলে। কিন্তু এখন—

"ম্যাডাম," মিটমিটে চোখে তাকিয়ে আছেন টিটেনাস। "পিয়ানো আমাদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। প্রতি সন্ধ্যাতেই সাবিত্রীদেবী আমাদের অনেক সুধা বিতরণ করেছেন। আপনার মতো সুধাময়ীর কাছ থেকেও কি কিছু সুধা আশা করতে পারি না?"

হেসে ফেলল বৈজয়ন্তী—"দারুণ ফ্ল্যাটারি করতে পারেন দেখছি।"

প্রত্যুত্তরে অট্টহাসি দিয়ে পিয়ানো দেখিয়ে দিলেন ডাঃ ভাদুড়ি।

পালানোর পথ বন্ধ। কত রাতে মুক্তি পাবে বৈজয়ন্তী? অনিশ্চিত, আজ রাত্রে সুন্দরীর নাগাল ধরা একেবারেই অনিশ্চিত। রাতের মধ্যেই যদি ডাক্তার হানা দেন সেখানে, যদি ডাক্তারি জেরার সামনে ফাঁস করে দেয় বুদ্ধদেবের বর্তমান ঠিকানা, তা হলেই হয়ে গেল...।

বৈজয়ন্তী মেয়ে—পুরুষ নয়। সর্বনাশের অশনিসংকেতে কান্না পেল ওর। অবরুদ্ধ কান্না পুঁটলির মতো ঠেলে উঠল গলার কাছে।

তবুও বসতে হল পিয়ানোতে, বসতে হল দাবার টেবিলে।

মনের সমস্ত কান্না উজাড় করে দিয়ে ইথারের মধ্যে অদৃশ্য কান্না ঝরাল সে। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হলেন। বিস্মিত হলেন। বিষাদসাগরে নিমজ্জিত হয়ে মূক হলেন।

বহুক্ষণ ধরে পিয়ানো বাজিয়ে ম্লান হেসে উঠে দাঁড়াল বৈজয়ন্তী। মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে গলা চড়িয়ে বললে—"আসুন, দাবায় কে বসবেন?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন মামাবাবু—"এখন হবে? রাত যে অনেক হল?"

"হোক। আসুন না, চৌধুরীবংশের নতুন বউ চৌধুরী বংশের উপযুক্ত কিনা, সে পরিচয়টা দেওয়া যাক," শেষের দিকে ব্যঙ্গ ঝরল বৈজয়ন্তীর কণ্ঠ থেকে। "মিথ্যেও তো বলতে পারি। ডাঃ ভাদুড়ি আপনি?"

বোবা হয়ে গেলেন সকলে।

দুর্বোধ্য হেসে শুধু উঠে দাঁড়ালেন ডঃ ভাদুড়ি—"আসুন।"

দাবার টেবিলে বসল দুজনে। উঠল রাত বারোটায়।

স্তব্ধ বিস্ময়ে থমথম করতে লাগল গোটা হলঘরটা। দাবায় অপরাজেয় ভাদুড়ি ডাক্তার একদানও জিততে পারেননি বৈজয়ন্তীর কাছে।

আনন্দ এবং বিস্ময়—সবার চোখে এই দুই ভাবের খেলা, সাবিত্রীর চোখে কেবল

জ্বালা...অপরিসীম জ্বালা...

বৈজয়ন্তী কিন্তু মনে-মনে হাসছে—উৎকণ্ঠা অনেক কমে এসেছে—প্ল্যান তার সফল হয়েছে—রাত বারোটা পর্যন্ত আটকে রেখেছে শয়তান-শিরোমণি ডাঃ টিটেনাসকে। এত রাতে নিশ্চয় সুন্দরীর বাড়িতে হানা দেওয়া সমীচীন মনে করবেন না তিনি।

রাতের মতো নিশ্চিন্ত সে—নিরাপদ তার স্বামী-দেবতা।

পরের দিন সকালবেলা থেকে সারাদিনের তোড়জোড় আরম্ভ করল বৈজয়ন্তী।

মামাবাবুকে ধরল কফির টেবিলে।

"একটা ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙব। ব্যাঙ্কের সঙ্গে আপনার খাতির আছে নিশ্চয়। একটু বলে দেবেন?" মিষ্টি হেসে চেয়ে রইল বৈজয়ন্তী।

"কত টাকার চেক?"

"পাঁচশো।"

"এখুনি টাকার দরকার পড়লে আমি দিতে পারি। কষ্ট করে যাওয়ার দরকার কি?"

"যাই না। শহরটা দেখা হবে তো।"

"তা যাও।" ব্যাঙ্কের ঠিকানা এবং এজেন্টের নাম বলে দিলেন মামাবাবু। "দরকার হলে আমাকে ফোনে কনট্যাক্ট করতে বলবে।"

"ঠিক আছে।"

ব্যাঙ্ক।

দরজা খুলতে না খুলতেই ঢুকে পড়ল বৈজয়ন্তী। ইচ্ছে করেই বাড়ির গাড়ি নেয়নি সে—এসেছে ট্যাক্সিতে। ব্যাঙ্ক থেকে যেতে হবে সুন্দরীর বাড়ি। ডাক্তার যদি দূর থেকে ফ্যালকন গাড়ি দেখে চিনতে পারে?

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। সোজা এজেন্টের ঘরে হানা দিল বৈজয়ন্তী। আত্মপরিচয় দিয়ে ট্র্যাভেলার্স চেক বাড়িয়ে দিল।

বলল—"টাকাটা কাইন্ডলি এখুনি দিন। জরুরি দরকার।"

তীক্ষ্ণচোখে তাকালেন এজেন্ট ভদ্রলোক। সুন্দরী দেখে মোহিত হওয়া তাঁর কুষ্ঠিতে লেখেনি। সতর্ককণ্ঠে শুধোলেন—"বুদ্ধদেব চৌধুরীর স্ত্রী আপনি?"

"বললাম তো।"

"উনি কবে ইন্ডিয়া এলেন?"

"গতকাল।"

"উনি নিজে এলেন না কেন?"

"গতকালই বোম্বাই গেছেন বলে।"

"আই সি। দেখুন মিসেস চৌধুরী, আমরা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের চাকুরে তো, কতগুলি ফর্ম্যালিটি মেনে চলতে হয়। রামকৃষ্ণ সান্যালের সঙ্গে যদি এখন টেলিফোনে কথা বলি, কিছু মনে করবেন না আশা করি।"

"একদম না। কিন্তু যা করবেন, তাড়াতাড়ি করুন," মুখ ফুটে বাঁ করে বলবে

বৈজয়ন্তী, দেরি হলে ডাক্তার তার আগেই পৌঁছে যেতে পারে সুন্দরীর বাড়িতে?

চৌধুরীবাড়িতে ফোন করলেন এজেন্ট। দু-একটা কথার পর রিসিভার নামিয়ে হাসিমুখে বললেন বৈজয়ন্তীকে—"কী নোট নেবেন?"

"একশো টাকার পাঁচখানা নোট।"

বেল টিপলেন এজেন্ট।

একশো টাকার পাঁচখানা নোট! এই নিয়ে কত তুফানই উঠল এরপর। পালিয়ে বেড়াতে হল চৌধুরীবংশের কুলবধূ বৈজয়ন্তীকে।

মূলে সেই একজন। ডক্টর টিটেনাস!

ট্যাক্সিতে উঠে ঠিকানাটা বলল বৈজয়ন্তী। ট্যাক্সি-ড্রাইভার বিস্মিত হল গন্তব্যস্থান শুনে। এমন খানদানি চেহারার মেমসাহেবরা তো ও অঞ্চলে যায় না!

কিন্তু কৌতূহল প্রকাশ করা শোভা পায় না ট্যাক্সিচালকদের। সুতরাং বেশ কিছুক্ষণ পরে অনেক পথ-পরিক্রমার পর শহরের উপকণ্ঠে যে অঞ্চলে পৌঁছল বৈজয়ন্তী, তা গরিবদের জন্যই চিহ্নিত। দৈন্য সে-অঞ্চলের পথে ঘাটে, বাড়ি-ঘরদোরে, দোকান-পসরাতে।

দোতলা বাড়িটা পাওয়া গেল অনায়াসেই। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে তরতর করে ওপরে উঠল বৈজয়ন্তী। ওঠবার সময়ে দেখে গেল নিচের তলার ঘরগুলো গুড়ের আড়তদারের কৃপায় সে-ঘরের ত্রিসীমা মাড়ায় কার সাধ্য। মাছি ভনভন করছে চারিদিকে। গুড়ের বস্তা সাজানো সিঁড়ির ওপরেও।

সটান সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে চাতাল। চাতালের সামনে প্লাইউড-আঁটা নড়বড়ে দরজা। কড়া নাড়ল বৈজয়ন্তী।

ভেতর থেকে ভেসে এল সুন্দরীর মার্কামারা গলা—"কে গো?"

"আমি, তোমার বোনঝি।"

দরজা খুলল সঙ্গে-সঙ্গে। সুন্দরী তো অবাক বৈজয়ন্তীকে দেখে।

"একী গো বাছা! খুঁজে পেতে সত্যিই চলে এলে?"

"আসব না তো কী করব?" সুন্দরীকে ঠেলে ভেতরে ঢুকল বৈজয়ন্তী। "তোমার কতবড় ক্ষতি করলাম বলো তো?"

"তুমি আর কী করবে বলো বাছা, বড়লোকদের মেজাজই ওইরকম।"

একখানি মাত্র ঘর। গরিব-দুঃখীর ঘর যেরকম দীনহীন হয়—সেইরকমই। দুটি তক্তপোশ। একটি তক্তপোশের ওপর পুরুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র।

"মাসি, জামা-প্যান্টগুলো কার?"

"আমার ছেলের গো। ড্রাইভারি করে তো। লরি চালিয়ে বোম্বাই যায় আর আসে। এই তো পরশু গেল সে। আসবে পনেরো দিন পর।"

"ও। তুমি বোনের বাড়ি যাচ্ছ কখন?"

"এখুনি। তাই তো বাঁধা-ছাঁদা করছি।" সত্যিই আরেকটা তক্তপোশে একটা পুঁটলি বেঁধে রেখেছে সুন্দরী।

"মাসি," জানলা দিয়ে রাস্তার ওপর চোখ রেখে রুদ্ধকণ্ঠে শুধোল বৈজয়ন্তী—"আর কেউ তোমার কাছে এসেছিল?"

"কে আবার আসবে গা।"

"ইয়ে মানে...উনি কোথায় গেছেন জিগেস করতে কেউ আসেনি?—"

"না তো।"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বৈজয়ন্তী। কিন্তু আর দেরি করা যায় না। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে তাড়াতাড়ি নোট পাঁচখানা বার করে গুঁজে দিল সুন্দরীর হাতে।

বলল—"রাখো। দিনদশেকের আগে এদিকে আর এসো না। এখুনি যাও। আর মনে রেখো, কারও কাছে, সে যেই হোক না কেন, উনি কোথায় গেছেন তা বলবে না। কেমন?"

দন্ত বিকশিত করে, বিগলিত হাসিতে লুটিকাটা হয়ে বললে সুন্দরী—"তা আর বলতে," বলে নোট পাঁচখানা চালান করল ব্লাউজের অন্দরে।

দৃশ্যপটে ডক্টর টিটেনাস দৃশ্যমান হলেন ঠিক সেই মুহূর্তে।

জানলা দিয়ে দেখা গেল রাস্তার মোড়ে আবির্ভূত হয়েছে একটা হলুদ গাড়ি। চকিতে মুখ বাড়িয়ে দেখল বাড়ির নম্বর। আবার গড়াল চাকা।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল বৈজয়ন্তী। ডক্টর টিটেনাস এসে গেছেন। হলুদ গাড়ি চালিয়ে নিজেই এসেছেন সুন্দরীর পেটের কথা জানতে।

পালাতে হবে এই মুহূর্তে। কিন্তু পালাবে কোন পথে? দরজা দিয়ে নামলেই নিমে সড়ক—সামনে আগুয়ান হলুদ গাড়ি আর ডক্টর টিটেনাস।

ত্রস্তে বলল বৈজয়ন্তী—"মাসি, সে আসছে।"

"কে আসছে গা?"

"ডক্টর ভাদুড়ি!"

"ডাক্তারবাবু? আমার বাড়িতে আসছেন? কেন গা?"

"সুন্দরী, ওই শোনো ওঁর গাড়ি থামল বাড়ির সামনে। তুমি কিন্তু কোনও কথা বলবে না, কেমন?"

ঘাড় নেড়ে বিমূঢ় মুখে সায় দিল সুন্দরী।

"এটা কি তোমার রান্নাঘর? আমি লুকোচ্ছি ভেতরে। তুমি বাইরে থেকে শিকলি তুলে দাও। বোলো না যেন আমি ভেতরে আছি, বুঝেছ?"

হল কী মেয়েটার? মনে-মনে ভাবল সুন্দরী। ভয়ে সে সিঁটিয়ে গেল ডাক্তারবাবুকে আসতে দেখে...মাথা-টাথা খারাপ নয় তো?

মুখে বলল—"কোনও ভয় নেই বাছা। তুমি রান্নাঘরে যাও।"

দরজায় কড়া নাড়ল।

রান্নাঘরের শেকল তুলতে-তুলতে হাঁক দিল সুন্দরী—"কে রা?"

জবাব এল ভারী গলায়—"আমি ডাক্তারবাবু।"

"যাই," দরজা খুলল সুন্দরী। গম্ভীরমুখে তার মুখের দিকে তাকালেন ডক্টর ভাদুড়ি।

সে-মুখে হাসি নেই মোটেই। ইচ্ছে করেই হাসিশূন্য রাখতে হয়েছে মুখকে। ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে হলে ভয়-গাম্ভীর্যের প্রয়োজন আছে বইকী।

সুন্দরী কিন্তু সে মুখ দেখে এতটুকু টসকাল না। বরং নিজের মুখখানাকে আরও উৎকট গম্ভীর করল। বলল নীরস গলায়—"কী চাই?"

"সুন্দরী, তুমি কত দামি পাথরের দুল নিয়েছিলে চৌধুরীদের নতুন বউয়ের কাছ থেকে। ঠিক?"

"ঠিক কী বেঠিক, সে-কথা আপনি জিগেস করবার কে? চাকরির পরোয়া করে না সুন্দরী। গতর দেব, পয়সা নেব।"

"জানি। তোমার গতর আছে, খাটাতেও পারো। কিন্তু গতরটা কোথায় খাটাবে? জেলখানায়?"

"জেলখানায়! কে জেলে দেবে? আপনি?"

"তা দিতে পারি।" আলতো করে বললেন ডাক্তার। "পুলিশ আমার হাতের মুঠোয়। তুমি যে বউদিমণিকে ভয় দেখিয়ে দুল নিয়েছ, তা পুলিশকে বললেই হল।"

"ভয় দেখিয়ে নিয়েছি?" চিৎকার করে উঠল সুন্দরী। পরক্ষণেই বাকি কথাটা গিলে নিয়ে বললে—"আপনার সঙ্গে বাকি বলার আমার সময় নেই। আপনি যান।"

ক্রূর হাসলেন ডক্টর ভাদুড়ি। রান্নাঘরে অন্ধকারে দাঁড়িয়েও খলখল সেই হাসি শুনে রক্ত হিম হয়ে গেল বৈজয়ন্তীর।

বললেন ডাক্তার—"পুলিশকে তাহলে তুমি ভয় করো না?"

"কাউকেই করি না। আপনাকেও করি না," বলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করতে গেল সুন্দরী।

তার আগেই দরজার ফাঁকে জুতো গলিয়ে দিলেন ডাক্তার। সেইরকম গা-শিউরোনো হাসি হেসে বললেন—"সুন্দরী, পুলিশের কাছে আমি যাব না। ভয় নেই। কিন্তু সত্যি করে বলো তো বউদিমণি তোমার মুখ বন্ধ করার জন্যে দুলজোড়া তোমাকে দিয়েছিল, তাই না?"

"না।"

"সুন্দরী!"

"আপনি যাবেন, না লোককে ডাকব?"

সুন্দরীকে গায়ের জোরে ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গেলেন ডাক্তার। কিন্তু সমান জোরে তাঁকে চৌকাঠের বাইরে আটকে রাখল সুন্দরী।

গলায় শির তুলে বলল—"দেখবেন, চেঁচাব?"

"সুন্দরী," অকস্মাৎ মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুললেন ডাক্তার। "আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম এতক্ষণ। বউদিমণি তোমাকে যা বলতে বারণ করেছে, তা যদি আমাকে বলো অনেক টাকা দেব তোমাকে।"

"বেরিয়ে যান।"

"পাঁচশো টাকা দেব।"

আচমকা ডাক্তারকে এক ঠেলা মারল সুন্দরী। দরজার ফাঁক থেকে পা সরে গেল ডাক্তারের। চকিতে পাল্লা বন্ধ করতে গেল সুন্দরী। কিন্তু বাঁ-হাতটা কপাটের

ফাঁকে ঢুকিয়ে ডানহাতে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলেন ডাক্তার। ছিটকে পড়ল সুন্দরী বাথরুমের দরজার ওপর।

ঝনঝন করে কেঁপে উঠল দরজা। ভেতরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল বৈজয়ন্তী।

মৃত্যুর বুঝি আর দেরি নেই। বিষধরের হাসি স্বকর্ণে সে শুনেছে। ও হাসি যে হাসতে পারে, মানুষ খুন তার কাছে 'পিঁপড়ে হত্যার সামিল—'!

দরজা বন্ধ করে পাল্লায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন ডাক্তার।

ইস্পাত কঠিন কণ্ঠে শুধোলেন—"বলো, কী জানো আমাকে বলো।"

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল সুন্দরী। দুই চোখে তার আগুন জ্বলছে।

বলল—"বলবনি।"

"বউদিমণির খুনও পেলে না, চাকরিও গেল, তবে কেন বলবে না? আমাকে বলো, তোমায় আমি দুল গড়িয়ে দেব।"

নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল সুন্দরী।

নোক্ষম টোপ ফেলেছেন ডাক্তার।

বাথরুমের কোণে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে নিজের উত্তাল হৃদপিণ্ডটাকেই খামচে ধরল বৈজয়ন্তী।

এরপরের দৃশ্যটা ঘটল চক্ষের নিমেষে।

ছোঁ মেরে দেওয়ালের কোণ থেকে বঁটিটা তুলে নিল সুন্দরী। নিমেষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ডাক্তারের ওপর।

এরকম আক্রমণের জন্যে তৈরি ছিলেন না ডাক্তার। কিন্তু আশ্চর্য তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং ক্ষিপ্রতা। চকিতে সরে দাঁড়ালেন পাল্লার সামনে থেকে। ব্যর্থ হল সুন্দরীর প্রথম কোপ।

শুরু হল ঝটাপটি।

সাধুর সাজ খসে পড়তেই দুষ্টের আসল চেহারা বেরিয়ে আসে। মতলব ভোকাট্টা হওয়ার উপক্রম হতেই ডাঃ টিটেনাসের ভিটকিলিমিও উধাও হল নিমেষের মধ্যে।

ফিকিরে ফকির ডঃ বিশ্বম্ভর ভাদুড়ির স্বরূপ দেখা গেল এবার।

এখন আর তাড়াতাড়ি নয়, ভিরকুটি নয়, তঞ্চকতা নয়—তুলারাম খেলারাম কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে।

তখনই হল সব কিছু। সুন্দরী খেটে খাওয়া মানুষ। ভদ্রঘরের বিধবা—অভাবে পড়ে গতর খাটাতে নেমেছে। অভাবের তাড়নায় টাকা বস্তুটা হাড়ে-হাড়ে চিনেছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা সাধুতা লুকিয়েছিল ওর মধ্যে। ছোট্ট একটা সৎপ্রবৃত্তি। যার প্রভাবে ডাক্তারের অত প্রলোভনেও বৃথা গেল—বৈজয়ন্তীকে পথে বসাল না সে।

আরম্ভ হল খাণ্ডারনির তেড়ে বিষ ঝেড়ে দেওয়া পর্ব। হাতের কাছে যা পেল, তাই নিয়ে চড়াও হল ডাক্তারের ওপর। ডাক্তারের মাথায় তখন যেন খুন চেপেছে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে সুন্দরীকে দেওয়ালের গায়ে সেঁটে ধরে গলাটা টিপে ধরার। কণ্ঠ নিষ্পেষণ

শুরু হলেই, আধখানা জিভ ঝুলে পড়লেই কথার তুবড়ি ছোটাবে হতচ্ছাড়া মেয়েমানুষটা। উঠতি বয়েসের কত মেয়েছেলেকে সিধে করেছেন তিনি, আর এ তো আধবয়েসি মেয়েমানুষ।

কিন্তু সুন্দরীকে বাগে পাওয়া মুশকিল। তার চুল ছিঁড়ল, ব্লাউজ ছিঁড়ল, খান কাপড় লুটোলো, গালে আঁচড় পড়ল, ঠোঁট কেটে রক্তপাতও ঘটল। যত আঘাত পেল, ততই মরিয়া হল।

ঝটাপটি করতে-করতে দরজা খুলে গেছিল। খোলা দরজা দিয়ে চত্বরে ছিটকে এসেছিল দুটি মূর্তি। দাঁতে দাঁত চেপে সুন্দরীর চুলের মুঠি খামচে ধরেছেন ডাক্তার, আর-এক হাতে ধরেছে টুঁটি।

কিন্তু সুন্দরীর দুটো হাত নিশ্চেষ্ট হয়ে না থেকে খামচে ধরেছে ডাক্তারের মুখ। চোখের মধ্যে আঙুল ঢোকানোর চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

দপদপে আগুন জ্বলছে যেন ডাক্তারের চোখে। মৃদুভাষী, স্মিতমুখ মানুষটির আর কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না চোখে-মুখে। এ অন্য-এক মানুষ! সৃষ্টির শুরু থেকে পঞ্চভূতের মধ্যে মিশে থাকা ভূতপ্রেতরাজ্য থেকে জমাট বাঁধা কুপ্রবৃত্তি যেন মূর্ত হয়েছে ডঃ বিশ্বম্ভর ভাদুড়ির মধ্যে। নৃশংসতা, হিংস্রতা, অমানুষিকতা প্রকট হয়েছে তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দুতে, শিরায়-শিরায়, অস্থিমজ্জায়। ডঃ জেকিলের মুখোশ খসে গিয়েছে, বেরিয়ে এসেছে মিস্টার হাইড।

আঙুল দিয়ে চোখ খাবলে ধরতে গিয়েই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল সুন্দরী। মুহূর্তের মধ্যে দানবিকসত্তার বিপুল বিস্ফোরণ ঘটল ডাঃ টিটেনাসের চেতনায়।

এক সেকেন্ডের বহু ভগ্ন অংশের একটিমাত্র অংশের মধ্যে ঘটল ঘটনাটা। চুলের গোড়া আর কণ্ঠনালীর ওপর দুটো হাত নিযুক্ত থাকায় এবার হাঁটু প্রয়োগ করলেন ডাক্তার। ডান হাঁটু দিয়ে আচমকা সবেগে আঘাত করলেন সুন্দরীর তলপেটে।

ঘাঁক করে একটা শব্দ বেরোল সুন্দরীর নিষ্পেষিত কণ্ঠগহ্বর দিয়ে, বিস্ফারিত চক্ষুতারকা ভীষণ চমকেই স্থির হল, পলকহীন হল এবং ডাক্তারের চোখের ওপর থেকে সাঁড়াশি-কঠিন আঙুলগুলো শিথিল হয়ে নেমে এল দেহের দুপাশে।

কয়েক চাহনি দিয়ে দৃশ্যটা অবলোকন করলেন ডাঃ টিটেনাস। পাতলা অধরের সীমাহীন নৃশংসতা যেন বিকট উল্লাসে নৃত্য করতে চাইল...পাথর-কঠিন জ্বলন্ত চক্ষুদুটি পাথর হয়ে দেখল অবাধ্য মেয়েটার অবাধ্যতার শাস্তি।

চুলের মুঠি আলগা করলেন ডাক্তার। হাত সরিয়ে নিলেন কণ্ঠনালী থেকে। এলিয়ে পড়ল সুন্দরী। ঘাড় মুচড়ে আছড়ে পড়ল সিঁড়ির ওপর।

বিশ্রীভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে দেহটা বার-দুই ডিগবাজি খেয়ে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে—মাঝপথে আটকে গেল একটা ওপড়ের বস্তার গায়ে।

হাইটিতে সিঁড়ির ডগায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখলেন শয়তানশিরোমণি ডক্টর টিটেনাস। নাড়ি অনুভব না করেও উনি বুঝলেন প্রাণপাখি মুক্ত হয়েছে সুন্দরীর দেহপিঞ্জর থেকে। ওভাবে ঘাড় মুচড়ে থাকার অর্থ একটাই—প্রাণ নেই দেহে।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন ডাক্তার। খামোকা খানিকটা সময় নষ্ট হল। তার চাইতেও ক্ষতি হল মেয়েটার পেটের কথা না জানায়। জানলে সুবিধে হত বিস্তর।

না জানলেও ক্ষতি নেই। বৈজয়ন্তী তো আছে। ওখানে অন্য দাওয়াই দিতে হবে। যে বিয়ের যে মন্ত্র!

সুন্দরী পড়ে রইল একইভাবে। ডাক্তার চৌকাঠ পেরিয়ে প্রবেশ করলেন লন্ডভন্ড ঘরে।

রান্নাঘরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনল বৈজয়ন্তী। ইউরোপ থেকে সদ্য আগত বৈজয়ন্তী চৌধুরী। মৃত্যু কি সন্নিকটে?

ডাক্তারের জুতো মসমসানি রান্নাঘরের দরজা পেরিয়ে পৌঁছল শোবার ঘরে। জিনিসপত্র ইটকানোর শব্দ শোনা গেল মিনিট কয়েক। ঝকমারির মাশুল গোনার জন্যে এবার তৈরি হল বৈজয়ন্তী। কেননা পদশব্দ এগিয়ে আসছে রান্নাঘরের দিকে।

দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ডাক্তার। শেকল খোলার আওয়াজ হচ্ছে। নিঃশব্দে পাল্লার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল বৈজয়ন্তী। কপাল ভালো ওর। বাইরে যাওয়ার তাগিদে সুন্দরী রান্নাঘরের জানালা বন্ধ করে রেখেছিল আগে থেকেই। দিনের বেলাও তাই ঘুটঘুটে অন্ধকার বিরাজ করছিল ঝুলভর্তি ছোট্ট ঘরটার মধ্যে।

কপাটে ঠেলা দিয়েছেন ডাক্তার। দেওয়ালের সঙ্গে যেন মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৈজয়ন্তী। প্রাণপাখিটা চড়ুইপাখির ক্ষীণ আর্তনাদের মতো চিঁ-চিঁ করতে চাইছে। সময় ফুরিয়ে এসেছে। ডাক্তার ঘরে ঢুকলেই সেল খতম!

কিন্তু ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন না। কপাটি দু-হাট করে দাঁড়ালেন। অতি হুঁশিয়ার তিনি। আঙুলের ছাপ রাখতে রাজি নন কোথাও। তাই আঙুলে রুমাল জড়িয়ে শেকল খুলেছেন, দরজায় ঠেলা দিয়েছেন। ঘরে ঢুকতেও রাজি নন ওই কারণে। অপরিচ্ছন্ন রান্নাঘরের মেঝেতে কোথায় জুতোর ছাপ থেকে যায়, তা কি বলা যায়?

যা দেখবার, চৌকাঠের বাইরে থেকেই দেখা হচ্ছে। ঘর শূন্য।

পাল্লা টেনে বন্ধ করলেন ডাক্তার। পাল্লার আড়ালে অর্ধমৃত বৈজয়ন্তীর নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস সবেগে বেরিয়ে আসতে চাইল প্রাণফিরে পাওয়ার আনন্দে।

নেমে গেলেন ডাক্তার। সুন্দরীর দেহ টপকে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে উধাও হলেন মিনিট কয়েকের মধ্যে।

এবার পালানোর পালা বৈজয়ন্তীর। একটা বিষম বিপদের হাত থেকে ডাক্তার ওকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন। দরজায় শেকল তোলেননি, ভেজিয়ে দিয়ে গেছেন।

বৈজয়ন্তী অবশ্য কল্পনাও করতে পারেনি সুন্দরী আর ইহলোকে নেই। ভীষণ ঝটাপটি, 'ধাঁক' জাতীয় একটা শব্দ, সিঁড়ির ওপর ধুপ করে গুরুভার দেহপতনের আওয়াজ, তারপরেই কিছুক্ষণের নীরবতা। জুতোর মসমসানি। ডাক্তারের অন্তর্ধান

রান্নাঘরে আড়ষ্টদেহে দাঁড়িয়ে শব্দগুলো থেকে আঁচ করেছিল, বেচারি সুন্দরী হয়তো অজ্ঞান চৈতন্য হয়ে গিয়েছে। তাই আর কোনও শব্দ নেই।

ঘর থেকে বেরোনোর পর সুন্দরীর প্রাণহীন দেহটাকে বীভৎসভাবে দুমড়ে মুচড়ে সিঁড়ির মাঝে পড়ে থাকতে দেখল সে। সুন্দরী যে মারা গেছে, বিশ্বাস করতে পারল

না। তাই হেঁট হয়ে কবজিতে ধমনি-স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করল। কিন্তু নিথর ধমনি আর নিস্পন্দ বুকে প্রাণের কোনও চিহ্ন পেল না।

নিহত সুন্দরীর নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকতে তাই দু-চোখ জলে ভরে এল বৈজয়ন্তীর। হতভাগিনী! প্রাণ দিল, কিন্তু কথার মান খোয়াল না।

সেই সঙ্গে প্রাণ বাঁচিয়ে গেল বুদ্ধদেব চৌধুরীর।

সুন্দরীকে পাশ কাটিয়ে নেমে এল বৈজয়ন্তী। প্রাণপাখিটা অসম্ভব চঞ্চল হয়েছে বুকের খাঁচায়। এত উত্তেজনা, এত উৎকণ্ঠা জীবনে সইতে হয়নি বৈজয়ন্তীকে। তাই চটপট মৃত্যু-নিকেতন থেকে উধাও হওয়ার তাগিদে নিজের মৃত্যু-পরোয়ানার স্বাক্ষর রেখে গেল হত্যার আসরে।

ছোট্ট একটা সূত্র। কিন্তু অকাট্য। অমোঘ!

দ্রুত পদক্ষেপে অনেক দূর আসার পর ট্যাক্সি পেয়েছিল বৈজয়ন্তী। ট্যাক্সি। অনেক দূর আসার পর মনে পড়েছিল ভয়ানক ভুলটা।

সুন্দরীর ব্লাউজের ভাঁজে গোঁজা রয়েছে কড়কড়ে পাঁচখানি একশো টাকার নোট। যে নোট একটু আগেই দেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে— দেওয়া হয়েছে বৈজয়ন্তী চৌধুরীকে।

ফিরে যাবে বৈজয়ন্তী? অসম্ভব। এতক্ষণে নিশ্চয় কেউ এসে গিয়েছে সেখানে।

সুতরাং ছায়ের মতো রক্তহীন মুখে চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে রইল বৈজয়ন্তী। অকস্মাৎ আঘাতে নাকি সাড় চলে যায় মাংসপেশির এবং স্নায়ুমণ্ডলীর। বৈজয়ন্তীর কিন্তু তা হল না। ওর শুধু ইচ্ছে হল ডুকরে কেঁদে ওঠে ছেলেমানুষের মতো। বুদ্ধদেব যে ওর ওপর অনেক ভরসা করে বিদেশের শহরে মুখ বাড়িয়েছে। তাকে যে সে কথা দিয়েছিল। মিথ্যের প্রাসাদ রচনা করবে কিন্তু তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেবে না কাউকে, কিন্তু কী করতে কী হয়ে গেল। ঘটনার স্রোত ঘূর্ণিপাকের মতো ঘুরতে-ঘুরতে এ কোথায় এনে ফেলল বৈজয়ন্তীকে? এরপর আসছে পুলিশ। ওরা খুঁজে বার করবে বৈজয়ন্তীকে সুন্দরীর হত্যার দায়ে শেষ পর্যন্ত—

বুদ্ধদেব! বুদ্ধদেব! তুমি এখন কোথায়?

ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীর আর-একদিকে মেক্সিকোতে বুদ্ধদেব চৌধুরী দীর্ঘ গ্রিক মূর্তি ঝুঁকে পড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল লিটল টনির সামনে।

আধখানা চাঁদের মতো টেবিল। চকচকে বস্তু দিয়ে মোড়া। এপাশে সারি সারি গদিমোড়া চেয়ার। ও-পাশে যেন একটি সিংহাসন। মণিমাণিক্য রত্নখচিত নয় যদিও, সোনা দিয়েও মোড়া নয়। কিন্তু এমন বাহারি কারুকাজ সম্রাট আকবরের সিংহাসনেই বুঝি দেখা গিয়েছিল।

সিংহাসনে আসীন মর্কটাকৃতি একটি মনুষ্য মূর্তি। প্যাঁচার চোখের মতো আশ্চর্য ধরনের একজোড়া চোখ; খুদে মানুষটার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। হাত-পা সরু-সরু, মাথাটা অস্বাভাবিক বড়, ঠোঁটের গড়ন চাপা। চিবুক যেন বাটালি দিয়ে খোদাই করা। কিন্তু ওই

চোখ, খয়েরি অন্তর্ভেদী এবং মড়ার চোখের মতো স্থির ওই দুটি চোখ অসামান্য ব্যক্তিত্ব দান করেছে মানুষটিকে। চোখ তো নয়, যেন সজীব রেডিও টেলিস্কোপ। ও চোখ যার ওপর নিবদ্ধ হয়, দেখে নেয় তার ভেতর পর্যন্ত। ওই চোখের মধ্যেই যার প্রয়োজন ফুরোয়, চিত্রগুপ্তের খাতায় তার নামের পাশে ঢ্যাঁড়া পড়ে তক্ষুনি। ভূগোলকের সর্বত্র মাকড়শার জালের মতো অগুন্তি তন্তু বিছিয়ে যে বিশাল কর্মকাণ্ড চলছে অষ্টপ্রহর, তার প্রতিটির বিশদ বিবরণ যেন প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ছে ওই চোখে। ওই চোখ ঘুমিয়ে থেকেও যেন সজাগ থাকে, আড়ালে থেকেও যেন চক্ষুষ্মান থাকে। সর্বনাশা এ চোখের সামনে কিছুই কোনওদিন অজানা থাকেনি। থাকবে না।

হ্যাঁ, এ চোখ লিটল টনির চোখ। মর্কট মূর্তি লিটল টনির মূর্তি। মহার্ঘ সিংহাসন লিটল টনির পৃথিবীব্যাপী কারবারের কন্ট্রোল চেয়ার।

বানরের মতো খুদে হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট টেনে নিল লিটল টনি। হুঁশিয়ার চোখ ওৎপেতে রইল বুদ্ধদেব চৌধুরীর অত্যন্ত স্মার্ট, অত্যন্ত সুন্দর, অত্যন্ত পৌরুষব্যঞ্জক মুখশ্রীর ওপর।

হাসছিল বুদ্ধদেব। হাসির আড়ালে লুকোনো অভিপ্রায়টা জানতে চাইছিল লিটল টনির রেডিও টেলিস্কোপ চোখজোড়া।

এইভাবেই শুরু হল কথাবার্তা। লিটল টনির কাছে ছদ্মনামে পরিচিত বুদ্ধদেব চৌধুরী তার সোজা প্রস্তাব রাখল বিস্তর বাঁকা কথার পর। বেশ ফিরছে সে। লিটল টনির কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব কি তাকে দেওয়া যায় না?

প্রস্তাবটা লিটল টনি প্রত্যাখ্যান করল না। গ্রহণও করল না। বললে আরও দুদিন পর আসতে।

সময় দরকার বইকী। কাজের মানুষকে কাজ দেওয়ার আগে তার মতলবটা বুঝিয়ে নেওয়ার দরকার আর বইকী। লিটল টনি বড় হুঁশিয়ার পুরুষ। হুঁশিয়ার বলেই ইন্টারপোল অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পিপে-পিপে মাদকদ্রব্য আকাশপথে, জলপথে, স্থলপথে...

লিটল টনির গোপন ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে মেক্সিকোর রাজপথে এসে দাঁড়াল বুদ্ধদেব। ও জানে এই মুহূর্ত থেকে ওর পেছনে ফেউ লাগবে আগামী দুদিন পর্যন্ত। লিটল টনি ওর গতিবিধির খবর নেবে দুদিন...তারপর আসবে কাজের কথায়...

তাই এলোমেলোভাবে দর্শনীয় স্থানগুলিতে ক্যামেরা কাঁধে দেখা গেল বুদ্ধদেবকে। ছায়ার মতো পেছনে লেগে রইল রিভলভারধারী গুপ্তচর—

এরই ফাঁকে ইন্ডিয়ায় খবর গেল ওস্তাদের কাছে। বোম্বাইতে বৈজয়ন্তী পৌঁছেছে কি?

খবর এল যথাসময়ে। না। পৌঁছয়নি। বাড়ি ছেড়ে নড়েনি বৈজয়ন্তী। অদ্ভুত কতকগুলো ঘটনা ঘটছে চৌধুরী ভবনে। ওস্তাদের চর নজর রেখেছে তার নিরাপত্তার ওপর।

চৌধুরীভবনে অদ্ভুত ঘটনা? শঙ্কিত হল বুদ্ধদেব।

পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে হোঁচট খেয়ে পড়ল বৈজয়ন্তী।

কিন্তু হতাশ হল। তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও পেল না সুন্দরীর লাশ আবিষ্কারের চাঞ্চল্যকর সংবাদ।

তাজ্জব ব্যাপার তো! দিনলোকে হত্যাকাণ্ডের সংবাদও পৌঁছয় না খোদ চক্ষু রিপোর্টারের দপ্তরে। অপবার্তা এল ঘটাখানেকের মধ্যেই।

থমথমে মুখে ঘরে ঢুকলেন রামকৃষ্ণ সান্যাল। টাক মাথায় বিন্দু-বিন্দু ঘাম। গোঁফজোড়া সচরাচর যতখানি ঝুলে থাকে—তার চাইতে যেন একটু বেশি ঝুলেছে। তীব্র তিরস্কারের মেঘ ঘনিয়েছে হাসিখুশি দুই চোখে।

ঘরে ঢুকেই বললেন—"বউমা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

বৈজয়ন্তী শুধু চেয়ে রইল। না জানি আবার কী অগ্নিপরীক্ষা এসে পৌঁছল সামনে।

"বউমা," জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর মামাবাবুর। মুখাবয়ব ঈষৎ আরক্ত। ক্রোধে কী উত্তেজনায় বোঝা যাচ্ছে না—"বউমা, গতকাল তুমি ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলে?"

প্রশ্নটা এমনই অতর্কিত যে এই প্রথম থতমত খেয়ে গেল বৈজয়ন্তী।

সেকেন্ডকয়েক পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। নিটোল নীরবতা। সব রহস্য-কাহিনিতেই নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্যে এইসব মুহূর্তেই একটা ঘড়ির টিকটিক শব্দ শোনা যায় ঘরের মধ্যে। এমনই কপাল বৈজয়ন্তীর, এ ঘরের শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ্যর ওপর যেন হাতুড়ির ঘা ফেলে-ফেলে এগোচ্ছিল নিষ্ঠুর মহাকাল দেওয়ালে ঝোলানো সেকেলে ঘড়িটার পেণ্ডুলাম দুলুনির সঙ্গে-সঙ্গে।

বৈজয়ন্তীর মনে হচ্ছিল, ওর কণ্ঠের বুকের দুমদুম পেটার শব্দ বুঝি ছাপিয়ে উঠেছিল সময়যন্ত্রের ওই সাসপেন্স শব্দকে...

অসহিষ্ণুকণ্ঠে বললেন মামাবাবু—"কথা বলছ না কেন বউমা?"

এ সুরে আজ পর্যন্ত এ বাড়ির কেউ তার সঙ্গে কথা বলেনি। তাই বৈজয়ন্তীর ইচ্ছে হল, বুনো-ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে জবাব দেয় মুখের মতো—"গেছিলাম আপনারই ভাগ্নের জীবনরক্ষার জন্যে। তার জীবন রক্ষে পেয়েছে, বিনিময়ে আমার জীবন যেতে বসেছে। কিন্তু তাতে আপনার কী? কালসাপের সঙ্গে তো দোস্তি পাতিয়েছেন, কালসাপকে ঘরে ঢুকিয়েছেন, চিকিৎসার নামে মেয়ের সঙ্গে অশোভন প্রেমের ন্যাকামি চালাচ্ছেন। সুন্দরীর অকালমৃত্যুর জন্যে দায়ী আপনি, আপনারা, এ-বাড়ির প্রত্যেকে।"

কিন্তু একটি শব্দও মুখে ফুটল না। থরথর করে ঠোঁট কাঁপল। না বলার যাতনায় চম্পকবর্ণ ঈষৎ সঙ্কুচিত হল। তার বেশি কিছু না।

"বউমা," ক্রোধে ফাটতে গিয়েও নিজেকে রুখে নিলেন রামকৃষ্ণ সান্যাল। "চৌধুরীবংশের মর্যাদা রক্ষার ভার কিন্তু তোমার ওপরেও। তোমার এমন কিছু করা উচিত নয় যা বংশের মর্যাদাহানিকর।"

"জানি," অনেক কথার সারকথাটি বলল বৈজয়ন্তী।

"তবে কেন বলছ না কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"

"আপনি কি না জেনে জিগ্যেস করছেন কোথায় গিয়েছিলাম?" ঠান্ডা-স্বর বৈজয়ন্তীর। ভেঙে পড়লে চলবে না, এ-যে অগ্নিপরীক্ষা, উতরোতেই হবে তাকে।

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন মামাবাবু। সেকেন্ড দশেক পরে গলাটা খাদে নামিয়ে এনে বললেন—"বউমা, এ তুমি কী করছ?"

আবেগের পুঁটলি ঠেলে উঠল গলার কাছে। বৈজয়ন্তীর ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে বলে—"আমি না, আমি না, আপনার বন্ধু ডক্টর টিটেনাস।"

কিন্তু কিছুই বলা হল না। শুধু চেয়ে রইল করুণ চোখে।

মামাবাবু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। টেবিলের কোণে বসে পড়ে বললেন—"পুলিশ এখনও জানে না তুমি সেখানে গিয়েছিলে। ওরা পাঁচখানা একশো টাকার নোটের সূত্র ধরে ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়েছিল এজেন্ট ভদ্রলোক বুদ্ধিমান পুরুষ। তিনি কিছু ভাঙেননি। আমাকে ফোন করে এইমাত্র সব জানালেন। তুমি নাকি টাকা নেওয়ার সময়ে অস্থির হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলে, যেন খুব দেরি হয়ে যাচ্ছিল তোমার। কেন, বউমা, কেন? সুন্দরীর কাছে যেতে হবে বলে?" বৈজয়ন্তী নিশ্চুপ।

"বউমা," বললেন মামাবাবু, "মুখে চাবি এঁটে থাকার মতো পরিস্থিতি এটা নয়। পরশু রাত থেকেই সুন্দরীর সঙ্গে তোমার ব্যবহারের কোনও মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে তোমার দাসি নয় কস্মিনকালেও, তবুও একটা ঝিকে পা-সুদ্দু মাসি বলতে তোমার মতো রুচিসম্পন্না মেয়ের বাধছে না। তুমি তাকে বংশের স্মৃতিজড়ানো মূল্যবান নীলকান্ত মণির দুল দিয়েছিলে। আর এখন জানছি তাকে দিয়েছ পাঁচশো টাকা। তাতেও ক্ষান্ত হওনি—তার...তার..."

বলতে-বলতে থেমে গেলেন মামাবাবু। বৈজয়ন্তীর মুখ সিঁদুরের মতো লাল হয়ে গিয়েছে—"মামাবাবু, প্লিজ। আমি এখন কিছু বলতে পারব না।"

"কিন্তু বলতে তোমাকে হবেই। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে, বংশের মানমর্যাদা রক্ষে করার জন্যে আমার কাছে অন্তত অকপটে সব স্বীকার করতে হবে। বউমা, সত্যি করে বলো তো, সুন্দরী তোমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল। তাই না?"

অধরে মুখে কুলুপ আঁটল বৈজয়ন্তী।

এবার অসহিষ্ণু হলেন মামাবাবু—"একটা কথা তুমি কিছুতেই বুঝছ না। আমাকে সব কথা না বললে আমি তোমাকে বাঁচাব কী করে? বুদ্ধদেবের অবর্তমানে এ-দায়িত্ব যে আমার। তুমি আর কারও কাছে না বলতে পারো, আমার কাছে বলো। আমি কথা দিচ্ছি, তৃতীয় ব্যক্তি জানবে না।"

তবুও চুপ করে রইল বৈজয়ন্তী।

একপরদা গলা চড়িয়ে তালুতে ঘুসি মেরে বললেন মামাবাবু—"কী মুশকিল! তুমি কি ভাবছ, পুলিশ তোমার ছায়া মাড়াতে পারবে না? ভুল, বউমা, ভুল। ওরা রান্নাঘরের ময়লা মেঝেতে পায়ের ছাপ পেয়েছে। হালকা চটি পরে যে সেখানে লুকিয়েছিল, সে নাকি মহিলা এবং অল্পবয়স্কা। কী করে এত কথা ওরা জেনেছে, তা জানি না। নোটের ওপরেও আঙুলের ছাপ পেয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকেও আজ না হয় কাল জানবে নোটগুলো কাকে ইস্যু করা হয়েছিল। তারপর? তারপর কী করবে বউমা? ওরা এ-বাড়ি আসবে, তোমার চটি নেবে, আঙুলের ছাপ নেবে, চারিদিকে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। তখন?"

মনে-মনে বলল বৈজয়ন্তী—"তখন তো আমার শক্তিমান স্বামীদেবতা ফিরে আসবে।"

মুখে বলল—"এখন কোনও কথাই আপনাকে বলতে পারব না। শুধু একটা কথা ছাড়া। বলুন রাখবেন সে-কথা?"

"কী কথা?"

"আগে কথা দিন!"

"দিচ্ছি।"

"পুলিশ রুটিনমাফিক তদন্ত করে যখন জানবে জানুক। তার আগে আপনি যা জেনেছেন, তা কাউকে বলবেন না। এ বাড়ির বাইরের কাউকে তো নয়ই, এমনকী এ-বাড়ির কাউকেও নয়।" ডক্টর টিটেনাসের নামটা উল্লেখ না করেও ইঙ্গিতে তাঁকে আর সবার মধ্যে এনে ফেলল বৈজয়ন্তী।

লম্বা নিশ্বাস ছাড়লেন মামাবাবু—"তুমি তাহলে কোনও কথাই বলবে না?"

"না।"

কী আর বলবেন রামকৃষ্ণ সান্যাল? প্রচণ্ড জেদি মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে হাড়ে-হাড়ে বুঝলেন ইস্পাতের নির্যাস দিয়ে তৈরি ওর ভেতরটা। ভাঙবে তবু মচকাবে না।

আর-একটা কথাও না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

এবং কথা রাখলেন না।

সান্ধ্য-আসরেই জানা গেল ঠাকুমার বুক ভেঙে গেছে নাতবউয়ের কুকীর্তিতে, উল্লসিত হয়েছে সাবিত্রী এবং তার মা।

আর হাসি মিলিয়ে গেছে ডক্টর টিটেনাসের চোখ থেকে।

হ্যাঁ। ডক্টর টিটেনাসকেও কিছু আর বলতে বাকি রাখেননি মামাবাবু। বলেছিলেন পরামর্শের আশায়। সমূহ বিপদ থেকে বাঁচবার আশায়। প্রভাবশালী ডাক্তারের প্রভাব খাটিয়ে পুলিশের প্রচেষ্টা বন্ধ করার আশায়। কেলেংকারি যেন অংকুরেই বিনষ্ট হয়—খবরের কাগজ পর্যন্ত না পৌঁছয়। টাকা? দেবেন দেবী চৌধুরানী—যত লাগে তত।

গুম হয়ে রইল বৈজয়ন্তী। এ-বাড়িতে কারও কাছে কোনও সহযোগিতা সে পাচ্ছে না। গোড়া থেকেই যেন সবাই ষড়যন্ত্র করছে ওর বিরুদ্ধে। ওকে পাকেচক্রে ঠেলে দিচ্ছে বিপদের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে। মামিমা ওকে কথা দিয়েছিলেন, সুন্দরীকে দুল দেওয়ার কথা ঠাকুরমাকে বলবেন না। কিন্তু কথা রাখেননি। মামাবাবু এবং সাবিত্রী দুজনেই কথা দিয়েছিলেন সান্ধ্য আসরে দুল-প্রসঙ্গ নিয়ে মাথা হেঁট করাবেন না বৈজয়ন্তীর। কিন্তু সাবিত্রী সেখানেও তাকে অপদস্থ করেছে এবং জীবনমরণের প্রচ্ছন্ন লুকোচুরিখেলায় তাকে কোণঠাসা করেছে। আর এখন মামাবাবুকে অত কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও খোদ শয়তানের কাছেই ফাঁস করে দিলেন কালকের ঘটনা।

বিপদের আর বাকি রইল কী? ডক্টর টিটেনাস এখন জেনে ফেলেছেন, বৈজয়ন্তী পাঁচশো টাকা দিয়ে কার মুখ বন্ধ করতে গিয়েছিল সুন্দরীর। কিন্তু উনি এখনও ধাঁধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি একটা বিষয়ে। উনি আঁচ করতে পারছেন না বৈজয়ন্তী কতটুকু দেখেছে। সে কি জানে সুন্দরীর হত্যারক কে? সে কি সুন্দরীনিধনের আগে গিয়েছিল, না পরে গিয়েছিল? রান্নাঘরে তার চটির ছাপ পাওয়া গেছে কেন? রান্নাঘরে তো কাউকে

দেখেননি ডাক্তার? তবে কি সে আগেই গিয়েছিল? বাথরুমে অকারণে ঢুকেছিল? নন্দনারায়ণ ব্লাকমেল করার জন্যেই মুখ খুলতে রাজি হয়নি সুন্দরী?

থমথমে মুখে মামাবাবুকে নিয়ে অনেকক্ষণ গুজগুজ ফুসফুস করলেন নাটের গুরু ডক্টর টিটেনাস। মামাবাবু খানদানি গোঁফ চুমরে বৈজয়ন্তীর পানে আড়চোখে তাকিয়ে অনেক কথাই নিবেদন করলেন কালসাপের কাছে, দূর থেকে একটা বর্ণও শুনতে পেল না বৈজয়ন্তী। কিন্তু অনুমান করে নিল তাকে আরও কোণঠাসা করার আয়োজন চলছে।

সাবিত্রী রুষ্টমুখে বসেছিল তার মায়ের পাশে। ঘৃণ্য কীটের দিকে তাকালে চোখমুখে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, বৈজয়ন্তীর পানে তাকিয়ে সেইভাবেই মুখভঙ্গি করছে থেকে-থেকে।

সাদা পাথর কুঁদে গড়া মূর্তির মতো নিষ্কম্প দেহে বসে আছেন শুধু ঠাকুরমা। চৌধুরী বংশের ওপর অনেক ঝড়ঝাপটার উৎপাত তিনি দেখেছেন, বিস্তর দাবানলকে তিনি ব্যক্তিত্বের ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু কনেবউকে নিয়ে এ-জাতীয় কেলেংকারির মোকাবিলা করতে হয়নি কখনও। এককথায়, তাই তিনি স্তম্ভিত, হতবাক, বিমর্ষ।

মামাবাবুর পাশ ছেড়ে উঠে আসছেন ডক্টর টিটেনাস। আবার হাসি দেখা দিয়েছে তাঁর সুশ্রী মুখে। দুইচোখে যেন কাচ্ছ-টেনে-নেওয়া-জাদু থিরথির করে কাঁপছে। দীর্ঘ পদক্ষেপে তাঁর দীর্ঘছন্দ দেহ এসে পৌঁছল বৈজয়ন্তীর পাশে।

সঙ্গে-সঙ্গে বৈজয়ন্তীর অন্তরাত্মা যেন কেঁচোর মতো কুঁকড়ে গুটিয়ে এতটুকু হতে চাইল। হত্যাকারীর সান্নিধ্য যেন সহস্র বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা ধরাল ওর অণু-পরমাণুতে।

সহজগলায় বললেন ডাক্তার—"বড্ড টেনশন হচ্ছে, তাই না?"

চোখে চোখ রাখল বৈজয়ন্তী। মনে মনে বলল, মানসচিন্তা দিয়ে তুমি আমার মনের কথা জানতে পারো, সম্মোহন দিয়ে তুমি আমাকে কাবু করার চেষ্টাও করতে পারো। কিন্তু তুমি পারলে না। আমি যে তোমাকে দেখেছি, জেনেছি, চিনেছি।

মুখে বলল—না হেসেই বলল—"তা যাচ্ছে।"

"আপনি আমার কাছে মন খুলুন। পুলিশের বড়কর্তারা আমাকে খাতির করে। কেস আমি বানচাল করে দেব।"

"কীসের কেস?"

"ব্ল্যাকমেলার সুন্দরীকে হত্যা করার।"

"সুন্দরী ব্ল্যাকমেলার নয়। সুন্দরীকে আমি খুনও করিনি।"

"প্রমাণ করবেন কী করে? নোট পাঁচখানা তো আপনারই দেওয়া।"

"প্রমাণ করতে আমি চাই না।"

"টেনশন আপনার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়েছে। সুন্দরীর মতো বদমাশ মেয়ে উপযুক্ত সাজা পেয়েছে। এবার আত্মরক্ষার পালা। আপনি আর ভাবতে পারছেন না বুঝতে পারছি। ভাববার পালাটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি আপনাদের সবার হিতাকাঙ্ক্ষী।" থামলেন ডাক্তার। স্মিতমুখে ভাসতে লাগল সমবেদনা, সহানুভূতি, দরদ।

অন্য সময় হলে অভিভূত হত বৈজয়ন্তী। অভিনয় যে এমনভাবে মনের গোড়া ধরে নাড়া দিতে পারে, তাতো সে জানত না। এ বাড়ির মিত্ররা কেউ এমন করে তার মন ছুঁয়ে কথা বলেনি—বলছেন তার শত্রু, স্বামীর শত্রু, দেশের শত্রু!

সহজগলায় বলল বৈজয়ন্তী—"একটা ছাড়া আর কোনও কথা বলার নেই আমার। আমি নিষ্পাপ।"

"বিশ্বাস করলাম," আন্তরিকভাবেই বললেন ডাক্তার। "কিন্তু সেটা প্রমাণ করতে হবে। সেইজন্যেই জানা দরকার সুন্দরী আপনাকে দোহন করছিল কেন, কথাটা কী?"

চুপ করে রইল বৈজয়ন্তী। সেকেন্ডের পর সেকেন্ড অতিবাহিত হল কথা বলল না। কেউ কথা বলল না। শুধু চেয়ে রইল তার দিকে।

অবশেষে বললেন মামাবাবু—"ছিঃ! শুধু একজনের জন্যে বংশের নামে কালি লাগতে চলেছে।"

কথাটা চাবুকের মতো সপাং করে যেন আছড়ে পড়ল বৈজয়ন্তীর ওপর। মুখের সমস্ত রক্ত নেমে গেল নিমেষ মধ্যে। দুই হাতে সোফার হাতল আঁকড়ে ধরল এমন জোরে যে আঙুলের গাঁটগুলো পর্যন্ত গেল সাদা হয়ে।

আর কত সইতে হবে বৈজয়ন্তীকে। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমানের আর বাকি রইল কী?

বৈজয়ন্তীর সত্তায় মিশে থাকা অতিভীষণা চণ্ডীর তেজ মাথা তুলতে চাইছে। চিরকালই এমনি ঘটেছে। অপমান সে মাথা পেতে নেয়নি, নিতে শেখেনি, শেখাননি তার স্নেহময় পিতৃদেব। মহিষমর্দিনী অসুরদলনী চণ্ডিকার মতোই ফুলে-ফুঁসে রুদ্ররূপ ধারণ করেছে, রক্তনয়না রক্তচামুণ্ডার মতোই শাণিতরক্ত রসনায় সহস্র বাক্যবাণ বাক্যবজ্র নিক্ষেপ করে ঘায়েল করেছে প্রতিপক্ষকে। বাবা যে বলতেন, "বৈজয়ন্তী মা, দুনিয়াটা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। শক্তিরূপিনী নারী তুই। প্রয়োজন হলেই সেই শক্তি ছুঁড়ে মারবি—দুনিয়ায় তোকে সবাই ভয় করবে, ভক্তি করবে, ভালোবাসবে।"

সত্তায় নিহিত শক্তি নিক্ষেপের সময় এবার এসেছে। এ শক্তি তার কথার শক্তি, মস্তিষ্কের শক্তি, বুদ্ধির শক্তি, চোখের চাহনিতে দ্বাদশ আদিত্যের শক্তি। বাবাকে স্মরণ করে তৈরি হল সে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটা খোঁচা এল ঠাকুরমার দিক থেকে। এতক্ষণ পাথর হয়ে বসে থাকার পর এই প্রথম কথা বললেন তিনি।

বললেন—"ছিঃ!"

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে গেল বৈজয়ন্তী।

পারস্য দেশের গোড়ালি ডুবে যাওয়া কার্পেটের ওপর ঋজুদেহে দাঁড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চাইল ঠাকুরমার দিকে। শুধু ঠাকুরমার দিকে। আর কারও দিকে নয়।

তারপর শুরু হল স্বরযন্ত্রের মধ্যে বেহালার ছড়িটানার খেলা। স্বর উঠল, নামল, তীব্র হল, তীক্ষ্ণ হল, স্বরের মধ্যে ঝড়ের ঝঙ্কার শোনা গেল। ঝরনার ঝিরিঝিরি শোনা গেল, দামামার দ্রিমিদ্রিমি শোনা গেল। মঞ্চে যে স্বর অন্যলোক সৃষ্টি করেছে, জলসায় সুরলোক—সেই স্বরের সম্মোহনী লহরী শুরু হল বিশাল হলঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে।

বলল বৈজয়ন্তী—"আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! অনেক আশা নিয়ে, অনেক সাধ নিয়ে, অনেক স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলাম চৌধুরীভবনে। কিন্তু আমি এসে পৌঁছলাম পাথরপুরীর মিউজিয়ামে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে চৌধুরীভবনের কদর থাকতে পারে, আধুনিক মানুষের কাছে এর দাম কানাকড়িও নয়। কারণ এ বাড়িতে যাঁরা থাকেন, তাঁরা দুষ্প্রাপ্য বস্তু—দুষ্প্রাপ্য কিউরিও। সাজিয়ে রাখার বস্তু—এ যুগে অচল। এ যুগ ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ, মানুষকে মানুষের অধিকার দেওয়ার যুগ। কিন্তু এ বাড়িতে দেখছি ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করার চেষ্টা হয়, মনের কথা মুখে টেনে আনার জন্যে জুলুমবাজি হয়। এখানে কারও গোপন কথা কিছু থাকতে পারে না। থাকাটা অপরাধ। কারণ মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে কিছুই অগোচর রাখা চলবে না। তাঁর সব জানা চাই। কনেবউয়ের গুপ্ততত্ত্বও জানা চাই। শুধু তাই নয়। এ বাড়ির মানুষগুলোকেও যন্ত্রের মতো থাকতে হবে তাঁর কাছে। তাঁর হুকুম ছাড়া বাড়ির কিকেও কিছু দেওয়া যাবে না। কারণ মিউজিয়ামের মালিক যে তিনি। অঙ্গীকার রক্ষা করার রেওয়াজও নেই এ বাড়িতে। তাই কনেবউকে দেওয়া কথার খেলাপ করা হয় হরদম। তাকে অপদস্থ করা হয়, কোণঠাসা করা হয়, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমানে নিমজ্জিত রাখা হয়। এ বাড়ির ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কার তাতে বাধা দেয় না—বরং উৎসাহ জোগায়। এ বাড়ির মেয়ে তাই মিউজিয়ামের প্রাণহীন বস্তু হয়ে আইবুড়ো থাকে—কারণ তার রুচি-প্রকৃতি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সবই নিয়ন্ত্রিত হয় মিউজিয়ামের মালিকের রুচি, প্রকৃতি ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনুসারে। কিন্তু এ যুগ ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ। এ যুগের মেয়েরা নিজের ইচ্ছা নিয়ে বাঁচে—পরের ইচ্ছায় নয়। নিজের গুপ্ত তত্ত্বর ভাগ কাউকে দেয় না—কেউ সে দাবিও করে না। এ যুগে আমরা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াই—কারুর সাহায্যের প্রত্যাশা করি না। আমরা অতীতের ধ্বজাধারী নই, ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। কারণ চলমান সমাজে আমরাই আগামী যুগের সোনালি পথ রচনা করে চলেছি—মিউজিয়ামের সাজানো পিস হয়ে শোভাবর্ধন করতে আসিনি, গতিশীল সমাজকে সঙ্কীর্ণ রক্ষণশীলতার গর্তে আবদ্ধ করতে আসিনি, পুরাতনের চোখে আমরা তাই বখাটে, বর্তমানের চোখে বিদ্রোহ, ভবিষ্যতের চোখে আশা। চললাম। আপনাদের কাছে এই আমার শেষ কথা। আমার স্বামী ফিরে না-আসা পর্যন্ত আমি আমার ঘর ছেড়ে নামব না—সে চেষ্টাও করবেন না।"

ছুটন্ত বিদ্যুতের মতই উধাও হল বৈজয়ন্তী। মর্মরের সিঁড়ির ওপর দিয়ে, পাথরের বারান্দা দিয়ে অন্তর্হিত হল নিজের ঘরে।

প্রস্তরীভূত প্রতিমার মতো শুধু চেয়ে রইলেন বৃদ্ধা ঠাকুরমা।

বোম্বাইতে ট্রাঙ্ককল করলেন মামাবাবু। জল অনেকদূর গড়িয়েছে। বুদ্ধদেবের প্রত্যাবর্তন আশু প্রয়োজন।

কিন্তু হতভম্ব হয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি। বুদ্ধদেব বোম্বাইতে যায়নি।

শুনে চোয়ালের রেখা কঠিন হল ডক্টর টিটেনাসের। কিন্তু আর এক ডিগ্রি বাড়ল তরল চক্ষুর তরলতা।

মামাবাবুকে নিয়ে তিনি বসলেন গোপন পরামর্শে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দুজনেই

এসে দাঁড়ালেন ঠাকুরমার সামনে।

ডাক্তার বললেন—"আমি আপনাকে এখন যা বলব, তা ডাক্তার হিসেবেই বলব।"

প্রস্তরীভূত প্রতিমার প্রস্তর-চক্ষু নিবদ্ধ হল ডাক্তারের ওপর।

"আপনার নাতবউ এমন একটা গুরুতর কথা গোপন করছেন, যা গোপন রাখার জন্য তাঁকে ঘুষ দিতে হয়েছে, একটা প্রাণও নিতে হয়েছে, ফাঁসির দড়ি সামনে দেখেও তিনি মুখ খুলছেন না যখন—তখন তাঁর মুখ খোলাতেই হবে। পুলিশ কালকেই ধরে ফেলবে ওঁর নাগাল, তার আগেই ওঁকে আমি নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ভয়-উদ্বেগ-উত্তেজনা-উৎকণ্ঠা ওঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। মস্তিষ্ক পুরোপুরি বিকৃত হওয়ার আগেই ওঁর সুচিকিৎসার দরকার এবং এত কেলেঙ্কারির মূলে যে ভয়ঙ্কর গোপন কথাটা উনি প্রাণপণে আগলে রেখে দিয়েছেন মনের মধ্যে তা মন থেকে টেনে বাইরে এনে মুক্তি দেওয়া দরকার।" ডাক্তার ক্ষণেক বিরতি দিলেন। পাথর চোখে চেয়ে রইলেন প্রস্তরীভূত প্রতিমা।

বললেন ডাক্তার—"আমার সন্ধানে এমন প্রাইভেট নার্সিংহোম আছে যেখানে থাকলে পুলিশ ওঁর হদিশ পাবে না অন্তত দিনকয়েক। এর মধ্যেই নিশ্চয় এসে যাবে আপনার নাতি। সে এসে যাতে স্ত্রীকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পায়, তাই সুচিকিৎসার জন্যে আজ রাতেই ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি নার্সিংহোমে। উনি স্বেচ্ছায় যাবেন না। তাই ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

চোখের পলক পড়ল না প্রস্তরীভূত প্রতিমার।

"রাতের খাবার ওঁর ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে। সে খাবারে ঘুমের ওষুধ মেশানো থাকবে। আধঘণ্টার মধ্যে উনি ঘুমিয়ে পড়বেন। আমি ওঁকে নিয়ে যাব নার্সিংহোমে। তারপরের ভার আমার।" শেষ করলেন ডাক্তার।

ঠোঁট নড়ল প্রস্তরীভূত প্রতিমার—"কেন? ওর মনের কথা জানতে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কীভাবে?"

"হিপনোটাইজ করে।"

বিস্ফারিত হল প্রস্তর চক্ষু। থরথর করে কাঁপল চোখ। পরক্ষণেই কুশন মোড়া আসন ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে উঠলেন প্রস্তরীভূত প্রতিমা। হনহন করে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে সটান উঠে গেলেন ওপরে।

শুকনো চোখে জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল বৈজয়ন্তী।

রাঁধুনি নিজে এসে খাবার রেখে গেল টেবিলের ওপর। রেখে আর দাঁড়াল না।

বৈজয়ন্তীও ফিরে তাকাল না। খাবার স্পৃহা ওর নেই। যতদিন না বুদ্ধদেব ফিরছে, জীবন্মৃত হয়ে পল-অনুপল প্রহর-দিবস গুণে যেতে হবে। খাওয়ার রুচি ফিরবে তখনি।

আচম্বিতে ডাক শোনা গেল ঠিক ওর পিছনে : "নাতবউ!"

সচমকে পিছন ফিরল বৈজয়ন্তী। দেবী চৌধুরাণী ঠাকুরমা। চোখে বিচিত্র চাহনি। দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বময়ী বৃদ্ধার চোখে এমন চাহনি তো এর আগে দেখেনি বৈজয়ন্তী।

বেপরোয়া চোখে চেয়ে রইল সে। ঠাকুরমাও চেয়ে রইলেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে

দেখলেন ওর চোখমুখ। যেন নতুন করে দেখলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন খুব নরম কিন্তু খুব স্পষ্ট গলায় : "খাবে না?"

"না।"

"খেও না।"

অবাক হল বৈজয়ন্তী।

"খেও না।" ফের বললেন ঠাকুরমা, "খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশনো আছে।"

চুলের ডগা থেকে নখের ডগা পর্যন্ত বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে গেল যেন। বিমূঢ় চোখে শুধু চেয়ে রইল বৈজয়ন্তী। ঘুমের ওষুধ? খাবারে?

ঠাকুরমা বললেন—"তুমি ঠিকই বলেছ। মনের কথা জানতে চাওয়াটা অন্যায়। গুপ্তকথা জানতে চাওয়ার জন্যে জুলুমবাজি করাটা মহাপাপ। সেই পাপই এই কদিন ধরে হয়ে এসেছে—" একটু থেমে—"পাথরপুরীর এই মিউজিয়াম বাড়িতে।"

বৈজয়ন্তী বিস্মিত!

ঠাকুরমা বলছেন—"সেই পাপ এবার মহাপাপ হতে চলেছে। ডাক্তার তোমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাবে ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে। সেখানে গিয়ে হিপনোটাইজ করে মনের কথা মুখে নিয়ে আসবে।"

শিউরে উঠল বৈজয়ন্তী।

"কিন্তু আমি তা হতে দেব না," বললেন ঠাকুরমা। "আমার নাতবউ তুমি। তোমার গোপন কথা যাতে গোপন থাকে, তা দেখা আমার কর্তব্য—মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষের কাছে এটুকু কর্তব্য তুমি আশা করতে পারো। আমি বিশ্বাস করি, তুমি যা করছ, ভেবেচিন্তে করছ। আমি বিশ্বাস করি না, ওরা বললেও বিশ্বাস করি না, তুমি পাগল হয়ে গেছে।"

আতঙ্ক শিরশির করে উঠল বৈজয়ন্তীর শিরদাঁড়ার খাঁজে-খাঁজে। পাগল সাজিয়ে ওকে নিজের খাঁটিতে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় শয়তান ডাক্তার? হিপনোটাইজ করে জানতে চায় বুদ্ধদেবের ঠিকানা?

ঠাকুরমা ঠিক বলে চলেছেন—"নাতবউ, তুমি এই মুহূর্তে এই মিউজিয়াম ছেড়ে চলে যাও। বাগানের দরজা খুলে রেখেছি। বুদ্ধদেব না ফেরা পর্যন্ত ফিরো না। পুলিশ যেন তোমার সন্ধান না পায়।"

দ্বিধা না করে, আর কিছু না ভেবে দরজার দিকে পা বাড়াল বৈজয়ন্তী।

"দাঁড়াও," বললেন ঠাকুরমা, "সঙ্গে টাকা আছে?"

"না।"

"এই নাও হাজার টাকা।"

"দরকার নেই ঠাকুরমা। আমি যে শিখেছি নিজের পায়ে দাঁড়াতে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি আশীর্বাদ করুন। পুলিশ আমার সন্ধান পাবে না।"

ছোট সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বৈজয়ন্তী। বাগানের দরজা দিয়ে এসে দাঁড়াল রাস্তায়। রাতের অন্ধকারে গাছগাছালির ছায়ায় মিলিয়ে গেল তার তন্বী মূর্তি।

পরের দিন। মেক্সিকো।

লিটল টমির গোপন-বিবর থেকে খুশি মনে বেরিয়ে এল বুদ্ধদেব। অভিযান সফল

হয়েছে। একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে মর্কটাকৃতি স্মাগলার সম্রাট। সেখানে ডায়াল করলেই কাজের নির্দেশ মিলবে।

এবার রওনা হওয়ার পালা। শূন্য হাতে ফিরছে না বুদ্ধদেব। তাই খবর পাঠাল ওস্তাদকে। ইউরেকা! ইউরেকা! স্মাগলার রিং ছত্রাকীর্ণ হতে আর বেশি দেরি নেই।

সবশেষে জানতে চাইল বৈজয়ন্তীর শেষ খবর। চৌধুরীভবনের অদ্ভুত ঘটনাগুলোর হিল্লে হল কি?

জবাব শুনে রক্ত হিম হয়ে গেল বুদ্ধদেবের।

বৈজয়ন্তী নিখোঁজ হয়েছে। ওস্তাদের ধুরন্ধর চরও হদিশ পাচ্ছে না তার।

চিঠি পড়ে গেল শহরে।

সুন্দরী হত্যার সাড়ম্বর কাহিনি তুখোড় সাংবাদিকরা সংগ্রহ করে ফেলেছে, এমনকী সম্ভাব্য হত্যারকের নাম-ঠিকানাও জেনে নিয়েছে। কাগজগুলো তাই সরগরম চাঞ্চল্যকর ক্রাইম আর বিলেতফেরত ক্রিমিন্যালকে নিয়ে।

চৌধুরীভবনের আবহাওয়া ঘড়ি-ঘড়ি পালটাচ্ছে। কখনও রাগ, কখনও বিষাদ, কখনও অপমান, কখনও আস্ফালন। মুহুর্মুহু পট পরিবর্তনের মধ্যে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রের মতো নির্বাক নিষ্কম্প নির্বাক হলেন একজনই—পাথরপুরীর মিউজিয়ামের মালিক বলে যাঁকে বর্ণনা করে গেছে বৈজয়ন্তী। ভাবজগতের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। অথচ তাঁকে ঘিরে, তাঁর মান-অপমান-লাঞ্ছনার চিত্র নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড চলছে বাড়িময়।

বিকেল ঠিক পাঁচটার সময়ে রহস্যজনক একটা টেলিফোন এল। ধরলেন মামাবাবু। কম্পমান কণ্ঠে এক বৃদ্ধ জিগ্যেস করলেন—"বুদ্ধদেব চৌধুরী আছেন?"

"না," বললেন মামাবাবু।

অপর প্রান্তে রিসিভার রেখে দেওয়ার শব্দ শোনা গেল।

তারপরের দিন এয়ারপোর্টে নামল বুদ্ধদেব। শব্দের চেয়েও বেশি গতিবেগে উড়ে এসেছে সে সুদূর মেক্সিকো থেকে। সাসপেন্স শেষ হয়ে এলেও অনাবিল রেখেছে চোখ-মুখকে।

এয়ারপোর্ট থেকে ওস্তাদের হেড কোয়ার্টার। টেলিফোন নাম্বার আগেই আনিয়েছিল মেক্সিকো থেকে। এখন জানল, ওস্তাদের অনুমান অভ্রান্ত। নাম্বারটা যাঁর তিনিই এই উপমহাদেশে বিশাল কর্মকাণ্ডের একমাত্র পরিচালক। ফি বছর সরকারকে চারশো কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা হারাতে হচ্ছে কল্পনাতীত পরিমাণ শুল্ক ফাঁকি দেওয়া মাল আমদানির দৌলতে। এই অঙ্কের একটা মোটা অংশের জন্য দায়ী এই ভদ্রলোক। এঁর আঞ্চলিক হেড কোয়ার্টার দুবাই। প্রচুর অর্থ খাইয়ে ইনিই সরকারের উপকূল অরক্ষিত রেখেছেন, অর্থাৎ যে পরিমাণ হেলিকপ্টার আর হাইস্পিড বোট কিনলে পুরো পশ্চিম উপকূলে টহল দিতে পারে কাস্টমস অফিসাররা—সে আয়োজন হতে ফাইলবন্দি হয়েই পড়ে থাকে—সে ব্যবস্থা করেছেন। মাত্র পঞ্চাশটি অত্যাধুনিক হাই-স্পিড বোট হলেই বিস্তীর্ণ পশ্চিম উপকূলে পেট্রলিং সম্ভব। বোটের দাম দেওয়াও হয়ে গিয়েছে। অর্ডার দেওয়া শুধু বাকি। বোটপিছু

দশ লাখ টাকা খরচ করতে প্রস্তুত সরকার। কিন্তু লাল ফিতের অপার মহিমায় গোড়াপত্তন গেরো দিয়ে রেখে দিয়েছে পর্দার অন্তরালের খলনায়ক ডক্টর ভাদুড়ি ওরফে ডক্টর টিটেনাস।

হ্যাঁ ডক্টর টিটেনাসই নারকোটিকস অর্থাৎ মাদকদ্রব্য স্মাগলিং র‍্যাকেটের রিংলিডার এ দেশে। লিটল টনির ইন্ডিয়ান এজেন্ট। এঁরই টেলিফোন নাম্বার সে দিয়েছে বুদ্ধদেবকে নিছক কোকেন, হিরোইন, এল.এস.ডি, ম্যানড্রেক নয়, লিটল টনির বাসনা এবার অন্যান্য ক্ষেত্রেও জাল বিছোনো। দেশ এখন স্মাগলারদের স্বর্গক্ষেত্র নানা দিক দিয়ে। সোনা, সিনথেটিক কাপড়, ঘড়ি, মদ, সিগারেট, ব্লেড, ট্রানজিসটর, টেপরেকর্ডার আর টেলিভিশন সেট দেশের মাটিতে পৌঁছতেই বিকিয়ে যাচ্ছে 'হট কেক' এর মতো। কলকাতার জাহাজ ঘাটা আর চৌরঙ্গী এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে এমনি কয়েকশো দোকান, বোম্বাইতেও বিশিষ্ট এক অঞ্চলে দোকান সাজিয়ে বসেছে স্মাগলাররা। বুদ্ধদেবকে এই নতুন দিকটা ভাবতে বলেছিল লিটল টনি—মাদকদ্রব্য ছাড়াও।

ওস্তাদ নজর রেখেছেন ডক্টর বিশম্ভর ভাদুড়ির ওপর। পিঠটান দেওয়া সম্ভব নয় কোনওমতেই। কিন্তু—কিন্তু যার উধাও হওয়ার কথা নয়, সে-ই যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে রাতারাতি। সুন্দরী-হত্যার চার্জ যার মাথার ওপর ঝুলছে খাঁড়ার মতো, তার অকস্মাৎ অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে জল্পনা-কল্পনা তুঙ্গে পৌঁছেছে সব মহলেই।

সব শুনল বুদ্ধদেব। স্তব্ধ হয়ে শুনল কীভাবে বৈজয়ন্তী তারই সই করা ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে পাঁচশো টাকা নিয়ে দিয়েছিল সুন্দরীকে। যে ট্যাক্সি ড্রাইভার তাকে নিয়ে গিয়েছিল, তাকেও খুঁজে বার করেছে পুলিশ। বৈজয়ন্তীকে দেখলেই সে শনাক্ত করতে পারবে।

সুন্দরী! ঘোর চক্রান্ত দানা পাকিয়েছিল এই সুন্দরীকে কেন্দ্র করে। তারই জন্যে কি প্রাণ দিতে হল তাকে? হত্যারক কে? বৈজয়ন্তী? অসম্ভব! ডক্টর টিটেনাস কি টের পেয়েছেন বুদ্ধদেব বোম্বাই যায়নি, মেক্সিকো গিয়েছে? বৈজয়ন্তী কিডন্যাপড হয়েছে কি সেই কারণেই? বুদ্ধদেবকে মাশুল গুনতে হবে বলে?

সন্ধে নাগাদ চৌধুরীভবনের গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। হাতের জ্বলন্ত 'বেনসন হেজেস' টুসকি দিয়ে শূন্যে নিক্ষেপ করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নেমে দাঁড়াল যেন লোহার কার্তিক। মুখে উত্তেজনার লেশমাত্র নেই—আছে শুধু গাম্ভীর্য। যেন বাটালি দিয়ে কোঁদা প্রতিটি মাংসপেশি।

এ মূর্তি কদাচিৎ দেখা যায়। জেমস বন্ডের কঠোর নিষ্ঠুর চেহারার সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে মানুষটার। বুদ্ধদেব চৌধুরী অকারণে খ্যাতির শিখরে ওঠেনি, আজ তার স্টিল নার্ভের চরম পরীক্ষা।

হলঘরে হাজির ছিলেন সকলেই। এমনকী ডক্টর ভাদুড়িও। থমথমে মুখে বুদ্ধদেবকে ঢুকতে দেখে সবার আগে উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুরমা।

বললেন শান্তকণ্ঠে—"বুদ্ধ, এদিকে আয়।"

হলঘরের দক্ষিণ কোণে আলমারি দিয়ে আড়াল করা সোফাসেটগুলির একটিতে গিয়ে বসলেন তিনি। পাশে বুদ্ধদেব।

ধীরে-ধীরে সব বললেন। একটি কথাও না বলে শুনল বুদ্ধদেব। সব শেষে বললেন ঠাকুরমা—"বুদ্ধ, নাতবউ অনেকগুলো শক্ত কথা আমাকে বলে গেছে। এসব কথা এর আগে কেউ বলেনি আমাকে। চৌধুরীভবন নাকি পাথরপুরীর মিউজিয়াম। এখানে যারা থাকে, সবাই কিউরিও, যন্ত্র। তাদের নিজস্ব কোনও ইচ্ছে নেই, আমার ইচ্ছেই তাদের ইচ্ছা। সাবিত্রীকে তাই আইবুড়ো হয়ে থাকতে হয়েছে আজও। বুদ্ধ, আমি কি মিউজিয়ামের মালিক? আমি কি নিজের পায়ে কাউকে দাঁড়াতে দিই না?"

"আমাকে তো দিয়েছ," ভরাট গলায় আশ্বস্ত করল বুদ্ধদেব। "ঐকান্তিক ইচ্ছে যার আছে, সে-ই নিজের পায়ে দাঁড়ায়। যে চায় না, সে পারেও না। এ বাড়ির সবাই চায় তোমার ছায়ায় থাকতে। লড়তে ভয় পায়। অপরাধটা তাদের—তোমার নয়। বৈজয়ন্তী ঠুকেছে তাদের—তোমাকে সামনে রেখে।"

"ও।" একটু পরে বললেন ঠাকুরমা—"বুদ্ধ, বিকেল ঠিক পাঁচটার সময়ে সেই টেলিফোনটা আবার এসেছিল।"

"কোন টেলিফোনটা?"

"গতকালও এসেছিল। জিগ্যেস করেছিল তুই আছিস কি না। সেই শোনার সঙ্গে-সঙ্গে লাইন কেটে দিয়েছে।"

"কে ফোন করেছিল বলেনি?"

"না। লোকটা নাকি বয়েসে বুড়ো, কথা বললে গলা কাঁপে।"

বৃদ্ধের কণ্ঠ। কে সে? শত্রুর চর? সুন্দরীর হত্যারক? গর্দান নিতে চায় বুদ্ধদেব চৌধুরীর মেক্সিকো যাওয়ার অপরাধে?

দেখা যাক।

পরের দিন বিকেল সাড়ে চারটে থেকে টেলিফোনের পাশে বসে রইল বুদ্ধদেব।

আজকেও হলঘরে হাজির প্রত্যেকে। ডক্টর ভাদুড়িও। প্রশান্ত অন্তরে সবার সঙ্গে কথা বলছে বুদ্ধদেব। হেসে-হেসে কথা বলছে ডক্টর ভাদুড়ির সঙ্গেও। কঠোর-নিষ্ঠুর সেই হাসির সঙ্গে তুলনা চলে কেবল জেমস বন্ডের কঠোর-নিষ্ঠুর হাসির।

ডক্টর ভাদুড়ি? ভাষায় অবর্ণনীয় তাঁর মনের অবস্থা।

কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটার সময়ে ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। খপ করে রিসিভার তুলল বুদ্ধদেব।

"হ্যালো?"

"বুদ্ধদেব চৌধুরী আছেন?" কাঁপা গলা, নিঃসন্দেহে কোনও বৃদ্ধের।

"কথা বলছি।"

সেকেন্ড কয়েক কোনও সাড়া নেই। তারপর কে যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্না জড়ানো কণ্ঠে জিগ্যেস করল—"ভালো আছ তো?"

"হ্যালো? কে? কে?"

"আমি—আমি—তোমার বিজু।"

"ও। কোত্থেকে?"

ঠিকানা বলল বৈজয়ন্তী।

"আসছি এখুনি।" রিসিভার নামিয়ে উঠে দাঁড়াল বুদ্ধদেব।

"কোথায় যাচ্ছেন?" শঙ্কিত কণ্ঠ ঠাকুরমার।

একই জবাব দিল বুদ্ধদেব—"আসছি এখুনি।"

"আমি সঙ্গে আসব?" গায়ে পড়ে কথা বললেন ডাঃ ভাদুড়ি।

"আজ্ঞে না," বলে কঠোর-নিষ্ঠুর হেসে বেরিয়ে গেল বুদ্ধদেব।

কিন্তু ডঃ ভাদুড়ি মূর্খ নন। বুদ্ধদেবের আগমনের মুহূর্ত থেকে তিনি ওত পেতে আছেন চৌধুরীভবনে শুধু এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষায়। বৈজয়ন্তী ফিরে আসবেই বুদ্ধদেব ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে। টেলিফোন রহস্যও জানা যাবে তখনি।

তাই বুদ্ধদেবের ফ্যালকন পোর্টিকো থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যেতেই রুগি দেখার অছিলায় বেরিয়ে এলেন ডক্টর টিটেনাসও। হলুদ গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। দূর থেকে চোখে-চোখে রাখলেন ফ্যালকনকে।

ফ্যালকন এসে দাঁড়াল শহরের অভিজাত অঞ্চলে একটা বিভাগীয় বিপণির সামনে। স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে ভেতরে প্রবেশ করল বুদ্ধদেব। কসমেটিকস কাউন্টারে ক্যাশের টাকা গুনছেন এক বৃদ্ধ। পাশে টেলিফোন। আর, একদঙ্গল মার্কিন টুরিস্টকে নিমতেল থেকে তৈরি প্রসাধন সামগ্রীর গুণাবলী ব্যাখ্যা করছে এক দারুণ স্মার্ট, দারুণ সুন্দরী, দারুণ তুখোড় সেলসগার্ল।

বৈজয়ন্তী চৌধুরী!

চোখের কোণ দিয়ে স্বামীদেবতাকে দেখল বৈজয়ন্তী। ইশারা করল গ্রীবা ভঙ্গিমায়। টুরিস্টদের মাথায় নিমতেলের উপকারিতা অর্ধেক ঢুকিয়ে বাকি অর্ধেকটুকু চিরকালের মতো মুলতুবি রেখে বিদেয় করল তাদের। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বলল শুধু একটি কথা।

বলল—"আমি কাউকে বলিনি—কাউকে না।"

ঠিক সেইসময়ে হলুদ গাড়িটা এসে দাঁড়াল ফ্যালকনের পিছনে। কাচের বড় বড় দরজা দিয়ে রাস্তা থেকেই দেখা যাচ্ছে দোকানের কসমেটিকস সেলস কাউন্টার। দেখা যাচ্ছে, দুই চোখে জন্ম-জন্মান্তরের প্রেম নিয়ে ঢলঢল চোখে বুদ্ধদেবের পানে তাকিয়ে আছে বৈজয়ন্তী। অকস্মাৎ তার এই হাসি মিলিয়ে গেল। ভূত দেখার মতো ডাগর চাহনি বিস্ফারিত হল এবং ভীষণ আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল রাস্তার দিকে চেয়ে।

একই সঙ্গে দুটি ঘটনা ঘটল রাস্তায়।

হলুদ গাড়ির চালক কোটের পকেট থেকে রিভলভার বার করে তাগ করল বৈজয়ন্তীর দিকে। লক্ষ্য তার ভুল হয়নি কোনওদিন। হতও না। সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারের শব্দও শোনা যেত না। যদি না—

ঠিক সেইসময়ে একটা রঙচটা ভাঙা গাড়ি পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারল হলুদ গাড়িকে। ফলে, সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারের গুলি লক্ষ্যচ্যুত হল। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল বুদ্ধদেব। কঠোর-নিষ্ঠুর হেসে চক্ষের নিমেষে কোটের আড়াল থেকে রিভলভার বার করে কাচের মধ্যে দিয়েই তাগ করল হলুদ গাড়ির চালককে।

কিন্তু গুলি করার প্রয়োজন হল না। পথচারীরা অবাক হয়ে দেখল এক অবিশ্বাস্য

দৃশ্য। অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে ফুটপাতের ওপর। হলুদ গাড়ির চালক চকিতে নেমে এলেন দরজা খুলে। কিন্তু পিছনের রঙচটা ভাঙা গাড়ির চালকের দিকে তেড়ে না গিয়ে ছুটে গেলেন বিপরীত দিকে। বেশিদূর অবশ্য যেতে পারলেন না। রঙচটা ভাঙা গাড়ি থেকে পান চিবুতে-চিবুতে নামল ফেজ টুপি মাথায় একটা লোক এবং ছোট্ট একটা রিভলভার বার করে কোনওরকম টিপ না করে ট্রিগার টিপল মাত্র একবার।

মাত্র একবার। কিন্তু গোলাম কিবরিয়ার পিস্তল কখনও ভুল পথে ছোটে না। বুলেটের অপচয় সে একদম পছন্দ করে না। ফলে হলুদ গাড়ির ছুটন্ত চালক হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়লেন ফুটপাতের ওপর।

ঠিক জায়গায় বুলেট লেগেছে। পায়ের ডিমে।

পনেরো মিনিট পরে চৌধুরীভবনে আবির্ভূত হল বুদ্ধদেব এবং বৈজয়ন্তী। ঠাকুরমা জানতেন ওরা আসছে। তাই অবাক হলেন না। সস্নেহে বললেন—"নাতবউ, কষ্ট হয়নি তো?"

ছুটে গিয়ে পায়ের ধুলো নিল বৈজয়ন্তী—"না ঠাকুরমা।"

"দুষ্টু মেয়ে। মুখ তো শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।"

কাষ্ঠ হেসে খুয়ো ধরে বললেন মামাবাবু—"তা তো যাবেই, ধকল তো কম হয়নি।"

"তার জন্যে দায়ী আপনি, মামিমা আর সাবিত্রী," বুদ্ধদেবের কণ্ঠস্বর পিস্তল নির্ঘোষের মতোই শোনালো।

"আমি...আমি," হকচকিয়ে গেলেন মামাবাবু।

"আপনাদের হেপাজতে তাকে রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনারাই তাকে তিলতিল করে বিষম বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। সে তো আপনাদের কাছে বেশি কিছু চায়নি। আপনাদের তিনজনকেই তিনটে কথা গোপন রাখতে বলেছিল। আপনারা রেখেছিলেন কি? রাখেননি। উলটে তাকে শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছিলেন ঘুম পাড়িয়ে তার আর আমার চরম সর্বনাশ করার জন্যে। ছি-ছি-ছি!"

"শত্রু! শত্রু কে?"

ভ্যাবাচাকা খেতে-খেতে রামকৃষ্ণ সান্যালের মুখখানা গোল চাকার মতো হয়ে গেল।

"আপনার বন্ধু ডক্টর টিটেনাস। তিনি দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু, চৌধুরীবাড়ির শত্রু। নারকোটিকস স্মাগলিং র‍্যাকেটের পুরোধা তিনি। তাঁকেই ফাঁসাতে গোপনে আমি মেক্সিকো গিয়েছিলাম। ডাক্তার তা জানলে আমাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হতো না। বৈজয়ন্তী প্রাণপণে তা গোপন করার চেষ্টা করেছে। সুন্দরী মুখ খুলতে রাজি না হওয়ায় ডাক্তার তাকে খুন করেছে, বৈজয়ন্তীরও সেই দশা করতে চেয়েছিল একটু আগে।"

"ডাক্তার!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ডক্টর টিটেনাস। আপনার ফ্রেন্ড, ভাবী জামাই। এই মুহূর্তে সে পুলিশ ফাঁড়িতে।"

এই সময়ে একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শোনা গেল। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে সাবিত্রী।

ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চলল বুদ্ধদেব—"আপনাদের সান্নিধ্য থেকে তাই সরে যাচ্ছি কাল সকালেই। যাচ্ছি কাশ্মীর। সেখান থেকে চলে যাব বোম্বাইতে।"

"বুদ্ধ," শান্তকণ্ঠে বললেন ঠাকুরমা—"বোম্বাইতে আমাকে একটা ফ্ল্যাট কিনে দিবি?"

"তুমি! ফ্ল্যাটে থাকবে?"

"হ্যাঁ। নাতবউ আমার চোখ খুলে দিয়েছে। পাথরপুরীর এই মিউজিয়াম আমি বেচে দেব। জমি-জমা, চা বাগান সব বেচে দেব। আমি জানি এসবের ওপর তোর কোনও লোভ নেই। থাকলে দিল্লিতে গিয়ে বসে থাকতিস না। নাতবউয়েরও দরকার নেই। যাদের দরকার আছে, তাদের তিনজনকেই কিছু-কিছু দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বলব। তারা যেন আর মিউজিয়ামের পিস হয়ে না থাকে, অহিবুড়ো হয়ে না থাকে, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাস হয়ে যন্ত্র হয়ে না থাকে।"

"ঠাকুমা!"

"জানি তুই কী বলতে চাস। পূর্বপুরুষের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই বাড়িতে। কিন্তু সব স্মৃতির নির্যাস দিয়ে গড়া তুই। তুই মানুষের মতো মানুষ হয়েছিস, আমার স্মৃতিরক্ষাও হয়ে গেছে। তোর ঠাকুরদাকে আমি তোর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি। তোরই মতো দুরন্ত ছিল সে, ঘরবিমুখ ছিল। তুই ওর ধারা বজায় রেখেছিস, এইটাই তো বড় কথা রে। পাথরপুরীর এই মিউজিয়াম তোদের ছেলেমেয়েদের আত্মবিশ্বাস যাতে নষ্ট করে না দেয়, তাই এসব আমি বেচে দিয়ে থাকব বোম্বাইতে সাগরের ধারে। নাতবউ।"

স্তম্ভিত বিস্ময়ে এতক্ষণ চেয়েছিল বৈজয়ন্তী। এবার বলল—"ঠাকুরমা, আমার ঘাট হয়েছে। আমি আর কিছু বলব না।"

স্নেহকোমল চোখে চেয়ে বললেন ঠাকুরমা—"নাতবউ, দেখি তোমার কানজোড়া।"

"তাই দাও ঠাকুমা, কান মলে দাও ওর। বড্ড কাটকেটে কথা।" রাগ করে বলল বুদ্ধদেব।

জবাব দিলেন না ঠাকুরমা। আঁচলের খুঁট খুলে নীলকান্ত মণির দুলজোড়া বার করলেন। বৈজয়ন্তীর কানে পরিয়ে দিয়ে চিবুক ধরে মুখটি তুলে বললেন : "এ বংশে এ দুল পরবার যোগ্যতা শুধু তোমার আছে, নাতবউ।"
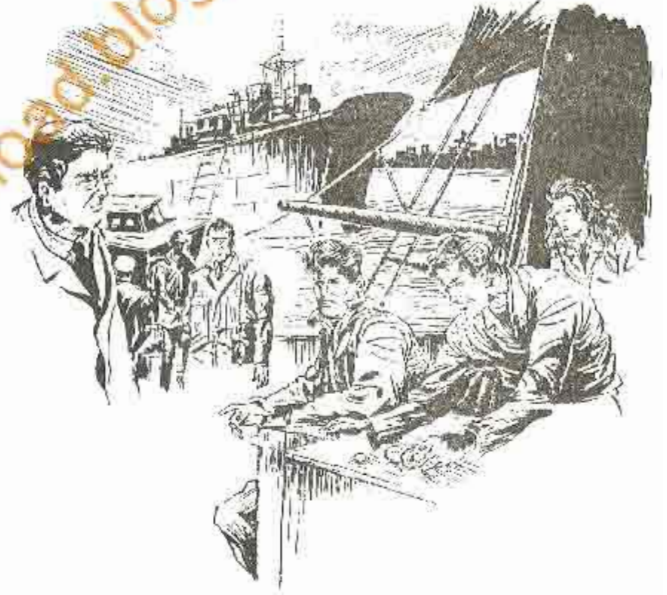
রুপোর টাকা

জানলার ধারে প্যাকিংকেসটা টেনে নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল ইন্দ্রনাথ। বর্ষা নেমেছে। অবিশ্রান্ত ধারায় কদিন ধরে বর্ষণের আর বিরতি নেই। অবিরাম, অবিরল ধারায় নামছে বর্ষাসুন্দরী। অসমছন্দের সে বর্ষণ-সঙ্গীত শুনে-শুনে ইন্দ্রনাথেরও একঘেয়ে লাগতে থাকে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। প্রকৃতির সঙ্গীতের সুরে মানুষের মনোবীণাও একই তারে বাঁধা। একের ঝঙ্কার অপরটিতে অনুরণিত হয়ে এসেছে সুদূর সেই আদিম প্রভাত থেকে। তাই বুঝি আজ বাইরের মেঘ ভিড় করে এসেছে ইন্দ্রনাথের মনের আকাশেও। বাইরের স্তিমিত আলোয় ওর মনের দীপও বুঝি আজ নিষ্প্রভ। বাইরের ঝাপসা জলধারায় সজল ওরও অন্তর।

বর্ষার মৃত্যুশীতল অবসাদ যেন ধীরে-ধীরে ওর মনেও সঞ্চারিত হয়ে যেতে থাকে। ম্লান-বিষণ্ণ দুই নয়ন-মণিকায় সুদূর অতীতের স্বপ্নালু স্মৃতির আবেশ ঘনিয়ে ওঠে। যৌবনের প্রভাতে কল্পনার কত অলীক জালবোনা আর স্বপ্ন সৌধ ভঙ্গের সুখদুঃখবিধুর উষ্ণ সে অতীত। রুক্ষ জীবনের ধূসর পথপ্রান্তে ধুলার মাঝে তারা আজ পেতেছে আসন—সে ধুলা তার জীবনের ব্যর্থতা, বেদনা আর বঞ্চনার নির্মম আঘাতে রেণু-রেণু কল্পনার মর্মর মঞ্জিল বিরচিত। যার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে মিশে আছে তার যৌবনের নিশ্বাস, বোবা কান্নার অদৃশ্য অশ্রু।...

বিবর্ণ, বিরং, পাণ্ডুর আকাশ আর নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারার দিকে তাকিয়ে তাই বুঝি ইন্দ্রনাথের দুই চোখ জ্বালা করে ওঠে।...

দরজায় আচমকা করাঘাত হতে চমক ভাঙল ওর।

ডাকপিওন পুরু আর বিপুলায়তন একটা রেজিস্টার্ড প্যাকেট হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নেয় সে।

প্যাকেটের ওপর চোখ পড়তেই ওর মুখের বিষাদকে ম্লান করে দিয়ে ফুটে ওঠে খুশির আভা। মৃগাঙ্কর চিঠি। বম্বে থেকে সে লিখছে।

বোম্বাই
এপ্রিল ১২,১৯৫৭

ভাই ইন্দ্রনাথ,

বুঝতেই পারছি, আমার এ চিঠি যখন তুমি পাবে, তখন হয় স্মৃতি রোমন্থন করছ ম্লান মুখে, আর না-হয় কীর্তি ধ্বংস করছ একমনে। দেখো ইন্দ্র, বহুবার বলেছি তোমায়, আবার বলছি: সুখ, দুঃখ, আশা, বঞ্চনা নিয়েই মানুষের জীবন। সব স্বপ্নই কি ফসল ফলায়? সব জেনেশুনেও কেন যে তিলে-তিলে জীবনের এই মূল্যবান অধ্যায়টিকে নষ্ট করছ জানি না।

তোমার প্রতিভার এই অহেতুক আত্মহত্যা রোধ করতে না পেরে বাধ্য হয়ে নিতান্ত রাগের বশেই এসেছিলাম বোম্বাইয়ে—সাংবাদিকের জীবনকে বেছে নিয়ে। এখানে এসে কেটো বিচিত্র ঘটনার আবর্তে জড়িয়ে পড়ি। ব্যাপারটা বেশ মজার হলেও ওর মধ্যে একটু রহস্যের গন্ধ পাওয়ায় তোমার সান্নিধ্য থেকে পাওয়া যৎসামান্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিলাম। ফল পেয়েছি হাতে-হাতে। লিখতে লিখতে আজ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছি, সত্যিই মন যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি। কী, বুঝলে না তো? এ আমার নিছক রহস্যভেদ নয়, অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ, আর...আচ্ছা, শোনোই তবে সে-কাহিনি।...

সন্ধে হয়ে এসেছিল। মালাবার হিলের ওপাশে সূর্য নেমে এসেছিল—আকাশকে রঙে-রঙে রাঙিয়ে ক্ষণেকের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরব সাগরের বুকের উপর। বোম্বাই নাগরিক-নাগরিকাদের বড় প্রিয় এই গোধূলি মুহূর্তটি। আকাশে-বাতাসে রঙের উৎসব ওদের মনেও সুরের পরশ লাগায়। তাই প্রত্যেকেই গৃহকোণ ছেড়ে বেরিয়ে আসে পথে—আসে সাগরের তীরে, বসে শ্যাওলা সবুজ পাথরের আনাচে-কানাচে অথবা বালুকা-চিক্কণ জুহু-চৌপাটির বেলাভূমিতে। সারাদিন কর্মমুখর সুদীর্ঘ প্রহরগুলো কাটাবার পর এই সংক্ষিপ্ত ম্লান মধুর গোধূলি মুহূর্তটি প্রতিজনেই লঘু রসালাপ আর ভ্রমণ-বিলাসে ভরিয়ে তোলে।

কিন্তু ছুটি নেই আমার—নেই সম্পাদক শেখর শর্মার। আর, বোধহয় এই কারণেই প্রতিদিন ঠিক এই সময়টাতেই বিশেষভাবে বিগড়ে থাকত শর্মাজির মেজাজ। বিশ বছর ধরে বিরতিবিহীন সম্পাদনায় সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি, আর বিশ বছরের প্রতিটি সকাল-সন্ধ্যায় করুণ নয়নে শুধু দূরদর্শন করে নিষ্ফল রোষে আক্রমণ করেছেন ফাইলের স্তূপকে। সে রোষবহ্নি থেকে আমরাও নিষ্কৃতি পাইনি।

সেদিনও তিরিক্ষে মেজাজ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। সটান এসে দাঁড়ালেন আমার টেবিলের সামনে।

প্রথমে আমি লক্ষই করিনি। লক্ষ করবার মতো অবসরও ছিল না। টেলিফোন যন্ত্রটির মাউথপিসের ওপর সপ্রেম দৃষ্টি রেখে মধুক্ষরা শব্দ প্রেরণ করছিলাম অপর প্রান্তে।

'সত্যিই কবি, তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা যে কীভাবে শুরু করব, তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না...ভাবব না? তবে থাক...না—না, এ বিষয়ে এখনও বিন্দুবিসর্গও শুনিনি, তবে শুনব শিগগিরই...তাহলে আগামীকাল সন্ধে ছটায় আলেকজান্দ্রা ডকে...আরে, আমি তো থাকবই...সমস্যা তো সেটা নয়, কাল পর্যন্ত সময়টা যে কী দুঃসহ কাটবে, তা ভাবতেও অসহ্য লাগছে।...বললাম, মৃদুছন্দে একটু কবিত্ব করলাম আর কী।...তাহলে কাল সন্ধেয় দর্শন পাচ্ছি, কেমন? আচ্ছা, তাহলে এখনকার মতো—

বলে, রিসিভার নামিয়ে রেখে মুখ তুলতেই ম্যানেজিং এডিটরের বরফ-কঠিন চোখে চোখ পড়ল আমার।

বেশ কিছুক্ষণ তুষার-রশ্মি বিকীরণ করল শেখর শর্মার চোখ দুটি। তারপর শ্লেষ-বঙ্কিম স্বরে বললেন, 'বটে! আজকাল তাহলে কবি নাম ধরেই ডাকাডাকি চলছে দেখছি।'

সসম্ভ্রমে বললাম, 'অনেকটা সময় বেঁচে যায় তাতে, তাই—'

'একমাত্র সন্তানকে এমন মিঠি নামে আপ্যায়নের বৃত্তান্ত কি সোমেশ রায় শুনেছেন?'

'খুব সম্ভব না। অত্যন্ত কাজের মানুষ কিনা—'

'খবরটা শুনলে আর একটা কাজ তাঁর বাড়বে শুধু। জ্যান্ত তোমার চামড়া ছাড়িয়ে রোস্ট করবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করতে বেশি দেরি ওঁর লাগবে না। সামান্য একটা সাংবাদিক—মাস গেলে তিনশো টাকা যার রোজগার, সে কিনা—'

'সত্যিই, মাইনেটা বড় অল্প স্যার।' তৎক্ষণাৎ একমত হই আমি। এ-প্রসঙ্গে আরও কিছু বক্তব্য ছিল আমার, কিন্তু সেরকম কোনও সুযোগ না দিয়ে ঝাঁজিতে উত্তর দিলেন শেখর শর্মা, 'তোমার দাম ওর থেকে এক কানাকড়িও বেশি নয়। বুঝলে গোবর্ধন?'

'আজ্ঞে, আমার নাম—'

'গোপরাও। মেয়েটা তাহলে সবই বলেছে তোমায়। হুম. এখন সব জলের মতো বুঝতে পারছি। মতলবটা এসেছে ওরই মাথা থেকে, তাই কিনা?'

'কবিতা একটা মস্ত সুখবর শোনাল স্যার। কিন্তু সে যাই শোনাক না কেন, আদেশ তো স্যার আপনার কাছ থেকেই নেব।'

এবার বোমার মতো ফেটে পড়লেন শেখর শর্মা।

'ইস্কুল ম্যাগাজিন চালানোর মতো কতকগুলো নিরেট সাংবাদিক আমায় দিয়ে আবার তাদের মধ্যে থেকে একজনকে ছেঁকা হচ্ছে কিনা একটা মেয়ের মনোরঞ্জনের জন্যে।'

'তা যা বলেছেন স্যার।' খুশি-খুশি স্বরে সায় দিই আমি।

খরখরে চোখে তাকাল শেখর শর্মা। 'বেশি কথা বোলো না ছোকরা। কথাটা হচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধেয় অন্নদাতাকে নিয়ে। সে খেয়ালটা থাকে যেন। এইমাত্র ফোনে জানালেন যে, ইস্তাখানেকের জন্যে সোমেশ রায়ের স্টিমার-পার্টিতে তোমাকেও যেতে হবে। পার্টি পোর্ট ভিক্টোরিয়া, রত্নগিরি, ম্যাঙ্গালোর ঘুরে আসবে। কাল সন্ধ্যা ছটায় আটারো নম্বর আলেকজান্দ্রা ডকে। কিন্তু সবই তো জানো বলে মনে হচ্ছে।'

'জানলেও আপনার মুখে শুনে বুঝছি খাঁটি খবরই দিয়েছে কবিতা।'

'বটে! নিছক সাগর-বিহারের জন্যে যে তোমায় ডাকা হচ্ছে না, কাজের দায়িত্ব যথেষ্ট আছে, তা নিশ্চয় মেয়েটা বলতে ভুলে গেছে, তাই না?'

'তা স্যার, গেছে। নিরস কথাবার্তা ও মেয়েটাই পছন্দ করে না কিনা, তা না—হলে—'

'স্পেশাল রিপোর্টার রোমিও!' বলেই চোখ পাকালেন শেখর শর্মা। 'ইস্তাখানেক হল সিলোন থেকে ডক্টর তারাপদ তরফদার ফিরেছেন। ভদ্রলোকের নাম তোমার অজানা নয়। তোমার কাজ হচ্ছে ও-দেশ সম্বন্ধে ডক্টরের মতামতগুলো কায়দা করে লিখে নেওয়া। বুঝেছ?'

'এ আর এমন কী কঠিন কাজ, স্যার।' বলি আমি।

'যতটা সহজ ভাবছ, অতটা সহজও নয়। এ যে শুধু ডিউটি নয়, সেইসঙ্গে সাগর বিহার, কাজেই—' শ্লেষের শেষ খোঁচাটুকু অনুক্ত রেখেই পেছন ফিরলেন শেখর শর্মা।

'একটা কথা স্যার, ইয়ে... কাল তাহলে আমার আর অফিসে আসার দরকার নেই, কী বলেন?' তাড়াতাড়ি বলি আমি।

আবার খরখরে চোখে তাকালেন শেখর শর্মা।

'কে বললে দরকার নেই? এইমাত্র কবিত্ব করছিলে না সময়টা বড়ই মধুচ্ছন্দে যাবে? সেভাবে যাতে না যায়, তা আমি দেখব। যথা-সময়ে কাল অফিসে হাজিরা দেবে, বুঝেছ?'

'বুঝেছি।' বেশ দমে যাই আমি। বড় কড়াপ্রকৃতির মানুষ শেখর শর্মা

'আর একটা কথা,' টেবিলের কাছে এগিয়ে আসেন উনি। 'ইয়ে মানে, তোমার এই কবিতা রায়টিকে তো দেখতে-শুনতে মন্দ নয়, কী বলো?'

'তাই তো সবাই বলে স্যার।'

'দ্যাখো ছোকরা, মনটিন দিয়ে কাজকর্ম করো একটু।' কোমল হয়ে আসে ওঁর বলি-অঙ্কিত রুক্ষ মুখ।

'জানোই তো দুনিয়াটা কতখানি কঠিন। এখানে চলতে গেলে কাঁটায় পা ছেঁড়ে রক্তারক্তি। তাইতেই হতাশ হয়ে শুধু কাব্যবচনা করলেই গোলাপ হাতের মুঠোয় আসে না। বুড়ো সোমেশ রায় আলট্রা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ধুলো থেকে সোনা তুলেছেন; আর, চোখে টেলিস্কোপ আঁটলেও দুনিয়ার টাকা ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না তাঁর। টাকা আর টাকা—এছাড়া কিছু ভাবেনই না তিনি।'

'আমিও অনেকটা সেই রকম শুনেছি স্যার।'

'জীবনে সর্বপ্রথম যে রুপোর টাকাটি তিনি রোজগার করেছিলেন, আজও তা সযত্নে রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে। তোমার প্রথম রোজগারের টাকাটা কোথায় শুনি?'

'কাকে যেন দিয়েছি, ঠিক মনে পড়ছে না।'

'পড়বে না। তোমার সঙ্গে সোমেশ রায়ের তফাৎ এইখানেই। যাই হোক, এ দুর্মুখ বুড়োটার কথা মনে রেখো। একজন ভালো রিপোর্টার জেনেশুনে পরে কিঁচে ভুল করে পস্তাক, তা আমি দেখতে চাই না।'

'ভালো রিপোর্টার স্যার?' উজ্জ্বল হয়ে উঠি আমি।

'তাই তো বললাম হে।'

হেসে ফেলি আমি। আরও খুশি-খুশি হয়ে ওঠে আগে থেকেই প্রসন্ন মেজাজটা।

এবার একটু সাহস করেই বলে ফেলি, 'মাইনের দিন কিন্তু স্যার পরশু।'

'ক্যাশিয়ারকে বলে দেব'খন।' বলে খস খস করে একটা কাগজে দু-ছত্র লিখে আমার হাতে তুলে দিলেন উনি। 'টাকাটা কালকেই নিয়ে নিও, বুঝলে?'

'মাত্র পঞ্চাশ টাকা!' করুণ হয়ে ওঠে আমার চোখ। 'আমি যে স্যার একটা ভালোরকমের ডিনার সুটের কথা ভাবছিলাম!'

আবার তিরিক্ষে হয়ে ওঠে শেখর শর্মার মেজাজ

'যে শার্ট আর প্যান্ট পরতে দিয়েছ, তাই নিয়ে যাবে। ফালতু বাবুগিরির জন্যে তোমায় আমরা পাঠাচ্ছি না—তা যেন মনে থাকে।' বলে হন-হন করে উনি বেরিয়ে গেলেন ওনার খুপরি-ঘরে।

কাজেই, ঘরের মধ্যে রইলাম শুধু আমি। কাগজটা সান্ধ্য দৈনিক। শেষ সংস্করণও

পথে চলে গেছে অনেকক্ষণ। তাই হাতে আর বিশেষ কোনও কাজ ছিল না। বাইরের গোধূলি ক্রমশ ফিকে হয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যার অবগুণ্ঠন অন্তরালে। অল্প-অল্প ছায়া দানা বেঁধে উঠছিল ঘরের কোণগুলিতে। রাস্তার ওপাশের গাছটায় স্তবকে-স্তবকে ফোটা হলুদ ফুলের আড়ালে দেহ লুকিয়ে দিনের শেষ গান গাইছিল নাম না-জানা একটা পাখি। আনমনে সেই দিকেই তাকিয়ে রইলাম আমি।

সেই ছায়া-ছায়া গোধূলি সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে অনেক কথাই ভিড় করে এল মনে। মনটা পিছিয়ে-পিছিয়ে চলে গেল সেই দিনটিতে, যেদিন প্রথম দেখেছিলাম কবিতা রায়কে।...

গেছিলাম বান্দ্রার মাউন্ট মেরিতে। নিরাশ্রয় অনাথদের আশ্রয়-লাভের জন্য একটা সাহায্য রজনীর ব্যবস্থা করেছিল বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতের প্রখ্যাত নট-নটী ও সঙ্গীত-শিল্পীরা। বেশ বড় অনুষ্ঠান। আর তাই শেখর শর্মা আমাকে পাঠিয়েছিলেন হরেকরকম মালমশলার সন্ধানে। প্রত্যঙ্গ-প্রতীচ্য কায়দায় সুসজ্জিত বলমসে ভেরণের নিচে হাসিমুখে আগতদের মাঝে ফুল বিক্রি করছিল একটি তন্বী। মেয়েটির একহাতে বেতের সাজিতে ম্যাগনোলিয়া, রজনীগন্ধার গুচ্ছ, অপর হাতে রক্তগোলাপের কয়েকটি সুদৃশ্য বাটন হোল। হাত-মুখ, ঠোঁট-ভুরু-চোখ নেড়ে অপূর্ব ভঙ্গিমায় ফুল বিকোচ্ছিল সে। দেখেই থমকে দাঁড়ালাম। যদিও সুন্দরী ললনা দেখে থমকে দাঁড়ানোর অভ্যাস আমার কোনওদিনই ছিল না, তবুও এ মেয়েটির চোখে-মুখে এমন কিছু একটা ছিল, যা দেখে আপনা হতেই স্তব্ধ হয়ে গেল আমার চরণ-যুগল।

মেয়েটিকে ডানাকাটা পরী বলব না। রম্ভা-তিলোত্তমা-উর্বশী-মেনকার মতো স্বর্গীয় সৌন্দর্য না থাকলেও সে সুন্দরী। ছিপছিপে একহারা চেহারা, টুকটুকে ফর্সা মুখ, কালো চঞ্চল দুটি চোখ, চুলগুলো টান করে পেছনে বাঁধা আর টানা-টানা দুই ভুরুর মাঝে রক্তচন্দন বিন্দুর মতো একটি কুমকুমের টিপ।

এই টিপ দেখেই মনে হল মেয়েটি মহারাষ্ট্রীয় নয় নিশ্চয়। গুজরাটি বা মহারাষ্ট্র প্রদেশের তরুণীদের টিপ অঙ্কন দেখেছি বিশেষ ধরনের এবং বিশেষ স্থানে। কিন্তু এ মেয়েটির কুমকুম-বিন্দু, বিশেষ করে ওর মুখের ঢলঢলে স্নিগ্ধ লাবণ্য দেখে মনে হল, বঙ্গললনা ছাড়া তো এমন চোখ-জুড়োনো শ্রী আর কোনও নারীর মুখে দেখিনি।

বড় ভালো লাগল মেয়েটিকে। জীবনে বহু সৌন্দর্যের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু হৃৎপিণ্ড নামক দেহযন্ত্রটি কোনওদিন ভুলেও কোনওরকম চাঞ্চল্য দেখায়নি। আর সেই আশ্চর্য রকমের শান্ত যন্ত্রটাই হঠাৎ ওই তন্বী-সৌন্দর্য দেখে অত্যধিক মাত্রায় চনমনে হয়ে উঠে এমন দাপাদাপি শুরু করে দিলে যে কেমন জানি চুম্বকের টানে পড়ে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে।

মেয়েটির সামনে এসে দাঁড়ালাম বটে, কিন্তু ওর চন্দন-স্নিগ্ধ লাবণ্য আমার অশান্ত হৃদযন্ত্রকে শান্ত করা দূরে থাক, বরং তার স্পন্দনবেগ রীতিমতো বাড়িয়ে তুললে। বোধ করি আমার বিমুগ্ধ-আনন দেখেই মিষ্টি করে একটু হাসল ও। আহা, মরি, মরি! সে তো হাসি নয়, যেন সুদৃশ্য শুক্তির ফাঁকে একসার দুধ-সাগরের সেরা মুক্তা ঝিলমিল করে উঠল, আর সে দুধ মুক্তার চাঁপা শুভ্রদ্যুতি রাঙা অধরের কোণে-কোণে আশ্রয় নিলে অপরূপ ভঙ্গিমায়।

আমি যদি কবি হতাম, তাহলে সেই মুহূর্তেই ওই অমল-ধবল কুন্দবরণ সুন্দর হাসি নিয়ে সৃষ্টি করতাম শ্রেষ্ঠ কাব্যের।

মেয়েটি কিন্তু শুধু একটু হাসল। হেসে সুরেলা সুরে বললে ফুলের দরদাম আর দাম। দামটা যদিও একটু বেশিই বললে, কিন্তু বর্ণ-ভঙ্গি এমনই সরস, সুন্দর আর সুমিষ্ট যে খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হল তা। তাছাড়া, আমার এতদিন ধরে দিব্যি শান্ত থাকা হৃদযন্ত্রের দাপাদাপি আর সহ্য করতে না পেরে পকেট উজাড় করে সর্বস্ব তুলে দিলাম শিখরদশনার হাতে।

শিঞ্জিত-কাঁকন চপল-চঞ্চল বহু পরিচিত তরুণী আশপাশে ঘুরছিল ফুরফুরে প্রজাপতির মতো লঘুচরণে ও লঘুমনে। বোধ করি আমার মুগ্ধ নয়ন দেখেই ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিলে আমাদের।

আর, তা শুনেই নিমেষ মধ্যে স্থির হয়ে গেল আমার চঞ্চল চিত্ত। ফুলওয়ালি মেয়েটি অনাথা নয় মোটেই। সারা বোম্বাইতে হেন জন নেই যে চেনে না ওর দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতৃদেবটিকে। পরিচয়-পর্ব সাঙ্গ হওয়ার আগেই আমার তখন চক্ষুস্থির! বুঝলাম, বড় বেশি আশা করে ফেলেছি আমি। রায় কনস্ট্রাকশন কোম্পানির চেয়ারম্যান সোমেশ রায় কোনওদিনই মার্জনা করবেন না আমার এ ধৃষ্টতা। জীবন-পথে আসা কোনও কাঁটাকে তিনি কখনও পাশ কাটিয়ে যাননি, দলে গেছেন দুই পায়ে। আর, তিনশো টাকা মাইনের যে নগণ্য সাংবাদিক তরুণটি তাঁর একমাত্র কন্যা-সন্তানের শুধু রূপসুধা পান নয়, জীবন-সঙ্গিনী করারও স্বপ্ন দেখে, তাকে যে তিনি অতি সহজে রেহাই দেবেন না, তা তখনই মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করে ফেললাম আমি।

যাকে বলে হরিষে-বিষাদ—তাই হল আমার। মুহূর্তের স্পর্শে আকাশ-কুসুম রচনা শুরু করে দিয়েছিলাম, তারপর মুহূর্তেই পতন ঘটল স্বর্গ থেকে মর্তে। তোমার কথাই মনে পড়ল তখন। তুমিও যা চেয়েছ, তা পাওনি, শুধু পেয়েছ আঘাতের পর আঘাত। তাই বাইরের জগত থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনেছ নিজের অন্তরের কন্দরে, তাই চিত্তের কুহরে কুহরিছে সদা অতীত দিনের কাহিনি। নিজেকে সেদিন আরও বেশি করে একাত্ম বোধ করলাম তোমার সঙ্গে।

কাজ নিয়ে গেছিলাম—তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসার উপায় ছিল না। তাই থেকে গেলাম শেষ পর্যন্ত। অবশ্য যতক্ষণ ছিলাম, মেয়েটির মধুসঙ্গ দিয়ে হৃদয়ের ছোট-বড় সব ফাঁকগুলিই ভরিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর উৎসব-চঞ্চল মণ্ডপ ত্যাগ করলাম আর মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এই প্রথম আর এই শেষ। কাশ্মিরী আপেলের আভা-মাখা ও-মুখ ইহজীবনে আর দেখা তো দূরের কথা, ওর স্মৃতিও সজ্ঞান-নির্জ্ঞান মন থেকে বিসর্জন দেব চিরতরে।

এরপর অনেকদিন কেটে গেল। আর প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আমি অন্তরে-অন্তরে উপলব্ধি করছিলাম যে সেদিনকার সন্ধ্যার সে সুখস্মৃতি কেটে-কেটে বসে গেছে এ হতভাগ্যের মানসপটে। বুঝলাম, আমি প্রেমে পড়েছি।

প্রেম কারও জীবনে আনে শুধু আনন্দ—অমৃতময় আনন্দরসে ভরিয়ে তোলে তার অন্তর-পেয়ালা, আর কারও জীবনে আনে শুধু বেদনা, দুঃখ আর অশ্রু। সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমার মনে কোনও চিন্তা, কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু তারপর

থেকেই এক দুঃসহ চিত্তভারে তিরোহিত হল আমার মনের শান্তি। শুধু দুটি পথ ছিল আমার সামনে। মেয়েটিকে স্মৃতি থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলে কাজে ডুবে যাওয়া; ব্যর্থতার গ্লানি মনেপ্রাণে বয়ে নিয়ে যাওয়া জীবনের শেষ সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর না হয় পৌরুষকারকে অবলম্বন করে সংগ্রামে নেমে পড়া। যে পত্রিকায় আমি এখন সামান্য সাংবাদিক, মনপ্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করলে হয়তো একদিন এইখানেই উচ্চতর পদের সঙ্গে যশ আর অর্থ সমাগমও বিচিত্র হবে না। তখন এই দুই হাতিয়ারকে সম্বল করে স্বর্ণ-প্রসাদ চূর্ণ করে রাজকন্যাকে জয় করে আনা এমন কিছু কঠিন কাজ হবে না আমার পক্ষে। তবে এই শেষের পথটিই আমি বেছে নিলাম—যদিও দুস্তর এই পথ বহু বিঘ্নে সঙ্কুল, তবুও পিছু হটে আসার কথা কিছুতেই ভাবতে পারলাম না।

কবিতা রায়ের মুখদর্শন না করার প্রতিজ্ঞা শেষপর্যন্ত আর রাখতে পারিনি আমি। দেখা-সাক্ষাৎ পুরোদমেই চলছিল। কখনও লেকে, কখনও পিকচার, কখনও জুহু, আবার কখনও রেসিন কোর্টে মিলতাম আমরা। বন্ধুর মতো সহজ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমাদের মধ্যে তার আর আমার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, তা সে মনেপ্রাণেই উপলব্ধি করত। কিন্তু তবুও সে সমানে তার মিষ্টি হাসির অমৃত-সিঞ্চনে নিত্য সঞ্জীবিত করে চলেছিল আমার অন্তরের আনন্দ-উৎসের। দিনের পর দিন দেখা-সাক্ষাতের আয়োজন করেছে সে নিজেই—অকুণ্ঠ, সহজ, স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে নিবিড়তর করে তুলেছে আমাদের পরিচয়। আর আজকে সোমেশ রায়ের দেওয়া স্টিমার-পার্টিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর মূলেও আছে সে। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমত সাগরবিহার, দ্বিতীয়ত পুরুষসিংহ সোমেশ রায়ের সঙ্গে তাঁরই প্রাসাদতুল্য আধুনিক বজরাতে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়া।

ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল আমার। অথচ ভেবে পেলাম না বৃদ্ধ সোমেশ রায়কে এত বেশি ভয় পাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে আমার। বংশমর্যাদার দিক দিয়ে নিতান্ত কম যাই না আমি। বোম্বাইতে না হোক, কলকাতায় আমার কুলপঞ্জিকা দিলে এখনও সম্মান পাওয়া যায় সমাজের বনেদিমহলে। পক্ষান্তরে, শুধু সোনার বাট সাজাতে-সাজাতেই সন্ধে ঘনিয়ে এল সোমেশ রায়ের জীবনে। টাকা আর টাকা। টাকা ছাড়া দুনিয়াতে ভদ্রলোকের কাছে সত্য বস্তু আর কিছুই নেই। ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর যে-কটি কোম্পানির কাগজ পেয়েছিলাম, সেগুলো তো বৃদ্ধ সোমেশ রায়ের বিপুল অর্থ সমুদ্রের তুলনায় নগণ্য কটি বিন্দু। অর্থ আর অর্থ। অর্থ ছাড়া প্রতিভার কোনও আদরই নেই তাঁর কাছে।

দূত্তোর, কী আর করব এত ভেবে। আমাদের মোলাকাতের জন্য কবিতা যখন এত বড় একটা পার্টির আয়োজনই করে ফেলেছে, তখন যাবই আমি। অর্থ সম্রাট সোমেশ রায়কে কেন যে লোকে এত ডরায়, তা দেখতে হবে স্বচক্ষে। শেখর শর্মা ঠিকই বলেছেন। ধনীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নতুন ডিনার-স্যুটের কোনও প্রয়োজনই নেই আমার। যে শার্ট-প্যান্ট আমি ধুতে দিয়েছি, তা নিয়েই—

হঠাৎ শার্টের কথা ভাবতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল আমার এলোমেলো চিন্তা। যে শার্ট-প্যান্ট আমি ধুতে দিয়েছি, তা তো সামনের শুক্রবারের আগে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ঘরেতেও ধোয়া জামা কাপড় নেই একটিও।

কী নিয়ে যাব আমি? লন্ড্রিতে আজ ধুতে দিলে শনিবারের আগে তো আর পাওয়ার উপায় নেই। নতুন শার্ট কেনারও কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে ওই পঞ্চাশ টাকা থেকে যা উদ্বৃত্ত থাকবে, তা দিয়ে আর বেয়ারা-খানসামাদের কাছে ইজ্জত রক্ষা করা যাবে না। ওই তো, করি কী তাহলে?

মহা চিন্তায় পড়লাম আমি। অদূরে কাঠের পার্টিশন দেওয়া পায়রার খুপরির মতো ছোট্ট ঘরটায় শেখর শর্মা নির্বাক চোখে অগ্নিবৃষ্টি করছিলেন একটা প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকার শেষ সংস্করণের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। ওঁর কাছে আরও কিছু চাইলে হয় না? কিন্তু দৃশ্যটি বিশেষ আশাপ্রদ মনে হল না। তারপরেই হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল ওয়ার্ডেন রোডে একটা চীনা লন্ড্রির সাইনবোর্ড। ও-পথে যেতে-আসতে বহুবার বোর্ডটা চোখে পড়েছে আমার। আঁকাবাঁকা চীনা কায়দায় তাতে লেখা আছে, সকাল আটটার মধ্যে ময়লা পোশাক দিয়ে গেলে সেইদিনই তা পরিষ্কার করে ফেরত দেওয়া হয় সন্ধ্যার সময়ে।

মহোপকারী চীনা ভদ্রলোকটির নামটাও মনে পড়ল আমার—হনলুলু স্যাম। মনে পড়ামাত্র আর অযথা দেরি করলাম না। টেবিল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সম্পাদকীয়তে তন্ময় শেখর শর্মাকে আর না ঘাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে।

প্রোগ্রামটা মনে-মনেই তৈরি করে নিলাম। প্রথমেই আশপাশের কোনও হোটেলে ঢুকে রাতের আহারটা সেরে নিয়ে যাব আমার ঘরে। সেখান থেকে গিয়ে হনলুলু স্যামের দোকানে—ময়লা পোশাকের প্যাকেটটা তার হাতে সঁপে দিয়ে ফিরব আপন শয্যায়; পরিপাটি নিদ্রা দেওয়া দরকার। বহুদিন আশা মিটিয়ে ঘুমোনোর সুযোগ পাইনি—আজ যখন পেয়েছি, তখন তার সদ্ব্যবহার করবই।

কিন্তু বোম্বাইয়ের মতো নিশীথ-নগরীতে সকাল-সকাল ঘরে ফেরা তো আর সহজ কথা নয়। হোটেলেই কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ছাড়া যখন পেলাম, তখন আর চীনা ভদ্রলোকের নিদ্রাভঙ্গ করা সমীচীন বোধ করলাম না। ময়লা পোশাকের প্যাকেটটা সুটকেসে পুরে মাথার কাছে রেখে অ্যালার্ম ঘড়িটার কাঁটা ভোর ছটায় ঘুরিয়ে রেখে টান-টান হলাম শয্যায়।

মনকে আশ্বাস দিলাম, খেদ মিটিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা স্টিমারে যেভাবেই হোক করব আমি।

পরের দিন সকাল ঠিক সাড়ে সাতটার সময়ে হনলুলু স্যামের কাউন্টারে এসে দাঁড়ালাম আমি।

সুটকেস খুলে প্যাকেটটা কাউন্টারে রাখতে-রাখতে হাঁক দিলাম, 'আজই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় চাই।'

'আজকেই পাবেন ঠিক, তবে সাড়ে পাঁচটায় কি সাড়ে সাতটায় তা বলতে পারছি না—আটটার আগে দেব ঠিকই।'

'উঁহু, ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায় চাই সব কটা পোশাক।'

কাচের মতো স্বচ্ছ চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নীরবে মাথা নাড়লে হনলুলু স্যাম।

মোক্ষম দাওয়াই দিলাম এবার। কড়কড়ে একটা দু-টাকার নোট কাউন্টারে রেখে বললাম, 'জলদি দেওয়ার আলাদা চার্জ—হবে না এবার?'

'হবে?' স্ফটিক-স্বচ্ছ চোখ দুটো চিকচিক করে ওর।

'শাবাশ!' অন্তরের সঙ্গেই স্যার মহাশয়ের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রশংসা করে ফেলি টাকাটা অবশ্য ডেলিভারি দেওয়ার সময়ে দিলেই চলত, তবুও ভাবলাম এ রকম পরিস্থিতিতে কর্তব্যনিষ্ঠ চীনাম্যানদের বিনাবাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করা উচিত আমার। কথায় কখনও নড়চড় হয় না ওদের, তা কে না জানে।

ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠেছিলাম সেদিন। উঠেই খুম খুম চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। পাঁচখানা ধোয়া শার্ট, আনুষঙ্গিক ট্রাউজার, নেকটাই আর একখানা মাত্র কোট—এই বিপুল পোশাক-সম্ভার নিয়ে যাব আজ সোমেশ রায়ের আধুনিক বজরায়। নাই বা রইল নতুন ডিনার-সুট—তাতে কী আসে-যায়। কবিতা তো রইলই, তার মধুমুখ, তার মৃদু হাসি, তার সুধাভরা আঁখিই রইল আমার সব গর্ব আর আনন্দের উৎসে, রইল আমার না-থাকা সম্পদ জৌলুসের পরিপূরক হয়ে—নাই বা থাকল সেথায় জমকালো পোশাকের চোখ-ধাঁধানো পারিপাট্য। একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মতো শুভ্রসুন্দর কবিতার কথা ভাবতেই—মনটা বড় খুশি-খুশি হয়ে উঠল। হঠাৎ রবি ঠাকুরকে মনে পড়ে গেল। তাই 'আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল' আবৃত্তি করতে করতে ঢুকলাম অফিসে।

আর তৎক্ষণাৎ আমার দ্রাক্ষাকুঞ্জবনের সব দ্রাক্ষারসই লুটেপুটে নিলেন শেখর শর্মা—আমাকে অত্যন্ত কঠিন একটা কাজে পাঠিয়ে। সারাদিন ওই এক কাজ নিয়েই ছুটোছুটি করে কাটল—খাওয়ার সময় পেলাম না। কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে পাঁচটার সময় সুটকেসটা আঁকড়ে সবে বন্দুকের গুলির মতো বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে সামনে দরজার পথ আটকালেন শেখর শর্মা।

বললেন, 'শুভেচ্ছা রইল ছুটি কাটানোর। এই মাত্র খবর পেলাম একজন বেজায়-সম্মানিত ভদ্রলোকও সঙ্গদান করবেন তোমাদের।'

'ডিউক অব এডিনবরা?'

'হুম! সোমনাথ মুখার্জি।'

'অ্যাঁ! সোমনাথ মুখার্জি?'

'হ্যাঁ, সোমনাথ মুখার্জি তোমার-আমার একমাত্র অন্নদাতা প্রভু আর এ পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সোমনাথ মুখার্জি। চোখের পাতা একটুও না কাঁপিয়ে যিনি অঙ্গুলি হেলনে আমাদের প্রত্যেককেই পথে বসাতে পারেন, অথচ যাঁর অসীম অনুগ্রহে এখনও দিব্যি বহাল তবিয়তেই রয়েছি আমরা। কাজেই, বুঝতেই পারছ কত বড় সুযোগ তুমি পাচ্ছ। এ মহাসুযোগে তাঁদের অশেষ কবিতা আবৃত্তি করে নষ্ট না করে কাজে লাগিও, তাঁকে সম্মান দিও, তাঁর স্নেহ অর্জনের চেষ্টার কসুর কোরো না। তারপর যখন অতিরিক্ত কাজের চাপে চোখ বুজব আমি—হৃদ্রোগ থেকেই তা ঘটতে পারে—তখন আমার এ-কাজের দায়িত্ব হয়তো তোমাকেই দিতে পারেন উনি।'

'কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা করার কোনও সদিচ্ছাই নেই আমার।' মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি আমি।

'ননসেন্স! অন্ততপক্ষে তিনশোবার তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছি আমি, আর প্রতিবারই পরিতাপের অন্ত ছিল না আমার। যাকগে, না গেলেই তাহলে ভালো। করাতে

হু' কোনওরকমে ঠান্ডা লাগিয়ে হুপিংকাফ তৈরি করে ফেলো, না হয় ডিসেন্ট্রি—তাহলেই তোমার জায়গায় আর একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'রাবিশ!'

'আজ বেস্পতিবার।'

'তাতে কী?'

'বেস্পতিবারের বারবেলা।'

'হুঁ'!

'তার ওপর তেরো তারিখ। কী বুঝলে?'

'কিস্সু না। চললাম।'

'যত্তো সব—'

বাকি কথাগুলো আর কানে ঢুকল না—ততক্ষণে আমি অফিস ফেরতা পথচারীদের মধ্য দিয়ে উল্কাবেগে ধেয়ে চলেছি ইনসুলু স্যামের দর্শন অভিলাষে।

সবে অফিস ভেঙেছে তখন। ফুটপাতের জনস্রোত ঠেলে যখন বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম, তখন বিরাট কিউ দাঁড়িয়ে গেছে শেডের তলায়। প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো সে দীর্ঘ সারি দেখে বাসে চড়ার আশা ত্যাগ করে ভিড় ঠেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চললাম ওয়ার্ডেন রোডের ইনসুলু স্যামের রেস্তোরাঁর অভিমুখে। ওখান থেকেই নিয়ে যাব আলেকজান্দ্রা ডকে। তারপর সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়ব আমি আর কবিতা। কে জানে, হয়তো এই সাগর-বিহারই আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে সূচনা করবে নতুন অধ্যায়ের।

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড দিয়ে সবে কেম্পস কর্নারে পৌঁছেছি। চার রাস্তার মোড়—তাই যানবাহন দাঁড়িয়ে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। হিউজেস রোড দিয়ে আসা অত্যন্ত মূল্যবান একটা গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তাটা পেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে আচমকা লাফিয়ে উঠল আমার হৃদযন্ত্রটি।

একেবারে কানের কাছে শুনলাম এক অতি পরিচিত মধু-কণ্ঠ: 'এই তো মৃগাঙ্ক!'

দেখি, গাড়ির জানলা দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে কবিতার হাসি-হাসি মুখটি।

আহা, সে কী দৃশ্য! কালো চোখের সে আলো দেখেই নিমেষে মুছে গেল আমার সারাদিনের ক্লান্তি। কিন্তু সে মুহূর্তে এ দৃশ্যটা না দেখলেই খুশি হতাম আরও। কিন্তু একেবারে চোখে-চোখে তাকিয়ে ফেলেছি—কাজেই না-দেখার ভান করা আর চলে না কোনওমতেই! অগত্যা একটা ট্যাক্সির পাশ দিয়ে এসে পৌঁছলাম জানলার পাশে—ও ততক্ষণে একটা দরজা খুলে ধরেছে।

মহা খুশিতে রনরনিয়ে ওঠে ওর স্বর, 'ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল! আমরাও চলেছি ডকে। উঠে পড়ো।'

উঠে পড়ো! ধোয়া পোশাক না নিয়েই! হিম-শীতল একটা স্রোত শির-শির করে নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। কী কুক্ষণেই হেঁটে এসেছিলাম। গাড়ির মধ্যে দেখলাম আরও জনতিনেক বসে। একপাশে একজন বর্ষীয়সী বিধবা ভদ্রমহিলা আর ওপাশে দুজন

পলিতকেশ পুরুষ। তাঁদের একজন যে সোমেশ রায়, তা না বলেও বুঝতে দেরি হল না আমার। আর, অপরজন সোমনাথ মুখার্জি হবে। পাশাপাশি বসে দুইজন হলকুমেরঃ যেন দুটি সজীব ব্যাঙ্ক

'কিছু মনে কোরো না,' আমতা-আমতা করি আমি, 'দারুণ জরুরি একটা কাজ সারতে হবে। পরে দেখা করবখন।'

'চলেছ কোন দিকে?' শুধোয় কবিতা

'ইয়ে—এই তো এই দিকে।'

'তবে উঠে এসো। গাড়ি ওদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

লাখ টাকা দামের গাড়িতে চড়ে হনলুলু স্যামের দোকানের সামনে যাওয়ার দৃশ্য কল্পনা করেই শিউরে উঠলাম আমি।

বললাম, 'আরে না-না, কী দরকার মিছিমিছি এদিক দিয়ে যাওয়ার। তুমি চলে যাও—একটা ট্যাক্সি নিয়ে এ খুনি আসছি আমি।'

ট্র্যাফিক পুলিশের এগোবার নির্দেশ পাওয়ায় সোমেশ রায়ের গাড়ির ঠিক পেছনের অধৈর্য ড্রাইভারটা অত্যন্ত অভদ্রভাবে হর্ন টিপতে শুরু করে দিয়েছিল।

বিপন্ন সুরে বলি আমি, 'তুমি এগোও কবি।' সাঁৎ করে একটা গাড়ি গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল সামনে।

'সামনের ওই ব্লকটায় তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব, বুঝলে?' মিষ্টি হেসে বলল। বাধ্যতা গুণটা বাস্তবিকই নেই ওর মধ্যে। তারপরেই হাত বাড়ায়, 'দাও তোমার সুটকেসটা, গাড়িতে রেখে দিচ্ছি।'

'আরে...ইয়ে...না...না।' প্রাণপণে খাঁকড়ে ধরি আমি সুটকেসটা। 'দরকার আছে যে, আমার কাছেই থাকুক না।'

মস্ত একটা লন্ড্রি-প্যাকেট নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সোমেশ রায়ের সামনে হাজির হওয়ার দৃশ্যটা কল্পনা করেই লাল হয়ে উঠি আমি। পেছনের হট্টগোল ততক্ষণে তুমুল হয়ে উঠেছে; ট্র্যাফিক কনস্টেবল নিজেও এগিয়ে এল এদিকে।

'ক্যায় ঝামেলা সাব?' মাতৃভাষা প্রয়োগ করে নীল কুর্তাপরা মহারাষ্ট্রীয়।

'যাও কবি, এগোও তুমি।' অনুনয় ফুটে ওঠে আমার কণ্ঠে।

এবারে পেয়েছি আইনের সাহায্য। তাই আর অবাধ্যতার চেষ্টা করল না ও। তাছাড়া আমার বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখেও বোধ করি দয়া হল ওর। সিটের পেছনে হেলে পড়ে কনস্টেবলের মুখের ওপরেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল ও।

'বেশি দেরি কোরো না যেন!' হাসি মুখে বলে ও।

গাড়ি ততক্ষণে স্টার্ট নিয়েছে। কবিতার কথার উত্তরস্বরূপ কোনওরকমে একটা কষ্টহাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে তুললাম আমি। তারপরেই মূল্যবান সুটকেসটা আঁকড়ে ধরে সচল গাড়ি-অরণ্যের মধ্য দিয়ে হর্নের বিকট শব্দ উপেক্ষা করে দ্রুত এগিয়ে চললাম অপর দিকের ফুটপাতে। মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে উর্দিপরা কয়েকজন ড্রাইভারের কটূক্তি শুনতে শুনতে ওপাশে পৌঁছে খেট-গতিতে এগিয়ে চললাম হনলুলু স্যামের দোকানের দিকে।

ভেতরে ঢুকেই লাল কাগজের মোড়কটা আছড়ে ফেললাম কাউন্টারের ওপর।

তারপর সুটকেস রেখে স্ট্র্যাপ খুলতে খুলতে জোর হাঁক দিলাম, 'কই হে, গেলে কোথায়? জলদি, জলদি করো—চটপট বার করো জামাপ্যান্টগুলো।'

ধীরে-সুস্থে পেছনে আলমারির ফাঁক থেকে যে মূর্তিটি বেরিয়ে এল, সে হনলুলু স্যাম নয়। বয়সের ভারে নুব্জ এক চীনা বৃদ্ধ—নাকের ডগায় দূরবীক্ষণ লেন্সের একটা ট্যারাবাঁকা চশমা। হনলুলু তাহলে দোকানে নেই—বাড়ি গেছে নিশ্চয়।

সুটকেস ততক্ষণে খোলা হয়ে গেছে। ডালাটা তুলে ধরে অধৈর্য স্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে? জলদি বার করো প্যাকেটটা।'

কিন্তু চটপট কাজ না করার মহা গুণটি বোধ হয় চীনা বুড়োর জন্মগত। তাই ধীরে-সুস্থে চশমার ধোঁয়াটে লেন্স দুটো জামার তলাকে হাতার মুছে তুলল লাল মোড়কটা। তারপর র‍্যাকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অসহায় ভঙ্গিমায়।

'প্লিজ! প্লিজ!' মিনতিতে করুণ হয়ে ওঠে আমার স্বর। 'বাড়তি টাকা দিয়েছি এ-জন্যে—হনলুলু স্যাম আমায় কথা দিয়েছে সাড়ে পাঁচটায় ডেলিভারি দেবে। দাও, দাও আমায়, দেখি—ধুত্তোর, কী যে ছাই লিখেছে, বুঝতেই পারছি না কিছু। আরে গেল যা, তুমি আবার হাঁ করে তাকিয়ে রইলে কেন—দ্যাখো না ওদিককার আলমারিতে।'

এমন ভর্ৎসনা মিশানো চোখে আমার দিকে তাকাল বৃদ্ধ, যার অর্থটা দাঁড়ায় 'শান্ত হও, শান্ত হও, এত হুটোপাটি কেন?' চশমার কাচদুটো আবার ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছিল। সেইভাবেই আবার ধীরে সুস্থে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল আলমারির সামনে। আর কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করে মুণ্ডপাত করতে লাগলাম প্রায় অন্ধ ছবিরটার। কিছুক্ষণ পরে বেশ বড় আকারের একটা প্যাকেট টেনে নিয়ে এগিয়ে এল ও। হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে সুটকেসে পুরে স্ট্র্যাপ লাগাতে লাগলাম দ্রুত হাতে। তখনও লাল মোড়কটা নাকের হাত ইঞ্চি দূরে রেখে চোখের কসরত করছিল বুড়ো চীনেটি।

বেশ কিছুক্ষণ পর বলল ও, 'থ্রি রুপিজ।'

'দারুণ সস্তা রে!' বাংলায় মন্তব্য করে চটপট বার করে দিই পাঁচ টাকার একটা নোট। তারপর ওর হাত থেকে রুপোর টাকা দুটো একরকম ছিনিয়ে নিয়ে পকেটে পুরতে-পুরতে ছুটলাম দরজার দিকে। চীনেটি ততক্ষণে জামার ঢিলে আস্তিন দিয়ে আবার চশমার কাচ মুছতে শুরু করেছে।

'জোরে হাঁটো,' প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার মতো জোরে হেঁটে যখন গোয়ালিয়র ট্যাঙ্কের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম, দেখি, ঝকঝকে গাড়িখানা পথের পাশেই দাঁড়িয়ে আমার জন্যে। উর্দিপরা ড্রাইভারের ঝকঝকে তকমা আঁটা নেপালি সহকারী বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। হাঁপাতে-হাঁপাতে পৌঁছনোমাত্র সুটকেসটা হাত থেকে টেনে নিয়ে খুলে ধরল পেছনের দরজা। ক্ষণেকের জন্য শ্বাস রুদ্ধ রেখে পরমুহূর্তেই উঠে পড়লাম ভেতরে। মাঝের কোলাপসিবল চেয়ার দুটোর একটায় বসেছিল কবিতা—অপরটা দখল করলাম আমি। ওর দিকে ফিরে বসলাম আমি—কবিতাও কাত হয়ে ফিরল আমার দিকে, তারপর শুরু হল আলাপ-পরিচয়।

'পিসিমা, ইনিই মৃগাঙ্ক, মৃগাঙ্ক রায়।' মাথা হেলিয়ে হালফ্যাশানি কায়দায় অভিবাদন জানালাম আমি। পেছনের সিটে স্থান অকুলান হওয়ার মূল কারণ বিপুলকায়া রাশভারী প্রকৃতির মহিলাটিও মাথা হেলালেন—তবে কঠোর চোখে।

'সোমনাথকাকাকে চেনো তো?' বলে চলে কবিতা, 'চিনবে বইকী, ওঁর কাগজেই তো কাজ করো তুমি।'

অগত্যা ভদ্রলোকের বরফ-ঠান্ডা মসৃণ চোখে চোখ রাখলাম আমি। সোমনাথ মুখার্জিকে দেখতে অনেকটা কুস্তিগীর পালোয়ানের মতো। তাঁর অত নামডাকের মূল কারণ অবশ্য তা নয়।

'নমস্কার স্যার' একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বলি আমি। ভদ্রলোকের চোখ দুটো যেন বরফ দিয়ে তৈরি একজোড়া ধারালো ছুরি।

'আর ইনি আমার বাবা। বাবা, ইনিই মিস্টার রায়।'

রোগা-রোগা ছোট্ট একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন সোমেশ রায়। মানুষটি সত্যিই খুব ছোটখাটো। প্রখ্যাত শিল্পপতির নাম করলেই যে-রকম ছবিটি ভেসে ওঠে চোখের সামনে, সে রকমের নয় মোটেই। ভাবলেশহীন শীর্ণ মুখ—কিন্তু চোখ দুটো বেশ স্বপ্নকরিণ। সে চোখ দেখে কিছুতেই অনুমান করা যায় না যে, কী প্রখর ব্যক্তিত্ব ঘুমিয়ে আছে তাঁর ওই শান্ত-সুন্দর মণিকার অন্তরালে। আর বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের সামান্য স্ফুরণ মাত্রই প্রতিপক্ষের অর্ধেক সাহসই যায় উবে. তার ছায়াও ছিল না তাঁর স্বপ্নাচ্ছন্ন দুই চোখে, ভাবলেশহীন প্রশান্ত মুখে। পক্ষান্তরে, পাশেই বিন্ধ্যাচলের মতো অসীম মহিলাটি তাঁর চেয়েও অনেক বেশি ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর সর্ব অবয়বে। ভদ্রমহিলা সে বিষয়ে বেশ সচেতনও বটে।

সোমেশ রায়ই প্রথম কথা বললেন, 'খুব খুশি হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করে। কবিতা তো প্রায়ই আপনার কথা বলে আমায়।'

বিগলিত সুরে বললাম, 'আপনাদের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার যা উপকার করলেন—'

'অফিসের কাজেই আসা হয়েছে নিশ্চয়?' কীরকম যেন রুক্ষ স্বরে শুধোলেন সোমনাথ মুখার্জি।

একটু থতমত খেয়ে গেলাম আমি। কিছু বলার আগেই কিন্তু সোমেশ রায় উত্তর দিলেন, 'আরে তা তো আছেই। কাজ তো আর চব্বিশ ঘণ্টা নয়। হ্যাঁ মিস্টার রায়, ওর পদ ওরফদার মানুষটা বড় চমৎকার। প্রবন্ধের বেশ কিছু খোরাক পেয়ে যাবেন ওঁর কাছে। কিন্তু কাজ নিয়ে এসেছেন বলে পার্টির আনন্দ থেকে দূরে থাকবেন, তা চলবে না—এমনকী সোমনাথ থাকলেও নয়।' বলে যুগপৎ আমার আর সোমনাথ মুখার্জির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি হাসলেন সোমেশ রায়।

প্রত্যুত্তরে আপনা হতেই একটু হাসি ফুটে উঠল আমার ঠোঁটে। মুখে বললাম, 'চেষ্টা করব স্যার।'

অস্বস্তির ভাবটা কাটিয়ে দিব্যি সহজ হয়ে উঠলাম এরপর। বাস্তবিকই, সোমেশ রায় ধনকুবের হলেও মানুষ হিসেবে অতি চমৎকার।

গাড়ি তখন গ্রান্ট রোডের মোড় ঘুরেছে। সোমেশ রায় বললেন, 'আচ্ছা, পার্টিটা খুব নীরস, নিরানন্দ হয়ে যাচ্ছে না তো? আপনি কী বলেন মিস্টার রায়?'

উত্তর দিল কবিতা, 'সে আর এমনকী নতুন ব্যাপার বাবা। তাই না পিসিমা?'

'তার শুরু তো দেখছি এখন থেকেই হল।' ফোঁস করে বলে নাসিকা কুঞ্চন করলেন

পেছনের সিটের বিন্ধ্যাচলটি।

সোমেশ রায় বললেন, 'সে যাই হোক, মিসেস প্যাটেল তো আসছেনই।'

'মিসেস প্যাটেল!' ঘন ঝোপের মতো পুরু ভুরুজোড়া ওপরে তুললেন সোমনাথ মুখার্জি।

'ভুরু দুটো যে একেবারেই ওপরে তুলে ফেললে হে!' পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললেন সোমেশ রায়। 'ভদ্রমহিলা হিসেবে মিসেস প্যাটেলের জুড়ি মেলা ভার শুনেছি, স্বচক্ষেই দেখব তা। অনেকদিন সিলোনে ছিলেন। তাই ওখানকার হালচাল সম্বন্ধে ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হওয়া দরকার। জানোই তো, নিছক ফুর্তির জন্য এবার আমি বেরোইনি না। ফিরে আসার আগে অন্তত গুরুত্বপূর্ণ দুটো প্রশ্নের উত্তর আমায় জানতে হবে। সিলোন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে মালেয় নদীতে ব্রিজ তৈরির যে কনট্রাক্টটা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে—তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কিছুই স্থির করা হল না। তোমাকে তো এ বিষয়ে আগেই একবার বলেছিলাম না? কাজটা আদৌ শুরু করব কি না সেই চিন্তাই ঘুরছে এখন মাথায়। মিসেস প্যাটেল আর ডক্টর তরফদারের সঙ্গে দু-চা'র কথা কইলেই মনস্থির করে ফেলতে পারি।'

সোমনাথ মুখার্জি বললেন, 'শুনলাম, চুনীলাল দয়াভাইও নাকি এ-ব্যাপারে উঠে-পড়ে লেগেছে? তা যদি হয়, তাহলে কিন্তু তুমি বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তোমার মনে হওয়াটা যে চিরকালই একটা অদ্ভুত ব্যাপার, তা ভালো করেই জানি। দয়াভাই যে একটা পাকা জোচ্চোর, তা কে না জানে? আমি যদি উঠে-পড়ে লাগি, তাহলে দয়াভাইয়ের ক্ষমতা নেই কনট্রাক্টটা ছিনিয়ে নেয় আমার হাত থেকে। শুনলাম, সেই কারণেই আমি কী করি-না-করি তা জানার জন্যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে বেচারা। যদি মনে করি, তাহলে ওর খেলা আমি একেবারেই মাত করে দিতে পারি।' বলে হাসলেন সোমেশ রায়। সে হাসিতে এবার আমি স্বপ্নের ছায়াও দেখলাম না। বললেন, 'যাই হোক, এখনও তো কটা দিন রয়েছে হাতে। এ মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত সময় পাচ্ছি আমি।'

'আরও একটা প্রশ্নের কথা বলছিলে না?' বলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'অ্যাসেম্বলির ইলেকশন। আমি দাঁড়াব কি না ভাবছি।'

'রাবিশ!' গরগর করে ওঠেন মিঃ মুখার্জি। 'এসব বাজে ঝামেলায় আবার মাথা গলাচ্ছ কেন?'

পিসিমা মুখ খুললেন এবার। 'আমিও তাই বলছিলাম। কী দরকার এসব বাজে ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করার?'

হাসিমুখে বললেন সোমেশ রায়, 'আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষেরই অল্পবিস্তর থাকে। এই কারণেই তো দেশমুখকে সঙ্গে নিচ্ছি আমি। আইনজ্ঞ বটে, কিন্তু রাজনীতির প্রশ্ন উঠলে ক্রেমলিন থেকে হোয়াইট হাউস পর্যন্ত সব কিছুই নখের ডগায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন।'

'দেশমুখ!' স্বরের তিক্ততা আর গোপন রাখেন না সোমনাথ মুখার্জি।

পেছনের বিন্ধ্যাচলটি সময় বুঝে আবার সরব হয়ে ওঠে। 'যত সব বাজেবাজে

লোকের ভিড়!'

আমার কিন্তু মনে হল, কথাটি বিশেষ সুরে বলে যেন একটু বিশেষ চোখেই তাকালেন আমার দিকে। মনে-মনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি আমি।

'সাধারণ পার্টির একঘেয়েমি কাটিয়ে কতটা বৈচিত্র্যের আয়োজন করেছি দেখো।' বলে চললেন সোমেশ রায়, 'আর সেইজন্যেই তো আমন্ত্রণ জানিয়েছি অলোক ঘোষকে।'

'অলোক ঘোষকে! চমৎকার! কবিতার তো খুশি হওয়া উচিত এ-খবর শুনে।' বলে আবার সরবরে চোখে পিসিমা তাকালেন আমার দিকে—এবারও সে-দৃষ্টির তাৎপর্য বড় গূঢ়।

বুঝলাম, ওঁরা ওঁর কোম্পানির অন্যতম ডাইরেক্টর অলোক ঘোষের কথা বলছেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে অলোক ঘোষ—সামাজিক প্রতিষ্ঠা তার যথেষ্ট। তার সঙ্গে কবিতার বিয়ের গুজব একাধিকবার শুনেছি শহরের অভিজাতমহলে। কবিতার দিকে আড়চোখে তাকালাম আমি—ও কিন্তু দেখি নির্বিকারভাবে তাকিয়ে রয়েছে সিধে সামনের দিকে। ওর স্নিগ্ধ সুন্দর মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই ওর মনের চিন্তাধারা।

গাড়ি তখন খিদিরপুরের সার্কেলটা ঘুরছে।

হঠাৎ কথা কইলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'সত্যিই আশ্চর্য!'

'কী আশ্চর্য?' শুধোন সোমেশ রায়।

'আশ্চর্য হচ্ছি এই জন্যে যে আজকের দিনে তুমি এত লোককে হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে বসলে কেন।'

'কেন, হয়েছে কী তাতে?'

'একে শনিবারের বারবেলা, তার ওপর ইংরেজি মাসের তেরো তারিখ।'

'বারবেলা! তেরো তারিখ! তাই তো হে, আমার তো একেবারেই খেয়াল ছিল না।'

পেছন ফিরে সোমেশ রায়ের মুখের অকস্মাৎ গাম্ভীর্য দেখে বেশ অবাক হয়ে গেলাম আমি।

মুচকি হাসলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'আমার তো মনে হয় না তোমার তা খেয়াল ছিল না। তোমার দুর্বলতা তো আমার অজানা নয়।'

'দুর্বলতা? কী সব আজেবাজে বকছ? ও-সব বাজে সংস্কার সোমেশ রায়ের নেই।' বলে একটু হাসলেন উনি। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ দুটিতে খুশির আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। 'যতক্ষণ পয়মন্ত রুপোটা পকেটে রয়েছে আমার, ওসব তুচ্ছ কারণকে না ডরালেও চলবে আমার।'

পয়মন্ত রুপো? কবিতার দিকে তাকালাম আমি।

'এই', ফিক করে হেসে ফেলে ফিসফিস করে বলে ও। 'বাবাকে যেন ও-কথাটা আর জিগ্যেস করে বোসো না। অবশ্য আমার উপস্থিতে সে দুরবস্থা তোমার হবে না ঠিকই—তবে এখন চুপ।'

আলেকজান্ড্রা ডকের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল। এখানে মস্ত বড় একটা স্টিমশিপ কোম্পানির হোমরা-চোমরা শেয়ার-হোল্ডার ছিলেন সোমেশ রায়। ভেতরে জেটির কাছে গিয়ে দেখি বেশ ঝকঝকে একটা লঞ্চ ভাসছে জলে। আরও চারজন অভ্যাগতের সঙ্গে আলাপ হল সেইখানেই। কবিতাই সে পর্বটা চটপট সেরে দিলে।

শিবেন্দ্র দেশমুখের সঙ্গে আলাপ আমার আজকের নয়। বহুবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে আমার শেখর শর্মার নির্দেশে। পুরুষের মতো নশসই চেহারা ভদ্রলোকের। কথাবার্তা কিন্তু খুব মোলায়েম।

বছর তিরিশ বয়স অলোক ঘোষের। ছিমছাম, মার্জিত চেহারা। খাস-খাস ইংরেজি বোল। পোশাক-পরিচ্ছদে কিন্তু উগ্র মার্কিনি ছাপ। মৃগাঙ্ক রায়ের সঙ্গে আলাপ করার কোনও আগ্রহই ওঁর ছিল না এবং তা গোপন করারও কোনও প্রচেষ্টা তিনি করলেন না।

বহু আয়াস সত্ত্বেও যে বয়েসে তার যৌবনের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়ে তোলা যায় না, সেই বয়েসে এসে পৌঁছেছিলেন মিসেস প্যাটেল। যৌবনকালে নিশ্চয় পরশ্রী সৌভাগ্যবতী ছিলেন ভদ্রমহিলা। এখন অবশ্য কিছু অবাঞ্ছিত মেদের আবির্ভাবে সুডৌল দেহ-রেখাগুলি লোপ পাওয়ায় সুপুষ্ট আশ্রয়গুলোও হঠাৎ ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে। তাতে কিন্তু মোটেই দমেননি তিনি। পুরোদমে কিউটেক্স-লিপস্টিক-মাস্কারা দিয়ে চেষ্টা করছেন পুরোনো অভ্যাস বজায় রাখার।

ডক্টর তারাপদ তরফদারকে দেখে কিন্তু অনেকটা শান্তি পেল আমার চোখ দুটো। চেহারা বটে তাঁর! লম্বায় সাড়ে ছ'ফুটের কম তো নয়ই—সেই সঙ্গে যেমনি চওড়া তাঁর বুকের ছাতি, তেমনি সুপুষ্ট তাঁর কাঁধের মাংসপেশি। সে স্বাস্থ্য দেখে তরুণী তো দূরের কথা, অনেক পুরুষেরও মাথা ঘুরে যায়। রেশমের মতো একমাথা নরম কোঁকড়ানো চুল, রাঙা মুখ আর পরনে টুইডের মূল্যবান সুট। ভদ্রলোক কিন্তু যতবার কবিতা রায়ের দিকে হাসিমুখে তাকাচ্ছিলেন, ততবারই কী রকম যেন খচখচ করে উঠছিল আমার বুকের ভেতরটা। শুধু আমি কেন, সুপুরুষ অলোক ঘোষও বোধ হয় অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন মনে-মনে; তাই মাপাজোকা সূক্ষ্ম হাসি আর মার্জিত কথার মধ্য দিয়েও মধ্যে-মধ্যে প্রগলভ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলেন কবিতার সঙ্গে।

সাদা পোশাক পরা নেপালি পরিচারক দুজন আমাদের মালপত্র তুলছিল লঞ্চে। ওদের কাজ শেষ হলে পর অভ্যাগতরা একে-একে উঠতে শুরু করলেন। আমার ইচ্ছে ছিল কবিতার ঠিক পাশের আসনটি দখল করা। কিন্তু তারাপদ তরফদার আর অলোক ঘোষ একদিক দিয়ে আমার চেয়ে আশ্চর্য রকমের তৎপর। আমাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে এমন ঝটিতি দুজনে এগিয়ে গেলেন যে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া গত্যন্তর রইল না আমার। যাত্রারম্ভেই প্রতিযোগিতার এই নমুনা দেখে অনুমান করে নিলাম, দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে শুরু হবে আমার সংগ্রাম। করুণ নয়নে একবার তারাপদ-অলোক বেষ্টিত কবিতাকে দেখে নিয়ে বসলাম মিসেস প্যাটেলের পাশে।

ফট-ফট শব্দে জল কেটে লঞ্চটা এগিয়ে চলল 'জলপরী' লেখা সোমেশ রায়ের বিরাট স্টিম-বজরার দিকে।

বজরার একপ্রান্তে দু-পাশে ডানামেলা মস্ত বড় একটা জলপরীর হাসি-হাসি মুখের দিকে বিরস-বদনে তাকিয়ে বসেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মিসেস প্যাটেল।

'কী মজা। কতদিন যে স্টিমার-পার্টিতে আসিনি। ওঃ, সে যে কত যুগ হয়ে গেল তার হিসেব নেই!'

আশ্চর্য কী! মনে-মনেই বলি আমি। সাগর-বিহারে যাওয়ার বয়স বেশ কয়েক বছর আগেই ফেলে এসেছেন আপনি। মুখে বললাম, 'যাই বলুন, বড়লোক হওয়ার অনেক সুবিধে, তাই না?'

'সত্যি কথাই বলেছেন।' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস প্যাটেল। 'নিজের চেষ্টায় কোটিপতি হওয়ার মধ্যে যে তৃপ্তি আছে, তার তুলনা নেই। আমাকে কিন্তু আপনার সব কথাই বলতে হবে—কিছুই তো জানি না আমি।'

'আমি!' প্রমাদ গনি আমি। 'মস্ত একটা ভুল করে ফেললেন মিসেস প্যাটেল। কোটি কেন, হাজারের ঘরে যাওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই। সামান্য একজন রিপোর্টার আমি।'

'রিপোর্টার!' একটু ফিকে হয়ে আসে প্রৌঢ়ার হাসি। কিন্তু প্রশংসনীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরমুহূর্তেই আবার সুর তোলেন 'সে তো আরও চমৎকার। রিপোর্টার—তার মানে—তার মানে হাজার রকমের অভিজ্ঞতা জমিয়ে রেখেছেন আপনার ঝুলিতে। ও, ওয়াণ্ডারফুল! আমাকে কিন্তু সব বলতে হবে।'

সপ্তদশী সুলভ 'আমাকে কিন্তু সব বলতে হবে' চপল সুরের অনুরণন প্রৌঢ়ার কণ্ঠে শুনে ভেতরে-ভেতরে বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি আমি। বলি, 'নিশ্চয়। কাজের ঝামেলা না থাকলে এন্তার গল্প করা যাবে আপনার সঙ্গে, কী বলেন?'

'কাজের ঝামেলা?' পেন্সিল আঁকা ভুরু দুটো একটু ওপরে উঠে গেল।

'হ্যাঁ—মানে ডক্টর তরফদারের সঙ্গে আমায় একটু বসতে হবে বলেই আমার আগমন এখানে। ভদ্রলোক সিংহলে বেশ কিছুদিন ছিলেন তো— অভিজ্ঞতা ওঁর প্রচুর।'

বাঁকা ভুরুটা আবার নেমে এল স্বস্থানে। এবার লিপস্টিক-রঞ্জিত অধর বেঁকিয়ে হাসলেন মিসেস প্যাটেল।

'বটে! আপনি বোধ হয় জানেন না, ডক্টর তরফদার আমার বহুদিনের—ইয়ে—বন্ধু। সিংহলে থাকার সময়ে আমাদের পরিচয় হয়। ভদ্রলোক কথা বলেন সুন্দর, গল্পও জমাতে পারেন চমৎকার। তবে কী জানেন, ওঁর সব কথাই ধ্রুবসত্য বলে বিশ্বাস না করলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবেন। একটু বেশি রকমের কল্পনাপ্রবণ কিনা, তাই।'

বলে, সুর্মা-আঁকা চোখ তুলে তাকালেন অদূরে তরফদারের পানে—সে দৃষ্টিতে বন্ধুত্বের বাষ্পটুকুও দেখলাম না। তরফদার তখন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে যুগপৎ হাত আর মুখ নেড়ে কোনও গূঢ় বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন কবিতাকে।

'জলপরী'-র ডেকে ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। লঞ্চ এসে দাঁড়াতেই কেতাদুরস্ত অভিবাদন জানালে সোমেশ রায়কে। সাদা ইউনিফর্ম পরা নেপালিরা আমাদের মালপত্র তুলতে লাগল ওপরে।

সবাই উঠে আসার পর বললেন সোমেশ রায়, 'ঠিক সাড়ে সাতটার সময়ে ডিনারের আয়োজন হয়েছে। আপনাদের মালপত্র ঘরে পৌঁছে যাওয়ার পর চলে আসুন সবাই স্মোকিংরুমে—গল্প-গুজব করা যাবে। কী বলেন?'

'আর আমরা?' পেছন থেকে কবিতা বলে ওঠে, 'আমরা কি ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের হাওয়া খাব?'

'আরে-আরে, তা কেন! মেয়েরাও তো আসবে।' বলে হাসলেন সোমেশ রায়,

'আমি ভাবলাম মেয়েরা বুঝি ব্যস্ত থাকবে অন্য কিছু নিয়ে।'

আসলে, মেয়েদের কথা তিনি একেবারেই ভুলে গেছলেন। ওঁর প্রকৃতিই এইরকম। নিজে পুরুষসিংহ, তাই অন্তরে-অন্তরে পছন্দ করেন পুরুষদেরই সান্নিধ্য।

মাথায়, পিঠে, দুই হাতে বিপুলায়তন সুটকেস, কিটব্যাগ ঝুলিয়ে একজন নেপালি এসে বিনীতভাবে আহ্বান জানালে আমায়। পিছু-পিছু এগিয়ে গেলাম আমি। সঙ্গে দেখি তরফদারও এলেন। দেখেই সন্দেহ হল হয়তো-বা একই ঘর ভাগাভাগি করে থাকতে হবে দুজনকে। আর, তার পরিণাম যে কী, তা না বললেও চলে। এই পর্বত-প্রমাণ মালপত্র সমেত ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরের তিন চতুর্থাংশ দখল করে নির্বিবাদভাবে নিক্ষেপ করবেন আমায় চতুর্থ অংশটিতে।

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসার পর—নেপালিটা কিন্তু অতি কষ্টে একটু কাত হয়ে আমার সুটকেসটা নামিয়ে রেখে বাকি মালপত্র সমেত পাশের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল ভেতরের কেবিনে। তরফদারও গেলেন পেছনে। ভেতর থেকে শুনলাম নেপালি স্বর, 'আপকা কামরা।' তারপর বেরিয়ে এসে তুলে নিলে আমার সুটকেস। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। এক ঘরে একসঙ্গে থাকাটা মোটেই পছন্দ হয় না আমার।

ঠিক পরের দরজাটা খুলে ধরল নেপালিটি—সুটকেস ভেতরে রেখে জানালে ও ঘর আমার।

'বাঃ চমৎকার। সব ঘরটাই আমার তো?'

'জি হাঁ সাব। জলপরীমে ফিফটিন বেডরুম হ্যায়।'

'বহুৎ আচ্ছা। জলপরী জিন্দাবাদ।'

'বাথরুম ইধর হ্যায়।' বলে পাশের ছোট্ট দরটা খুলে ধরল সে।

ভেতরে উঁকি মেরে দেখে অবাক বনে গেলাম। মাইসোর গেস্ট হাউসের বাথরুমের মতো ঝকমক করছে ভেতরটা—নিষ্কলঙ্ক সিঙ্ক আর আয়নার ঝিলমিলে রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

হঠাৎ ও-পাশের দরজাটা খুলে গেল—তারপরই দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল তরফদারের ক্রুদ্ধ মুখ। পরক্ষণেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

'দো আদমি কা বাথরুম, সাব। আপকাও।' বলে বেচারি নিজেও যেন একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকে।

মেজাজ গরম হয়ে উঠেছিল আমার। বললাম, 'সে-কথাটা ওদিককার সাবকে আগে ভালো করে সমঝে দিয়ে এসো—নইলে ও-বাথরুমে ইহজীবনেও ঢুকছি না আমি।'

বেরিয়ে যায় নেপালি-নন্দন। পাশের কেবিনে শুনলাম ওর কণ্ঠস্বর। তারপরই বাথরুমের লকে শব্দ হল ক্লিক এবং পরক্ষণেই ছোট দরজা খুলে ফিরে এল সে ঘরে একগাল হেসে বললে, 'ঠিক হ্যায় সাব।'

'ঠিক হ্যায়। ক্যায়া নাম হ্যায় তুমহারা?'

'বাহাদুর।'

'বহুৎ অচ্ছা বাহাদুর—' বলে দু'টাকার একটা নোট তুলে দিলাম ওর হাতে। আর একটু ছড়িয়ে পড়ে বাহাদুরের হাসি।

'উঁহু, সাব দরওয়াজা বন্ধ করকে চলা যায়। আপনি এদিক দিয়ে গিয়ে—'

'ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়। ঠিক সময়ে স্নান সেরে নেব আমি, ঘাবড়াও মাত।'

নোটটা একবার উলটে পালটে দেখে নিয়ে টোকা মেরে সযত্নে পকেটে রেখে অন্তর্হিত হল বলবাহাদুর।

পোর্টহোলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। বাইরে নীল আকাশকে অস্পষ্ট করে ছায়া-ধূসর গোধূলি নেমেছিল বোম্বাই নগরীর ওপর— প্রাসাদ শীর্ষ বুকে নিয়ে যেন সমস্ত পাষাণ-পুরীটাই দুলছিল আরব সাগরের নীল কোলে। ভাবলাম, এই তো জীবন। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ, নিরঙ্কুশ।

ঘরের মধ্যে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পা বাড়ালাম বাইরে।

ওপরের ডেকেই মুখোমুখি হয়ে গেল সোমেশ রায়ের সঙ্গে। আমাকে দেখেই সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানালেন উনি।

'আসুন, আসুন, চলুন সবাই মিলে স্মোকিংরুমে, গল্প-গুজব করা যাবে।'

আগে থেকেই স্মোকিংরুমে এসে বসেছিলেন সোমনাথ মুখার্জি। শুধু বসেছিলেন না, ঊর্ধ্বমুখ হয়ে 'নোটিলস' আকারের একটা চুরুট থেকে সশব্দে এবং সবেগে ধূম্রোদ্গীরণ করছিলেন।

আমরা ঢুকতেই শুধোলেন উনি, 'কারেন্ট ম্যাগাজিনের প্যাকেটটা এনেছ, সোমেশ?'

'বলা বাহুল্য। কিন্তু এসেছ দুদিন সমুদ্রের হাওয়া খেতে, এখানে ম্যাগাজিন পড়ার কী দরকারটা শুনি?' বলেন সোমেশ রায়।

'ও তুমি বুঝবে না। কারবার তো করো লোহা-লক্কড় নিয়ে—এসব ব্যাপারের কী বুঝবে হে?

'শোনো কথা। আরে, এই তো সাংবাদিক ভায়া এসেছেন, ইনিও কী সঙ্গে ম্যাগাজিন এনেছেন বলতে চাও?'

'আনা উচিত ছিল।' গম্ভীর স্বরে বলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'ইয়ে...মানে—' গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে বলি আমি, 'এত তাড়াতাড়ি এলাম যে জামাকাপড় গুছোবারই সময় পেলাম না। তা না হলে—'

দেশমুখ ঢুকলেন ঘরে।

'মিস্টার রায়, স্টিমার-পার্টির নাম করে এ যে একেবারে জাহাজে এনে ফেললেন দেখছি।'

'জাহাজ আর কোথায় বলুন।' খুশি-খুশি স্বরে বলেন সোমেশ রায়, 'দেখতে-শুনতে মোটামুটি মন্দ নয়—এই যা।'

'মন্দ নয়। এমন সুন্দরভাবে সাজানো, এত বড় বজরা তো আমি জীবনে দেখিইনি, তার ওপর—'

'আপনার জাহাজি কথা এখন থাকুক মিস্টার দেশমুখ।' বাধা দিয়ে বললেন সোমনাথ মুখার্জি। 'সোমেশের মাথায় একটা উদ্ভট-খেয়াল ঢুকেছে। অ্যাসেম্বলির ইলেকশনে নামবার বদ মতলব কে যে ওর মাথায় ঢুকিয়েছে জানি না, কিন্তু ওর যে মুখে চুনকালি মাখাই সার হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই আমার।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' জবাব দিলেন দেশমুখ, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাফল্যের খোলো আনা সম্ভাবনাই রয়েছে ওঁর। আপনি নেমে পড়ুন মিস্টার, তারপর আমরা তো রইলামই।'

স্মিত মুখে বললেন সোমেশ রায়, 'এখনও তো পাকাপাকিভাবে কিছুই ভেবে উঠিনি। পরে এ-প্রসঙ্গে আরও কথাবার্তা আছে। আরে, ডক্টর তরফদার যে, আসুন, আসুন। তারপর বলুন, ঘর কী রকম পেলেন? মনের মতো হয়েছে তো?'

'ওয়ান্ডারফুল, স্টিম-এঞ্জিনে চলে, অথচ ভেতরে-বাইরে জমিদারি বজরার কায়দায় সাজানো এ রকম জলযানে তো মশায় আমার আগমন এই প্রথম। আর এ জন্যে যে আপনাকে কী ভাষায় ধন্যবাদ দেব, তা ভেবে পাচ্ছি না, মিস্টার রায়।'

'আপনাকে কিন্তু এখানে আমন্ত্রণ জানানোর মূলে আমার উদ্দেশ্য আছে প্রচুর। এই যেমন ধরুন না কেন, সিংহলে একটা বড় রকমের কাজে হাত দেওয়ার ইচ্ছে আছে। সে বিষয়ে আপনারই পরামর্শ দারুণ প্রয়োজন। তাছাড়া—'

'সিংহল সম্বন্ধে যা কিছু জানি, তা যদি আপনার কোনও কাজে লাগে, তাহলে সত্যিই খুব খুশি হব আমি। অবশ্য আমার পরামর্শ কতটা কার্যকরী হবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে যথেষ্ট। আপনি ব্রিজ কনট্রাক্টের কথা বলছেন, না?'

'ধরেছেন ঠিক। খুব সিরিয়াসলি ভাবছি ব্যাপারটা।'

'কাজটা কিন্তু বেশ ঝুঁকির। কাজে নামার আগে অনেক কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করার দরকার। কিন্তু তাতেও এর রিস্ক কমবে বলে মনে হয় না আমার।'

'আপনার সঙ্গে আমিও একমত ডক্টর।' বললেন অলোক ঘোষ। সবে ভেতরে এসে একটা কাউচ দখল করেছিলেন উনি।

'কিন্তু জানেনই তো ঝুঁকি আমি ভালোবাসি।' স্মিত মুখে বললেন সোমেশ রায়।

'তা জানি। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে তো।' একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন অলোক ঘোষ, 'আপনি যাই বলুন কাকাবাবু, এ ব্যাপারে কিছুতেই আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারব না।'

'বার্মার লাইট হাউসের ব্যাপারেও হওনি।'

'সেক্ষেত্রে ভুল হতে পারে—কিন্তু এবার আর নয়। আবার বলছি আমি, এ ব্যাপারে নাক না গলানোই মঙ্গল। আপনি কী বলেন ডক্টর?'

সিগারেটের জ্বলন্ত প্রান্তটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়েছিলেন তরফদার। বললেন, 'এ কনট্রাক্টে টাকা ঢালা মানেই তিন টেক্কার জুয়া খেলা। তিনটে টেক্কা পড়লেই লক্ষপতি—না পড়লেই ফকির। স্রেফ লাক—আর কিস্সু না।'

'লাক।' মৃদু হাসি ফুটে ওঠে সোমেশ রায়ের ঠোঁটের কোণে। 'লাক! আর এই একটিমাত্র শব্দকেই সম্বল করে রায় কনস্ট্রাকশন কোম্পানির এই জয়যাত্রা। সাঁইত্রিশ বছরেরও ওপর হল—তিন টেক্কা শুধু ঘুরে-ফিরে পড়ছে আমার দিকেই। লাক! কী বলেন? জীবনের দীর্ঘ সাঁইত্রিশটি বছর যে শুধু একটা লাকি পিসকে নিয়েই জীবন-যুদ্ধে জিতে এল, তার কী কখনও লাক-এর অভাব হয়?' বলে ঘড়ির পকেট থেকে বার করলেন চকচকে একটা রুপোর টাকা।

অলোক ঘোষ আর সোমনাথ মুখার্জি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন অন্য দিকে। অপর তিনজন কিন্তু সাগ্রহে তাকিয়ে রইলেন মুদ্রাটির দিকে।

সস্নেহে টাকাটির দিকে তাকিয়েছিলেন সোমেশ রায়। ক্ষণেক পরে মৃদু স্বরে বললেন, 'আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে রোজগার করেছিলাম টাকাটা—সেই আমার প্রথম উপার্জন। তখন আমার বয়স বছর এগারো হবে। বাবা ছিলেন রাজমিস্ত্রি। মাউন্ট মেরির ওপর মস্ত বড় একটা প্রাসাদ তৈরি হচ্ছিল। উনি সেখানেই কাজ করছিলেন। নিচ থেকে ইট আর টুকরো-টুকরো পাথর বয়ে আনার জন্যে একজন ছোকরার দরকার হওয়ায় বাবা আমায় কাজে লাগিয়ে দিলেন। পাহাড় ভেঙে ভেঙে ইট বয়েছিলাম ওই অল্প বয়সেই। মাথায় বোঝা চাপিয়ে ওপরে ওঠার সময়ে যে কী কষ্ট হত, তা বোঝাতে পারব না কিছুতেই। ঘাড় টনটন করত, শিরদাঁড়াটা যেন ভেঙে পড়তে চাইত—দরদর ঘামের ধারায় ভিজে উঠত সর্বাঙ্গ। এইভাবে কাজ করলাম ক'দিন। তারপর পেলাম এই টাকাটা। সযত্নে তা বুক-পকেটে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম বাবার সঙ্গে। পথে কত আলো-ঝলমল রঙচঙে লোভনীয় জিনিস সাজানো দোকান হাতছানি দিয়ে প্রলুব্ধ করে তুললে আমায়। বাবাও জিগ্যেস করলেন, 'কী করবি রে টাকাটা নিয়ে?' বললাম, 'খরচ করব না বাবা, আমার কাছেই চিরকাল থাকুক এটা।' আছেও। তারপর সাঁইত্রিশ বছর কেটে গেছে, সঙ্গে-সঙ্গে ফিরেছে টাকাটা। জীবনের কত অবিস্মরণীয় মুহূর্তে এই টাকার সান্নিধ্য আমায় শান্তি দিয়েছে, এনেছে সাফল্য। একে সঙ্গে রেখে যে আত্মবিশ্বাস, মনোবল পেয়ে এসেছি তার তুলনা নেই। ১৯১০ সালে কলকাতার টাঁকশাল থেকে পিঠে-বুকে ছাপ নিয়ে পথে বেরিয়েছিল ছোট্ট এই রুপোর টুকরোটি। কিন্তু ওর ক্ষমতা অসীম, অপরিমেয়, অবিশ্বাস্য। আমার জীবন তার প্রমাণ।'

স্বপ্নালু চোখে টাকাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ সোমেশ রায়। সাঁইত্রিশ বছরের একমাত্র সঙ্গী; রুক্ষ, ধূসর জীবনযাত্রার মূক সাক্ষী; বিপদে শক্তি, সাহস আর আত্মবিশ্বাসের একমাত্র উৎস। ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখচ্ছবি আঁকা অতি সামান্যদর্শন ছোট্ট একটি রুপোর টাকা।

তরফদার এগিয়ে এসেছিলেন টাকাটা হাতে নেওয়ার জন্যে, কিন্তু চকিতে হাত টেনে নিয়ে সোমেশ রায় তা রেখে দিলেন ঘড়ির পকেটে।

বললেন, 'আজও যে কোনও সঙ্কুল পরিস্থিতিতে এর সাহচর্য আর সান্নিধ্য আমাকে শুধু সাফল্যের পথেই নিয়ে চলেছে।'

'রাবিশ!' মন্তব্য করলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'হতে পারে। কিন্তু শুনেছি চুনীলাল দয়াভাইয়ের অফিসে নাকি পাঁচ হাজার টাকার একটা অফার আছে সামান্য এই রুপোর টাকাটার জন্যে। রবিশ, কী বলো, সোম?'

'চুনীলাল দয়াভাই ভালোভাবেই জানে তোমার দুর্বলতা। তোমার মনের ওপর টাকা হারানোর প্রতিক্রিয়া যে কী নিদারুণ, তা তো ওদের অজানা নয়। আর সেই কারণেই পাঁচ হাজার কেন, ওর দ্বিগুণ টাকা দিতেও পেছপা হবে না ওরা।'

'যথাসর্বস্ব দিলেও নাকি পিস্-এর ধারে-কাছে ঘেঁষার সাধ্য ওদের হবে না। যাক, চা এসে গেছে। আসুন, এক-একটা কাপ তুলে নেওয়া যাক।'

কাপে ঠোঁট ঠেকাবার আগে লক্ষ করলাম, উপস্থিত প্রত্যেকেরই দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে ঘড়ির পকেটের ওপর।

সাতটার সময়ে ডিনারের জন্য সাজগোজ করার উদ্দেশে রওনা হলাম ঘরের দিকে। সিঁড়ির গোড়াতেই দেখা হয়ে গেল কবিতার সঙ্গে। গাঢ় সবুজ রঙের একটা ভেলভেটের

ব্লাউজের ওপর উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা শাড়ি জড়িয়ে ধরেছে ওর শ্রীঅঙ্গ। আহ, সে বরতনু দেখে নিমেষে যেন স্নিগ্ধ হয়ে গেল আমার সর্ব অঙ্গ।

আমার মুগ্ধ রসনা তৎপর হওয়ার আগেই কলকলিয়ে উঠল কবিতা, 'কীরকম আছেন বলো তো তোমাদের? কারও আর পাত্তা নেই। কখন থেকে একজন দোসর খুঁজছি—একলা কি আর সূর্যাস্ত দেখতে ভালোলাগে?'

'খাঁটি কথাই বলেছ। আগে থেকেই দরখাস্ত দিয়ে রাখছি—জায়গাটা যেন আর কেউ বেদখল না করে। কবি, আজকের এ পার্টিতে আমাকে এনে যা উপকার তুমি করলে, কোনওদিনই তা শুধতে পারব না।'

'তুমি খুশি হয়েছ তো?'

'শুধু খুশি! এরকম দুর্বল বিশেষণ ব্যবহার করছ কবি?'

'আমি জানতাম তুমি খুশি হবে। আমোদ-প্রমোদের হরেকরকম আয়োজন আছে জলপরীতে। বিস্তর খরচ করে বাবা তৈরি করেছিলেন শুধু এই কারণেই।'

'বজরার কথা মোটেই বলছি না আমি। একটা ডিঙিনৌকোতেও যদি বেরোতাম তুমি আর আমি—আনন্দ আমার একতিলও কম হতো না। জানোই তো—'

সোমনাথ মুখার্জি আর অলোক ঘোষ পিছনে এসে পড়েছিলেন।

'কী মুশকিল!' চট করে সুর পালটে নেয় কবিতা, 'এতক্ষণ ধরে স্মোকিং রুমে কী করছিলেন বলুন তো? বাবা রুপোর টাকার কাহিনি শোনাচ্ছিলেন নিশ্চয়?'

'তা আর বলতে!' বললেন মিঃ মুখার্জি।

বললাম, 'আমি কিন্তু গল্পটা শুনে খুব খুশি হলাম। ওঁর মনের গঠনের নতুন একটা পরিচয় পেলাম গল্পটার মধ্যে। ইট-পাথরের বোঝা মাথায় নিয়ে চড়াই বেয়ে ওঠার সে দৃশ্য—'

'বেচারা!' স্মিত মুখে বলল কবিতা, 'খারাপ লাগার মতো গল্প তো নয় ওটা। একবার শুনলেই ভালো লাগে। কিন্তু বারবার ওই একই কাহিনি যদি তোমার কানের কাছে দিবানিশি শোনানো হয়, তাহলে তোমার অবস্থাটা কীরকম দাঁড়ায় ভাব তো? বিশ বছর ধরে একই কাহিনির পুনরাবৃত্তি কি খুব চমৎকার লাগে শুনতে? মাঝে-মাঝে তাই তো ভাবি, ভগবান, দাও না কেন টাকাটা হারিয়ে!'

'আমিও,' সায় দেন অলোক ঘোষ, 'বিশেষ করে সিংহল-গভর্নমেন্টের ব্রিজ কনট্রাক্ট নেওয়ার মতো দুঃসাহস যখন তিনি দেখান, তখন ভাবি, চুলোয় যাক ওই চাঁদির চাকতিটা।'

'তবেই হয়েছে,' ছোট-ছোট চোখ নাচিয়ে বলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'সোমেশ তাহলে হার্টফেল করবে।'

'তা যা বলেছেন,' সায় দেন অলোক ঘোষ। তারপর যা বললেন, তা আর কানে ঢুকল না আমার। উর্ধ্বশ্বাসে কেবিনের দিকে যেতে-যেতে আমি তখন কল্পনার চোখে দেখছি কবিতার পাশে সুট পরে দাঁড়িয়ে সাগরের বুকে সূর্যাস্তের রঙিন দৃশ্য।

আমার অনেক আগেই স্মোকিংরুম থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন তরফদার। করিডর দিয়ে যেতে-যেতে শুনলাম কেবিনের মধ্যে উচ্চগ্রামে স্বর চড়িয়ে তাঁর সঙ্গীত-সাধনা।

শুনে খুশি হলাম। কিন্তু নিজের কেবিনে ফিরে বাথরুমের দরজা খুলতে গিয়ে দেখি, তা ভেতর থেকে বন্ধ। খটাখট শব্দ-তরঙ্গ তুললাম আর আদ্য-শ্রাদ্ধ করতে লাগলাম তরফদারের। আর পাঁচজনের সুবিধে-অসুবিধের কথা মোটেই ভাবেন না, কীরকম ভদ্রলোক ইনি?

উত্তর সঙ্গে-সঙ্গেই পেলাম। ভাবেন না সত্যিই। ওঁর এক ঝলক রুক্ষ দৃষ্টিই বলেলে তা।

নিষ্ফল রাগে ফুলতে-ফুলতে পেছন ফিরেছি, এমন সময়ে ঘরে ঢুকল বলবাহাদুর।

ঢুকেই এক লম্বা সেলাম ঠুকে বললে, 'বহুৎ দেরি হো গায়া সাব। আসুন, আপনাকে ডিনার-সুট পরিয়ে দিই।' বলে সুটকেস খুলে বার করল একমাত্র কোটটা।

জীবনে ডিনার-সুট পরার জন্য ভ্যালের সাহায্য নিইনি—নেওয়ার সৌভাগ্যই হয়নি। বনেদি বংশের মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের ছেলে আমি—সাহেব-ঘেঁষা আভিজাত্যের স্বাদ বলতে গেলে এই প্রথম নিচ্ছি। বলবাহাদুরের কথায় তাই যেন কানে সুধাবর্ষণ হল। পরক্ষণেই মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে উঠল তরফদারের স্বার্থপরতা মনে পড়তে।

বললাম, 'বাপু হে, কোট এখন থাক। আগে গিয়ে ওপাশের লোককে বাথরুম থেকে চটপট বার করে দাও দিকি— তাহলেই বুঝব তোমার কেরামতি।'

খুবই স্মার্ট বলতে হবে বলবাহাদুরকে। মুখের কথা খসতে-না খসতেই উধাও হল সে বাইরে। পরমুহূর্তেই বাথরুমে শুনলাম কথা কাটাকাটির শব্দ। তারপরেই কড়াং করে বন্ধ হল বাথরুমের ওপাশের দরজা আর চকিতে ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হল বলবাহাদুর।

সাঁ করে ওর পাশ দিয়ে বাথরুমে ঢুকে সজোরে কড়াং করে টেনে দিলাম ওপাশের লকটা। শব্দটা যতটা জোরে হলে আমার মনোভাবটা পুরোপুরি প্রকাশ পেত, ততটা জোরে না হওয়ায় একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলাম যদিও।

ফিরে এসে পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললাম, 'শাবাশ বাহাদুর, কিন্তু আজ আর তোমায় কোনও কষ্ট দেব না। ভ্যালের কাজটা আর-একদিন তোমার কাছে শিখে নেব'খন, কী বলো?'

'দরকার হলেই কলিংবেল টিপবেন,' বলে অন্তর্হিত হল বাহাদুর।

ক্ষিপ্র হাতে শার্ট খুলতে শুরু করলাম আমি। সূর্যাস্ত যদি দেখতেই হয়, আর কয়েক মিনিটের জন্যও যদি কবিতাকে নিরালায় পেতে চাই, তাহলে আর একটা মুহূর্তও নষ্ট করা চলে না। ভোরবেলা উঠে বিশ মিনিটের মধ্যে স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, পোশাক পরে অফিস যাওয়ার যে রেকর্ড আমার ছিল—তাও আজ ভাঙবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলাম আমি।

দাড়িটা নিখুঁতভাবে কামানো হল কি না হাত বুলিয়ে দেখছি, এমন সময়ে আবার দরজার নবটা বাজাতে শুরু করলেন তরফদার। বহুক্ষণ ধরে বেশ ধৈর্যের সঙ্গে খটাখট-সঙ্গীত শোনালেন তিনি—আর ফটকিরি ঘষতে-ঘষতে তন্ময় হয়ে উপভোগ করতে লাগলাম সে সুর-লহরী।

'যতই লম্ফ-ঝম্ফ করুন না কেন—দরজা আর খুলছি না।' বিড়-বিড় করে বলি আমি।

'ধুত্তোর।' তারপরেই শুরু হল মন-সঙ্গীত।

ও-পাশের লক যেমন, তেমনি রেখে চটপট বেরিয়ে এলাম বাথরুম থেকে। বার করলাম হীরের বোতামগুলো। পুরোনো আমলের যদিও, তবুও মূল্যবান সন্দেহ নেই। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর বোতাম ক'টা আমার হাতেই তুলে দিয়েছিল ঠাকুমা। আজকের এই অভিজাত-মহলে সে বোতাম যে এমনভাবে কাজে লেগে যাবে, তা তো ভাবিনি।

লঘু সুরে শিস দিতে-দিতে লন্ড্রির বিরাট প্যাকেটটা খুলতে লাগলাম। হনলুলু সাম জিন্দাবাদ—শেষ পর্যন্ত শপথ সে রেখেছে। যেদিন দেওয়া, সেদিনই ধোওয়া—এ বিজ্ঞাপনের যথার্থ হাতেনাতে প্রমাণ করে দিয়েছে স্যামমশায়। বাস্তবিকই চীনাম্যানদের গুণের অবধি নেই। দেখতে এমন বেঁটেখাটো হলেও যে বিদ্যুৎশক্তি লুকিয়ে আছে ওদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, তা কি আর বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায়? না, বোঝা যায় পেত্তাচেরা চোখের কুতকুতে চাহনি দেখে ওদের অভ্রভেদী সততা? দারুণ বিশ্বাসযোগ্য ওরা—যা বলবে তা করবেই। আঙুলের টান দিয়ে সুতোটা ছিঁড়ে ফেললাম, তারপর সন্তর্পণে খুললাম প্যাকিং পেপারটা।

আর দেখলাম, প্রথম স্তরেই রয়েছে টকটকে লাল-সাদা ডোরাকাটা একটা ম্যানিলা।

জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তগুলিতে কেন যে অতি সহজ জিনিসও বুঝতে এত দেরি লাগে, তা ভেবে অবাক হয়ে যাই। বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে বসে থেকেও বুঝলাম না আমার ব্যক্তিগত পোশাকের সারিতে এ বিচিত্র বস্তুটার প্রবেশের স্পর্ধা হল কেমন করে। তারপরই একটানে ম্যানিলাটা নিক্ষেপ করার পর এমন গাঢ় নীল রঙের একটা শার্টের সম্মুখীন হলাম—যা জীবনে দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি। এরপর যেন কুচকাওয়াজ করে পর-পর বেরিয়ে এল সবুজ পুলওভার, ময়লা একটা অন্তর্বাস, একজোড়া বেতার ঝলমলে নাইলন মোজা, গোটা কয়েক পশুপাখি আঁকা নেকটাই—ব্যস! আর কোনও শার্টের চিহ্নই দেখলাম না।

অবশ হয়ে বসে পড়লাম মেঝের ওপর।

এ লন্ড্রি আমার নয়।

এই সামান্য ব্যাপারটা এত দেরিতে মাথায় এলেও এর পরই অতি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠল চিন্তাশক্তি। ঢেউ-উত্তাল দরিয়ায় আজ আমি বড় নিঃসঙ্গ—বড় একলা। সঙ্গে শুধু একটি সুটকেস—সে সুটকেসে সবই আছে, নেই শুধু—ডিনার টেবিলে বসার উপযুক্ত অন্তত একটা সাদা শার্ট। রঙচঙে ম্যানিলা আর তার সহোদরদের শ্রীঅঙ্গে চাপিয়ে ডাইনিং হলে ঢুকেছি—এ-কথা কল্পনা করতেই শিউরে উঠলাম আমি। অথচ আর মিনিট পনেরো পরেই পড়বে খাওয়ার ঘন্টা। টেবিলে উপস্থিত হবেন আমার দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী—দুজনেই সঙ্গে এনেছেন দুটি সংক্ষিপ্ত বস্ত্রশালা।

চোখ ফেটে বুঝি-বা জল গড়িয়ে পড়ে এবার। ভেবেছিলাম, এই সাগর-বিহারকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে জয় করব কবিতা রায়ের অভিভাবকদের চিত্ত—এমন ছাপ ফেলব তাঁদের মনে যে আমার বরনারী আমারই থেকে যাবে জীবনের শেষ সন্ধ্যা পর্যন্ত। কিন্তু সাগর-যাত্রার প্রথম সন্ধ্যায় এ কী দুর্দৈব? সাদা শার্টবিহীন মৃগাঙ্ক রায়ের ক্ষমতা কোথায় প্রতিপক্ষবাহিনীর বিদ্রূপ হাসিকে উপেক্ষা করার? প্রতীচ্য-রীতি-অনুরাগী সোমেশ রায়ের বিরাগ দৃষ্টির সামনে সাধ্য কি তাঁর স্নেহ অর্জন করার?

অসহায় অবস্থায় আত্মসমর্পণ করলাম দুঃখে ক্ষোভের কবলে। প্রায়-অন্ধ চীনে স্থাবরটাই আমার এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। পেতাম যদি বুড়োকে হাতের কাছে— অন্ধত্ব তার ঘুচিয়ে দিতাম ইহজন্মের মতো।

মূর্খ! অসতর্ক মুহূর্তে এমন একটা সাংঘাতিক ভুল সে করে বসল, যার ফলে বহু বছর ধরে বহু পরিশ্রমে অর্জিত চীনাদের সুনাম নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল জগৎবাসীর কাছে। শুধু যে দুর্নামই কুড়োলে তা নয়, ও জাতটারও অবলুপ্তির সূচনা এঁকে দিলে ওই নিরেট চীনে বুড়োটা! কেননা, পৃথিবী চীনে শূন্য করার কাজ শুরু করব আমিই স্বয়ং—আর তা শুরু হবে ইনলুং স্যামের দোকানঘর থেকেই।

কিন্তু হু-হু করে সময় বয়ে যাচ্ছে। প্রবীণ এক চীনেম্যানের কবর রচনার পরিকল্পনায় সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না মোটেই। কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু করি কী? আবহাওয়া তো দেখছি চমৎকার—শুধু যা জলপরীই এদিকে-ওদিকে সামান্য হেলে-দুলে ভেসে চলেছে। সমুদ্র-পীড়ার ছল করে বার্থ আশ্রয় করলে কেমন হয়? কিন্তু তাহলে তো কবিতাকে আবার সঙ্গ দিতে হবে তরফদার-অলোক ঘোষের যুগ্ম দাঁড়ায়। উঁহু, তা হবে না। না, শার্ট একটা চাই-ই। যেভাবেই হোক, যেমন করেই হোক, চুরি করে হোক, ডাকাতি করে হোক, শার্ট একটা জোগাড় করতেই হবে আমায়।

জলপরীতে সমাগত অভ্যাগতদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে যিনি এই সঙ্কট মুহূর্তে আমায় কিছু সাহায্য করতে পারেন? দেশমুখ অবশ্য পারেন কিন্তু দেশমুখের একটা শার্টে অনায়াসে সেঁধিয়ে যাবে দু-দুটো দুপাঞ্চ রায়। কিন্তু অপর অভ্যাগতদের কাছেও তো আমার এ দুরবস্থার কথা বলা সম্ভব নয় কিছুতেই। অবশ্য কবিতাকে বলা চলতে পারে, কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা তো হবে না। তাকে বললে সহানুভূতি পাওয়া যাবে প্রচুর—কিন্তু শার্ট নয়। তাহলে? তাহলে বাকি থাকে শুধু বলবাহাদুর। দু-টাকার কড়কড়ে নোট যখন দিয়েছি ওকে, তখন প্রতিদান পাব নিশ্চয়।

ঘণ্টা বাজালাম অন্তর্বাস পরে নিজে-নিজেই এসে পড়ল নেপালি-নন্দন। ভেবে দেখলাম, এ রকম পরিস্থিতিতে অকপট সরলতাই হল শ্রেষ্ঠ পন্থা।

বললাম, 'বাহাদুর, সর্বনাশ হয়ে গেছে।' লাল, নীল, সবুজ রঙের বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়ে বলি, 'চীনে ব্যাটা আমার জামা-কাপড় সব পাল্টে দিয়েছে। সাদা শার্ট একটিও নেই।'

'চীনেরা লোক খুব খারাপ!' মন্তব্য প্রকাশ করে বলবাহাদুর।

'নিঃসন্দেহে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে পরে কথা বলা যাবে'খন। কিন্তু আপাতত, বাহাদুর, কী পরে ডিনারে যাই বলো তো? সাদা শার্ট হবে নাকি দু-একটা?'

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বলবাহাদুর। ওর মুখভাব দেখেই বুঝলাম, 'সাহেবের পরার উপযুক্ত স্নো-হোয়াইট শার্ট রাখার স্পর্ধা সে রাখে না। ইচ্ছে হল একটা একটা করে মাথার চুলগুলো সব টেনে ছিঁড়ে ফেলি, আর না হয়, ডাক ছেড়ে কাঁদি কিছুক্ষণ। ধবল-ধবল কামিজ পরে ডিনার খাওয়ার রেওয়াজ আমার ঊর্ধ্বতন কোনও পুরুষের কখনও ছিল না—আর এখনও সে ঐতিহ্য ভঙ্গ করার কোনও সদিচ্ছাই আমার নেই। কিন্তু কবিতা তা জানে বলেই আগে থেকেই একাধিকবার আমায় মনে করিয়ে দিয়েছে

জন্মাবধি বোম্বাই শহরে মানুষ বৃদ্ধ সোমেশ রায়ের প্রত্যাশা-প্রীতি আর তাঁর উগ্র সাহেবিয়ানা। গণ্যমান্য অভ্যাগতদের সামনে ডিনার টেবিলে সাদা শার্ট না পরে গেলে তাঁর মনে কতখানি বিরাগ বিতৃষ্ণা সঞ্চারিত হবে, তা ভেবে চিন্তিত হলাম না মোটেই; কিন্তু তার ফলে কবিতারাণীর আশা যে ইহজন্মের মতো ত্যাগ করতে হবে, তা ভাবতেই হৃদকম্প উপস্থিত হল আমার।

আমার শুকনো মুখ আর সজল চোখ দেখে বুঝি বলবাহাদুরের মনেও করুণার উদ্রেক হল। নিজে থেকেই 'জরুর কোশিশ করনা পড়েগা সাব' বলে উধাও হল সে।

মনে হল, শার্ট তো নয়, যেন আমেরিকা আবিষ্কার করতে বেরোল সে। ধরমর অনর্থক দাপাদাপি না করে পোশাক-পরিচ্ছদ যতটা সম্ভব এগিয়ে রাখার উদ্দেশেই আগে জুতো মোজা পরে ফেললাম। কিন্তু শার্ট? রামধনু-রঙিন মার্কিনী পরে ডিনার টেবিলে অনুকম্পা-দৃষ্টির সামনে উপস্থিত হওয়ার চাইতে বিরহী-যক্ষের মতো শার্ট বিরহে অশ্রু বিসর্জন করব ঘরে বসে-বসে। আর সেই সুযোগে মহা আনন্দে অনবগুণ্ঠিতা কবিতা-সুন্দরীর রূপসুধা পান করে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিচরণ করবে সুখের সপ্তম স্বর্গে?

এমন পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সতর্কতা যে রীতিমতো প্রয়োজন, তা কি জানি নেপালি-তনয়ের চোখ দেখেই বুঝেছিলাম। তাই চকিতে আলো নিভিয়ে দিয়ে অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে উঁকি মারলাম বাইরের প্যাসেজে। কারও চিহ্নও দেখলাম না। নেপালি-সুতই বা গেল কোথায়?

তারপরেই, করিডরের শেষপ্রান্তের দরজাটা আস্তে-আস্তে খুলে গেল—বেরিয়ে এল একটি মূর্তি। সামনে-পেছনে সাবধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে লোকটি পা টিপে টিপে এগিয়ে এল করিডর দিয়ে। বাহাদুর যে নয়, তা বুঝলাম চলার ধরন দেখেই। কেবিনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিলাম লোকটিকে। আরও একটু এগিয়ে একটা স্টেটরুমের দরজা খুলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা।

হতাশভাবে বসে পড়লাম বার্থের ওপর। বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠতে লাগল কপালে। বলবাহাদুর কি শেষপর্যন্ত মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করল? তারপরেই দরজায় অস্পষ্ট শব্দ শুনে চমকে উঠে দেখি ওর হাসি-হাসি মুখ। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম আমি। আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে জ্বাললাম আলোটা।

জয় জগদীশ্বর! নেপালি-নন্দনের হাতে ঝকমক করছে বকের পালকের মতো ধবধবে সাদা একটা শার্ট।

চোখের সামনে যেন পরশমুক্ত দেখছি, এমনিভাবে জুলজুল চোখে তাকিয়ে রইলাম তুষার-শুভ্র শার্টটার দিকে।

বলবাহাদুর বললে, 'দিন, দিন, বোতামগুলো লাগাই তাড়াতাড়ি।' বলে নিজেই ঠাকুরদার হিরের বোতাম লাগাতে বসল বোতাম-ঘরে। 'খুব বড় হবে না, কী বলেন?'

হঠাৎ কীরকম যেন মনে হল আমার।

একটু কঠিন স্বরেই শুধোই, 'শার্টটা আনলে কোত্থেকে?'

'আনলাম।' সংক্ষিপ্ততর জবাব আসে ওদিক থেকে। 'নিন, পরে ফেলুন।'

'সামান্য একটু টিলে হচ্ছে যদিও, তবুও শার্ট তো, তাহলেই হল। বাঃ, কলারটাও তো দেখছি বেশ ফিট করে গেল গলায়। কপাল, বুঝলে বাহাদুর, সবই কপাল। উঃ,

কলারটা তো দারুণ শক্ত হে!' ক্ষিপ্রহাতে টাইয়ের গ্রন্থি রচনা করতে-করতে বলি।

'বাঃ, বেশ মানিয়েছে সাব!' ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে-শুনে প্রশংসিকা দিয়ে দেয় বাহাদুর।

একটা নোট ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলি, 'দ্যাখো বৎস, শার্টটা যেখান থেকেই আনো না কেন, আবার ফিরিয়ে দিতে হবে, বুঝেছ?'

'জরুর।'

'বহুৎ আচ্ছা। একটা টাকাও দেব সেই সঙ্গে—ধোয়ার খরচ হিসেবে। সততার জয় সর্বত্র, বুঝলে বাহাদুর, অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দিতে নেই।'

'জি সাব।'

'নিজে যদি সৎ থাকো, তাহলে সারা দুনিয়া এসে লুটিয়ে পড়বে তোমার পায়ে।' নেপালি-নন্দন ততক্ষণে দরজার বাইরে এক পা দিয়েছে। 'আরে, ইয়ে শার্টটা এল কোত্থেকে তা বলে গেলে না?'

'আনলাম।' বলে মুচকি হেসে অন্তর্হিত হল সে।

ধুত্তের, কী আর করা যায়, বেপরোয়া পরিস্থিতির একমাত্র সমাধান হল নিজেই বেপরোয়া হয়ে যাওয়া। চটপট ট্রাউজারের মধ্যে দুই পা গলিয়ে ফেললাম—ওয়েস্ট কোট আর কোট চাপানো শেষ হতে-না-হতেই প্যামত্রিবর বিউগলে একটা নাম না-জানা ইংরেজি সুর বাজাতে শুরু করে দিলে। বাথরুমের দরজায় আবার খটাখট শব্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করছিলেন তরফদার। তাই, প্রথমে সবক'টা আলো নিভিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে খুলে দিলাম লকটা, তারপরেই তিরবেগে উঠে এলাম ওপরের ডেকে কবিতার সন্ধানে।

আমাকে দেখেই স্ফুরিত অধরে আর ঘনকৃষ্ণ আঁখিযুগলে ভর্ৎসনা আর অভিমানের এক বিচিত্র মিশ্রণ ফুটিয়ে তুলল ও।

শুধু বলল, 'সূর্য অনেকক্ষণ ডুবে গেছে।'

'জানি। কিন্তু—' দু'আঙুল দিয়ে অস্থিরভাবে কলারটা টানাটানি করতে-করতে বলি, 'কিন্তু কী করব, সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে দেরি করে দিল আমার।'

'তা তো বলবেই, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় কখনও?'

'তা যা বলেছ,' অন্যমনা হয়ে বলি আমি। ভাবছিলাম, শার্টের প্রকৃত অধিকারীর গলাটা নিশ্চয় ইস্পাত দিয়ে তৈরি। এরকম শক্ত আর ধারালো কলার কি রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে পরা সম্ভব?

'কী ব্যাপার বলো তো? সুস্থ আছ তো?'

'নিশ্চয় নয়। তুমি যে মূর্তিমতী উর্বশী, তা তো আমার অজানা নয় হে ভুবনমোহিনী উর্বশী—তবুও তোমায় দেখেই কেমন জানি বোঁ করে ঘুরে গেল মাথাটা।'

উঠে দাঁড়াল কবিতা। ডাইনিং সেলুনে ঢুকতেবার ঘুরিও সেটা। খাবার টেবিলে দেরি হওয়া মোটেই পছন্দ করেন না বাবা।'

কবিতার ডানদিকের আসনটাই নির্ধারিত হয়েছিল আমার জন্যে—দেখেই বেশ খুশি-খুশি হয়ে উঠল মনটা। বাঁ-দিকে বসেছিলেন সোমনাথ মুখার্জি স্বয়ং। এমন নিখুঁত আসন পরিকল্পনা লক্ষ করে নিমেষের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠলাম আমি। এক মুহূর্ত আগেই হাবুডুবু খাচ্ছিলাম হতাশার সমুদ্রে—কিন্তু এখন আর আমায় পায় কে! পরস্মৈপদী শার্টের প্রসাদ যে এত সুমধুর তা তো জানতাম না!

খাওয়ার শুরুতেই সোমেশ রায় প্রস্তাব করলেন, তরফদার সিংহলে তাঁর প্রবাসী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শোনান গল্পচ্ছলে। ভাবলাম, গেল বুঝি এবার খাওয়ার সব আনন্দটাই মাটি হয়ে। কিন্তু তরফদার ভদ্রলোক অন্যান্য ব্যাপারে যতই অশিষ্ট অভদ্র হোন না কেন—কথা বলার ব্যাপারে সত্যই অতুলনীয়। সুন্দরভাবে গুছিয়ে সামান্য ঘটনাকেই গল্পের আকারে পরিবেশন করে আসর জমাতে দক্ষ পুরুষ তিনি। কলম্বোতে একটা ইংরেজি দৈনিকের সহকারী সম্পাদক থাকার সময়ে তাঁর অ্যাডভেঞ্চার, ক্যান্ডির একটা হাসপাতালে টাইফয়েডে শয্যাশায়ী থাকার সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের সংস্পর্শে আসার সুযোগ টীকাটিপ্পনী দিয়ে বেশ চমৎকারভাবেই বলে গেলেন তিনি। কেকেলাই, বাটিকালোয়া, ভাঙ্গালা, আরিপু প্রভৃতি ছোটখাটো বন্দরে কত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির নাবিকের সঙ্গে, কত দুর্দান্ত কোকেন, আফিমের চোরা-কারবারীদের সাথে তাঁর আলাপ জমেছিল—তা শুনতে-শুনতে পুলকে-ভয়ে-রোমাঞ্চে শিউরে উঠল সবাই। জীবনে বিঘ্ন এসেছে বহু, আর তা জয় করতে গিয়ে শিখেছেন প্রচুর, দেখেছেন অনেক; জীবনের মূল সত্তা অন্তরে-অন্তরে উপলব্ধি করেছেন দীর্ঘকাল ধরে বন্ধুর পথে চলার মধ্য দিয়ে।

কফি না-আসা পর্যন্ত একাই আসর সরগরম করে রাখলেন তরফদার—তারপর শুরু হল লঘু রসালাপ। বহু কণ্ঠের গুঞ্জরন ছাপিয়ে হঠাৎ সোমেশ রায়ের উচ্ছ্বসিত স্বর ভেসে এল প্রত্যেকের কানে। মিসেস প্যাটেলকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন তিনি।

'সাঁইত্রিশ বছর। দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর ধরে পকেটে-পকেটে ঘুরছে টাকাটা। জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তগুলিতে ওর স্পর্শ আমায় দিয়েছে শক্তি, সাহস, উদ্যম, প্রেরণা আর সাফল্য। ছোট্ট একটা রুপোর টাকা—উনিশশো দশ সালে আলিপুর মিন্টে যার জন্ম—'

ফিক করে হেসে ফেলল কবিতা। 'সেরেছে! আবার লাকি পিস-এর গল্প ফেঁদেছে বাবা।'

'থ্রিলিং!' বললেন মিসেস প্যাটেল। সেই সঙ্গে উৎসাহসূচক লিপস্টিক রাঙানো একটু হাসি। 'টাকাটা আপনার কাছেই আছে তো?'

'নিশ্চয়!' বলেই ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে চকচকে একটা রুপোর টাকা বার করে আনলেন তিনি। 'সাঁইত্রিশ বছরের একমাত্র বন্ধু আমার এই লাকি পিস।' বড়-বড় চোখে পলক তাকিয়ে রইলেন তালুর ওপর রাখা টাকাটার দিকে। তারপর, খুব থেমে-থেমে বললেন, 'একী! এ তো আ-আমার টাকা নয়!'

থমথমে স্তব্ধতা নেমে এল সেলুনের মধ্যে।

কবিতাই প্রথম কথা বলল, 'কী বলছ বাবা, এ টাকা তোমার নয়?'

'না! এতে ছাপ রয়েছে ১৯৩৪ সালের।' বলে ঠন করে টেবিলের ওপর টাকাটা ছুড়ে দিয়ে সব ক'টা পকেট হাতড়ালেন। তারপর শূন্য দুই হাত টেবিলের ওপর রেখে মুখ অন্ধকার করে বসে রইলেন ক্ষণকাল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বললেন অত্যন্ত মৃদুস্বরে, 'ভাবছেন, খুবই সামান্য ব্যাপার এটা—কিন্তু আসলে তা নয় মোটেই। জানি না, কী জাতীয় রসিকতা এটা। রসিক পুরুষটি যেই হোক না কেন, তাঁকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না কিছুতেই। কিন্তু তবুও আমি সব ভুলে যেতে রাজি আছি যদি এই মুহূর্তে তিনি স্বীকার করেন সব

কিছু। বলুন—' গলা কেঁপে ওঠে ওঁর, 'বলুন, এ কার রসিকতা?'

উৎকণ্ঠিত চোখে প্রত্যেকের মুখের ওপর একে একে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন উনি। কেউই কথা বলল না। কঠিন হয়ে এল সোমেশ রায়ের বয়াসু চোখ।

বললেন, 'তাহলে রসিকতা নয়। একটা বদ উদ্দেশ্যই রয়েছে এর পেছনে।'

'কী আজেবাজে বকছিস সমু? তিলকে তাল করে তুলিসনি।' বাধা দিয়ে বলেন ঝুলকায়া পিসিমা।

'সেটা আমিই বুঝব ভালো।' ইস্পাতের মতোই কঠিন শোনাল তাঁর স্বর। তারপর চেষ্টা করে একটু ফিকে হাসি হেসে বললেন, 'তা তুমি মন্দ কথা বলোনি দিদি। পার্টিটা নষ্ট করা উচিত হবে না আমার।'

থমথমে ভাবটা একটু লঘু হল। মিসেস প্যাটেল অবশ্য সুযোগটা যথা ব্যবহার করতে দ্বিধা করলেন না। কণ্ঠে দরদ ঢেলে বললেন, 'আশ্চর্য! আপনার কোনও কর্মচারীর কাণ্ড নয় তো এটা?'

'আপনার ধারণা ভুল, মিসেস প্যাটেল।' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন সোমেশ রায়। 'আমার সঙ্গে ওরা অনেক দিন আছে। তবুও, জলপরী থেকে নামার আগে প্রত্যেককে তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করব আমি নিজে। যাক, এ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এখন এখানেই বন্ধ থাকুক। ভালো কথা—আর কারও কিছু হারিয়েছে?'

নিস্পন্দ হয়ে গেল আমার হৃদযন্ত্র। শাঁটা কারও মুখে এখনি প্রকাশ পাবে একটা শার্টের রহস্যজনক অন্তর্ধানের কাহিনি। আর, তার পরিণাম ভাবতেই বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল আমার কপালে।

কিন্তু কারওর জিহ্বাকেই তৎপর হতে দেখলাম না। তাহলে চুরির খবর এখনও প্রকাশ পায়নি। আবার শুরু হল আমার শ্বাসপ্রশ্বাস।

'তাহলে এ প্রসঙ্গ বন্ধ থাকুক এইখানেই।' বললেন সোমেশ রায়।

'এক মিনিট!' দাঁড়িয়ে উঠলেন দেশমুখ। 'টেবিল ছেড়ে ওঠার আগে আমার একটা প্রস্তাব আছে। তুচ্ছই হোক আর মূল্যবানই হোক, একটি জিনিস হারিয়েছে মিস্টার রায়ের। কাজেই সন্দেহভাজন এখন আমরা প্রত্যেকেই। তাই, আমার ইচ্ছে প্রথমেই সার্চ করা হোক আমায়। আমার তো বিশ্বাস এ প্রস্তাবে কারওরই আপত্তি থাকতে পারে না।'

'কী বাজে বকছেন?' কঠিন স্বরে বললেন সোমেশ রায়। 'এ প্রস্তাব শোনার মতো ধৈর্য আমার নেই।'

তরফদার বললেন, 'মিস্টার দেশমুখ কিন্তু কিছুই অন্যায় বলেননি। আমার তো মনে আছে, কলম্বোর ব্রিটিশ এম্ব্যাসিতে একবার গৃহস্বামিনীর একটি হীরার নেকলেস হারায়। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল সেখানে—তবুও তৎক্ষণাৎ আমাদের প্রত্যেককেই ছোট একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে সার্চ করা হল তন্ন-তন্ন করে।' বলে উঠে দাঁড়ালেন উনি। 'মিস্টার দেশমুখের প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি।'

'রাবিশ! এভাবে কিছুতেই অপমানিত হতে দেব না আমার অতিথিদের।' অনড় থাকেন সোমেশ রায়।

এবারে কথা বললেন অলোক ঘোষ, 'আপনাকে স্যার কিছুই করতে হবে না।

নিজেরাই যদি নিজেদের সার্চ করে সন্দেহের কাঁটা থেকে মুক্তি পাই, তাহলে খুশি হবে প্রত্যেকেই। এতে অপমানিত হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মহিলারা যদি অনুগ্রহ করে সেলুনে অপেক্ষা করেন, তাহলে—'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিসিমা, মিসেস প্যাটেল আর কবিতা বেরিয়ে গেল বাইরে। চটপট কোট আর ওয়েস্টকোট খুলে ফেললেন দেশমুখ।

'আপনাদের মধ্যে একজন এগিয়ে আসুন। আমার পালা শেষ হলে আপনাদের আমিই দেখব'খন।'

অলোক ঘোষই এগিয়ে এলেন সবার আগে। অতি কষ্টে বুকের ধুকপুকুনি সংযত করে আমিও খুললাম আমার কোট আর ওয়েস্টকোট। শার্টটিও গায়ে ভালো করে ফিট করেনি, তা কী আর কারও চোখ এড়িয়েছে! দেশমুখ নির্দোষ প্রমাণিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে মহা উৎসাহে শুরু করলেন অপরের অঙ্গ তল্লাশ। কিন্তু এত কিছু করেও ফল হল না কিছুই। আগাগোড়া শূন্য দৃষ্টি মেলে এমনভাবে টেবিলে বসে রইলেন সোমেশ রায় যেন এ ছেলেখেলায় কোনও আগ্রহই নেই তাঁর। কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে শূন্য হাতে তাঁর পাশে এসে বসলেন দেশমুখ।

'খুশি তো?বেশ, আমার একান্ত অনুরোধ এ বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে আর কোনও কথা নয়। চলুন, এখন বাইরে যাওয়া যাক!' বলে উঠে দাঁড়ালেন সোমেশ রায়।

সেলুনে গিয়ে দেখি ব্রিজখেলার উদ্দেশে সোৎসাহে দুটো টেবিল জোড়া লাগাবার কাজ তদারক করছেন পিসিমা। বাড়তি হচ্ছিল শুধু একজনই। কিন্তু প্রত্যেকেরই আন্তরিক ইচ্ছে যে বাদ দেওয়া হোক তাকেই। শেষ পর্যন্ত ভারিক্কি চালে অলোক ঘোষকেই বাড়তি হিসেবে গণ্য করলেন পিসিমা—আর বেশ খুশি মনেই চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

এরপর পার্টনার নেওয়ার পালা। সভয়ে লক্ষ করলাম, আমার ঠিক বিপরীত দিকেই বসেছেন পিসিমা স্বয়ং। এমন ভাবে বসেছেন যেন ব্রিজখেলার আবিষ্কর্ত্রী তিনিই। আর, কার্যত দেখলাম তাই বটে।

তাস কেটে দিলাম আমি। মেদ-থলথল বিশাল বাহু সঞ্চালন করে তাস ক'টি তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকালেন পিসিমা। শুধু তাকালেন তো নয়, যেন দৃষ্টিশরে বিদ্ধ করলেন।

তারপরেই এল কড়া আদেশ, 'তাস গুনুন। এই হল প্রথম নিয়ম। আপনি কোন নিয়মে খেলেন মিস্টার রায়?'

'নিয়ম?' ক্ষীণস্বরে পুনরাবৃত্তি করি আমি। 'তা তো জানি না। আমি তো শুধু খেলি।'

চট করে বললেন উনি, 'আমরা কন্ট্রাক্টে খেলব।'

'ইয়ে—ঠিক বুঝতে তো পারলাম না।' কাঁচুমাচু মুখে বলি আমি।

'বলা হচ্ছে যে মাঝে-মাঝে পার্টনার পালটাব আমরা।'

'ওঃ, তাতে আমি রাজি!' আন্তরিকভাবেই বলি আমি।

এমন শক্ত চোখে আমার দিকে উনি তাকালেন যে চোখ এড়াতে গিয়ে আমায় তাকাতে হল অন্য দিকে। আর, তাইতেই চোখাচোখি হয়ে গেল যাঁর সঙ্গে, তাঁকেই আজ

সন্ধ্যায় ডিনারের ঠিক আগেই দেখেছিলাম অর্ধো-অন্ধকার করিডরে। হঠাৎ রাশি-রাশি চিন্তা ভিড় করে এল মাথায় পিসিমার দু-নম্বর কানুন মনে হল যেন মাইলখানেক দূর থেকে ভেসে আসছে। অবশ্য, সে স্বরলহরী অচিরেই এসে পৌঁছল একেবারে কানের গোড়ায়।

বেশ কিছুক্ষণ খেলার পর পিসিমা বুঝলেন যে, অনভিজ্ঞ শুধু আমি একা নই, উপস্থিত প্রত্যেকেই। অসাধারণ তাঁর সহ্যশক্তি, কিন্তু তবুও তিন তিনবার পার্টনার বদল করার পরও যখন দেশমুখই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন তাঁর আবিষ্কৃত নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে, তখন হাতের তাস টেবিলে আছড়ে ফেলে সচল বিন্ধ্যাচলের মতো সেলুন ত্যাগ করলেন তিনি। 'জলপরী'র ঘড়িতে তখন পর-পর ছ'বার ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে, তাই শুনে বেশ কিছুক্ষণ হিসেব করে এবং নিজের ঘড়ি দেখে জানলাম ছটা ঘণ্টাধ্বনির অর্থ রাত এগারোটার সময়-সঙ্কেত।

অলোক ঘোষ আর তরফদার দুজনেই তখন বেজায় ব্যস্ত কবিতাকে নিয়ে। মনে হল, রাত এগারোটার আগে কন্দর্প দুজনের জিহ্বাযুগল অসাড় হবে না কোনওমতেই। কবিতা কিন্তু আড়চোখে ইশারা করে দিলে আমায়—তারপর হাসি মুখে দুজনকেই শুভরাত্রি জানিয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে।

ফিসফিস করে বললে, 'শালটা আনছি—একটু অপেক্ষা করো, বুঝলে? সূর্যস্ত সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা আছে তোমার সঙ্গে।'

হাতে বিশেষ কোনও কাজও ছিল না তখন। কাজেই সানন্দে সায় দিলাম কবিতার প্রস্তাবে। শালটা গায়ে জড়িয়ে একটু পরেই ও ফিরে এলে দুজনে এগিয়ে গেলাম ডেকের এক নিরালা কোণে পাশাপাশি রাখা দুটো ডেক চেয়ারের দিকে।

নিস্তরঙ্গ আরব সাগরের ওপরে দুলে-দুলে এগিয়ে চলেছিল 'জলপরী'। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো অপরূপ সুষমা এনেছিল ধীর-স্থির-শান্ত জলে। যেন লক্ষ মণিদীপদীপ্ত অঞ্চল চঞ্চল দেহে টেনে সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীত শুনতে-শুনতে প্রবাল-পালঙ্কে সুপ্তির অঙ্কে ঢলে পড়েছে অযুত জলকন্যা। মৃদুমন্দ বাতাসে মধ্যে-মধ্যে সে-অঞ্চলে জাগছিল বিলোল-হিল্লোল। চারদিক নিশ্চুপ নিথর—দিক হতে দিগন্তে প্রসারিত সে অসীম, অনন্ত, অব্যয় শান্তির সঙ্গে তুলনা হয় না কোনও কিছুর সঙ্গেই।

মুগ্ধ হয়ে গেছলাম আমি। কল্পনাপ্রবণ বাঙালি নাকি সহজেই প্রকৃতির সৌন্দর্যে হারিয়ে ফেলে নিজেকে। দেশ ছেড়ে সাত সমুদ্দর তেরো নদী আর তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজকন্যার পাশটিতে বসে আরব সাগরের বুকে দুলতে-দুলতে আবেশ লাগল আমারও চোখে। মুগ্ধ অন্তর থেকে তাই শুধু একটি শব্দই বেরোল, 'অপূর্ব!'

'তোমার ভালো লেগেছে?' শুধোয় কবিতা।

নিরর্থক প্রশ্ন। ভালো যে লেগেছে, তা না জিগ্যেস করলেও চলে। তবুও সেই আদম আর ইভের সময় থেকে যুগ-যুগ ধরে মুগ্ধ পুরুষের আঁখিতে মায়া সিঞ্চন করার পর এই প্রশ্নই করে এসেছে প্রিয়ংবদারা। এ-প্রশ্নের কথায় উত্তর নেই—আছে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির পালা, আছে আঁখির কালো মণিকা দিয়ে শব্দের অতীত সুরকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস।

আমিও তাই কথা বলে আর হৃদয়-তন্ত্রীতে ধ্বনিত সুর-হারানোর কারণ হলাম না। কতক্ষণ চুপ করে পাশাপাশি বসে রইলাম দুজনে।

তারপর শুধোলাম এক সময়, 'সূর্যস্ত সম্বন্ধে কী যেন বলছিলে না? কীরকম লাগল তোমার?'

'মন্দ কী। তবে আমার আবার চাঁদকেই ভালো লাগে বেশি।' বলে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ও। তারপর শুধোয়, 'কী ভাবছ তুমি?'

'ভাবছি নয়। ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি। মধ্যবিত্তের পর্যায়ে নেমে আসুক কবিতা রায় আর তার ফ্যামিলি, আর শ-দুই টাকা মাইনের হেডমাস্টার হয়ে যান সোমেশ রায়। সত্যি কথা বলতে কী কবি, বাক্সার চারিটি শোতে তোমায় আমার প্রথম পরিচয়ের পরের মুহূর্ত থেকেই সমানে প্রার্থনা জানিয়ে চলেছি আমি।'

হেসে ফেলল কবিতা।

'ফলে গিয়ে সময় নষ্ট করার মতো সময় সারা জীবনেও পাননি বাবা। কাজেই বৃথাই শক্তিক্ষয় করছ তুমি।'

একঝলক ঠান্ডা হাওয়া ভেসে আসে সাগরের বুক থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের ওপর থেকে র‍্যাগটা তুলে নিয়ে জড়িয়ে দিলাম ওর ঊর্ধ্বাঙ্গে। ওর আঙুলের ছোঁয়া লাগল আমার আঙুলে। হঠাৎ কী হল, হাতখানা সরিয়ে ওর উষ্ণ কোমল আঙুলগুলি আলতো করে ধরলাম আমার মুঠির মধ্যে। সে ছোঁয়ায় বুঝি সোনার কাঠির যাদু-পরশ লাগল দুজনের মনের মণিকোঠায়—তাই দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলাম চুপ করে।

তারপর যেন বাতাসের সুরে বললাম, 'কবি!'

'বলো।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা আর হল না। আবার নৈঃশব্দ্য।

একটু পরে কবিতাই শুধোয়, 'বাবাকে কীরকম লাগল তোমার?'

'সত্যিকারের পুরুষসিংহ উনি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমার মতামতের কী মূল্য বলো? হোমরা-চোমরা অভ্যাগতদের মতামত শুনলেই খুশি হবেন তিনি বেশি।'

'ভুল ওইখানেই করলে মৃগ। কোটিপতি হলেও সামান্য রাজমিস্ত্রির সন্তান তিনি—তা সোমেশ রায় কখনও ভোলেন না। সমাজের অভিজাত মহলে মেশবার জন্যে আজ তিনি সাহেবিয়ানা রপ্ত করেছেন—কিন্তু একদিন যে দিনরাত পরিশ্রম করেও মাসান্তে কুড়িটা টাকাও রোজগার করতে পারেননি—তা উনি ভোলেন না কখনও।'

'কিন্তু সে তো বহু বছর আগেকার কথা।'

'বিয়ের ক'বছর আগে পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল ওঁর।'

লক্ষ মাণিকের দীপ্তি জড়ানো সাগর জলের অশান্ত কল্লোল-সঙ্গীতে সুর মিলিয়ে এমন সুরে কথাটা ও বললে যে, হঠাৎ যেন কীরকম হয়ে গেলাম আমি। বসন্ত-বায়ুর মত স্পন্দন-কম্পন, নিশ্বাস-উচ্ছ্বাস আর আভাসগুঞ্জন মৌন বেদনায় হারিয়ে যাচ্ছিল নীরব নিশীথের অশ্রুত সঙ্গীত-ঝঙ্কারে। তাই আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, দুহাতে ওর হাতটা চেপে ধরে বললুম, 'কবি, তুমি কী কিছুই বোঝোনি?'

'বুঝেছি। যেদিন প্রথম তোমায় দেখেছিলাম, সেদিনই।'

'আমি জানতাম। এতদিন প্রতীক্ষা করছিলাম কখন তুমি নিজে তা বলবে।'

'কবি '

ঠিক এই সময়ে একটুকরো মেঘের আড়ালে মুখ লুকোলে চাঁদ। আমিও যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

বললাম, 'না কবি, এ আমার দুরাশা। কোনওদিনই রাজি হবেন না তোমার বাবা '

'কিন্তু রাজি তাঁকে করাতেই হবে '

'তুমি বুঝছ না, একথা শোনামাত্র উনি সোজা আদেশ দেবেন জ্যান্ত অবস্থায় আমায় একটা ফার্নেসে ঢুকিয়ে দিতে।'

'তোমার সঙ্গে আমাকেও ঢোকাতে হবে তাহলে।'

'কবি! আশ্চর্য! কিন্তু এ কি অন্তর থেকে বলছ তুমি?'

'তুমি যে জন্যে আশ্চর্য হচ্ছ তা আমি শুনতে চাইছি না। বিয়ে আমি তোমাকেই করব, এই কথাই বলতে চাই আমি।'

'আমিও তা চাই। ধনীকন্যাদের বিয়ে করার পরই অর্থ পিশাচ হয়ে যেতে দেখেছি অনেককে। আমি কিন্তু একটি কানাকড়িও নেব না তোমার বাবার কাছ থেকে, এমনকী কোনও চাকরিও নয়।'

'মিছে ভেব না—কোনওটাই পাবে না তুমি।'

'কিন্তু কবি, আমি তো তা বলতে চাই না। আমি বলতে চাই—আমি বলতে চাই—'

'থাক, শুধু চাইলেই হবে না। সক্রিয় হতে হবে, যেমনটি আমি চাই।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ, বাবার কাছে গিয়ে সব কিছুই বলতে হবে তোমায়। পারবে?'

'অলবাৎ। ইয়ে...নিশ্চয়। এবার দেখা হলেই কথা পাড়ব।'

'কী বলবে? গুড মর্নিং, না গুড ইভনিং?'

'ঠাট্টা হচ্ছে? কিন্তু এক লাইন শুনলেই তো উনি বলবেন জলপরী ছেড়ে জলে নেমে যেতে।'

'মোটেই না। বাবার প্রকৃতিই নয় ও-রকম। তোমার প্রস্তাব যদি ওঁর মনঃপূত না হয়, তাহলে তুমি যা ভাবছ, সেরকমটি কিছুই করবেন না উনি। বুদ্ধি আর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষের হৃদয়ের তল পর্যন্ত দেখে নেওয়ার ক্ষমতা ওঁর আছে বলেই জীবনে এত উন্নতি করতে পেরেছেন কারও সাহায্য না নিয়েই। লোক চিনতে বেশি দেরি ওঁর হয় না।'

'তাহলে কলির সত্যবান মৃগাঙ্ক রায়ের জয় তো অবশ্যম্ভাবী।'

'আহা রে, সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির আর কি। ওই বচনটুকুই শুধু সার।'

'ও-র মানে? বলো না কী করতে হবে?'

'কিছু না করলেই বাধিত থাকব। শুধু এমনভাবে ওঁর সঙ্গে মানিয়ে চলবে যেন তোমার ভেতর পর্যন্ত দেখার সুযোগ পান উনি। মোট কথা, খুব সহজ হয়ে উঠবে, বুঝেছ?'

'তাহলে আরও বছর কয়েকের মতো নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'তোমার মুণ্ডু! সাধে কি আর বলি—যাই হোক, শোনো বাক্যবাগীশ, আমি যেমন তোমায় ভালোবাসি—ঠিক তেমনি বাবাও ভালোবাসেন আমায় সমস্ত অন্তর দিয়ে, কাজেই যেভাবেই হোক, তোমাকে তাঁর প্রিয়পাত্র হতেই হবে। তাঁর অমতে কিছুতেই সুখী হব না আমি এ বিয়েতে।'

'খুবই স্বাভাবিক তা '

'তার ওপরে হতচ্ছাড়া ওই টাকাটা হারিয়ে যাওয়ায় একেবারেই মন ভেঙে গেছে ওঁর।'

সেকেন্ড কয়েক একটা নতুন চিন্তা করে নিই। তারপর বলি, 'কবি, ইন্দ্রনাথের নাম শুনেছ?'

'তোমার বন্ধু তো? অনেকবার ওঁর গোয়েন্দাগিরির গল্প তো আমায় শুনিয়েছ। কেন বলো দিকি?'

'জানোই তো, সব বাঁশে বংশলোচন হয় না। অনেকদিন ধরে ইন্দ্রনাথের শাগরেদি করেও তাই যে-রকম জড়ভরত ছিলাম, সেই রকমটিই রয়ে গেছি—'

'তা না বললেও চলত।'

'কিন্তু চেষ্টা করলে ওর অভিজ্ঞতাকে হয়তো আমিও কাজে লাগাতে পারি।'

'তাতে লাভ?'

'রুপোর টাকা উদ্ধার।'

লাফিয়ে উঠল কবিতা। 'দি আইডিয়া! এতক্ষণ একথা বলোনি কেন?'

'বলতে আর দিচ্ছ কই। বরো, টাকাটা খুঁজে পেতে বার করে ফেললাম—তাহলেই পুরস্কারস্বরূপ তোমায় তখন অনায়াসেই চাইতে পারব, কী বলো?'

'শুধু কি তাই? সেই সঙ্গে পিসিমা আর জলপরীকেও উনি গছিয়ে দেবেন তোমার হাতে।'

'তবেই সেরেছে। ইয়ে-মানে—আমি বলছি কী, জলপরী রাখার মতো সঙ্গতি কই-আমার?'

'ও-সব বাজে কথা এখন থাকুক। শোনো,' বলে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ও বলে, 'এসো, আমরা দুজনেই একসঙ্গে তদন্ত করি এ ব্যাপারে। প্রথম কাজ তো সন্দেহভাজনদের জেরা, তাই না?'

'তাহলে প্রথমে তোমাকে দিয়েই শুরু করা যাক। তুমিই তখন বলছিলে না, টাকাটা হারিয়ে গেলে খুশি হতে খুবই?'

'খবরদার, কী বলতে চাও তুমি?'

'এই দ্যাখো, চট করে চটে গেলে কাজ এগোয় কী করে?'

'চটব না? তোমাকে আর ভাবতে হবে না, আমি বলছি। পিসিমাকেও অনায়াসে বাদ দিতে পারো তুমি।'

'ওভাবে পটাপট বাদ দিতে থাকলে গোয়েন্দাকেও তল্পিতল্পা গুটোতে হবে।'

'আলবাৎ দেব। এসব ব্যাপারে মেয়েদের সহজাত বোধশক্তি গোয়েন্দাদের চেয়েও অনেক বেশি কার্যকরী। মিস্টার তরফদার—কোনও মোটিভ নেই। মিস্টার দেশমুখ—তোমার কী মনে হয়?'

'একে আইনজ্ঞ, তার ওপর রাজনীতিজ্ঞ। চালচলন বেশ দুর্বোধ্য আর রহস্যময়।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। সবার আগে নিজের দেহ সার্চ করানোর জন্য বড় বেশি আগ্রহ দেখেছিলাম। খুবই সন্দেহজনক।'

'কিন্তু যাই বলো, তোমার বাবা কিন্তু ভারি চমৎকার মানুষ। পাছে অতিথিদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে, তাই কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না দেশমুখের প্রস্তাবে।'

ফিক করে হেসে ফেলল কবিতা।

'বাবার সৌজন্যবোধ দেখে এতটা মুগ্ধ না হলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতে। টাকা-চোর যে চোরাই মাল নিয়ে টেবিলে আসেননি—তা উনি ভালো করেই জানতেন। অতখানি দুঃসাহস চোরের থাকবে না জেনেই চূড়ান্ত আতিথেয়তা দেখাতে কুণ্ঠিত হননি বাবা। কিন্তু রুপোর টাকা ওঁর যেভাবেই হোক চাই। আর, সেজন্যে জলপরী থেকে নামার আগে প্রত্যেকের কেবিন ঘিরে দেখতেও ইতস্তত করবেন না উনি। তারপর ধরো অলোক ঘোষকে। বাবাকে সিংহলের ব্রিজ কনট্রাক্ট থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁর আগ্রহ লক্ষ করেছ তো?'

'হুম। অলোক ঘোষকে তো তাহলে রেহাই দেওয়া চলে না কোনওমতেই। ভালো কথা, মিসেস প্যাটেলকে কীরকম মনে হয় তোমার?'

'ওঁর সম্বন্ধে তো কিছুই জানি না আমি।'

'ভদ্রমহিলার অবস্থা কিন্তু খুব সচ্ছল নয়। আমাকে বলছিলেন নিজেই। আমার অবস্থাও অবশ্য তাই।...ও হ্যাঁ, আমাকে যেন আবার বাদ দিও না।'

'ননসেন্স। পরের জিনিস নেওয়ার মতো নীচ তুমি নও।'

'তা—ইয়ে—ঠিকই বলেছ।' গলার কলারটা আবার যেন বড় শক্ত মনে হল।

হতাশ হয়ে পড়ে কবিতা। 'কিন্তু কোনও লাভই তো হল না। একটা সূত্র যদি পেতাম।'

'তা অবশ্য পেয়েছি।'

'কী বললে?'

'একজন অভ্যাগতকে তুমি একেবারেই বাদ দিয়েছ। রুপোর টাকা চুরি করার পেছনে সোমনাথ মুখার্জিরও তো মোটিভ থাকতে পারে?'

'মোটেই না—ভুল ধারণা তোমার।'

'হবেও বা। আচ্ছা, করিডরের শেষের কেবিনটা তোমার বাবার, তাই না?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল কবিতা।

বললাম, 'ডিনারের ঠিক আগেই দেখলাম স্বয়ং সোমনাথ মুখার্জি চোরের মতো পা টিপে-টিপে বেরিয়ে আসছেন কেবিনটা থেকে। তাঁর ধরন ধারণ কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল। দেখলাম, চুপিসাড়ে করিডর পেরিয়ে উনি ঢুকে গেলেন নিজের কেবিনে।'

'কী বলছ তুমি?'

'যা দেখেছি। ভদ্রলোক আমার অন্নদাতা, হর্তাকর্তা-বিধাতা। এ ব্যাপার যদি ফাঁস করে দিই—তাহলে খুবই খুশি হয়ে উঠবেন আমার ওপর, কী বলো?'

'কী করবে তাহলে?'

'জানি না। অদ্ভুত সঙ্কুল পরিস্থিতিতে এসে পড়েছি। তোমার বাবাকে যদি সব বলি, তাহলেই সোমনাথ মুখার্জি এমন একটা সাফাই গাইবেন যে, আমি যে একটা নিরেট মূর্খ, তা প্রমাণিত হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গেই। আমার মতে, আগে সোমনাথ মুখার্জিকেই সব কিছু খুলে বলা ভালো।'

'তোমার চাকরিও খতম তাহলে।'

'আশ্চর্য নয়। কিন্তু সত্যের দাম চিরকালই এই রকম। তাছাড়া, দৈনিকের অভাব এদেশে নেই, কাজেই—'

'খ' ভালো' বোঝো করো।'

'ভালো কি না জানি না। তবুও বুক ঠুকে দেখা যাক খেপে টেকে কি না প্ল্যানটা। সোমনাথ মুখার্জি যে আসলে একটা পাকা ক্রিমিনাল, এইটাই প্রথম সমঝে দিতে চাই তাঁকে। ঘরের মধ্যে কী করছিলেন উনি—তাহলেই তা জানতে পারব। পারলে এখনই দেখা করতাম ওঁর সঙ্গে।'

উঠে দাঁড়ালাম দুজনে।

কবিতা বলল, 'তাহলে মনে থাকে যেন, এ কেসের দায়িত্ব দুজনেরই সমান। তুমি শার্লক হোমস আর আমি ডক্টর ওয়াটসন। ওয়াটসন হিসেবে আমাকে তো অনায়াসেই চালিয়ে দেওয়া যায়, কী বলো?'

'শুধু ওয়াটসন! স্বয়ং কনান ডয়েল বললেও অত্যুক্তি হয় না!'

'সত্যি? তাহলে আমার ব্রেন আছে বলো? আমি কিন্তু ব্রেনওয়ালা পুরুষদের ভালোবাসি খুবই।'

'আর, আমি বাসি তোমায়। কবি, সত্যই কি পাব তোমার বরমাল্য? আমার যেন মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি।'

'কিন্তু আমি দেখছি না। চললাম। গুডনাইট আন্ড গুড লাক।'

সৌভাগ্য সূর্য যে আমার মধ্যগগনে, তার প্রমাণ পেলাম তৎক্ষণাৎ। স্মোকিং রুমে গিয়ে দেখি, 'নোটিলাস' আকারের চুরুট কামড়ে ধরে তন্ময় হয়ে ধূম্রজাল নিরীক্ষণ করছেন সোমনাথ মুখার্জি। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন বলে মনে হল না—আমি কিন্তু তা উপেক্ষা করে বেশ আয়েস করে বসলাম পাশের কাউচে।

'বাইরের আবহাওয়া কত পরিষ্কার দেখছেন?' একটু নড়ে-চড়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করি আমি।

'দেখেছি।' নিস্পৃহ স্বর সোমনাথ মুখার্জির।

'দিব্যি ফুর্তিতে ছিলাম সবাই—যত ঝামেলার সূত্রপাত হল ওই টাকাটা হারিয়ে গিয়ে। আপনি কী বলেন?'

'ঠিক কথা।'

বলে, চুরুটে লম্বা একটা টান দিয়ে ওঠবার উদ্যোগ করলেন তিনি।

'এক মিনিট স্যার,' বাধা দিয়ে বলি আমি। 'আপনি প্রবীণ, অভিজ্ঞ, তাই আপনার কাছে কিছু পরামর্শ চাই আমি।'

'বটে?'

'ধরুন এমন একটা সূত্র আমাদের একজন পেয়েছে, যা—ইয়ে—টাকা-চোরকে

খুঁজে বার করার কাজে লাগতে পারে খুবই। তাহলে তা মিস্টার রায়ের কাছেই জানানো উচিত হবে আমাদের, তাই নয় কি? আপনি কী বলেন স্যার?'

'এ বিষয়ে কোনও দ্বিমতই থাকতে পারে না।'

'মহাসঙ্কটে পড়েছি আমি। ডিনারের ঠিক আগেই ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম—ঘরের আলো অবশ্য নেভানো ছিল। হঠাৎ দেখলাম মিস্টার রায়ের কেবিন থেকে একটা মূর্তি বেরিয়ে এসে করিডর পেরিয়ে ঢুকে গেল নিজের কেবিনে। লোকটার হাবভাব কীরকম অদ্ভুত মনে হল আমার।'

'তাই নাকি?'

'এরকম পরিস্থিতিতে আপনি পড়লে কী করতেন স্যার?'

'সোমেশ রায়কে সব কিছুই খুলে বলতাম নিশ্চয়।'

'কিন্তু স্যার, সে মূর্তি তো আপনারই।'

প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায় মহলে মধ্যে মধ্যে সোমনাথ মুখার্জির মুখকে তুলনা করা হয় ড্রাগনের মুখের সঙ্গে। ভদ্রলোকের বরফ-ঠান্ডা দৃষ্টি আমার ওপর পড়তে এ উপমার যাথার্থ উপলব্ধি করলাম অন্তরে-অন্তরে।

শুধোলেন, 'অফিসে ওরা কত মাইনে দেয় আপনাকে?'

সংযত স্বরে বললাম, 'ব্ল্যাকমেল করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই স্যার।'

দপ্‌ করে জ্বলে উঠল বৃদ্ধ সোমনাথ মুখার্জির দুই চক্ষু।

'কে বলেছে আপনাকে ব্ল্যাকমেলের কথা? আমি শুধু বলতে চাই যে অফিসের ওরা আপনাকে যা দেয়, তার উপযুক্ত আপনি নন মোটেই। কেননা, আপনার মতো নিরেট আহাম্মক আমি জীবনে আর দুটি দেখিনি। সোমেশ রায়ের টাকা আমি নেব কী জন্যে?'

'তা তো জানি না স্যার।'

'কেউই জানে না। ওর ঘরে আমি গিয়েছিলাম ঠিকই—ওর একটা জিনিসও আমি সরিয়েছি, কিন্তু নিতান্ত অদরকারি সে জিনিসটা। যদিও সব কথা বলার কোনও দরকার দেখি না—তবুও শুনে রাখুন। ভালো রাখা নিয়ে বহু বছর ধরে সোমেশের সঙ্গে আমার তর্ক-বিতর্ক চলছে। পোশাক পরার সময়ে ভালো রাখা পছন্দ করে ও—আমি কিন্তু একদম দেখতে পারি না তা। নিজের পোশাক যদি নিজেই না পরতে পারলাম—তাহলে বাইরে বেরোবার জন্যেও তো দরকার অন্য লোকের। কিন্তু আজকেও সুটকেস খুলে দেখি, তাড়াতাড়িতে একটা ড্রেস-টাইও আনা হয়নি সঙ্গে।'

'টাই না নিয়েই সুটকেস গুছিয়েছেন?' ফস করে বলে ফেলি আমি। কোটিপতিদেরও পোশাক বিভ্রাট ঘটে তাহলে।

'একটিও না। অথচ ডিনার টেবিলে টাই না পরে গেলে অপদস্থর চূড়ান্ত হতে হবে। তাই, একথা ওর কানে না তুলে ওর অজান্তে ওরই একটা টাই নেওয়া স্থির করলাম। জানতাম হরেকরকম টাই আছে ওর কাছে—তাই ও বাথরুমে গেলে চুপিসাড়ে একটা টাই নিয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। ভেবেছিলাম, কাউকে বলব না এ কথা। কিন্তু যখন তা আর হল না, তখন এও বলে রাখি—অনায়াসেই একথা আপনি সোমেশের কানে তুলতে পারেন।'

মনে মনেই বলি, 'গভীর জলের মাছ!' কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল আমার

শার্ট-বৃত্তান্ত। মুখে বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। কথা দিচ্ছি, এসব কথা আর কেউই শুনতে পাবে না।'

'যথা অভিরুচি।' বলে উঠে দাঁড়ালেন সোমনাথ মুখার্জি।

'আর এক মিনিট, স্যার। ডক্টর ওবেরয়ের ইন্টারভিউ নেওয়ার দায়িত্ব কি এখনও রইল আমার ওপর? মানে—আপনার কাজে এরপরেও বহাল রইলাম কি না জানতে চাইছি।'

বেশ কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইলাম পরস্পরের দিকে। প্রথমে চোখ সরিয়ে নিলেন মিঃ মুখার্জিই।

বললেন, 'ওহো, সেই প্রবন্ধটার কথা বলছেন বুঝি? ঠিক আছে, সে ভার আপনার ওপরেই রইল।'

বলে, ধীর পদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন তিনি। আর পেছন থেকে তাঁর মন্থর চলন-ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি ফুটে উঠল আমার ঠোঁটে। আমি, আপন মনেই থেমে-থেমে পুনরাবৃত্তি করি, 'কে বলেছে আপনাকে ব্ল্যাকমেলের কথা?'

কেবিনে ফেরার পথে দেখি ফাঁকা হয়ে গেছে চাঁদের আলোয় ধোওয়া জলপরীর ডেক। ঘরে এসে চটপট কোট, টাই খুলে ফেললাম, তারপর টান মেরে নিজেকে মুক্ত করলাম বেয়াড়া আকারের শার্টের কবল থেকে। নিচু একটা সেট্রির ওপর হীরের বোতাম সমেত শার্টটা ছড়িয়ে রেখে এসে বসলাম বার্থের ওপর। সিলিংয়ের আলোয় ঝিকমিক করতে লাগল হীরেগুলো। সে দ্যুতি দেখে মনে হল ধার করা শার্টের শোভা বাড়িয়ে লজ্জায় অভিমানে ঝিলকিয়ে উঠছে রায় বংশের ঐশ্বর্য!

কাল সকালে উঠেই বাহাদুরকে দিয়ে শার্টটা ফেরত দিতেই হবে। ভাবতে ভাবতে লম্বমান হলাম শয্যায়। আজকের সোনালি সন্ধ্যা আমার জীবনে সৃষ্টি করল এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের। কবিতা তাহলে সত্যিই আমায় ভালোবাসে। যা এতদিন স্বপ্ন ছিল, সে ভিরু ইচ্ছাটাকে এতদিন অতি সঙ্গোপনে লালন করে এসেছি মনের গহনে, তা তাহলে সত্য হয়েছে। জীবনে যে এত সুধা আছে—তা তো জানতাম না। সুখ, শুধু সুখ—আনন্দের অমৃত-সলিলে অবগাহন করেও এত সুখ পায় কেউ...

ভালো কথা, টাকাটা যেভাবেই হোক খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু সন্দেহ কে? সোমনাথ মুখার্জির কৈফিয়ৎ মোটেই সন্তোষজনক নয়। সত্য হওয়াও বিচিত্র নয়। দারুণ দরকারের সময়ে আমারও তো শার্ট ছিল না। ও ভদ্রলোকেরও সে অবস্থা হওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু আর সকলে? অলোক ঘোষ, দেশমুখ, মিসেস প্যাটেল? প্রত্যেকেই সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে। বড় গোলমেলে ব্যাপার দেখছি...প্রমাণ নেই...কিন্তু...তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার, দেখতে পেলাম না কিছুই, তবুও সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করলাম ঘরের মধ্যে আবির্ভাব ঘটেছে দ্বিতীয় ব্যক্তির।

'কে?'

ঘুম জড়ানো চোখে জড়িত স্বরে শুধোই আমি।

ছোট্ট একটা শব্দ—খুলে গেল দরজা। তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়লাম বার্থ থেকে। চকিতে আলো জ্বেলে দিয়ে তাকালাম করিডরে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দেখলাম

করিডরের শেষপ্রান্তের সিঁড়ির দুটো-তিনটে ধাপ এক সঙ্গে টপকে বেগে ওপরে উঠে যাচ্ছে একটা কালো ছায়া। পেছন ফিরে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে, চিপারটা পায়ে গলিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম সেদিকে।

কিন্তু চাদর আনতে আর স্লিপার পায়ে গলাতে গিয়ে যে সময় নষ্ট করেছিলাম—তার খেসারত দিতে হল সঙ্গে-সঙ্গেই। ওপরের ডেকে পৌঁছে জলপ্রাণীর চিহ্ন দেখলাম না ধারে-কাছে।

ঘুম তখন একেবারেই ছুটে গেছে চোখ থেকে—তবুও যে কী করা উচিত, তা ভেবে না পেয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর রেলিংয়ের পাশ দিয়ে আস্তে-আস্তে এগোতে লাগলাম গলুইয়ের দিকে। আর তারপরেই আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি।

যে দৃশ্য দেখে দাঁড়ালাম, তা কিন্তু জাহাজের ডেকের ওপর নয়, জলপরী থেকে খানিক দূরে সাদা আশ্চর্য শান্ত সমুদ্রের ওপর। আরব সাগরের জলে দুলতে-দুলতে দ্রুতগতিতে দূর হতে দূরে ভেসে যাচ্ছিল—একটা শার্ট।

অবিশ্বাস্য, কিন্তু তবুও তা সত্য। আর—একী! এ আমার কল্পনা, না চক্ষুভ্রম? ভাসমান শার্টটার ধবধবে বুকে দুধ-সাগরের শুক্তি মুক্তার মতো ঝিকমিক করছে ঠাকুরদার হীরের বোতাম না?

দূরে, দূরে, আরও দূরে চলে গেল শার্টটা—আর ঠাকুরদার একমাত্র উত্তরাধিকারী জলপরীর রেলিংয়ে ভর দিয়ে বিচ্ছেদ-করুণ নয়নে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

হঠাৎ ঠিক পেছনেই একটা স্বর শুনে ধক করে উঠল হৃদযন্ত্রটা।

'কী ব্যাপার, বেড়াচ্ছেন নাকি?'

ঘুরে দাঁড়ালাম।

ডাইনিং সেলুনের ঠিক দরজার কাছে বসে একটা কালো ছায়ামূর্তি, জ্বলন্ত সিগারেটের লাল অগ্নিপ্রান্তটি স্থির হয়ে ছিল মুখের সামনে।

'মিস্টার দেশমুখ যে!' সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাই আমি।

'ধরেছেন ঠিকই। ভারি সুন্দর রাত, না?'

'কতক্ষণ আছেন এখানে?'

'ঘণ্টা দেড়েক তো বটেই। এমন সুন্দর রাতে ঘরে বসে থাকতে মোটেই ভালো লাগে না আমার!'

'আচ্ছা, একটু আগেই এদিকে কে দৌড়ে এল বলুন তো?'

'কে?'

'আমার কেবিনে ঢুকেছিল লোকটা—পিছু নিয়ে এদিকে দৌড়ে এলাম। কিন্তু কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'ব্রোমাইড আছে ঘরে? থাকলে এক ডোজ খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন, স্নায়ুগুলো শান্ত হবে, ভালো ঘুম হবে।'

'কিন্তু—।'

'ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আপনাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোনও প্রাণী আমি দেখিনি।'

'সারাক্ষণ এখানেই ছিলেন তো? কিন্তু সিগারেটটা তো দেখছি এইমাত্র ধরিয়েছেন।' বলি আমি।

'আপনার দুর্ভাগ্যক্রমে এটা আমার তিন নম্বর সিগারেট।' বললেন দেশমুখ। 'আপনি যদি আমি হতাম, তাহলে এত রাতে গোয়েন্দাগিরি অভ্যাস করতাম না ভদ্রসন্তানের ওপর। বাজে ছেলেমানুষি করবেন না মশায়। এখানে এসে পর্যন্ত লক্ষ করছি কেউ বা কারা একটা বিশ্রী ঝামেলার সৃষ্টি করছে নিতান্ত অকারণে। এসবের মধ্যে আমি নেই। শহরের হট্টগোল আর হাড়ভাঙা খাটুনি থেকে দূরে সরে এসেছি শুধু স্বাস্থ্যের খাতিরে—তাই নিরালায় এসে বসেছিলাম এখানে। কথা নেই বার্তা নেই কোত্থেকে আপনি উড়ে এসে শুধু আমার শান্তি ভঙ্গ করেই ক্ষান্ত হলেন না, ফট করে আমার সিগারেট সম্বন্ধে একটা নোংরা ইঙ্গিতও করে ফেললেন।'

'মাপ করবেন। আমি শুধু—।'

'শুধু কী?'

'বলতে চাই যে সমুদ্রের শোভা দেখতে-দেখতে আপনি এমনই তন্ময় হয়ে গেছিলেন যে লোকটাকে একেবারেই খেয়াল করেননি।'

'ঘরে গিয়ে ঘুমোন—মাথা ঠান্ডা হবে।'

'তা যাচ্ছি।' বলে সরে পড়ি আমি।

চটপট পা চালিয়ে কেবিনে এসে উদ্বিগ্ন চোখে তাকালাম এদিকে সেদিকে। আমার শঙ্কা অমূলক নয়—উধাও হয়েছে শার্টটা! সেই সাথে ঠাকুরদার সুখের হীরের বোতামও! ঠাকুরমা একথা শুনলে না জানি কী ধারণাই করে বসবে আমার সম্বন্ধে।

বার্থের কিনারায় বসে পড়ে মাথায় হাত দিয়ে এই সব কথাই ভাবতে লাগলাম। না বলে শার্ট আনাটা নিশ্চয় কারও মনঃপূত হয়নি। তাই—কিন্তু কে তিনি? শার্টের একমেবাদ্বিতীয়ম স্বত্বাধিকারী নিশ্চয়। তল্লাশি চালানোর সময়ে নিজের শার্ট চিনতে পেরে এই কাণ্ডটি করেছেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি কোনজন? কাল সকালেই বলবাহাদুরকে বেশ কিছু সিলভার টনিক দিয়ে আদায় করতে হবে নামটা।

হাই তুললাম সশব্দে। ব্রোমাইড না খেলেও ঘুমের কোনও অভাব আমার হবে না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই যেন বড় গোলমেলে। মাঝরাতে না বলে কয়ে কারও কেবিনে ঢুকে শার্ট চুরি করাটাই প্রথমত বেজায় বিদঘুটে ব্যাপার; তারপর অত কষ্ট করে নেওয়া শার্ট সাগর জলে বিসর্জন দিয়ে কী পুণ্যলাভ হল জানি না। সোমেশ রায়ের রুপোর টাকার সঙ্গে কি এ অদ্ভুত ব্যাপারের কোনও সম্পর্ক আছে? শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন। ধুত্তোর—মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। কিন্তু দেশমুখ যে তাহা মিথ্যে বলেছে, তা দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট। আবার একটা হাই উঠল। সতৃষ্ণ নয়নে তাকাই উষ্ণ বার্থটার দিকে; তারপর আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এসে লেপার ছেড়ে শুয়ে পড়ি বার্থে।

পরের দিন সকালে বাথরুমের ভেতর তরফদারের গলা ছেড়ে গান গাওয়ার শব্দে ঘুম ছুটে গেল আমার। ভদ্রলোকের গলা অবশ্য খুব খারাপ নয়— চারদিক আঁটা বাথরুমে ঝরনা জলে স্নান করার স্ফূর্তিতে সে গলা আরও খুলে গেছিল।

ঘড়িতে দেখি সাড়ে আটটার ঘর ছুঁই-ছুঁই করছে ছোট কাঁটাটা। উঠি-উঠি করেও উঠতে আর ইচ্ছে হল না। মধুর আলস্যে ঝিমঝিম করছিল দেহ-মন—চেতনার দিক হতে নিশ্চিন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তারই আমেজে। চুপ করে শুয়ে ওই তাকিয়ে রইলাম

পোর্টহোলের পাতলা পর্দাটার দিকে—সকালের ফুরফুরে হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছিল সেটা। ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল বাইরের ঝকঝকে নীল আকাশ—কাঁচা রোদের সোনালি আলোর প্রসাধন লাবণ্যে উজ্জ্বলতর তার সৌন্দর্য। মৃদু ছন্দে দুলতে-দুলতে মসৃণ গতিতে ভেসে চলছিল আমাদের জলপরী; মনে হল, হঠাৎ কি যাদুমন্ত্রবলে নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত, নিঃসীম শান্তিঘেরা কোনও এক স্বপনপুরীতে এসে পড়েছি আমি।

বড় মিষ্টি একটা সুখের পরশ পাচ্ছিলাম অন্তরে—বড় মোলায়েম সে অনুভূতি। যেন খুব আনন্দের একটা অধ্যায় হঠাৎ খুলে গেছে আমার জীবনে—ও, হ্যাঁ, কবিতা। আমায় ভালোবাসে সে। তার কাছে আমি শপথ করেছি টাকাটা খুঁজে বার করার। ফুটফুটে চাঁদের আলোর পাশে কবিতাকে নিয়ে কাজটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম, এখন মনে হল ততটা সহজ নয় নিশ্চয়। যেই নিক না কেন, টাকাটার মূল্য সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল সে; আর, সুযোগ পেলেই বেশ কিছু রজতখণ্ডের বিনিময়ে তাকে হস্তান্তরিত করতে সে দ্বিধা করবে না মোটেই। কিন্তু কে সেই চতুর-চূড়ামণি?

সোমনাথ মুখার্জির কথা মনে পড়ল। ভদ্রলোকের ভুল করে টাই না-আনার আঘাতে গল্পটা যেন কেমনতরো। রাত দেড়টার সময়ে শান্তি আর সৌন্দর্যের উপাসক দেশমুখকে মনে পড়ল নির্জন ডেকের ওপর। ভদ্রলোক দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে কাঁচা মিথ্যাকেও এমন সহজ-সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন যে ধরার ক্ষমতা তাঁর অতি প্রিয়জনেরও থাকে না। মনে পড়ল, গভীর রাতে শার্ট-চোর আগন্তুকের কথা—কিন্তু সত্যিই কি এসেছিল আমার ঘরে? স্বপ্ন নয় তো?

একলাফে নেমে পড়লাম বার্থ থেকে—তন্ন-তন্ন করে খুঁজলাম কেবিনটা। কিন্তু সাদা শার্টের চিহ্নও দেখলাম না কোথাও—শুধু চোখ ধাঁধানো লাল-সবুজ-নীল ম্যানিলা-পুলওভার যেন নীরবে বিদ্রূপ করতে লাগল আমায়। তাহলে কাল রাতের ব্যাপারটা স্বপ্ন নয় মোটেই। এই মুহূর্তে না জানি দূর হতে বহু দূরে কোনও এক অজানা অচেনা রোমাঞ্চের বন্দর অভিমুখে ভেসে চলেছে ঠাকুমার শখের হীরের বোতাম। কোনও বিজন দ্বীপের নরখাদক-গৃহিনী এবার তা সানন্দে ধারণ করবে নাক অথবা কানের ফুটোয়! ঠাকুমা শুনলে কী মনে করবে আমার সম্বন্ধে?

সেই মুহূর্তে অবশ্য ঠাকুমার মনে করা-করি নিয়ে খুব বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলাম না আমি। গোয়েন্দার চরিত্রে অভিনয় করতে যখন চুক্তিবদ্ধ হয়েছি, তখন কাজ শুরু করতেই হবে যেমন করেই হোক। পলাতক শার্টের মালিকের নাম জানাই হবে আমার সর্বপ্রথম কাজ।

ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলাম বলবাহাদুরকে। তখনও সমানে ছপাৎ-ছপাৎ শব্দে স্নান মুখ উপলব্ধি করে চলেছিলেন তৎকালের ভদ্রলোক—কাজেই খটখটে বাজনাসঙ্গীতটা একবার শুনিয়ে দিলাম বাথরুমের দরজায়। কাজ অবশ্য বিশেষ কিছুই হল না, তবে মনটা একটা তৃপ্তি পেল, এই যা।

ভেতরে ঢুকল বাহাদুর—কিন্তু আকর্ণবিস্তৃত হাসিটুকু না নিয়েই। বেশ চিন্তিত মনে হল ওকে।

'সেলাম সাব, বহুৎ তকলিফ আজ।' শুকনো মুখে শুরু করে ও।

'টাকা চুরি গেছে, তো আমাদের আর বিপদের শেষ নেই। আপ কুছ মাংগতা তো জলদি বাতাইয়ে।'

ওর চোখে চোখ রেখে শুধোলাম, 'শার্টটা কোত্থেকে এনেছিলে?'

'জি হাঁ।' নিমেষে উদাসীন হয়ে যায় ও।

'আজই ফেরত দেবে তো ওটা?'

'জি হাঁ।'

'দিতে আর হবে না। কাল রাতে ঘর থেকে চুরি গেছে শার্টটা।'

'জী হাঁ।'

বিস্ময় নেই, আগ্রহ নেই, উৎকণ্ঠা নেই। তাহলে কি বুঝব শার্টবৃত্তান্তের কিছুই অজানা নয় ওর? না, নিছক নেপালি সুলভ অহেতুক জেদে কিছু না জানার ভান করছে? অপলক চোখে তাকালাম ওর দিকে—নিষ্পলক চোখে সেও তাকাল আমার দিকে।

হতাশ হয়ে পড়লাম। চলতে-চলতে হঠাৎ নিরেট পাথরের দেওয়ালের সামনে হোঁচট খেলে যেমন হয়, তেমনি নিরাশ সুরে বললাম, 'বাহাদুর, খবরটা কিন্তু খুবই দরকারি। শার্টটা তুমি কার কাছ থেকে এনেছ তা আমায় জানতেই হবে।'

বার্থের দিকে তাকাল বাহাদুর, তারপর একে-একে বাথরুমের দরজা, পোর্টহোল, সিলিংয়ের ওপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে চোখ রাখল আমার ওপর। বলল, 'ভুল গয়া।'

'কী বললে?' দপ করে জ্বলে উঠি আমি। 'দ্যাখো, ওসব চালাকির চেষ্টা আমার কাছে কোরো না বলে রাখছি। কোত্থেকে এনেছিলে ভালো চাও তো বলে ফেলো চটপট।'

'ভুল গয়া।' উত্তর এল।

আশ্চর্য এই বর্বরগুলো নেপালিগুলো। অতি কষ্টে সামলে নিই নিজেকে।

'এক মিনিট আগেও তো বলছিলে শার্টটা আজই ফেরত দিয়ে আসতে। কোথায় ফেরত দেবে তা না জানলে কাকে দিয়ে আসবে শুনি?'

'ভুল গয়া।' বলে ও।

বাংলা আর নেপাল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। একজনা কটমট করে অগ্নিদৃষ্টি মেলে রইল তাকিয়ে—অপরজন শুধু নির্বিকারভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল তার জ্বলন্ত চক্ষু।

প্রথমে আমিই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। মেজাজ খারাপ করে কোনও লাভ নেই। ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা আর মিষ্টি কথা দিয়ে দেখা যাক কার্যোদ্ধার হয় কি না। পর মুহূর্তেই কাজে প্রয়োগ করলাম নতুন কৌশলই।

ও বলল, 'বাথরুমের দরজায় চাবি দেওয়া সাব? বহুৎ খারাপ, বহুৎ খারাপ।'

'তা যা বলেছ,' বলি আমি। 'যাই হোক, তোমাতে-আমাতে ঝগড়া না করাই ভালো। কাল যা উপকার করেছ, তারপর তো অন্তত নয়ই।'

নিরুত্তরে আমার কোটটার ওপর সবেগে ব্রাশ চালাতে থাকে বাহাদুর।

বিদ্যুতের মতো একটা মতলব ঝলসে উঠল মগজের তন্ত্রীতে।

বললাম, 'কালকের বিপদের কথা তো তুমি জানেই। কাল আরেকজনও এ বিপদে পড়েছিলেন। শুনলাম, টাই আনতে একেবারে ভুলে গেছেন মুখার্জি সাহেব।' একটু বিরতি। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাশ চালাতে থাকে বাহাদুর। 'শুনলাম, পোশাক পরতে গিয়ে উনি দেখলেন যে সবকটা টাই ফেলে এসেছেন বাড়িতে।'

কোটটা নামিয়ে রাখল বাহাদুর।

বলল, 'মোখার্জি সাবকা বহুৎ টাই হ্যায়'

'তাই নাকি?' এমন ভান করি যেন দারুণ ভুল করে ফেলেছি আমি। 'তাহলে তো বিলকুল বাজে কথাই শুনেছি আমি। অনেক টাই এনেছেন তাহলে?'

'বড় একটা বাক্স দেখলাম। দশ-বিশটা তো হবেই।'

'তুমি জানলে কী করে?'

'ওঁকে যে আমিই পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলাম।'

পাছে মুখের ভাব ধরা পড়ে যায়, তাই ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। দারুণ খবর। সোমনাথ মুখার্জির কৈফিয়ৎ তাহলে সত্যই কপোলকল্পিত। ইন্দ্রনাথের শাগরেদি করা সার্থক হয়েছে এতদিনে। রিপোর্টার না হয়ে গোয়েন্দা হলেই দেখছি উন্নতি ছিল অনেক

শার্টের মালিকানা নিয়ে আর মাথা ঘামালাম না।

আনমনা হয়ে পোর্টহোলের মধ্য দিয়ে বাইরের নীল আকাশ দেখতে-দেখতে শুধোলাম, 'পোর্ট ভিক্টোরিয়া কখন পৌঁছচ্ছি বাহাদুর?'

'পৌঁছচ্ছি না,' জবাব এল তৎক্ষণাৎ।

'কী বলছ?' চমকে উঠি আমি।

'বড়া সাবকা বহুৎ গোসসা হো গ্যায়া সাব। সকাল থেকেই বড় ঝামেলা চলছে সবার ওপর।' ওপর থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে এল। 'অভি যা রহা সাব।' বলেই সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল ও বাইরে।

আবার টোকা দিলাম বাথরুমের দরজায়—কোনও সাড়াশব্দ নেই। ধাক্কা দিলাম, নব ধরে বেশ কিছুক্ষণ ঝাঁকানি দিলাম, কিন্তু কোনওরকম প্রত্যুত্তরই পেলাম না ওদিক থেকে। দারুণ রাগ হয়ে গেল। এক ঝটকায় দরজা খুলে বেরিয়ে পাশের দরজায় বেশ সানন্দেই নক করলাম কয়েকবার।

খট করে খুলে গেল দরজা, ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল তরফদারের হাসি-হাসি প্রসন্ন মুখ।

'গুড মর্নিং মিস্টার রায়,' মধুক্ষরা স্বরে বললেন উনি। 'বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

বেশ সংযত স্বরে শুরু করি আমি, 'বাথরুমটায় আপনার-আমার ফিফটি-ফিফটি শেয়ার আছে, কী বলেন?'

'নিশ্চয়-নিশ্চয়', হাসি মুখে ঘাড় নাড়তে থাকেন ভদ্রলোক। 'একথা আর বলতে —যখন খুশি, যেভাবে খুশি আসতে পারেন আপনি।'

এবার আমার সংযম ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়—অতি কষ্টে সামলে নিই নিজেকে। দাঁতে দাঁত দিয়ে বলি কোনওমতে, 'দয়া করে ছিটকিনিটা তাহলে খুলবেন কি?'

'ও-হো। বড় দুঃখিত, সত্যই বড় দুঃখিত' একেবারেই মনে ছিল না আমার। এক মিনিট।' বলেই আমার মুখের ওপরেই দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

চটপট ফিরে এলাম কেবিনে। বাথরুমের দরজায় ক্লিক শব্দ হওয়া মাত্র একলাফে হাজির হলাম ভেতরে।

বললাম, 'আপনার সঙ্গে আজ আমার কিছু কথা আছে।'

'বটে?' ভুরু তোলেন তরফদার। 'তা কথা তো হচ্ছেই। এত কাছাকাছি যখন রয়েছি, তখন ইচ্ছে না থাকলেও উপায় কোথায় বলুন।'

'আমিও তাই বলি। যাই হোক, আমাদের কেবিনের মাঝখানে থেকে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার আছে আমার।'

'ওয়ান্ডারফুল। আপনি তাহলে প্রেস থেকে এসেছেন?'

'একটা দৈনিক পত্রিকায় কাজ করি।'

'তাই নাকি! বিলেতে কিন্তু এ-রকম হয় না।'

'কীরকম হয় না?'

'অভ্যাগত হিসেবে প্রেসম্যানদের আমন্ত্রণ জানানো। আশ্চর্য! অদ্ভুত!'

'জিহ্বা সংবরণ করে বিস্ময় প্রকাশ করার সুযোগ আমার কাজ না শেষ-হওয়া পর্যন্ত দেব আপনাকে। আর, আপাতত নিরালা বাথরুমে একলা স্নান করার ইচ্ছে প্রেসম্যানদেরও থাকে।'

'ওহো, আমি যাচ্ছি।' একটু তপ্ত স্বরেই বলেন তরফদার।

'চমৎকার।' বলে ওঁর পেছনেই কড়াৎ করে টেনে দিলাম লকটা।

ডাইনিং সেলুনে গিয়ে দেখি একসঙ্গে প্রাতরাশ খেতে বসেছেন মিসেস প্যাটেল আর দেশমুখ। দেখে মনে হল বেশ গভীর একটা আলোচনা চলছে দুজনের মধ্যে। আমার সদ্য-নিদ্রোত্থিত আর দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিষ্কার চকচকে মুখ দেখে ওঁরা যে খুব খুশি হয়েছেন, তা মনে হল না।

বললাম, 'গুড মর্নিং। আজ দেখছি প্রত্যেকের দেরি হয়েছে।'

'রোজই।' সায় দেন মিসেস প্যাটেল

সায় দিয়ে বলি, 'অর্ধেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে দেরি হওয়া স্বাভাবিক। রাত করে ঘুমোনো মানেই বেলা করে ব্রেকফাস্ট খাওয়া, কী বলেন মিস্টার দেশমুখ?'

মিসেস প্যাটেল শুধোন, 'মিস্টার দেশমুখ রাত জেগেছিলেন নাকি?'

'রাত প্রায় দেড়টার সময়ে ওঁর সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি লেগে যায় ডেকের ওপর।' নিরীহ স্বরে হাসি-হাসি মুখে বলি আমি

'আপনার তাতে খুশি হওয়াই উচিত মশায়।' অপ্রসন্নভাবে বলেন দেশমুখ। তারপর উদ্দেশ্য করেন মিসেস প্যাটেলকে, 'মাঝরাতে কে যেন ঘরে ঢুকেছে এই রকম একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ডেকের ওপর ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে পাঠাতে কম বেগ পেতে হয়নি আমার।'

ফিক করে অষ্টাদশীর হাসি হাসলেন মিসেস প্যাটেল। তারপর বড়-বড় চোখ করে বললেন, 'তাহলে খুব মজার-মজার স্বপ্ন দেখেন বলুন! ভারি আশ্চর্য তো! আমায় কিন্তু সব কিছুই বলতে হবে। ভালো কথা, আজ আমার একটু মার্কেটে যাওয়ার দরকার ছিল, ভাবছি কার সঙ্গে যাব।'

'আর ভাববেন না।' বলি আমি

'বাঁচালেন আপনি। অনেক ধন্যবাদ।' হাসেন মিসেস প্যাটেল।

'আ—আমি বলতে চাই যে', তাড়াতাড়ি বলি আমি, 'মোটেই পোর্ট ভিক্টোরিয়া যাচ্ছি না আমরা।'

'তার মানে?' প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন দেশমুখ। 'তবে চলেছি কোথায়?'

বললাম, 'আমাকে জিগ্যেস করে কোনও লাভ নেই, মিস্টার দেশমুখ। এইটুকুই শুধু বলতে পারি যে পোর্ট ভিক্টোরিয়ায় অনেক আগেই পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের।'

'কিন্তু এ-সবের অর্থ কী?' উত্তেজিত হয়ে ওঠেন দেশমুখ।

অলোক ঘোষ ঢুকলেন সেলুনে। দুধের মতো ধবধবে সাদা শার্টটা দেখে নিজের অজান্তেই ভাবি ভদ্রলোকের কেবিনটা কোন দিকে। দেশমুখ কিন্তু তৎক্ষণাৎ খবরটা জানিয়ে দিলেন ওঁকে।

'সত্য কথাই শুনেছেন।' বললেন অলোক ঘোষ। 'পোর্ট ভিক্টোরিয়া কেন, কোনও পোর্টের দিকেই যাচ্ছি না আমরা। কাল রাত থেকেই জলের ওপর চরকির মতো পাক দিচ্ছে জলপরী।'

'চরকির মতো পাক দিচ্ছে জলপরী!' পুনরাবৃত্তি করেন দেশমুখ।

'হ্যাঁ। স্রেফ হাওয়া খাচ্ছি আর কী। আরও কতদিন যে খাব, তা জানি না!'

'বুঝলাম না।' হতবুদ্ধি হয়ে যান রাজনীতিবিদ ভদ্রলোক।

মৃদু হাসলেন অলোক ঘোষ।

'সোমেশ রায়কে আমরা ভালো করেই চিনি। অত্যন্ত মূল্যবান একটা জিনিস খোয়া গেছে ওঁর। কাজেই, এ জাহাজের প্রতিটি কর্মচারী, এমনকী অভ্যাগতদেরও ভ্যাকুম ক্লিনার দিয়ে সার্চ না করা পর্যন্ত পোর্টে নামতে দেওয়ার মতো আহাম্মক তিনি নন।' দেশমুখের দিকে শক্ত চোখে তাকিয়ে বলে চলেন অলোক ঘোষ। 'প্রত্যেককেই বলছি, টাকাটা সত্যিই যদি কেউ নিয়ে থাকেন, ফিরিয়ে দিন। না হলে, এ বছরে আর বোম্বাই ফিরতে হবে না কাউকে।'

উঠে দাঁড়ালেন দেশমুখ।

'একী অত্যাচার! সোমেশ রায়ের মনের অবস্থা আমিও বুঝছি। কিন্তু যারা চোর নয়, তাদের এ-জাতীয় নিগ্রহ শুধু অন্যায় নয়, বেআইনিও।' বলে তিনিও শক্ত চোখে তাকালেন অলোক ঘোষের দিকে। 'সোমবার সকলের মধ্যেই আমাকে বোম্বাই ফিরতে হবে—মিঃ রায়কে জানিয়ে দেবেন তো।' বলে লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন সেলুন থেকে।

মিসেস প্যাটেল বললেন, 'আশ্চর্য! আশ্চর্য!' তারপর তিনিও অনুসরণ করলেন দেশমুখকে।

অলোক ঘোষ তাকালেন আমার দিকে—আমি তাকালাম ওঁর দিকে। তারপর একটু সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলি আমি, 'আমার মনে হয় একজন প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দা আনা উচিত এখন।'

ভাবলেশহীন স্বরে বললেন অলোক ঘোষ, 'নিশ্চয় নয়। নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান করার মতো যোগ্যতা মিঃ রায়ের আছে।'

তারপর সব চুপচাপ।

প্রাতঃরাশ শেষ হলে পর বেরোলাম কবিতার সন্ধানে। খোলা ডেকে চোখ-ধাঁধানো রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম ওকে।

'আশ্চর্য!' দেখামাত্র উচ্ছ্বাস জাগে আমার

'তার মানে?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় ও।

'যখন দূরে থাকি, ভাবি না-জানি কত সুন্দরী তুমি। কিন্তু যখনই কাছে পাই, দেখি যা ভেবেছিলাম তার চাইতেও অনেক বেশি তোমার সৌন্দর্য। তাই বলছিলাম—'

'থাক, আর বলতে হবে না। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'উদরদেবকে শান্ত করছিলাম। তোমার বুঝি হয়নি এখনও?'

'অনেক আগেই।'

'সাবাশ।'

'শার্লক হোমস ছিলেন কর্মবীর, তোমার মতো বাক্যবীর ছিলেন না। একসঙ্গে গোয়েন্দাগিরির চুক্তি তো হল কাল—এদিকে সব খবর না শুনাতে পেয়ে যে দম আটকে মরতে চলেছি। সে খেয়ালটা নেই?'

'কুছ পরোয়া নেহি। আমি তোমায় বাঁচাব।'

সোমনাথ মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কাহিনিটা বললাম ওকে। টাইপ্রসঙ্গও বাদ গেল না। কর্নেলবাহাদুরের দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটাও সরস করে শুনিয়ে দিলাম। শুনে কপাল কুঁচকে ওঠে ওর।

অবিশ্বাসের সুরে বলে, 'তুমি বলছ কী, মৃগাঙ্ক! সোমনাথকাকা বাবার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'বেশি ঘনিষ্ঠতাই তো বিপজ্জনক। ভালো কথা, তোমার বাবার খবর কী?'

'সারারাত ঘুমোতে পারেননি উনি। শুনে অবাক হলাম না মোটেই। সাঁইত্রিশ বছর পর এই প্রথম নাকি পিল না নিয়ে রাত্রিযাপন—আশ্চর্য কী! এ ব্যাপারে তুমি যে স্বেচ্ছায় তদন্ত শুরু করেছ তা বলেছি ওঁকে। তোমার বন্ধু গোয়েন্দা শিরোমণি ইন্দ্রনাথের শাগরেদি করে তুমিও যে একটা ছোটখাটো গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ, তাও বলেছি। এমন সুন্দর করে বললাম যে আগাগোড়া বেশ মন দিয়ে শুনলেন বাবা।'

'এই তো চাই। আশীর্বাদ করছি প্রিয়ে, আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই চিরকাল এমনি করেই যেন স্বয়ং সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হন তব জিহ্বাগ্রে।'

'বড় যে পুলক দেখছি আজ, ব্যাপার কী?'

ব্যাপার কী, তা বলার আগেই স্বয়ং সোমেশ রায় এসে হাজির হলেন আমাদের মাঝে।

উস্কোখুস্কো চুল, চোখের কোণে রাত জাগার ক্লান্তি-চিহ্ন। বুঝলাম, সত্যিই বড় মানসিক অশান্তিতে রয়েছেন উনি।

'এই যে মিস্টার রায়, কবিতার কাছে শুনলাম আপনি নাকি এই বিশ্রী ব্যাপারে আমায় সাহায্য করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন?'

'লেগেছি ঠিকই। কিন্তু আমার ক্ষমতা এমন কিছু বেশি নয় যে—'

'রাবিশ! অন্তত আমার চেয়ে এসব ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি, আর সেই কারণেই আপনার সাহায্য আমার এখন খুবই দরকার। তাছাড়া'—আশপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেন আবার। 'তাছাড়া অভ্যাগতদের সবাইকেও তো এসব কথা বলা চলে না। কিন্তু আপনি—ইয়ে তুমি আমার ছেলের মতো। আমার পুরো আস্থা রইল তোমার ওপর।'

শেষের শব্দ ক'টি শুনেই বুঝলাম কবিতার কথাই ঠিক। সোমেশ রায়ের সৌজন্যবোধের অন্তরালে যে কী পরিমাণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন আছে, তা আগে থেকে জানা না থাকলে প্রথম আলাপে বুঝে ওঠার সাধ্য কারওরই নেই।

বললাম, 'আপনার কথা শুনে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি, স্যার। কিন্তু একটা প্রশ্ন। টাকাটা উদ্ধার করার জন্যে আপনি নিজে কি কিছু করেছেন?'

'জলপরীর প্রত্যেক কর্মচারীকে জেরা করেছি নিজে। খানসামারাও বাদ যায়নি। প্রত্যেকের দেহ তল্লাশ হয়েছে—ঘরগুলোও বাদ যায়নি। কিন্তু ওদের কাউকেই সন্দেহ হয় না আমার। দিনের বেলায় এক ফাঁকে অভ্যাগতদের মালপত্রগুলোও পরীক্ষা করা হবে। যদিও আতিথেয়তায় কোনও ত্রুটি হতে দেওয়া পছন্দ করি না আমি, তবুও এ ব্যাপারের গুরুত্ব ওসব সেন্টিমেন্টের চেয়ে অনেক বেশি—কাজেই কাউকেই বাদ দেব না আমি। ক্যাপ্টেনকে আদেশ দিয়েছি, কোনও পোর্টের ধারে-কাছেও যাবে না জলপরী। খাবার-দাবার, কয়লা যা আছে তাতে পাঁচদিন পর্যন্ত নির্বিঘ্নে চলে যাবে। দরকার হলে ততদিন পর্যন্ত এইভাবেই ভেসে বেড়াব আমি।'

'চমৎকার ব্যবস্থা,' বলি আমি।

'এছাড়া, বোর্ডে এইমাত্র একটা নোটিশ দিয়ে এলাম—ব্যাগ কি পিস যে ফেরত দেবে, তাকে নগদ চার হাজার টাকা পুরস্কার তো দেবই, উপরন্তু সব রকম জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকেও রেহাই দেওয়া হবে। ওপরে মোটা-মোটা করে 'জরুরি' লিখে দিয়েছি। চোর যদি তুমি হও, তাহলে টাকাটা তোমারই হবে।'

'কিন্তু স্যার, টাকা তো আমি নেব না!' টাকা শব্দটার ওপর যতটা জোর দেব ভেবেছিলাম, ততটা না হওয়ায় একটু ক্ষুণ্ণ হই আমি।

'বাবিশ! কেন নয় শুনি? ও সামান্য টাকায় আমার কোনও ক্ষতিই হবে না। চার হাজার টাকার বিনিময়ে মনের যে শান্তি আমি ফিরে পাব, তার তুলনায় ও টাকা কিছুই নয়। আর যতক্ষণ না তা পাচ্ছি, আমার মতো অসুখী কেউ দুনিয়ায় নেই।'

চট করে কবিতা বলে উঠল, 'বাবাকে সব বলেই না '

'কী বলবে?' চকিত হয়ে ওঠেন সোমেশ রায়।

'ও যা জেনেছে, তা শুনলে অবাক হতে হবে বাবা। বিশ্বাস করা যায় না—'

'কী মুশকিল! এখনও পর্যন্ত তা জানাওনি আমারা? বলো, বলো, কোথায় আমার টাকা?' উত্তেজিত হয়ে ওঠেন বৃদ্ধ সোমেশ রায়।

বললাম, 'সবই বলব। কিন্তু তার আগে আমায় শুধু এক মিনিট সময় দিন। আমি '

'শুধু এক মিনিট? ঠিক আছে—নিলাম। কিন্তু শুধু এক মিনিট—মনে থাকে যেন? এ উদ্বেগের মধ্যে বেশিক্ষণ আর রেখো না আমায়।'

'না স্যার, এখুনি আসছি,' বলে তাড়াতাড়ি পা চালাই আমি।

সোমনাথ মুখার্জির কেবিনে গিয়ে বয়বাহাদুরকে জিগ্যেস করে জানলাম, অত্যন্ত দেরিতে শয্যা ত্যাগ করেই তিনি প্রাতরাশ খেতে গেছেন ডাইনিং সেলুনে।

সন্ধানী চোখে চারদিক দেখে নিই আমি। তারপর শুধোই, 'টাইগুলো গেল কোথায় বাহাদুর?'

'সুটকেসে চাবি দিয়ে রেখেছেন। চাবি সাবের পকেটে।'

মনে-মনে একটু হেসে নিয়ে গেলাম ডাইনিং সেলুনে। একটা টেবিল দখল করে, ধূমায়িত কফির দিকে তাকিয়ে চুরুট টানছিলেন তিনি।

'গুড মর্নিং স্যার।' বললাম আমি।

'গুড মর্নিং। বড় দেরি করে ব্রেকফাস্ট খান দেখছি।' এমন সুরে বললেন যেন এরকম গর্হিত স্বভাব আর দুনিয়ায় নেই।

বললাম, 'ব্রেকফাস্ট অনেক আগেই সেরে নিয়েছি স্যার। এখন এলাম আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে—অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন।'

'আর, যদি মনে করি?'

'তাহলেও আমায় বলতে হবে।' দৃঢ়স্বরে বলি আমি।

চুরুটটা নামিয়ে কঠিন চোখে আমার দিকে তাকালেন সোমনাথ মুখার্জি।

'আমার কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে বাচাল আর সবচেয়ে অসহ্য হলেন আপনি।'

'কী করব বলুন। যা ন্যায়, তাই শুধু বলতে চাই আমি।'

'যারা ভাবে, শুধু ন্যায় করবার জন্যই তাদের জন্ম—তাদের মতো নিরেট মূর্খ দুনিয়ায় আর নেই। কী মতলব এবার শুনি।'

'গতরাতে আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, যা জেনেছি, তা সোমেশ রায়কে বলব না। কিন্তু আমার এ শপথ রক্ষা করা আর সম্ভব হবে না স্যার।'

'বটে! কেন হবে না শুনি?'

'টাই সম্বন্ধে আপনার গল্পটার জন্য। গল্পটা যে সত্য নয়, তা আমি জেনেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার। আপনি বললেন, সোমেশ রায়ের ঘরে টাই আনতে গেছলেন আপনি। আমার মতে ওটা একটা আক্ষরিক ভুল। কেননা আপনি সেখানে টাই নয়, টাকা আনতেই গেছলেন।'

ন্যাপকিনটা আছড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন সোমনাথ মুখার্জি।

বললেন, 'আমার সঙ্গে বাইরে আসবেন কি?'

'নিশ্চয়, স্যার।' ওঁর পেছনে-পেছনে বেরিয়ে এলাম ডেকে। 'সত্যিই বড় দুঃখিত স্যার। কিন্তু কী করব—'

'আমিও—আপনার জন্য। সোমেশ রায় কোন দিকে আছে, জানেন?'

'নিচের ডেকে।'

সেইদিকেই ফিরলেন সোমনাথ মুখার্জি। 'ভালো কথা, ডক্টর তরফদারের ব্যাপার নিয়ে আপনার আর মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমার কাগজের সঙ্গে আপনার আর কোনও সম্পর্ক রইল না।'

'ধন্যবাদ স্যার।' মৃদু হেসে বললাম।

বললাম বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে দমে গেলাম খুবই। প্রেমের শুরু আর চাকরির সারা—অপূর্ব যোগাযোগ।

নিচের ডেকে অধীর আগ্রহে কবিতার সামনে পায়চারি করছিলেন সোমেশ

রায়। আমাদের দেখেই উৎকণ্ঠিত চোখে তাকালেন আমার পানে। তারপর যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসে পড়ে পা নাড়াতে লাগলেন ঘন-ঘন।

কিন্তু সোমনাথ মুখার্জিই প্রথমে কথা বললেন, 'সোমেশ, তোমায় কিছু বলতে চাই আমি।'

'বেশ তো, বলে ফেলো।'

'এই অর্বাচীন ছোকরাটির ধারণা, তোমার টাকাটা আমিই সরিয়েছি।'

'রাবিশ!' মুখ দেখে মনে হল আমার সম্বন্ধে ধারণাটা তাঁর ঠিকে হয়ে আসছে দ্রুত। 'রাবিশ! তুমি যে নেবে না তা আমি জানি।'

'কিন্তু—ইয়ে,' মুখ লাল হয়ে ওঠে সোমনাথ মুখার্জির। 'আমি—আমি', একটা ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি বলে ফেলেন, 'সত্যি কথা বলতে কী সোমেশ, টাকাটা আমিই নিয়েছি।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন সোমেশ রায়।

'কী বললে? আবার বলো!'

'আরে শোনো-শোনো, উত্তেজিত হয়ো না। এ একটা নিছক পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়।'

'পরিহাস! এই বয়েসে পরিহাস! ভীমরতি ধরেছে তোমার? যাক, কোথায় আমার টাকা?'

'আমার কথাটা শোনো আগে। টাকাটার সঙ্গে তোমার মনের কী সম্পর্ক, তা জানার জন্যেই সরিয়েছিলাম ওটা। প্রায় শুনি ও টাকা হারালে নাকি একেবারেই ভেঙে পড়বে তুমি। কিন্তু আমার তা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তোমার মতো একটা শক্ত পুরুষের মনের ওপর সামান্য একটা টাকার অর্থহীন কুসংস্কারের যে কোনও প্রভাবই থাকতে পারে না—তা প্রমাণ করবার জন্যেই গতকাল সন্ধ্যায় তোমার ঘরে চুপিসাড়ে ঢুকে টাকাটা পালটে রেখেছিলাম আমিই।'

'ক্রিমিনাল—হাড়ে হাড়ে তুমি একটা পাকা ক্রিমিনাল। প্রথম থেকেই আমি তা জানি। কিন্তু—'

'তুমি যে এ ব্যাপারে এত গুরুত্ব দেবে, তা তো কল্পনাও করতে পারিনি আমি। এই সম্পর্কেই কয়েকটি কথা বলতে চাই তোমায়। সোমেশ, টাকাটা যে তোমার কী ক্ষতি করেছে, তা বোঝো না কেন? কোনও পুরুষের উচিত নয় এরকম বাজে একটা কুসংস্কারের ওপর জীবনের সাফল্যের ভিত গাঁথা। তোমার তো নয়ই। এই তুচ্ছ কারণে কেন এত অশান্তি ভোগ করছ বলো তো? এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছিলাম তোমায়—'

'তোমার নীতিকথা সংক্ষিপ্ত করে টাকাটা বার করবে কি?'

'ঘরে আছে, এনে দিচ্ছি। যাক, কোনওরকম মন-কষাকষি রইল না তো সোমেশ?'

'থাকবে—যদি না মুখটা বন্ধ করে টাকাটা বার করো তাড়াতাড়ি।'

কেবিনের দিকে গেলেন সোমনাথ মুখার্জি। আর ডেকের এদিক থেকে ওদিকে পায়চারি করতে লাগলেন সোমেশ রায়। ভেতরে-ভেতরে তিনি যে কতখানি উত্তেজিত

হয়েছিলেন, তা তাঁর অস্থিরতা থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল। আত্মসংযম ওঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—কিন্তু সেই মুহূর্তে তার চিহ্নও দেখলাম না ওঁর মধ্যে।

'বুড়ো খোকা কোথাকার!' আপন মনেই গজরাতে থাকেন উনি। 'হল কী ওর? কচি খোকার মতো একী ব্যবহার! পরিহাস! শুনলে তো তুমি, বলে কিনা নিছক পরিহাস!'

সান্ত্বনার ছলে বলে কবিতা, 'কেন উত্তেজিত হচ্ছ বাবা। টাকা তো তুমি পেয়েই যাচ্ছ। মনে রেখো কিন্তু এ জন্য সমস্ত বাহবাটুকুই মৃগাঙ্কর পাওনা।'

'ভারি চালাক ছেলে। এখুনি চেক লিখে দিচ্ছি আমি।'

'এখন থাকুক স্যার,' প্রতিবাদ জানাই আমি। 'এরকম পরিস্থিতিতে ওসব ঝামেলা করবেন না। পরে হবে'খন।'

'রাবিশ! পাকা চোরের মতো—ছি-ছি, কী বিশ্রী ব্যাপার! বুড়ো কোথাকার! এই জন্যেই কোনওদিনই ওকে আমি বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি।'

'বাবা! কী বলছ তুমি! উনি তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।' আহত স্বরে বলে কবিতা।

ঠিক এই মুহূর্তেই ফিরে এলেন সোমনাথ মুখার্জি। আর সেই প্রথম দেখলাম তাঁর সুবিখ্যাত প্রশান্ত-মুখে উত্তেজনার রক্তিম উচ্ছ্বাস।

'সোমেশ, আমি সত্যই একটা গর্দভ।'

'স্বভাব তো সেইরকমই। টাকা কোথায়?'

নীরবে ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন সোমনাথ মুখার্জি। অধীর আগ্রহে সোমেশ রায়ও হাত পাতলেন। আর ওঁর প্রসারিত হাতের তালুতে টুপ করে তিনি ফেলে দিলেন নীল রঙের অশোক স্তম্ভের ছাপওলা একটা কাগজখণ্ড—দাবিমতো ভারত সরকারের এক টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার-পত্র।

'শয়তান!' সিংহের মতো গর্জে উঠলেন সোমেশ রায়।

ক্ষীণ স্বরে জবাব দিলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'টাকাটা যেখানে রেখেছিলাম, সেখানে হাত দিয়ে পেলাম এটা।'

আর একটিও কথা বললেন না সোমেশ রায়। নোটটা দলা পাকিয়ে নিক্ষেপ করলেন ডেকের ওপর। মুখ তাঁর এমনই টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল যে মনে-মনে বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠি আমি।

আবার বলেন সোমনাথ মুখার্জি, 'কী বলব ভেবে পাচ্ছি না সোমেশ। লাখ টাকার বিনিময়েও এ-ব্যাপার আমি ঘটতে দিতাম না। কিন্তু—'

'ক্ষমা! অনুতাপ!' গরগর করে ওঠেন সোমেশ রায়। 'ওসব কে শুনতে চায়? আমি চাই আমার টাকা—বাস, আর কিছু না।'

'নিছক রসিকতা করতে গিয়ে—'

কথাটা আর শেষ হয় না—বোমার মতোই ফেটে পড়েন সোমেশ রায়। 'রসিকতা! পরিহাস! বাঃ চমৎকার! চমৎকার! এই কথাই ভাবছে আরও একজন—চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে। যেখান থেকে শুরু করেছিলাম—ঘুরে-ফিরে সেইখানেই এসে দাঁড়ালাম আবার।'

'একটু শুধু তফাত রইল,' বললেন সোমনাথ মুখার্জি। 'তোমার পাশে এবার আমিও দাঁড়ালাম। তুমি আমি দুজনেই খুঁজে বার করব এ চোরকে। তাই আরও দু-হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করছি চোরকে যে ধরবে তার জন্যে।'

'তাতে কাজ হবে না কিছুই।' বললেন সোমেশ রায়। 'চার হাজারে যদি কোনও সুরাহা না হয়, তাহলে ছ-হাজারেও হবে না। কিন্তু কোনও উপায় তো আর দেখছি না আমি।' বলেই ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে। 'তোমার কি মনে হয়? আর কোনও সূত্রটুত্র আছে?'

করুণ স্বর শুনে মনে-মনে বেশ খুশি হই আমি।

বললাম, 'হ্যাঁ, এখনও একটা আছে।'

'আছে?' নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন তিনি।

'হ্যাঁ, আছে। খুব সামান্য যদিও, তবুও ওই নিয়েই কাজ করতে চাই। ভালো কথা, প্রয়োজনমতো সব কিছু করার অনুমতি চাইছি স্যার। যেমন ধরুন না কেন, অভ্যাগতদের ঘর তল্লাশি, অবশ্য তাঁদের অজান্তেই।'

'যা খুশি তা করবে, কোনও আপত্তি নেই আমার।' বলে সোমনাথ মুখার্জির দিকে ফিরলেন তিনি। 'ছেলেটি আমায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সোম।'

'ও এক আশ্চর্য ছেলে হে!' জবাব আসে তৎক্ষণাৎ।

'সত্যিই তাই। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও পাকড়াও করে এনেছে তোমায়। তাই, দু-নম্বর চোরটাকেও ধরার সুযোগ ওকেই দিচ্ছি আমি।'

'বাবা!' ঈষৎ ভর্ৎসনা মিশোনো সুরে বলে কবিতা।

ডেস্কের ওপর থেকে নতুন পাওয়া নোটটা তুলে নিলাম আমি।

বললাম, 'নোটটা আমার কাছেই রইল স্যার। আর একটা কথা, মিস্টার মুখার্জি, টাকাটা যে আপনার কাছেই ছিল, তা কি আর কেউ জানে?'

'তা—হ্যাঁ, জানে বইকী। পাছে আমার মোটিভের অন্য অর্থ দাঁড়ায়, তাই গোড়াতেই আমি অলোক ঘোষকে সব বলে রেখেছিলাম।'

'কখন বলেছিলেন?'

'গতকাল সন্ধ্যায়—টাকাটা নেওয়ার একটু আগেই। লাকি-পিস যে আমার কেবিনেই আছে, তাও ওকে পরে বলেছিলাম।'

চোখের সামনে গত রাতের একটা দৃশ্য ভেসে উঠল—ব্রিজের আসর বসেছে দুটো টেবিলে। সবাই আছেন সেখানে, নেই কেবল অলোক ঘোষ।

সোমেশ রায় বললেন, 'আর একটা কথা, বাবা, জানি না তোমার কাজে লাগবে কি না খবরটা। সকালে শুনলাম গত বুধবার চুনীলাল দয়াভাইয়ের সঙ্গে একসাথে লাঞ্চ খেয়েছিলেন মিসেস প্যাটেল। দয়াভাই যে আমার পুরোনো শত্রু, তা তো জানেনই। আর আমার লাকি পিসটা পাওয়ার জন্যে ওরা যে কিছুই করতে কুণ্ঠিত নয়—তাও জানি।'

'কার কাছে শুনলেন এ খবর?'

'অলোক ঘোষের কাছে।'

মৃদু হেসে বলি, 'খবরটা খুবই দরকারি। যাই হোক স্যার, কথা দিচ্ছি, আমার যথাসাধ্য করব আমি।'

'তা তো করবে, তা বিশ্বাস করি। ভুলো না—ছ-হাজার টাকা তোমার পকেটে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।'

মনে মনে বলি, তার চাইতেও অনেক বেশি। মুখে বলি, 'ঠিক আছে, স্যার।' বলে, কবিতার পানে একটু হেসে এগিয়ে গেলাম ওপাশে। পেছন থেকে ডাক দিলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'ভালো কথা, রায়। সময় পেলে ডাক্তার তরফদারের প্রবন্ধটা না হয় লিখেই ফেলো। কেদার শর্মা আশা করে রয়েছে তো।'

অল্প হেসে বললাম, 'ধন্যবাদ, স্যার।' কবিতা এসে পড়ায় দুজনে মিলে এগিয়ে গেলাম রেলিংয়ের ধারে।

প্রথমেই শুধোল ও: 'ও কথার মানে কী মৃগ?'

'টাকাটা আবার ফেরত দিলেন। কিছুক্ষণ আগেই পথে বসিয়ে দিয়েছিলেন আমায়—এখন দেখছি আবার ভালোবাসতে শুরু করেছেন। অহো, বিচিত্র এই সংসার। যাক, কতদূর এগোলে তুমি?'

'এক পা-ও নয়।'

'জানতাম আমি। আগে বলো, তারপর বলো কী বলবে।'

'আমি আবার কী বলব?' দুটো ডেক-চেয়ারের একটা দখল করে বলে কবিতা।

'দুজন যুবক-যুবতী একত্র হলে যা বলে, তাই। তুমি বলবে, যৌবন-প্রভাতে এলে তুমি শশাঙ্ক সমান, কী তব প্রার্থনা। আর আমি বলব, ফুলের কঙ্কন গড়ি সাজাইব তোমায়, অশোকের কিশলয়ে গাঁথি দিব হার, মঞ্জুমালিকাখানি জড়াইব ভালে কবরী ঘেরিয়া, অশোকের রক্তকান্তে চিত্রি পদতল, কহিব—আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার।'

'বড় যে উচ্ছ্বাস দেখছি! কী একটা নতুন সূত্রের কথা বলছিলে, তার কী হল?'

'চুলোয় যাক সূত্র। এখন কথা হচ্ছে প্রেমের—'

'প্রেম ছুটে যাবে তোমার বাবার সামনে একথা বললে। বলো, কী সেই সূত্র?'

'কী আবার, একটা শার্ট।'

'শার্ট!'

'উইপ্রসঙ্গ শেষ হয়েছে, এবার শুরু হোক শার্ট-বৃত্তান্ত।' বলে, সব কথা খুলে বললাম ওকে। হনলুলু স্যামের লড়িতে আমার অভিযান, জলপরীতে এসে প্যাকেট খোলার পর আমার মানসিক অবস্থা, বলবাহাদুরের সাহায্য, রাতে চুরি, পরদিন সকালে বাহাদুরের একগুঁয়েমি—সবই পর-পর বলে গেলাম।

শেষ হলে পর কবিতা শুধোল, 'শার্টটা কার বলে মনে হয় তোমার?'

'অলোক ঘোষের। ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা ছোটখাটো ওয়ার্ড্রোব এসেছে বলেই তো মনে হল আমার।'

'মৃগ, অলোক ঘোষ কিন্তু—'

'সত্যি-মিথ্যে জানি না, যা মনে হল তা বললাম। আপাতত আমার প্রথম কাজই হল বলবাহাদুরকে চাপ দিয়ে আসল খবরটা পেট থেকে টেনে বার করা।'

'নেপালিগুলো বড় একগুঁয়ে হয় কিন্তু।' বলে ও।

'খাঁটি কথাই বলেছ। কিন্তু দেখা যাক কার ধৈর্য এবার বেশি।'

'তোমার।'

'তোমাকে ভালোবাসাই তো তার একটা প্রমাণ।' বলেই সিধে স্টার্ন দিই কেবিনের দিকে।

কিন্তু আমায় নিরাশ হতে হল। আমার অটল অধ্যবসায়, প্রভূত আর ধৈর্য সম্বন্ধে কবিতার আর আমার স্থির বিশ্বাসকে টলিয়ে দিয়ে অনড় হয়ে রইল নেপালি নন্দন বলবাহাদুর। একটা শব্দও বার করতে পারলাম না ওর মুখ থেকে। পাক্কা পনেরো মিনিট ধরে সম্ভাব্য সবরকম পন্থা প্রয়োগ করলাম অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে—কিন্তু সব কিছুই নির্বিকার মুখে সহ্য করে মাউন্ট এভারেস্টের মতো অটল হয়ে রইল ও। মিনতি, তোষামোদ, চাকরি যাওয়ার ভয়—সবই হল ব্যর্থ। কুতকুতে মঙ্গোলিয়ান চোখে রহস্য ঘেরা তিব্বতের যাবতীয় রহস্য ফুটিয়ে তুলে শান্তভাবে শুধু তাকিয়ে রইল আমার পানে—শার্টের প্রকৃত অধিকারীর নাম শেষ পর্যন্ত আঁধারেই থেকে গেল। ঠিক এই সময়ে লাঞ্চের বিউগল্ বেজে উঠতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বললাম, 'এখনকার মতো ছেড়ে দিচ্ছি বটে, কিন্তু মনে রেখো, এত সহজে ছাড়ছি না তোমায়।'

'জি হাঁ সাব।' বলে এত সাধের পরও নির্লজ্জভাবে একটু হেসে সরে পড়ল ও।

ডাইনিং সেলুনের দরজার সামনেই পায়চারি করছিল কবিতা।

'কিছু হল?' সাগ্রহে শুধোয় ও।

'বলবাহাদুরের চরণে কোটি প্রণাম আমার।' বলি আমি।

'কিছুই বলল না?'

'দারুণ একগুঁয়ে।'

'ব্যাপার হতে ছেড়ে দাও না?'

'না। এ কাজ আমি একাই শেষ করতে চাই—কারণ না বললেও চলবে নিশ্চয়।'

'কিন্তু তাহলে কী করবে ঠিক করলে?'

'যা সব গোয়েন্দাই করে। ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, প্রিয়ে—'

'তুমোর ধৈর্যের নিকুচি করেছে—গোয়েন্দাগুলোই এইরকম।'

'বলেছ ঠিকই। অনেকদিন আগে একজন ফরাসি ডিটেকটিভের একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম—তখন না বুঝলেও এখন তার মর্মার্থ হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছি। লেখক ভদ্রলোক আরও একটা কথা বলেছিলেন। গোয়েন্দাদের অন্যতম প্রধান হাতিয়ারই হচ্ছে লাক্।'

'তোমার মোটেই তা নেই।'

'পক্ষান্তরে, কাল রাতের ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে দুনিয়ার সেরা লাকি মানুষ এখন আমিই।'

সোমেশ রায় উঠে এলেন নীচ থেকে।

'কী করছ এখানে?' রুক্ষস্বরে শুধোন উনি।

'তদন্ত।' বেশ গম্ভীরভাবে চট করে উত্তর দিই।

'করো, কিন্তু কলাফল যেন ভালো হয়।' ভঙ্গী নেড়ে বললেন উনি।

'আশা আছে তা হবেই।' বলে সবাই মিলে ঢুকলাম সেলুনে।

গত রাতের প্রাণচঞ্চল খুশি-উচ্ছল পরিবেশের চিহ্নও পেলাম না আজকের টেবিলে। প্রত্যেকেই নিঃশব্দে প্লেটের খাদ্য উদরে প্রেরণ করে চললেন, এমনকী টাকা ফিরে না-পাওয়া পর্যন্ত সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার যে অভিশাপ জারি করেছেন সোমেশ রায়—তার বিরুদ্ধেও টুঁ শব্দটি করলেন না কেউ।

খাওয়া শেষ হলে পর লক্ষ করলাম তরফদার গিয়ে ঢুকলেন স্মোকিং রুমে। পিছু পিছু আমিও এলাম—এসে বসলাম ঠিক তাঁর বিপরীত দিকের চেয়ারটায়। তারপর কেস খুলে অফার করলাম একটা সিগারেট।

সন্দিগ্ধভাবে সিগারেটটা তুলে নিলেন তরফদার—অগ্নিসংযোগও করলেন সেইভাবে। যদিও সিগারেটটা অত্যন্ত দামি, তবুও ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল, যা ভয় করেছিলেন তিনি তাই হয়েছে।

বললাম, 'আপত্তি না থাকলে আমাদের ইন্টারভিউ এখানেই শুরু করে নেওয়া যাক, কী বলেন?'

'যথা অভিরুচি। কিন্তু নোটবই কই আপনার?'

'নোটবই? ওহো—শুনুন। শুধু নভেল-নাটকের রিপোর্টাররাই সঙ্গে নোটবুক নিয়ে বেড়ায়—সবাই নয়।'

প্রতিবাদের সুরে বললেন তরফদার, 'কিন্তু আমি বলব এক, আর আপনি লিখবেন আর-এক—তা চলবে না।'

'ঘাবড়াবেন না। ভগবান দু-দুটো টেপ-রেকর্ডের মতো কান আমায় দিয়েছেন।'

'কী শুনতে চান বলুন তাহলে।'

'খুব ছোট্ট, অথচ যা দিয়ে বেশ জোরালো হেডলাইন লেখা যায়, এই রকম কিছু হলেই ভালো হয়।'

'কিন্তু আমার স্টাইল তো সে-রকম নয়। ও ধরনের সস্তা কায়দা দু'চক্ষে দেখতে পারি না আমি—অত্যন্ত বাজে রুচির পরিচয় ওটা। ওসব থাক। সিংহলবাসীদের সম্বন্ধে কিছু বলি শুনুন। সত্যিই আশ্চর্য মানুষ ওরা—প্রশংসা করার মতো।'

'তারপর?' নিস্পৃহ স্বরে শুধোই আমি।

শুরু করলেন তরফদার। নিঃসন্দেহে, কথা বলার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে ভদ্রলোকের। ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর অভিজ্ঞতা সরসভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলে চললেন তিনি—আমি শুধু মধ্যে-মধ্যে দু-একটি প্রশ্ন দিয়ে অব্যাহত রাখলাম তাঁর কথার স্রোত। মিনিট দশেক কেটে গেল—আর, তারপরেই—ডলপরীর সেকেন্ড অফিসার ঢুকলেন ঘরে।

'আপনার চিঠি, মিস্টার রায়।' বলে একটা খাম তুলে দিলেন আমার হাতে।

'এক মিনিট।' বলে খুলে ফেললাম খামটা।

ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়েছেন কেদার শর্মা বোম্বাই থেকে।

'ইন্টারভিউয়ের আর দরকার নেই। টেলিগ্রামে খবর পেলাম এইমাত্র। স্বভাব

চরিত্র খুবই খারাপ ভদ্রলোকের! কলম্বোর বাঙালিসমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন শুধু তাঁর শার্টের জন্য।'

আবার শার্ট!

'কী ব্যাপার? খুব দরকারি তথ্য নাকি?' শুধোলেন তরফদার।

'তেমন কিছু নয়। আপনি আবার শুরু করুন।'

শুরু হল বটে, কিন্তু আমার আর মন রইল না সেদিকে। ইন্টারভিউয়ের উৎসাহ নিভে গিয়ে তখন আবার টাকা-অনুসন্ধান পর্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে মগজে। শার্ট! কলম্বোর বাঙালি-সমাজ নাকি ভদ্রলোকের শার্ট পছন্দ করে উঠতে পারেননি। কিন্তু কেন?...তরফদারের শার্টগুলো পরীক্ষা করে দেখলেই বোধহয় এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে পারি...তবে...

'এর বেশি তো আর কিছুই বলার নেই আমার। আশা করি, এতেই হবে?' কাহিনির উপসংহার টানেন তরফদার।

'নিশ্চয়। প্রচুর বলেছেন আপনি। এতেই হবে।' আন্তরিকভাবেই বলি আমি। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলি, 'সিংহলকে এত ভালোবাসা সত্ত্বেও কেন যে ছেড়ে এলেন, তা ভেবে সত্যিই অবাক হয়ে যাই আমি।'

কপাল কুঁচকে ওঠে তরফদারের। সন্দিগ্ধ স্বরে বলেন, 'হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম, বাবার খুব শরীর খারাপ। সেই যে এলাম, সংসারের নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ায় আর যাওয়া হল না ওদিকে। তবে ইচ্ছে আছে, শিগগিরই স্থায়ীভাবেই ফিরে যাব ওদেশে।'

'যাওয়া উচিত।' বলে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি আমি।

যাচ্ছিলাম কেবিনের দিকেই। পরিস্থিতি দ্রুত পালটে যাচ্ছে—আলোর নিশানা যেন পাচ্ছি। এখন নির্জনে বসে ধীর মস্তিষ্কে কিছু চিন্তার দরকার। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম কলবাহাদুরের সঙ্গে।

তৎক্ষণাৎ টানতে-টানতে নিয়ে এলাম ওকে আমার কেবিনে।

'ফরমাইয়ে সাব?' নিরীহভাবে বলে ও।

তর্জনী নাড়তে-নাড়তে নাটকীয় কায়দায় শুরু করি আমি, 'শার্টটা তরফদার সাহেবের?'

'জি হাঁ। কে বললে আপনাকে?' কথাটা বলে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ও।

'যেই বলুক। মোটের ওপর তোমার আর কোনও বিপদ নেই। এখন বলো দিকি কী করে সরিয়েছিলে শার্টটা?'

'ও সাহেবের দুটো শার্ট আর আপনার একটাও নেই। উনি যখন তখন গালিগালাজ করতেন আমায়—তাই ওঘর থেকে একটা শার্ট এনে দিয়েছিলাম আপনাকে। কেন করব না বলুন?'

'আলবাৎ করবে। একশোবার করবে। কিন্তু একথা আমায় আগে বলোনি কেন?'

'কাল রাত প্রায় বারোটার সময়ে উনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমায়। আমি নাকি তাঁর একটা শার্ট চুরি করে আপনাকে দিয়েছি। আমি অবশ্য স্বীকার করিনি কিছুই। কিন্তু উনি বললেন, নিয়েছি বেশ করেছি, কিন্তু শার্টটা কার, তা যদি কাউকে না বলি, তা হলেই নগদ পঞ্চাশ টাকা বকশিস দেবেন উনি। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলাম আমি।' মুখ অন্ধকার

হয়ে গেল ওর। 'পঞ্চাশটা টাকা আমার গেল।'

'টাকা পাওনি তুমি?'

'একটা টাকা শুধু আগাম দিয়েছিলেন।'

'কই, দেখি সে টাকাটা।'

কড়কড়ে একটা ব্যাঙ্ক নোট আমার হাতে তুলে দেয় বাহাদুর।

শুধোলাম, 'এই টাকাটাই দিয়েছিলেন উনি?'

'জি হাঁ সাব।'

পকেট হাতড়ে সাবানের কেস থেকে পাওয়া একটা রুপোর টাকা বার করলাম। উলটে-পালটে দেখে দিয়ে দিলাম ওর হাতে।

'তোমার টাকাটা আমার কাছেই রইল বাহাদুর। আর শোনো, আজ থেকে কিন্তু আমরা দোস্ত। রাজি?'

'জি হাঁ সাব।' দন্তপংক্তি বিকশিত করে নেপালি নন্দন।

'বেশ, তাহলে যা বলি মন দিয়ে শোনো। তোমার বড়সাহেব, সোমেশ রায় রুপোর টাকাটি খুঁজে বার করার ভার আমাকেই দিয়েছেন। আর, আমার দোস্ত হলে তুমি—কাজেই আমাদের কোনও কথা তরফদার সাহেবের কাছে বলবে না, কেমন? যদি বলো, বিপদের শেষ থাকবে না—চাকরিটিও যাবে।'

'বুঝেছি।'

'বেশ। তরফদার সাহেবের বাকি শার্টটা আমি একবার দেখতে চাই বাহাদুর।'

'উঁহু। সুটকেসে চাবি দিয়ে রেখেছেন উনি।'

'জানতাম। তবুও ঘরটা একবার পরীক্ষা করতে হবে। চট করে দেখে এসো দিকি, ওঘরে কেউ আছে কি না।'

বাথরুমের ভেতর দিয়ে ওপাশে গেল বাহাদুর—সেকেন্ড কয়েক পরেই ফিরে এসে জানালে, কেউ নেই।

'চমৎকার।'

করিডরে পাহারায় রাখলুম বাহাদুরকে। তারপর পালাবার পথ হিসাবে বাথরুমের দরজা খুলে রেখে তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করলাম ঘরটা। কিন্তু পেলাম না কিছুই। মস্ত বড় একটা সুটকেসে তালা লাগানো ছিল। দেখেই বুঝলাম, ধূর্ত শিরোমণি তরফদার শার্টটিকে ওর মধ্যে বন্দি করে রেখে তবে কেবিন ছেড়ে গেছেন বাইরে।

হতাশ হয়ে কেবিনে ফিরে এসে ডাকলাম বাহাদুরকে। সব শুনে ও বলল, 'সুটকেসটা খুলতে চান?'

'খুললে তো ভালোই হয়।' বলি আমি।

'আমার মনে হয় টাকাটা ওর মধ্যেই আছে।'

'অসম্ভব নয়।'

'বড় শক্ত তালা।'

'তাও লক্ষ করেছ? শাবাশ! আচ্ছা, দেখা যাক, সবুরে মেওয়া ফলে। শার্ট তো ওঁকে পরতেই হবে—তখন দেখব।'

বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠতেই সবেগে প্রস্থান করল বাহাদুর।

বার্থে শুয়ে নতুন পরিস্থিতিগুলো ভালো করে ভেবে নিলাম। গত রাতে তাহলে তরফদারের শার্ট পরেই ডিনার খেয়েছি আমি। সুতরাং রাতের আগন্তুক যে তরফদার স্বয়ং—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই আর থাকছে না। নিজের জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কী অভিনব পন্থা! ওঁর পিছু ধরেছি, তা বুঝেই নিজের ঘরে ঢোকবার সাহস আর ভদ্রলোকের হয়নি। আর সেই কারণেই শার্টটা ফেলে দিয়েছেন সাগরের জলে। কিন্তু সামান্য একটা সাদা শার্ট নিয়ে কেন ঝামেলা, বুঝলাম না। সোমেশ রায়ের রুপোর টাকার সঙ্গে কি এর কোনও সম্পর্ক আছে? নিশ্চয় আছে—অন্তত আমার তো মনে হয় তাই।

কেবিন থেকে বেরিয়ে ওপরের ডেকে এলাম। জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখলাম না আশপাশে।

ও-পাশের ছায়া-ছায়া কোণের ডেক-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে বসলাম আরাম করে। সমস্যাটা কিন্তু অদ্ভুত একটা পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে এখন। তরফদারের সুটকেসটা খুলতেই হবে আমায়—কিন্তু কী করে?

ডেকের ওপর ভারী-ভারী পায়ের শব্দ শুনলাম—পাশ দিয়ে চলে গেলেন দেশমুখ। ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না—কথাও বললেন না। খুব চিন্তিত মনে হল ওঁকে। দেখে আবার চিন্তার আবর্ত পাক দিয়ে ওঠে মাথার মধ্যে। ভুল সূত্র নিয়ে সময় নষ্ট করছি না তো! দেশমুখ, অলোক ঘোষ, মিসেস প্যাটেল—প্রত্যেককেই সন্দেহ হয় আমার। কিন্তু—

কিন্তু না। আপাতত শার্ট-সূত্রই অনুসরণ করব আমি—দেখাই যাক না কোথায় পৌঁছই। তরফদারের ব্যাগের ভেতর কী আছে তা আমায় দেখতেই হবে। শখের গোয়েন্দারা এ-ক্ষেত্রে কী করত? তালাটা ভাঙত নিশ্চয়। উঁহু, সে বড় নিষ্ঠুর পদ্ধতি। ওর চাইতে চাবিটা সংগ্রহ করা ভালো। কিন্তু করি কী করে?

পুরো বিশ মিনিট কেটে গেল এই একই চিন্তায়—তারপরই চকিতে একটা মতলব এল মাথায়। তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে এগোলাম—স্মোকিং রুমের দরজায় পৌঁছে দেখি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন তরফদার।

বললাম, 'আপনার প্রবন্ধের কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ। এ সম্পর্কে একটা ফোটোগ্রাফ দরকার আমার।'

এস্তে উত্তর দেন তরফদার, 'না, না, ওসব পছন্দ হয় না আমার।'

'আপনার ফোটোর কথা বলছি না আমি। সিলোনে থাকার সময়ে কোনও ফটো তোলেননি ওখানকার?'

'তা তুলেছি। ঠিক আছে, পরে দেখব।'

হাসিমুখে বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, প্রবন্ধটা লিখতে-লিখতে উঠে এলাম শুধু ফোটোর জন্যেই।'

মুহূর্তের জন্যে স্থির চোখে আমার দিকে তাকালেন তরফদার। তারপর বললেন, 'বেশ তো, আসুন আমার সঙ্গে।'

কোনও কিছু যাতে চোখ এড়িয়ে না যায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে পিছু নিলাম ভদ্রলোকের। দরজার সামনে পৌঁছে উনি একগোছা চাবি বার করলেন পকেট থেকে। আর চেষ্টাকৃত অনাগ্রহ চোখে তাকিয়ে রইলাম আমি।

বললেন, 'সুটকেসে সব সময়ে চাবি দিয়ে রাখি আজকাল। যেভাবে জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছে, বিশ্বাস হয় না কাউকেই।'

'তা যা বলেছেন!' সায় দিই আমি।

সুটকেসের ওপর ঝুঁকে পড়লেন তরফদার এবং পরক্ষণেই ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠলেন, 'একী!'

দেখি, অতবড় তালাটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ঝুলছে সুটকেসের আংটা থেকে।

রাগে লাল হয়ে ওঠে ভদ্রলোকের মুখ। 'একী জঘন্য ব্যাপার! কী বিশ্রী কাণ্ড! এর একটা হেস্তনেস্ত আমি আজই করব—ঢের হয়েছে, আর না। একদল চোরের মাঝে এভাবে থাকা কোনও ভদ্রসন্তানের শোভা পায় না।' ক্ষিপ্র হাতে সুটকেসের ভেতরটা পরীক্ষা করতে থাকেন উনি।

'কিছু হারিয়েছে নাকি?' সহানুভূতির সুরে শুধোই আমি।

'মনে তো হচ্ছে না।' একটু ঠান্ডা হন ভদ্রলোক। 'কিন্তু কিছু হারানোটা বড় কথা নয়—সব কিছুর সীমা আছে। সোমেশ রায়ের সঙ্গে আজই একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে আমার।' একটা খাম বার করে বললেন, 'ফোটোগুলো এর মধ্যেই আছে। আপনার যেগুলো দরকার নিয়ে বাকিগুলো ফেরত দিয়ে যান, কেমন?'

'নিশ্চয়,' কিন্তু যাওয়ার কোনও চেষ্টা করি না আমি। অনেক আশা নিয়েই বলি, 'আপনি বরং মিস্টার রায়কে ডেকে নিয়ে আসুন—আমি আপনার জিনিসগুলোর ওপর নজর রাখছি।'

স্থির চোখে তরফদার তাকালেন আমার দিকে। আমার কল্পনা কি না জানি না, কিন্তু স্পষ্ট মনে হল যেন ওঁর ঠোঁটের কোণ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়ল অত্যন্ত নিগূঢ় প্রকৃতির কুটিল এক হাসি।

'অনেক ধন্যবাদ। মিস্টার রায়কে আমি এ-ঘরেই ডেকে পাঠাচ্ছি। আপাতত ঘর ফাঁকা রেখে বাইরে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে আমার নেই—এমনকী আপনার আগ্রহ থাকলেও নয়।'

আপনার আগ্রহ থাকলেও নয়। এ কথার অর্থ? আমি যে ওঁর পেছনে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছি, তা কি জেনে ফেলেছেন, না, স্রেফ আন্দাজের ওপর ঢিল ছুড়লেন অন্ধকারে?

'ইয়ে—তা তো ভালোই।' আমতা-আমতা করে সরে পড়ি আমি।

ঘরে এসে আবার নতুন করে ভাবতে বসি। 'আপনার আগ্রহ থাকলেও নয়', একথা বলার অর্থ? সুটকেসের তালাটাই বা ভাঙল কে? তাহলে শুধু তরফদারকেই সন্দেহ করা চলে না এ ব্যাপারে—আরও অনেকেই ওত পেতে রয়েছেন সুযোগের প্রতীক্ষায়!

একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম বার্থে। মনটা কিন্তু রইল পাশের কেবিনে।

পুরো এক ঘণ্টা কেটে গেল—কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না ওদিকে। তরফদার তাহলে সত্যিই ঘর পাহারা দিতে বসেছেন।

অবসাদে, ক্লান্তিতে, বিশেষ করে বহুদিন পরে কিছু চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় উদরস্থ করার ফলে বেশ ঘুম-ঘুম পাচ্ছিল। দিবানিদ্রার অভ্যাস যদিও ছিল না, তবুও সেদিনের সেই নিশ্চিন্ত অপরাহ্ণের তন্দ্রা-জড়ানো আবেশ বড় মধুময় মনে হল আমার কাছে। কেদার

শর্মার খিঁচুনি নেই, নেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটোছুটি করে সন্ধের আগেই কাগজ বার করার গুরুদায়িত্ব—আছে শুধু জলের মৃদু ছলছল সঙ্গীত, এঞ্জিনের গুঞ্জন আর ফুরফুরে হাওয়া। আর সেইসাথে নির্ঝঞ্ঝাট, নিরুপদ্রব, অনাবিল শান্তির কোলে ধীরে-ধীরে গা এলিয়ে দেওয়া।...

ঘুম ভাঙল দরজায় নক করার শব্দে।

ধড়মড় করে উঠে দেখি, ওপরের ডেকের একজন কর্মচারী।

'আপনাকে ওপরে ডাকছেন।' বিনীতভাবে জানালে সে।

আমাকে ডাকছেন? আবার কী হল? রুপোর টাকা নিয়ে নতুন কোনও জটিলতার সৃষ্টি, না টাকটার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন? তাড়াতাড়ি চুলটা আঁচড়ে নিয়ে ছুটলাম ওপরে।

সিঁড়ির গোড়াতেই দেখা হয়ে গেল পিসিমার সঙ্গে।

'এই যে, তোমাকেই খুঁজছিলাম। ব্রিজের টেবিলে একজন কম পড়ল বলে ডাকলাম তোমায়। অসুবিধে হল না তো?'

বুঝলাম ফাঁদে পড়েছি। অসহায়ভাবে তাকালাম এদিকে-ওদিকে।

'আ-আমি ভাবলাম বুঝি দারুণ দরকারি কিছু।' তোতলাতে শুরু করি আমি।

'ও।'

'তা ছাড়া, ইয়ে—আমি না খেললেই কিন্তু ভালো হতো। জানেন তো কী বিশ্রী খেলি আমি।'

'অভ্যাস করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোমায় কতকগুলো পয়েন্ট শিখিয়ে দেব'খন।'

'তাহলে তো ভালোই হয়। কিন্তু, ইয়ে—একটা জরুরি কাজ রয়েছে হাতে। তাছাড়া আমি তো ভালো দেখতেও পাই না।'

'তা আমি আগেই লক্ষ করেছি। গতকাল যখন সাহেব ফেলা উচিত, টি করে তুমি সেখানে দশ ফেলে দিয়েছিলে। চোখ খারাপ তো কী হয়েছে, টেবিলটা আলোর নিচেই রাখব'খন। চলে এসো।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।' আত্মসমর্পণ করি আমি।

আমার কীসে ভালো হয়, আর কীসে খারাপ হয়, তা দেখার চোখ পিসিমার ছিল না। আমাকে যে পাকড়াও করে বাগে এনে ফেলেছেন, এইটেই ওঁর সবচেয়ে বড় তৃপ্তি। ওঁর মতে যদিও আমি আদর্শ ব্রিজ-খেলোয়াড় নই, তবু একটি কারণে আমায় খুব পছন্দ করেন উনি। নিত্য নতুন নিয়ম বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়ায় আমার ওপর খুব খুশি ছিলেন তিনি। সচল বিহ্বলচলের পিছু-পিছু সেলুনে ঢুকতে-ঢুকতে বিপন্নভাবে তাকালাম আশপাশে কবিতার আশায়। কিন্তু ধারেকাছে ওর চিহ্নও দেখলাম না। মুখ অন্ধকার করে একটা টেবিলে বসেছিলেন অলোক ঘোষ আর সোমনাথ মুখার্জি—সদ্য-কেনা বন্দি ক্রীতদাসের মতো তাঁদের মুখচ্ছবি দেখে মনে-মনে বেশ হৃষ্ট হলাম আমি। তাঁকিয়ে বসলেন পিসিমা—শুরু হল খেলা। সে দীর্ঘ যন্ত্রণার আর বর্ণনা দেব না। প্রত্যেক হাতের তাস শেষ হওয়ার পর খেলা থামিয়ে প্রত্যেকের ভুল-ত্রুটি শুধরে দিতে লাগলেন পিসিমা। আর আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ করতে লাগলাম তাঁর আশ্চর্য সৃজনী-প্রতিভা আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

ডিনারের বিউগল বাজার কিছুক্ষণ আগে কবিতা এসে মুক্তি দিল আমাদের। পিসিমা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন আমার ওপর—আমার অজ্ঞতার ফলে যে তিনি ডুবতে বসেছেন, তা প্রতি দু-মিনিট অন্তর সরবে ঘোষণা করছিলেন প্রত্যেকের কাছে।

বাইরে এসে বললাম, 'আমার ওপর দারুণ চটেছেন উনি—ওঁর সব সিগন্যাল মিশিয়ে ফেলেছি আমি।'

হাসিমুখে কবিতা সায় দেয়, 'মাঝে-মাঝে পিসিমা সত্যিই বড় অসহ্য হয়ে ওঠে। তুমি না খেললেই পারতে।'

'খেলার কোনও ইচ্ছেই ছিল না আমার—কতটা সময় নষ্ট হল বলো তো। এতক্ষণে অনেকটা কাজ এগিয়ে যেত আমার।'

'তার মানে? অনেক কিছুই জেনে ফেলেছ মনে হচ্ছে?'

'তা জেনেছি।' বলে তরফদার সম্পর্কে কেদার শর্মার বেতার-বার্তা আর তরফদারের সুটকেসের তলা ভাঙার কাহিনি শুনিয়ে দিলাম ওকে।

সব শুনে ও বললে, 'তাহলে এখন তোমার কাজের প্রোগ্রাম কী শুনি?'

'পরে বলব, হাতে একদম সময় নেই এখন।' বলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি কেবিনে। বাথরুমের দরজা ঠেলে দেখি ওপাশ থেকে চাবি লাগানো। জোরে কয়েকবার নক করে আর ডেকেও কারও সাড়া পেলাম না ওদিকে। অগত্যা ওপাশ দিয়ে গিয়ে দরজা খোলা ছাড়া কোনও উপায় আর দেখলাম না।

তরফদারের কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় নক করতে গিয়েও হাত নামিয়ে নিলাম। ভাবলাম, এই তো সুযোগ। কাজেই নিঃশব্দে দরজা খুলে পা টিপে-টিপে ঢুকলাম ভেতরে।

কেবিনের আধো-আলো আধো-আঁধারের মাঝে মালপত্র ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতেই হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল আমার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া।

পোর্টহোলের ঠিক নিচেই একটা সেটির ওপর অন্ধকারের মধ্যেই দেখলাম ধবধবে সাদা একটা বস্তু—তরফদারের শার্ট।

সবে শার্টটায় হাত দিয়েছি—হঠাৎ বাথরুমে অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলাম আমি। চকিতে শার্টের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিলাম বটে—কিন্তু ওই ছোট্ট মুহূর্তটাতেই মস্ত এক আবিষ্কার করে ফেললাম। পরক্ষণেই বাথরুমের দরজায় আবির্ভূত হলেন তরফদার স্বয়ং।

'একী! কী করছেন আপনি এখানে? ঘরে ঢোকার আগে দরজায় নক করা যে সাধারণ ভদ্রতা, তাও কি আপনাদের পেশায় শেখায় না?'

কাঁচুমাচু মুখে বলি, 'মাপ করবেন, ওদিক থেকে নক করে কারও সাড়া না পেয়ে এদিক দিয়ে বাথরুমের দরজাটা খুলতে যাচ্ছিলাম—আপনি যে চুপ করে ভেতরে বসে আছেন, তা কী করে জানব?'

দাড়ি কামাতে-কামাতে বেরিয়ে এসেছিলেন ভদ্রলোক—এখন আবার সেফটি রেজারখানা তুলে নিয়ে বললেন, 'আমি ঘরে বসে থাকি কি দাঁড়িয়ে থাকি—তা আপনার দেখার দরকার নেই। ভবিষ্যতে ঘরে ঢোকার আগে নক করে ঢুকলেই খুশি হব আমি।'

তরফদারের বাক্যবাণগুলো কানে ঢুকলেও মাথা পর্যন্ত আর পৌঁছচ্ছিল না। ভদ্রলোকের সব রহস্যই জেনে ফেলেছি আমি—কিন্তু তবুও আমার নাটকীয় দৃশ্যলোভী মনটা তৎক্ষণাৎ কিছু করতে রাজি হল না। আধো-অন্ধকার একটা কেবিনে দুজনের মধ্যে খোলাখুলি না করে সকলের সামনে ধাপে-ধাপে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে মুখোশ খোলার দৃশ্য ভাবতেই পুলকিত হয়ে উঠলাম আমি।

বললাম, 'মাপ করবেন—সত্যিই খুব অন্যায় হয়ে গেছে।'

'এ কী অত্যাচার বলুন তো?' তবুও ফুলতে থাকেন ভদ্রলোক। 'প্রথমে ভাঙল সুটকেসের তালা, তারপর বলা নেই কওয়া নেই ভূতের মতো ঘুরে ঢুকে পড়লেন আপনি—এ সব কী?' পিছু-পিছু এসে আমার পেছনেই দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

করিডরে আসার পর কিন্তু অবিমিশ্র আনন্দে চনমন করে উঠল দেহমন। এত সহজে যে বিশ্বাস করা চলে না, কিন্তু তবুও তা সত্যি! সত্যিই ধড়িবাজ বটে তারাপদ তরফদার, কিন্তু গোয়েন্দাপ্রবর মৃগাঙ্ক রায় যে ধড়িবাজ-শিরোমণি, তা এবার ভদ্রলোক টের পাবেন হাড়ে-হাড়ে। রুপোর টাকা যে কোন গোপন কন্দরে গুপ্তিময়, তা আর অজানা নয় আমার কাছে।

কিন্তু এই চাঞ্চল্যকর নাটক মঞ্চস্থ করার আগে সোমেশ রায়ের সঙ্গে কিছু কথা বলার দরকার। পা টিপে-টিপে করিডরের শেষে এসে নক করলাম ওঁর ঘরে। ওঁর দরজা খুলেই কবিতাকে দেখে হৃদয়টা যেন ময়ূরের মতোই নেচে উঠল। অনুরাগিণী কন্যার মতোই বাবার ড্রেস-টাই বেঁধে দিচ্ছিল ও। আমাকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সোমেশ রায়।

'কতদূর?' ঘাড় ফেরাতে গিয়ে নটটাই খারাপ হয়ে যায় ওঁর।

'কাজ প্রায় শেষ।' খুশি-খুশি স্বরে বলি আমি।

'টাকাটা?'

'কোথায় আমি জানি—পাওয়ারই সামিল।'

'মোটেই নয়।' মুখটা আবার অন্ধকার হয়ে যায় ওঁর। 'যাক, কোথায় আছে শুনি?'

'যথাসময়ে তা বলব। আজ ডিনার শেষ হলে ছোটোখাটো একটা নাটকের অবতারণা করতে চাই। কফি শেষ হলে পর ডাইনিং সেলুন থেকে 'পার্সার' আর মিসেস প্যাটেলকে নিয়ে কবিতা তুমি বাইরে চলে যেও—ঘরে থাকব শুধু আমরা।'

'কী—এত বড় নাটকটা আমি দেখতে পাব না? না, আমি যাব না।'

'কবিতা—ও যা বলে শোন।' তিরস্কার মিশনো স্বরে বললেন সোমেশ রায়।

'কিন্তু বাবা—'

'কবিতা!'

'বেশ, মৃগাঙ্ক যদি বেশি জানে বলে মনে করে, তবে তাই হবে।'

'নিশ্চয় ও বেশি জানে—অন্তত আমাদের চেয়ে তো বেশি।'

বললাম, 'কতকগুলো অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটতে পারে—তাই মেয়েদের সেখানে থাকা সমীচীন নয় মোটেই। আর স্যার, আপনার সাহায্য তখন খুবই দরকার আমার।

আমি যাই বলি না কেন, তৎক্ষণাৎ আপনি সায় দেবেন তাতে। ব্যস, বাকি যা করবার আমিই করব।'

'নিশ্চয়, সে আর বলতে! তবে যদি একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে—'

'তা দিচ্ছি।' বলে কেলর শার্টের ভেতর-বার্তাটা তুলে দিই ওঁর হাতে। 'পড়ে দেখুন।'

পড়লেন সোমেশ রায়।

'কার কথা হচ্ছে? তরফদারের নয় নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, স্যার, তরফদারেরই।'

'আশ্চর্য! এ যে কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু ওর শার্টের কথা কী লিখেছে, তা তো বুঝলাম না।'

'এখন বললে বিশ্বাস হবে না আপনার, ডিনারের পর আমি নিজেই দেখিয়ে দেব আপনাকে।'

'চমৎকার!' আরও জেগে ওঠে সোমেশ রায়ের উৎসাহ। 'এ ঝামেলা আজ রাতেই মিটে গেলে খুবই খুশি হব আমি। ক্যাপ্টেন এইমাত্র বলে গেল, এঞ্জিনে নাকি কী গোলমাল দেখা দিয়েছে—জলতরী ওই পোর্ট ভিক্টোরিয়া'র দিকেই চলেছে। ভালো কথা, আজ দুপুরে তরফদার আমায় আমার ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বেশ খানিকটা লম্ফঝম্ফ করল। ওর সুটকেসের তালা নাকি কে ভেঙে রেখে গেছে। শুনে সহানুভূতি জানালাম। কিন্তু এর মূলে যে ক্যাপ্টেন, তা আর বলিনি।'

'ও-হো। তালাটা তাহলে ক্যাপ্টেন ভেঙেছে?'

'খুবই খারাপ সন্দেহ নেই। ও বললে যে সরু একটা ছুরি দিয়ে অনায়াসেই খুলে ফেলবে তালাটা—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ছুরি পিছলে যাওয়ায় ওই বিপত্তির সৃষ্টি হয়। এত বাড়াবাড়ি করাটা মোটেই পছন্দ হয়নি আমার।'

'কিছু পেয়েছে ও?' শুধোই আমি।

'কিস্সু না। তন্ন-তন্ন করে দেখেও কিছু পায়নি।'

'খুবই স্বাভাবিক,' হাসিমুখে বলি আমি। 'আর একটা কথা স্যার, আজকের ডিনারে আমি সাদা শার্টটা পরে হাজির হতে পারব না। যদি কিছু মনে না করেন—তাহলে সাধারণ পোশাক পরেই আসব।'

'দরকার হলে লুঙ্গি পরেও এসো, কোনও আপত্তি নেই আমার। শুধু টাকাটা আমায় পাইয়ে দিলেই হল।'

'তা দেব।'

আশ্বাস দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি আমি। বেরোবার আগে অবশ্য কবিতার স্ফুরিত অধরের কোণে ফোটা ছোট্ট হাসিটুকুর উত্তর দিয়ে যাই অপাঙ্গে চোখের ভাষা দিয়ে।

আসন্ন যুদ্ধজয়ের আনন্দ বুকে নিয়ে ফিরে এলাম কেবিনে।

সে রাতে বেশ থমথমে হয়ে ওঠে ডিনার টেবিলের আবহাওয়া। টাকা-তদন্ত যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে, তা যেন মনে-মনে প্রত্যেকেই উপলব্ধি

করতে থাকে। একজন শুধু দেখলাম নির্বিকার। সিংহলে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার গল্প অনর্গল বলে চললেন তরফদার। সেখে ভদ্রলোকের বুদ্ধিমত্তার আর-একদফা প্রশংসা না করে পারি না আমি।

মেয়েরা ঘর ছেড়ে যাওয়ার পর নিথর নৈঃশব্দ নেমে আসে ঘরের মধ্যে। সিগারেটের শেষ প্রান্তের দিকে কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন সোমেশ রায়।

তারপর বললেন, 'টাকা হারানোর প্রসঙ্গ আবার তুলছি, আশা করি কারও আপত্তি নেই। টাকাটা ফিরে পেলে শুধু আমি নই, আপনারাও যে কম খুশি হবেন না, তা আমি বিশ্বাস করি। মিস্টার রায়—মৃগাঙ্ক রায়—এ ব্যাপারে তদন্ত করছিলেন আমারই অনুরোধে। শুনলাম, রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আজ তৈরি হয়েই এসেছেন উনি।'

যন্ত্রবৎ প্রত্যেকের মুখ ঘুরে গেল আমার দিকে। সবার মুখের ওপর মসৃণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মৃদু হাসলাম আমি।

তারপর বললাম, 'গৌরচন্দ্রিকা না করে গোড়া থেকেই শুরু করছি আমি। টাকাটা প্রথমে মিস্টার রায়ের কাছ থেকে যিনি নিয়েছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরিহাস করা।' চেয়ারে উসখুস করে উঠলেন সোমনাথ মুখার্জি—কিন্তু কারও নামোল্লেখ না করে আমি বললাম কীভাবে রসিক পুরুষটি টাকা আনতে গিয়ে দেখেন রুপোর টাকার জায়গায় বিরাজ করছে একটা এক টাকার নোট। বলে পকেট থেকে বার করলাম ব্যাঙ্ক-নোটটা।

নোটটা একেবারেই নতুন। এর ক্রমিক সংখ্যা হল : Y15/641525A। ব্যাঙ্ক থেকে নতুন নোট নিলে টাকাগুলো যে ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে পরপর সাজানো থাকে, তা তো জানেনই, পকেট থেকে আর-একটা নোট বার করি আমি। 'এ নোটটার ক্রমিক সংখ্যা হল : Y15/641526A। দুটো নোটই যে এক লোকের কাছ থেকে এসেছে, তা অনুমান করে নেওয়া মোটেই কঠিন নয়, কী বলেন?'

'শাবাশ!' চিকচিক করে ওঠে সোমেশ রায়ের চোখ। 'এ টাকাটা পেলে কোত্থেকে?'

'দ্বিতীয় নোটটা হচ্ছে একটা কাজের পারিশ্রমিকস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল বলাইদুরকে। দিয়েছিলেন উপস্থিত ভদ্রলোকদেরই একজন।' একটু থামলাম। সবাই নির্বাক। 'দিয়েছিলেন ডক্টর তরফদার।'

প্রত্যেকের দৃষ্টি ঘুরে গিয়ে স্থির হল তরফদারের ওপর। কিন্তু ভদ্রলোকের বেপরোয়া মুখভাবের প্রশংসা না করে পারলাম না।

মৃদু হেসে বললেন উনি, 'বোধহয় দিয়েছিলাম, এখন দিয়েছি বলিও তা মনে নেই। কিন্তু হয়েছে কী তাতে?'

দেশমুখ বাধা দিয়ে বললেন, 'এসব ছেলেমানুষির কোনও মানে হয়? আইন-শাস্ত্রটা মোটামুটি ভালোই জানা আছে আমার। মিস্টার ডিটেকটিভকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে—'

হাসিমুখেই বলি, 'এক মিনিট মিস্টার দেশমুখ। আইনজ্ঞের প্রয়োজন এখনও আসেনি। এ প্রমাণ যে যথেষ্ট নয়, তা আমিও জানি। কিন্তু এটুকু বললাম শুধু পরবর্তী ঘটনার মুখবন্ধ হিসেবে। সবার চোখে ডক্টর তরফদারকে দোষী প্রতিপন্ন করতে শুধু নোট দুটোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই নয়, রয়েছে আরও অনেক কিছু এবং সবশেষে করছি আমি। কাজেই

ডক্টর তরফদারকে আমি অনুরোধ করব উঠে দাঁড়াতে নেহাত তল্লাশির জন্যে—অবশ্য মিস্টার রায়ের কোনও আপত্তি না থাকলে।'

'স্বচ্ছন্দে।' মাথা দুলিয়ে বেশ উল্লসিত স্বরে সম্মতি জানালো সোমেশ রায়। 'তাহলে ডক্টর তরফদার, অনুগ্রহ করে—'

লাল হয়ে ওঠেন তরফদার।

তীব্র স্বরে প্রতিবাদ জানান তিনি, 'এ শুধু আমাকে অপমান করার চক্রান্ত। মিস্টার রায়, আমার বিনীত অনুরোধ, আতিথেয়তার সহজ নিয়মটি যদি জানেন, তাহলে—'

'আমার আতিথেয়তাকে আপনিই অপমান করেছেন।' কড়া কণ্ঠে উত্তর দেন সোমেশ রায়। 'আপনার সব কথাই আমি জেনেছি। উঠে দাঁড়ান।'

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তরফদার।

'প্রথমে কোট আর ওয়েস্ট কোট।' চটপট আদেশ দিই আমি, আর মনে-মনে অনুভব করি প্রতিহিংসার নিষ্ঠুর আনন্দ উল্লাস। 'বেশ। এইবার টাইটা। ঠিক আছে, আমি সাহায্য করছি আপনাকে।' এই টানে টাইটা খুলে ফেলি—সেই সঙ্গে গোটা দুয়েক বোতামও।

এরপর বলি, 'ডাক্তার তরফদারের শার্টটি বাস্তবিকই অতুলনীয়। আর এখনো প্রথমেই তাঁর প্রশংসা করে নিচ্ছি মুক্ত কণ্ঠে। এই বিশেষ রকমের শার্ট পাওয়ার জন্যেই সিংহলে যথেষ্ট খাটিখাটুনি করেছিলেন উনি। লক্ষ করে দেখুন, শার্টের কলারটা একটু অস্বাভাবিক রকমের শক্ত। বিশেষ করে প্রান্ত দুটো। অনেক স্টার্চ দিয়ে খুব কড়া করে ইস্ত্রি করলেও কলার কখনও এত শক্ত হয় না। আসলে আশ্চর্য রকমের শক্ত দুটো প্রান্তে আছে দুটো ছোট্ট পকেট—মুখদুটো অবশ্য নিচের দিকেই ঢাকা পড়ে রয়েছে। ভাল ইস্ত্রি করা থাকলে কলারের বৈশিষ্ট্য কারওরই নজরে পড়ে না। আমারও পড়েনি। কিন্তু ওদেশের কাছে জানলাম, পকেট দুটোর সৃষ্টি ছোটখাটো কিন্তু মূল্যবান জিনিস চোরাই মাল পাচার করার জন্যে। যেমন ধরুন না কেন, হিরের দুল, নাকছাবি, আংটি, ছোট্ট করে ভাঁজ করা ব্যাঙ্ক নোট অথবা একটা রুপোর টাকা। প্রান্তের শক্ত হওয়ার দরুণ ওপর থেকে দেখলেও কিছু ধরা যায় না—যেমন এখনও যাচ্ছে না। তা ছাড়া, পো বর্ণিত 'The Purloined Letter'-এর মূল সূত্র অনুযায়ী অযোগ্য সবার চোখের সামনে থাকা জিনিসটাই চোখ এড়ায় সবার আগে, যেমন এড়িয়েছিল গতরাতে। কিন্তু এবার—' বলে কলারের ভেতর থেকে একটা রুপোর টাকা বার করে ফেলে দিলাম সোমেশ রায়ের সামনে। বিজয়োল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আমার স্বর। ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গেছি। আর কী মুখে বলি, 'আপনার লাকি পিস, স্যার।'

খুশির আলো জেগে ওঠে সোমেশ রায়ের কৃপালু চোখে। 'তোমার ঋণ যে কী করে শোধ করব—' বলতে-বলতে কাঁপা হাতে টাকাটা তুলে নিলেন। পরক্ষণেই দারুণ চিৎকারে চমকে উঠলাম আমি। টেবিলের ওপর টাকাটা আছড়ে ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি।

'আবার রসিকতা! আবার পরিহাস আমার সঙ্গে!' দুই হাত নাড়তে-নাড়তে চিৎকার করে ওঠেন তিনি।

'কী—কী হল স্যার?' আমার বিজয়-গৌরব তখন নিষ্প্রভ প্রায়।

সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন সোমেশ রায়ঃ 'এ টাকা আমার নয়! এতে ছাপ রয়েছে ১৯৪৬ সালের!'

'১৯৪৬ সালের!' তরফদারের মুখেও দেখি অকপট বিস্ময়ের প্রতিচ্ছবি।

মুহূর্তের মধ্যে তুমুল হট্টগোলে ভরে উঠল সেলুন,—প্রত্যেকেই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেন। কিন্তু গোলমাল ছাপিয়ে বিউগলের মতো বেজে ওঠে সোমেশ রায়ের তীক্ষ্ণ কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক স্বর। আমার দিকে ফিরে সবেগে তর্জনী নাড়তে-নাড়তে আমার মুণ্ডপাত করছিলেন তিনি।

'ডিটেকটিভ! তুমি আবার একটা ডিটেকটিভ! প্রত্যেকবার আশায় আনন্দে ভরিয়ে তুলছ আমায়, তারপর তুমি—তুমি—তুমি—'

'দুঃখিত স্যার।' ক্ষীণ স্বরে কোনওমতে বলি। রীতিমতো ঘাবড়ে গেছিলাম আমি।

'দুঃখিত! এটা আবার কী ধরনের কথা হে ছোকরা? দুঃখিত! ফের যদি নতুন-নতুন টাকা আবিষ্কার করতে দেখি তোমায়—তোমার ছাল আমি ছাড়িয়ে নেব।' তারপর ফিরলেন তরফদারের দিকে— ভদ্রলোক নিপুণ হাতে টাইটা বাঁধছিলেন। 'আর আপনি! কী বলার আছে আপনার? কী সাফাই গাইবেন ঠিক করেছেন? ম্যাজিক শার্ট পরে কোনও সৎ ব্যক্তি ভদ্রলোকের আসরে আসে না। সিংহলে আপনার কীর্তিকলাপ সবই শুনেছি আমি। কী করে এ-টাকা গেল আপনার কাছে?'

ওয়েস্ট-কোটটা পরতে-পরতে নিরুত্তাপ গলায় বললেন তরফদার, 'এক মিনিট।' বলে কোটটায় হাত গলাতে-গলাতে বললেন, 'এ রকম পরিস্থিতিতে সত্য ছাড়া মিথ্যা বলে কোনও লাভ নেই। একটু মাথা ঠান্ডা করে বুঝলেই দেখবেন আসলে কোনও ক্ষেত্রেই চুরি হয়নি। প্রতিবারই একটা টাকার জায়গায় রাখা হচ্ছে আর একটা টাকা—একে চুরি বলে না। তাছাড়া লাকি পিসটা আপনার কাছে নিছক একটা প্রেজুডিস ছাড়া কিছুই নয়। কথাটা মনে রাখলেই ভালো করবেন।'

'তা নিয়ে আপনি মাথা না ঘামালে আরও ভালো করবেন।' বললেন সোমেশ রায়।

'গত রাতে আপনার কেবিনে গেছিলাম টাকাটা আনতে। শুধু একটা রসিকতা করার উদ্দেশ্য ছিল আমার। দরজার কাছে হঠাৎ কার পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লাম বড় আলমারিটার আড়ালে। দেখি চুপিসাড়ে ঘরে ঢুকলেন মিঃ মুখার্জি। আপনার রুপোর টাকাটা নিজের পকেটে রেখে অন্য একটা টাকা রাখলেন নিজের পকেটে। ওঁর পিছু নিলাম আমি। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে উনি ডিনার-সেলুনে এলে ঢুকলাম ওঁর কেবিনে। টাকাটা খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না আমায়। তারপর মিঃ মুখার্জি যা করেছেন, আমিও তাই করলাম, অর্থাৎ টাকার বদলে টাকাই রাখলাম। আজ সকাল পর্যন্ত টাকাটা আমার কাছেই ছিল। আমাদের এই তরুণ বন্ধুটি যেখান থেকে নতুন টাকাটা বার করলেন, ওইখানেই লুকানো ছিল টাকাটা। টাকা সমেত শার্টটা তালা দিয়ে রেখেছিলাম স্যুটকেসে। কিন্তু আজ বিকেলে সে তালা কে যেন ভেঙে রেখে যায়—মিঃ রায়কে আমি তা দেখিয়েছি। আমার বিশ্বাস, তখনই কেউ আবার পালটে রেখে গেছে টাকাটা।'

'রাবিশ! আপনি তাহলে বলতে চান তালা ভাঙার পরও টাকাটা আছে কি না

তা যাচাই করে দেখেননি আপনি?' বললেন সোমেশ রায়।

'ওপর থেকে হাত দিয়েই বুঝেছিলাম একটা টাকা রয়েছে ভেতরে। কিন্তু সেটা যে আপনার লাকি পিস নয়, তা তো বুঝিনি তখন।'

পলকহীন চোখে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন সোমেশ রায়। তারপর মৃদু অথচ কঠিন স্বরে বললেন, 'আপনাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে ধুরন্ধর আপনি সন্দেহ নেই। এদ্দিন কী গণ্ডগোল হয়েছে, তবে আমরা পোর্ট ভিক্টোরিয়ার দিকেই চলেছি। কাল সকালে পোর্টে পৌঁছলে আপনার মালপত্র নিয়ে নেমে গেলে খুশি হব আমি। আপনার মতো অভ্যাগতর সান্নিধ্য আমি বা আমার বন্ধুরা পছন্দ করেন না বলেই একথা বলতে বাধ্য হলাম।'

'বেশ তো।' শান্তভাবে রাজি হন তরফদার।

'অবশ্য তার আগে আপনাকে আর একবার সার্চ করা হবে। আচ্ছা, এখন চলুন বাইরে যাওয়া যাক।' বলে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন সোমেশ রায়।

ডাইনিং সেলুন থেকে বেরোবার সময়ে লক্ষ করলাম তরফদারের কনুই ধরে আটকে রাখলেন দেশমুখ—ভদ্রলোকের আরক্ত মুখে বিবিধ ভাবের যে বিচিত্র খেলা দেখলাম—তার কোনওটাই বিশেষ প্রীতিপদ নয়।

বড় সেলুনে ঢুকেই পড়লাম কবিতার সামনে। সামনের টেবিলেই উদ্গ্রীব হয়ে বসেছিল ও। আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে টানতে-টানতে নিয়ে এল বাইরে।

'বলো, তাড়াতাড়ি বলো। তরফদারকে এক হাত নিলে তো?'

'হায়রে কপাল!' করুণ স্বরে বলি আমি।

'তার মানে?' একটু ঘাবড়ে যায় ও।

'তরফদারকে আমি এক হাত নিয়েছি ঠিকই, আর তোমার বাবাও বেশ এক হাত নিয়েছেন আমায়। গোয়েন্দা না কচু—ও: কবি, সব ভেস্তে গেল।' বলে আগাগোড়া সব বললাম ওকে।

শেষ হলে পর ও শুধোল, 'কিন্তু বাবা কী বললেন, তা বললে না?'

'বললেন যে ফের যদি নতুন-নতুন টাকা আবিষ্কার করি, আমার ছাল ছাড়িয়ে নেবেন তিনি। কবি, সে সময়ে যদি তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি দেখতে—না, আর আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

'দূর পাগল! এত সহজে ভেঙে পড়া কি পুরুষের শোভা পায়?' একটুও দমে না কবিতা। 'বাবা দুর্মুখ বটে, কিন্তু ওরকম মানুষ হয় না, তা তো বিশ্বাস করো। আর কোনও সূত্র নেই তোমার হাতে?'

'আছে, খুব সামান্য তা।'

'জানতাম, আমি জানতাম,' উৎসাহে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে ও। 'কী সূত্র শুনি?'

'খুব বেশি ভরসা নেই ওতে। তরফদারের কাছে পাওয়া টাকাটা আমার কাছেই রেখেছি। দেখলাম—'

সোমেশ রায় আর সোমনাথ মুখার্জি বড় সেলুন থেকে বেরিয়ে সিধে এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে।

'কী খবর হে গোয়েন্দাজি?' শ্লেষ-তীক্ষ্ণ স্বরে শুধোন সোমনাথ মুখার্জি। 'ওরকম

অবজ্ঞা দেখিও না হে সোম,' বললেন সোমেশ রায়।

'ছেলেটার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল রকফেলারের চেয়েও অনেক বেশি টাকা ও শুধু মাটি খুঁড়েই তুলতে পারে।'

'আমি খুবই দুঃখিত স্যার—' করুণ কণ্ঠে বলি আমি

'খাবড়াও মাত। তাহলে আমাদের এখন অবস্থাটা কী? আগের চেয়েও দেখছি পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠেছে।'

সোমনাথ মুখার্জি বললেন, 'আমার কথা যদি শোনো তো বলি। ক্যাপ্টেনকে তোমার কীরকম মনে হয়? তরফদারের সুটকেস তো সে-ই খুলেছিল। তখন তো ও একলাই ছিল—তাই না?'

'রাবিশ! চিরকালই এমনি ভুল করো তুমি।'

'বেশ তবে তাই। কিন্তু এঞ্জিনই বা হঠাৎ খারাপ হল কেন? ফিরেই বা যাচ্ছি কেন?'

'রাবিশ! আজ নয়, দশ বছর ধরে ক্যাপ্টেনকে আমি দেখছি।' মাথা নাড়তে-নাড়তে বলেন সোমেশ রায়। 'ওসব বাজে কথা থাক। এমন ধাঁধে জীবনে আর পড়িনি। বেশ বুঝছি, বিরাট একটা ষড়যন্ত্র চলছে আমার বিরুদ্ধে। তরফদার তো সব কিছুই অস্বীকার করতে পারত? তা না করে সবার সামনে দোষ স্বীকার করাটা আমার তো অদ্ভুত কীরকম লাগছে।'

কবিতা বলল, 'বাবা, মৃগাঙ্ক আর একটা সূত্র পেয়েছে।'

'আমি জানতাম তা।' উত্তর এল তৎক্ষণাৎ, 'সূত্র আবিষ্কার করতে ছোকরাটার জুড়ি মেলা ভার। এরপর যদি শুনি একজনের কানের ভেতর থেকে একটা টাকা বার করেছে, মোটেই অবাক হব না আমি। অবশ্য টাকাটা যে আমার হবে না—তা নিশ্চিত।'

'আর-একবার যদি সুযোগ দেন স্যার।' কোনওমতে বলি আমি।

'না দিয়েই বা উপায় কী? তুমিই এখন অগতির গতি—আর কেউ এমন নেই যার ওপর নির্ভর করতে পারি এ বিষয়ে। যাক, এবার কী সূত্র শুনি?'

'বেলা প্রায় আড়াইটের সময়ে তরফদারের সুটকেসের তালা ভাঙা হয়েছিল—তিনটের সময় আমরা তা জানতে পারি। দশ-পনেরো মিনিটের বেশি ঘরে ছিলেন না ক্যাপ্টেন—থাকতেও পারেন না। কাজেই, ক্যাপ্টেন বেরিয়ে যাওয়ার পর আর আমার তরফদারের ফিরে আসার মধ্যের সময়টায় যে কী ঘটেছে, তা কেউ জানে না।'

'তুমি যদি জেনে থাকো তো ভনিতা ছেড়ে বলে ফেলো।'

'আমার শুধু অনুমান স্যার। ১৯৪৬ সালের যে টাকাটা আমরা তরফদারের কাছে পেয়েছি, ওটা কার কাছে ছিল, তা আমি জানি।'

'কী! জানো তুমি?'

'হ্যাঁ, জানি। আজ সকালেই বলবাহাদুরকে আমি টাকাটা দিয়েছিলাম। তরফদারের কাছ থেকে যে এক টাকার নোটটা বকশিশ পেয়েছিল—তারই বদলে দিয়েছিলাম রুপোর টাকাটা।'

'বলবাহাদুর! শাবাশ! এসো স্মোকিং রুমে। বলবাহাদুরকে শায়েস্তা করে দিচ্ছি আমি।'

সোমেশ রায়ের পিছু-পিছু এসে বসলাম স্মোকিং রুমে। বলবাহাদুরকে তলব পাঠানো হল তৎক্ষণাৎ। একটু পরেই বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে-কাঁপতে ঘরে ঢুকল ও। আমার তর্জন-গর্জনের সামনেও ওর বেপরোয়া হাসি অম্লান ছিল—এখন তার চিহ্নমাত্রও না দেখে বুঝলাম মনিবকে কী রকম বাঘের মতো ভয় করে সে।

টাকাটা ওর সামনে ধরে বললাম, 'আজ সকালে তোমায় এ টাকাটা দিয়েছিলাম আমি। তারপর কী করেছিলে এটা নিয়ে?'

একদৃষ্টে টাকাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ও।

তারপর বলল, 'বেচে দিয়েছিলাম।'

'কাকে?'

'তরফদার সাবকে।'

'সত্যি বলো বাহাদুর।' কঠিন কণ্ঠে বলি আমি।

'সাচ বোলতা সাব। তরফদার সাব বললেন আমি যখন আমার কথা রাখিনি, তখন টাকাটা ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আপনি জানেন সাব তা সত্যি নয়। কিন্তু উনি গালিগালাজ করতে টাকাটা আমি ফিরিয়ে দিই।'

বাস, এই হল বাহাদুরের কাহিনি। বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জিগ্যেস করলাম অজস্র প্রশ্ন—কিন্তু পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ওই একই কাহিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উপহার দিতে লাগল সে। শেষে বিরক্ত হয়ে সোমেশ রায় বিদায় দিলেন ওকে।

'তাহলে?' শুধোন তিনি।

জোর গলায় বললেন সোমনাথ মুখার্জি, 'ব্যাটা আস্ত মিথ্যে বলে গেল।'

বললাম, 'কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও সত্যি কথাই বলছে। স্যার, তরফদারের স্বীকার-পর্বটা বেশ উদ্দেশ্যমূলকভাবেই অভিনীত হয়েছে।'

'কী উদ্দেশ্য শুনি?'

'ও আমিও সঠিক বলতে পারি না। শুধু বলতে পারি, টাকাটা এখনও ভদ্রলোকের কাছেই আছে।'

'কিন্তু ঠিক কোনখানটায় তা বলো?'

'সেইটাই তো জানতে হবে স্যার।' চকিতে আবার তৎপর হয়ে উঠি আমি। 'কবিতা, তুমি চট করে গিয়ে তরফদারকে ভুলিয়ে সেলুনে এনে ব্রিজ খেলায় আটকে দাও। ওর ঘরটা তল্লাশ করতে হবে।'

'ঠিক বলেছ।' সোৎসাহে বলেন সোমেশ রায়। পরমুহূর্তেই কপাল কুঁচকে ওঠে ওঁর। 'ঠিক অবশ্য তুমি আগাগোড়াই বলছ—কিন্তু প্রতিবারই ফলাফল দাঁড়াচ্ছে বিপরীত। আশা করি, এবার আসল টাকাটা বার করতে পারবে, কী বলো?'

'নিশ্চয়।' বলি বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে দমে যাই বেশ। সত্যিই তো, প্রতিবারই আশা দিয়ে নিরাশ করেছি ওঁকে। নাঃ, এবার আমায় সফল হতেই হবে। যেভাবেই হোক, যে পথেই হোক।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তরফদারকে তাসের টেবিলে বসতে দেখে আমি দৌড়লাম নিচে। কোনওরকম ইতস্তত না করে আলো জ্বেলে দিলাম তরফদারের কেবিনে—তারপর শুরু হল তল্লাশি পর্ব। তন্ন-তন্ন করে খুঁজলাম। কার্পেটের তলায়, আলমারির কোণে, র‍্যাকেটের

পেছনে, জুতোর শুকতলার নিচে—কোথাও বাকি রাখলাম না। কিন্তু সবই বৃথা। রুপোর টাকার চিহ্ন দেখলাম না কোথাও। কমোডের ঠিক নিচে এক টুকরো কুণ্ডলি পাকানো ন্যাপ্টা তার ছাড়া উল্লেখ্য আর কিছুই চোখে পড়ল না। নিতান্ত অদরকারি মনে হলেও কোটবুকে রেখে দিলাম তারটা।

হতাশ হয়ে আলোটা নিভিয়ে নিয়ে বাথরুমের মধ্য দিয়ে এগোলাম নিজের ঘরের দিকে। এক-পা তরফদারের কেবিনে, আর এক-পা বাথরুমে সবে রেখেছি, এমন সময়ে কেবিনের দরজা গেল খুলে।

'কী খবর?' খুব মৃদু মৃদু স্বরে বললেন একজন। দেশমুখ।

সরে পড়লাম। বাথরুম থেকে আমার ঘরে আসার দরজার চাবিটা নিঃশব্দে ঘুরিয়ে খুলে নিজের ঘরে এসে আবার চাবি ঘুরিয়ে দিলাম আস্তে-আস্তে। তারপর দরজার নবের ওপর একটা হাত রেখে অন্ধকারের মধ্যে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

একটু পরেই অস্পষ্ট শব্দ শুনলাম বাথরুমে—তারপরেই হাতের মুঠির মধ্যে খুব আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল নবটা। মুঠি আলগা করে দিলাম আমি। ছোট্ট একটা ঝাঁকানি—দরজা বন্ধ। আবার পায়ের শব্দ পিছিয়ে গেল ওপাশের ঘরে।

সাহস করে এবার চাবি ঘুরিয়ে সামান্য ফাঁক করলাম দরজাটা—উঁকি মারলাম ওদিকে। তরফদারের কেবিনে মাঝে-মাঝে টর্চের আলোর ঝিলিক ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁজলেন দেশমুখ। তারপরেই হঠাৎ আলো নিভে অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘরে এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু তার পরক্ষণেই দেশমুখের স্বর শুনেই বুঝলাম কে।

'মিসেস প্যাটেল!' মৃদু বিস্ময়ে স্বরে শুধোলেন উনি। 'মিস্টার দেশমুখ!' নারীকণ্ঠে উত্তর এল।

'বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে?' শ্লেষ বঙ্কিম সুরে শুধোলেন দেশমুখ।

'এ কেবিন আপনার?' একই রকম শ্লেষ তীক্ষ্ণ সুরে শুধোন মিসেস প্যাটেল।

'না।'

'তাহলে কী করছেন এখানে?'

'আপনি যা করতে এসেছেন—তাই। টাকাটার সন্ধানে।'

'কিন্তু মিস্টার দেশমুখ—'

'আস্তে। সব জানি আমি। শুনুন মিসেস প্যাটেল, আমাদের দুজনেরই স্বার্থ যখন এক তখন আসুন, একসঙ্গেই কাজ শুরু করা যাক।'

'বুঝলাম না কী বলছেন।'

'বুঝেছেন ঠিকই। আপনি টাকাটা খুঁজছেন চুনীলাল দয়াভাইয়ের জন্য। কিন্তু আমি খুঁজছি দেশের জন্য। আপনার উদ্দেশ্য অর্থলাভ—আমার উদ্দেশ্য সমাজসেবা। আগামী অ্যাসেম্বলির ইলেকশন থেকে যেভাবেই হোক সোমেশ রায়কে দূরে রাখাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। তাই পরের বুধবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত টাকাটা আমার কাছে রাখুন—তারপর নিয়ে গিয়ে যাকে খুশি দিন কোনও আপত্তি নেই।'

'কিন্তু মিস্টার দেশমুখ, টাকাটা তো আমি পাইনি।'

'তা জানি। যদি পাই টাকাটা—তাহলে এই চুক্তিই থাকবে আমাদের মধ্যে। রাজি?'

'রাজি। কিন্তু ওটা আছে কোথায় বলুন তো?'

'এঘরে থাকাই স্বাভাবিক। বড় বড়িবাজ এই তরফদার লোকটা। বোধ হয় শুনেছেন, ওর সঙ্গে আমার পাশাপাশি কথা হয়ে গেছিল এ সম্পর্কে। গত রাতে জলপরীর ডক থেকে সমুদ্রের জলে একটা শার্ট ছুড়ে ফেলার সময়ে ওকে ধরে ফেলি আমি। তখনই জেরার মুখে ও স্বীকার করে যে বাকি পিসটা ওর কাছেই আছে। ঠিক হয়, পোর্ট ভিক্টোরিয়াতে ও নগদ দু হাজার টাকার বিনিময়ে আমার হাতে তুলে দেবে টাকাটা।'

নারীকণ্ঠ বললে, 'আমি ভাবছিলাম, আমিও একটা দর দেব ওকে। ভারি ধূর্ত লোক তো। সব কিছুই সম্ভব ওর পক্ষে।'

'জানি, ভালোই করেছেন। আজ সকালে সোমেশ রায় আর সোমনাথ মুখার্জি যখন দু-হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন, তখনই হতভাগা অন্য সুর গাইতে শুরু করে। জাহাজ থেকে নামামাত্র আইনের প্যাঁচে ফেলে জেলে পোরার ভয় না দেখালে ও তো সকালেই ফিরিয়ে দিয়ে আসত টাকাটা। আমি যা বলি, তা করি। ও জানে বলেই চুপ করে রইল তখনকার মতো।'

'ডিনার টেবিলে অত স্বীকারোক্তি তাহলে সবই অভিনয়?'

'সব' অভিনয়। ওর চোখ দেখেই তা বুঝেছিলাম আমি। রিপোর্টার ছোকরাটাও লেগেছে ওর পেছনে। তাই টাকাটা অন্য কেউ সরিয়েছে, এইরকম একটা ধোঁকা দিয়ে ও নেমে যেতে চায় পোর্টে। তারপর অন্য কারও হাতে তা সোমেশ রায়কে ফিরিয়ে দিয়ে দু'হাজার টাকা রোজগার করতে কতক্ষণই বা আর লাগে। কিন্তু আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমি তা হতে দেব না। আসুন, খোঁজা যাক।'

'এ দরজাটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় জানেন নাকি?' শুধোন নারীকণ্ঠ।

'বাথরুমে। তার ওপাশে একটা কেবিন আছে—কিন্তু দরজায় চাবি দেওয়া।'

শুনে আর দেরি করলাম না। আশা মিটিয়ে আমার ঘরটাও তল্লাশ করার সুযোগ দিয়ে চলে এলাম ওপরের ডেকে।

ব্রিজের আসর তখন সবে ভাঙছে। পিসিমা ছাড়া আর কারও উৎসাহ নেই খেলায়। ববিতাকে ডেকে নিয়ে এলাম ঘরের এক কোণে। কিন্তু কিছু বলার আগেই স্বয়ং সোমেশ রায় এগিয়ে এলেন আমাদের মাঝে।

'কী হল?' শুধোন উনি।

তরফদারের কেবিনে এইমাত্র যা শুনে এলাম, সব বললাম ওঁকে। শুনে রাগে লাল হয়ে উঠল ওঁর মুখ।

'চমৎকার! দেশমুখ আর ওই স্ত্রীলোকটাও কিনা—! জানতাম, এ জাহাজে কাউকেই বিশ্বাস করা চলে না। ঠিক আছে, কাল সকালেই তরফদারের সঙ্গে ওরাও নেমে যাবে মালপত্র নিয়ে। কিন্তু তার আগে তিনজনকেই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সার্চ না করে ছাড়ছি না আমি।'

'বাবা!'

যা বললাম, তা করবই। ভালো কথা মৃগাঙ্ক, এখনও কীরকম বুঝছ এখন? তরফদার যদি টাকাটা রেখেই থাকে, কোথায় রেখেছে বলে মনে হয়?'

'আমি—'

'আর একটা সূত্র পেয়েছ, কেমন?'

'একটাও না।' বিষণ্ণভাবে বলি।

'একটাও না?' দাঁড়িয়ে উঠলেন সোমেশ রায়। 'তাহলে আর কী—বেশ বুঝছি, ইহজীবনে আর ও-টাকার মুখ দেখতে পাব না আমি। তোমার সূত্র ফুরিয়ে যাওয়া মানেই আমার দফারফা হওয়া। রিপোর্টার হিসেবে তোমার জুড়ি না থাকতে পারে, কিন্তু শখের ডিটেকটিভ হিসেবে—যাকগে, কী দরকার এসব কথা বলে। শুতে চললাম আমি।'

ওঁর পিছু-পিছু আমরাও বাইরের ডেকে এলাম। ওপাশের ছায়া-ছায়া একটা কোণে এসে দাঁড়ালাম দুজনে।

কারও মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ পর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবিতা বলল, 'তাহলে সত্যিই আমাদের আর কোনও আশা নেই, মৃগ?'

'খুব সামান্য একটা সূত্র আমি পেয়েছি, কবি। কিন্তু তা এতই তুচ্ছ যে ওঁকে বলার সাহস হল না আমার। তরফদারের কেবিনে ছোট্ট একটা তারের কয়েল কুড়িয়ে পেলাম।'

'ওতে লাভ?'

'তা তো জানি না। কিন্তু তবুও ওই নিয়েই আজ সারা রাত আমি ভাবব। কোনওদিন এভাবে আর চিন্তা করিনি, করবও না। তোমাকে আমি কিছুতেই হারাতে পারব না কবি, কিছুতেই না, কিছুতেই না।'

'আমি তো তোমার মতো অমন করে বলতে পারি না, কিন্তু আমার মনের কথা তো তুমিও জানো, মৃগ।' সজল চোখে বলে ও।

সে রাতে শোওয়ার আগে প্রতিজ্ঞা করলাম, ভোর হয় হোক, তবুও সূত্রের অর্থ না বার করে ঘুমোচ্ছি না। একে-একে তরফদারের ছোটখাটো মালপত্রগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল—আর মানস চোখে চুলচেরা দৃষ্টি নিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম তাদের। তারপর, নিজের অজান্তেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

প্রত্যেক মানুষের এমন একটা অবচেতন সত্তা আছে, যে কখনও ঘুমোয় না। বরং মানুষটির নিদ্রার সুযোগ নিয়ে সজ্ঞান মনের কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই কারণেই বোধ হয় পরদিন সকালে যে আনন্দ নিয়ে শয্যা ত্যাগ করলাম, সে আনন্দ বোধ করি কলম্বাসও আমেরিকা আবিষ্কার করে পায়নি। দেরি হয়ে গেছিল খুবই। পোর্টহোল দিয়ে তাকিয়ে দেখি, দূরে পোর্ট ভিক্টোরিয়ার জেটি দেখা যাচ্ছে। জলপরী তাহলে নোঙর ফেলেছে।

বাথরুমের দরজায় চাবি ছিল না—তরফদারের ঘরের দরজাও দেখি দু-হাট করে খোলা। ঘর শূন্য—রাশি-রাশি মালপত্রের একটিও নেই।

ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলাম বলবাহাদুরকে। শুনলাম, এখনও কেউ তীরে নামেনি।

'চট করে বড় সাহেবকে গিয়ে বলো—আমি না বলা পর্যন্ত কেউ যেন জলপরী ছেড়ে না যায়।' বলে তাড়াতাড়ি পোশাক পালটাতে শুরু করি আমি।

শার্টটার বোতাম আঁটছি—ঘরে ঢুকলেন সোমেশ রায়।

শুধোলাম, 'নতুন কোনও খবর আছে?'

'কিস্সু না।' বলে মুখ অন্ধকার করে বার্থে বসে পড়লেন তিনি। ম্লান মুখ দেখে খুশিই হলাম—নাটকের ক্লাইম্যাক্সটা ভালোই জমবে দেখছি।

'সেকেন্ড অফিসার—তরফদারের ঘর সার্চ করেছে সকলে—পোশাক পরার সময়েও তন্নতন্ন করে দেখেছে সব কিছু। মালপত্রগুলোও আবার পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু সবই বৃথা। টাকাটা হয় ওর কাছেই নেই, আর থাকলেও নির্ঘাৎ গিলে ফেলেছে ও।'

'ভদ্রলোক এখন কোথায়?'

'ডেকে, তীরে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে। লঞ্চ তৈরি। দেশমুখ আর মিসেস প্যাটেলও যাচ্ছেন।'

'ওঁদেরও সার্চ করেছেন নাকি?'

'না। সব কিছুর একটা সীমা আছে। তা ছাড়া, ওঁরাও যে আমার মতোই অসহায়, তা বিশ্বাস করি আমি। সকালে এসে ওঁরা বললেন যে এখানেই নেমে যেতে চান দুজনে। তৎক্ষণাৎ রাজি হলাম আমি। আর ঝামেলা বাড়িয়ে কী লাভ বলো।'

'তা ঠিক।' সায় দিই আমি।

'কিন্তু তুমিই তো একটু আগে বলে পাঠালে যে তুমি না আসা পর্যন্ত কেউ যেন জাহাজ ছেড়ে না যায়, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার, আমিই।' হাসিমুখে বলি আমি।

'তুমি—তুমি নতুন কোনও সূত্র পেয়েছ বুঝি?'

'মনে হচ্ছে।'

'সাবাশ। না-না, আবার বেশি আশা আমি করব না। নিরাশ হওয়ার আঘাত এবার আর সহ্য করতে পারব না আমি।'

'সামান্য একটু আলো দেখতে পেয়েছি, স্যার। তাই বেশি আশা না করাই ভালো।'

ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে সোমেশ রায় বললেন, 'সামান্যই হোক, আর অসামান্যই হোক, হাল ছেড়ো না কিছুতেই। আবার বলছি বাবা, টাকাটা যদি উদ্ধার করতে পারো—তোমার কোনও খেদ আমি রাখব না।'

'মনে থাকে যেন।' স্বগতোক্তি করি আমি।

ডেকে ওঠার সিঁড়িতেই দেখা হয়ে গেল কবিতার সঙ্গে। দুই চোখে ওর উদ্বেগের ছবি দেখে আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসলাম একটু। তারপর সবাই মিলে এগিয়ে গেলাম ডেকের মাঝখানে। সেখানে স্তূপীকৃত মালপত্রের মাঝে বসেছিলেন তরফদার, দেশমুখ আর মিসেস প্যাটেল।

সোমেশ রায় বললেন, 'বাধ্য হয়ে আজ এদের সঙ্গ আমায় হারাতে হচ্ছে।'

বললাম, 'ডক্টর তরফদারের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্যে নিজেকে আগে থেকেই শক্ত করে রেখেছিলাম। কিন্তু এঁরা—'

কটমট করে দেশমুখ তাকালেন আমার দিকে। খবর পেয়ে সোমনাথ মুখার্জিও উদ্বিগ্ন মুখে উঠে এলেন ডেকে।

অল্প হেসে বললাম, 'চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে ডক্টর তরফদারকে আমি শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই, স্যার।'

'নিশ্চয়। করে ফেলো।'

'ডক্টর তরফদার!' উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধোলাম আমি, 'ডক্টর তরফদার, কটা বাজে এখন?'

ধীরে-ধীরে সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে তরফদারের দুই চোখ।

'বুঝলাম না।'

'আপনার ঘড়িতে এখন কটা বাজে, তাই জিগ্যেস করছি। অনেকবার ঘড়িটার সময় দেখতে দেখেছি আপনাকে, তাই শুধোচ্ছি, কী সময় এখন?'

খুব সহজভাবে জবাব দিলেন তরফদার, 'ঠাকুরদার আমলের ঘড়ি তো, মাঝে-মাঝে বড় বেয়াড়া টাইম দিতে থাকে। কাল থেকে দেখছি একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে ঘড়িটা।'

'বন্ধ হয়ে গেছে? খুব খারাপ, খুব খারাপ।' বলে হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি। 'দিন আমায়—চালু করে দিচ্ছি আমি।'

চকিতে তরফদারের দুই চোখ ঘুরল ডাইনে আর বামে—যেন জলপরী আর পোর্ট ভিক্টোরিয়ার জেটির মধ্যে ব্যবধানটুকু মেপে নিলেন মনে-মনে।

বললাম, 'কই দিন। পালাবার কোনও পথই নেই—বার করুন।'

'দিন না!' বলে পকেট থেকে বড় আকারের সেকেলে একটা পকেট ঘড়ি বার করেন উনি। চেন থেকে খুলে বেশ হাসিমুখে আমার হাতে তুলে দিলেন ঘড়িটা—দেখে আবার দমে যাই আমি। সবই কি শেষে ভুল হয়?

শক্ত আঙুলে ঘড়িটা চেপে ধরে দুরুদুরু বুকে পেছনের ডালাটা খুলে ফেললাম। ভেতরটা পাতলা কাগজ দিয়ে ঠাসা। টেনে তুলে ফেললাম কাগজটা।

আর দেখলাম, ঠিক নিচেই রয়েছে একটা রুপোর টাকা।

হাসিমুখে টাকাটা তুলে দিলাম সোমেশ রায়ের হাতে। 'আশা করি, এবার ভুল হয়নি আমার।'

'শাবাশ! শাবাশ!' উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে সোমেশ রায়। 'এই আমার লাকি পিস। আমার জীবনের প্রথম উপার্জন। এই তো খুদে-খুদে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলো। শাবাশ মৃগাঙ্ক, শাবাশ!'

কবিতার দিকে তাকালাম। খুশির আভায় চিকমিক করছে ওর দুই চোখ। ডালা বন্ধ করে ঘড়িটা ফেরত দিলাম তরফদারকে।

বললাম, 'কাজ শেষ করার পর মেন স্প্রিংটাকে উপেক্ষা করা মোটেই উচিত হয়নি আপনার। জানেন তো বড় কাজের জিনিস এই মেন স্প্রিং, তাই না?'

'তাই বটে।' তখনও মৃদু হাসতে থাকেন তরফদার। বেপরোয়া ভঙ্গিমায় ঘড়িটা আমার হাত থেকে নিয়ে পকেটে রাখেন উনি। বলেন, 'মিস্টার রায়, এবার তাহলে যেতে পারি আমি? তবে দোহাই আপনার, চোর বদনামটা যাওয়ার আগে দেবেন না। আদতে

কিছুই চুরি হয়নি আপনার।'

'কে বলল্লে হয়নি?'

রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল দেশমুখের মুখ। সবেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন তিনি, 'মিস্টার রায়, এ জোচ্চোরটাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। ওকে জেলে পাঠাবার সব বন্দোবস্ত আমি করেছি।'

মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন সোমেশ রায়, 'ন্যায়ের প্রতি আপনার এই নিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসনীয়; কিন্তু আমার ইচ্ছে তা নয়। মিস্টার তরফদার, আমার অভিনন্দন জানবেন। ছেলেবেলায় লুকোচুরি খেলায় নিশ্চয় খুব পাকা খেলোয়াড় ছিলেন আপনি। যাক, আপনি এখন স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন।'

'অনেক ধন্যবাদ সেজন্যে,' হাসি মুখে বলেন তরফদার। 'সমুদ্রের ওপর ভাসলেই কটন কমিশ—সে জন্যেও রইল ধন্যবাদ।' দেশমুখের রক্ত-চক্ষুর ওপর চোখ পড়তেই ভদ্রলোকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। 'আপনার কাছে একটু অনুগ্রহ আশা করতে পারি কি মিস্টার রায়?'

'হুম। একটুও বিচলিত হননি দেখছি। বলুন কী চাই?'

'প্রথমে শুধু আমাকে পাঠিয়ে দিন তীরে—তারপর লঞ্চ ফিরে এলে এঁরা যাবেন'খন।'

বেশ খুশি-খুশি মন তখন সোমেশ রায়ের। তরফদারের বিচিত্র অনুরোধ শুনে হেসে ফেললেন তিনি।

'নিশ্চয়,-নিশ্চয়, তাই হবে। অনেকগুলি বস্তু একসঙ্গে রাখা যেমন সমীচীন নয়—তেমনি আপনাদের তিনজনকেই একসঙ্গে লঞ্চে চাপানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। উঠে পড়ুন আপনি। আর আপনি মিস্টার দেশমুখ—' এগিয়ে গিয়ে রাজনীতিবিদ ভদ্রলোকের পথরোধ করে দাঁড়ান উনি। 'যেখানে আছেন, ওইখানেই থাকুন।'

মালপত্রগুলো একজন খেলাসিকে দেখিয়ে দিয়ে চটপট সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন তরফদার। ফটফট শব্দে জলের ওপর মস্ত একটা অর্ধবৃত্ত কেটে জেটির দিকে এগিয়ে গেল লঞ্চটা। রেলিংয়ের ধারে গিয়ে শূন্যে মুঠি তুলে চিৎকার করে উঠলেন দেশমুখ, 'তোমায় দেখে নেব আমি জোচ্চোর কোথাকার!'

প্রত্যুত্তরে লঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে হাসিমুখে বিদায় অভিনন্দন জানালেন তরফদার। অজানা অচেনা পথে ভাগ্যের অন্বেষণে আবার নতুন করে শুরু হল তাঁর পথ চলা।

মিসেস প্যাটেলের কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল। 'মিস্টার রায়, জানেন তো মত পরিবর্তন করা মেয়েদের স্বভাব। তাই ভাবছি, আপনার সঙ্গেই থেকে যাই। একসাথে তাহলে বহে ফেরা যাবে।'

'আজ্ঞে না।' বিদ্রূপকঠিন স্বরে উত্তর দেন সোমেশ রায়। 'এত কষ্টে পাওয়া টাকা আর একবার হাতছাড়া করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

'তার মানে?' বিস্ফারিতভাবে তাকান প্যাটেল-গৃহিণী।

'আপনার আর মিস্টার দেশমুখের সঙ্গ বিষের মতোই অসহ্য মনে হচ্ছে—বলতে বাধ্য হলাম, কিছু মনে করবেন না। আপনার বন্ধু চুনীলাল রয়ভাইকে বলবেন

সিলোন ব্রিজ কনট্রাক্টটি আমি নেবই—ক্ষমতা থাকে তো ছিনিয়ে নিক আমার হাত থেকে। আর মিস্টার দেশমুখ—শুনে রাখুন, সামনের হপ্তাতেই অ্যাসেম্বলির ইলেকশানে নামার সব ব্যবস্থা আমি সম্পূর্ণ করছি। আপনার বর্তমান অবস্থাটি জেনে খুবই খুশি হলাম।'

'এ সবের মানে কী?' ব্যগ্র স্বরে শুধোন দেশমুখ।

'আপনি ভালো করেই তা জানেন। শহরে সামান্য কাজ আছে সেকেন্ড অফিসারের—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লক্ষ নিয়ে ফিরে আসবে ও। এলেই মিসেস প্যাটেলের সঙ্গে জলপরী ছেড়ে চলে যাবেন আপনি।'

বলে হাসিমুখে আমার দিকে ফিরলেন তিনি। দুই চোখে তাঁর অনাবিল আনন্দের প্রতিচ্ছবি। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ডিটেকটিভ-কাম-রিপোর্টার, শ্রীমৃগাঙ্ক রায়। কী বলো? এসো বাবা, সেলুনে এসো। তোমার-আমার মধ্যে ব্যবসার সম্পর্কটা এবার চুকিয়ে ফেলা যাক। ভালো কথা সোম, চেকবইটা কাছে আছে তো?'

'আছে।' বললেন সোমনাথ মুখার্জি।

সোমেশ রায়ের পিছু-পিছু সবাই এসে ঢুকলাম বড় সেলুনে। কবিতাও এল সঙ্গে।

'সোম, তোমার দু-হাজার।' স্মরণ করিয়ে দেন সোমেশ রায়।

'জানি,' অনিচ্ছার সঙ্গে টেবিলে বসে লেখার উদ্যোগ করেন সোমনাথ মুখার্জি।

'এক মিনিট, স্যার।' বাধা দিয়ে বলি আমি। 'আপনার কাছে কোনও টাকা আমি চাই না।'

'তবে কী চাও?' শুধোলেন সোমনাথ মুখার্জি।

'ভালো একটা কাজ।'

'ও তার উপযুক্তও বটে!' প্রশংসিকা দিয়ে দেন সোমেশ রায়।

অনিচ্ছার ভাবটা একটু একটু করে ফিকে হয়ে আসছিল মিঃ মুখার্জির মুখের রেখায়। বললেন, 'কিন্তু অফিসের ব্যাপারে নাক গলানো মোটেই পছন্দ করি না আমি।' বললেন বটে, কিন্তু মুখের ভাব দেখে মনে হল, নগদ দু-হাজারের বিচ্ছেদ-বেদনাও বড় কম নয় তাঁর কাছে।

বললাম, 'গত হপ্তায় সানডে ম্যাগাজিনের সম্পাদক চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। আপনার মুখের একটা কথা পেলেই প্রমোশনটা হয়ে যায় আমার। মাসে তা হলে সাড়ে চারশোর মতো পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।'

উঠে দাঁড়ালেন সোমনাথ মুখার্জি। 'আমি কথা দিলাম।' বলে সস্নেহে চেকবইটাও পকেটে রেখে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন সোমেশ রায়, 'কাজের মতো একটা কাজ করলে বাবা। ভালো কাজ মানে ভবিষ্যতের পথ সোনা দিয়ে বাঁধানো। নগদ টাকার চাইতে অনেক ভালো।'

'আমিও তা বিশ্বাস করি স্যার,' মৃদু হেসে বলি আমি। 'তা ছাড়া, আমি আবার বিয়ে করার কথা চিন্তা করছি।'

দাঁড়িয়ে উঠে সজোরে আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন সোমেশ রায়।

'চমৎকার-চমৎকার। এই তো চাই। আগে থেকেই তোমাদের কল্যাণ কামনা করে আশীর্বাদ করে রাখছি আমি।'

'তাহলে আপনার মত আছে?'

'একশোবার। বিয়ে মানেই ছন্নছাড়া তরুণের জীবন ঘড়ির কাঁটার মতো যথানিয়মে চলা। এর চেয়ে ভালো কাজ আর আছে? জীবনে বড় হওয়ার প্রেরণা, শক্তি আর সাহস—এসব কিছুর উৎসই তো স্ত্রী।'

'আমারও সেই বিশ্বাস, স্যার।' আন্তরিকভাবেই বলি আমি।

'অসংযম থেকে সংযম, যাযাবরের জীবন থেকে সংসার-জীবনের শ্রী, অন্যায়-প্রলোভন থেকে ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা—এসবই সম্ভব শুধু বিয়ের ফলেই।' বক্তৃতা শেষ করে আবার টেবিলের সামনে বসে পড়েন তিনি। 'আর এই বিয়ের প্রথম যৌতুক হবে আমার ছোট্ট চেকটা।' একটু থেমে, 'মেয়ে আশা করি ভালোই? রূপে-গুণে তোমার উপযুক্ত তো?'

'বরং আমিই তার উপযুক্ত নই।'

টেবিল চাপড়ে প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন সোমেশ রায়, 'বেশ কথা বলেছ বাবা, বেশ বলেছ। তবে কী জানো, আজকালকার এই মেয়েগুলোকে মোটেই পছন্দ হয় না আমার। অত্যন্ত অপব্যয়ী। সামান্য একটা টাকার মূল্য যে কতখানি, তা তো জানেই না, উপরন্তু—'

'কিন্তু এ মেয়েটি জানে। অন্তত জানা তো উচিত।'

'কে সে?'

'কবিতা।'

'এ কী!' লাফিয়ে ওঠেন সোমেশ রায়।

'চেকবইটা পকেটে রাখুন স্যার। আমি যা চাই, তা আপনার টাকা নয়।'

টেবিলের ওপর পেনটাকে সজোরে আছড়ে ফেললেন সোমেশ রায়।

'আমি—আমি কল্পনাই করতে পারিনি। কবিতা, এসবের মানে কী?'

পাশে গিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কবিতা।

'বাবা, ছেলেবেলা থেকেই আমি যা চেয়েছি, তাই দিয়েছ তুমি। মৃগাঙ্ককে নিয়ে তুমি আর উত্তেজিত হয়ো না। আমার কথা রাখো।'

'কিন্তু—এ কী করে সম্ভব—ছেলেটির—ওর যে কিছুই নেই।'

'তুমি যখন বিয়ে করেছিলে, তোমার কী ছিল বাবা?' শুধোয় ও।

'ছিল আমার মস্তিষ্ক আর শক্ত দুটো হাত।'

'মৃগাঙ্করও তা আছে।'

সোমেশ রায় মুখ ফেরালেন আমার দিকে। একটু পরে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'তোমাকে আমার ভালোই লাগে মৃগাঙ্ক। আর তাই তোমায় দুঃখ দেব না আমি। কিন্তু—কিন্তু তুমি কি পারবে? ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে কবিতা। ওর জীবনযাত্রার মান অনেক উঁচু। তুমি কি পারবে সামলাতে?'

'আপনার আশীর্বাদ পেলে নিশ্চয় পারব।' বলি আমি।

সস্নেহে মেয়ের চিবুকটি নেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সোমেশ রায়।

বললেন, 'একটু সময় দাও ভাববার। আচমকা কিছু করা উচিত নয়। কী বলো?'

বললাম, 'নিশ্চয়। ইতিমধ্যে—'

'ইতিমধ্যে!' দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন উনি। বেশ কিছুক্ষণ গভীর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন আমার পানে। তারপর বললেন, 'ইতিমধ্যে যে অবস্থায় তুমি পৌঁছেছ, সেখান থেকে লাখ টাকা পেলেও রাজি হব না তোমায় টেনে আনতে।' বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কবিতা বলল, 'দেখলে? আমার বাবা কত ভালো, দেখলে? এরকম মানুষকে ভালো না বেসে কেউ থাকতে পারে?'

'তোমাদের বংশের প্রত্যেকেই ওই রকম ছবি। অনেকদিন ধরেই তা লক্ষ করে আসছি।'

'কিন্তু চিরকাল কি এমনি সুন্দর থাকবে তোমার ভালোবাসা? পুরুষের মন—'

'তোমাদের মতো নয়। মানে—তোমাদের মতো অত সুন্দর নয়। জীবনের অত্যন্ত সঙ্কটময় মুহূর্তে তোমার সাহায্য, তোমার প্রেরণা, তোমার প্রেম কোনওদিনই আমি ভুলতে পারব না। তুমিই আমার জীবনের প্রথম প্রজাপতি স্ত্রী!'

'মৃগ! সবধান—কেউ এসে পড়তে পারে এদিকে।'

ভায়া ইন্দ্রনাথ, তাই বলছিলাম, এ শুধু আমার রহস্যভেদ নয়, অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ এবং বধূলাভ।

বম্বেতে ফিরেই লিখলাম এই চিঠি। পরের খবর পরের চিঠিতেই পাবে। অতএব, ধৈর্য ধরো!

ইতি—
তোমার প্রিয়তম
মৃগাঙ্ক রায়

চিঠিটা নামিয়ে রেখে চোখ তোলে ইন্দ্রনাথ। ওর টানা-টানা বিষাদ-মাখা দুই চোখে টলমল করে ওঠে আনন্দ-অশ্রু গোধূলির বিষণ্ণ আভায়...

কঙ্কাল পালিয়েছে

চক্রান্ত-পর্ব

ছোট্ট একটা মাইক্রোফিল্ম। লম্বা-চওড়ায় এক ইঞ্চি বাই দেড় ইঞ্চি। মাইক্রোফিল্মে লেখা অত্যন্ত গুপ্ত নির্দেশনামা একটা। নাগরাজ্যের প্রেসিডেন্টের হুকুম। নাগরাজ্য সায়ান্স ইনস্টিটিউটের জিওফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান কর্মকর্তাকে চিঠিটি লিখেছেন প্রেসিডেন্ট। চিঠিটা এই :

আমি শুনেছি নানা কারণে পৃথিবী সব সময়ে কাঁপছে। বিশেষ একটা দিনে এই কম্পন নাকি চরমে ওঠে। আমি প্ল্যান করেছি এই চরম-কম্পনকে কাজে লাগাব।

সাম্রাজ্যবাদী যক্ষরাজ্যকে ধ্বংস করতেই হবে। যক্ষরাজ্যের শক্তি বাহ্যিক। ক্ষয়িষ্ণু। যক্ষরাজ্যের সাম্রাজ্যবাদ আগ্নেয়গিরির মুখে বসে আছে। তাই তারা সারা বিশ্বে হন্যে হয়ে ঘুরছে অন্য জাতদের গোলাম বানাতে। সর্বত্র চেষ্টা করছে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে। যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে কুবের যুদ্ধ ব্যবসায়ীরা। তাদের লক্ষ্য যেন-তেন-প্রকারেণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উস্কানি দেওয়া, যুদ্ধ বাধানো এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে ধ্বংস করা।

কিন্তু যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করে জনসাধারণ, মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে তা সম্ভব নয়। কাগুজে বোমা বলে আণবিক বোমাকে তাচ্ছিল্য করাটাও ঠিক নয়। বোমাটা যদি পিঠের ওপর ফাটে? সুতরাং আণবিক যুদ্ধের মধ্যে না গিয়ে ওদের ধ্বংস করব নতুন কায়দায়।

অস্ত্রটা নতুন ধরনের। নাম দিয়েছি, লম্ফন অস্ত্র। হিসেব করে দেখেছি, পঁচাত্তর কোটি নাগ যদি মাত্র ছ-ফুট উঁচু মঞ্চ থেকে একই সময়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে, তা হলে সেই বিপুল ধাক্কার ঠেলা সাগরপাড়ের দেশেও পৌঁছবে। প্রশান্ত মহাসাগরে টাইডাল ওয়েভ দেখা দেবে। তালগাছ সমান ঢেউ আছড়ে পড়বে যক্ষরাজ্যের পশ্চিম উপকূলে। শুরু হবে পৃথিবীব্যাপী ভূমিকম্প। চক্ষের নিমেষে তলিয়ে যাবে দ্বীপময় দেশগুলো। নিশ্চিহ্ন হবে অন্যান্য দেশ। বিশ্বের প্রভু হব আমরা। অথচ একটা বন্দুকও ছুড়তে হবে না। শুধু লাফাতে হবে, ছ-ফুট উঁচু মঞ্চ থেকে।

জওহরলাল নেহেরু বলতেন, আণবিক যুদ্ধ হলে মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হবে। ভারতের মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাই আমি আণবিক যুদ্ধ থেকে বিরত রইলাম। ফলে, পৃথিবীর দুশো সত্তর কোটি লোকের সবাইকেই আর মরতে হচ্ছে না। যদিও মরা দরকার। নইলে ২০৫০ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৮৭০ কোটিতে। দুশো বছর পরে ৫০,০০০ কোটিতে। জুরিখের সেই প্রফেসর মোলার কথাটা মিথ্যে বলেনি। বুভুক্ষাই গ্রাস করবে পৃথিবীকে। বড়জোর একশো বছরের মধ্যে।

দরিদ্র দেশগুলো কিন্তু এখনও নির্বিকার। যেমন ভারত। ১৬০ কোটি ইঁদুর আর ৮ কোটি গরুকে পুষে রেখে দিয়েছে। নিজেরা খেতে পাচ্ছে না, কুবেরের জীবদের খেয়েও ফেলছে না। নিষিদ্ধ মাংস। অথচ গরুগুলো একফোঁটা দুধ দেয় না, গাড়িও টানতে পারে না। তার ওপর প্রত্যেকটা ইঁদুর ফি-বছর পাঁচজনের খাবার খেয়ে ফেলছে।

সুতরাং আমিই কল্কির কৃষ্ণ হব ঠিক করেছি। মানবজাতির সংখ্যা কমিয়ে এনে তাদের নিশ্চিত অনশন-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাব।

পরিকল্পনাটা টপ সিক্রেট। আপনি কম্পিউটার দিয়ে হিসেব করে বলুন, কবে, কখন পৃথিবীর কম্পন চরমে উঠবে। ঠিক সেই মুহূর্তে পঁচাত্তর কোটি নাগকে ছ-ফুট উঁচু মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়তে হবে। পৃথিবী টলমল করে উঠবে লম্ফন প্লাস কম্পনের ডবল ধাক্কায়।

এই অভিনব পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেলেই কিন্তু বুমেরাং হয়ে যাবে। অর্থাৎ চরম মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদীরাই ছ-ফুট উঁচু মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়ে তছনছ করে দেবে গোটা নাগরাজ্যকে।

নাগরাজ্যের চর-পর্ব

টেনে দৌড়তে পারলেই বাঁচত দোরজি গুরুং। কিন্তু তাতে সন্দেহ হবে পথচারীদের। ক্যাঁক করে একবার চেপে ধরলেই সর্বনাশ। জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেবে পিঙ্গলের ভয়ংকররা।

দোরজি গুরুংয়ের পূর্বপুরুষরা জন্মেছিল নেপালে। চোখে-মুখে মঙ্গোলীয় ছাপটা তাই অত স্পষ্ট। কিন্তু সারা পৃথিবী ঘুরে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে দোরজীকে। কলকাতায় ধারাপাত পড়েছে। নিউইয়র্কে পলিটিক্যাল সায়েন্স। প্রাণে গুর্খা বলেই অত ধকল সইতে পেরেছে। এখন সে [illegible] চালিয়াত।

দোরজির জন্ম খুব উঁচু বংশে। নেপালের রাজবংশের পরেই ওদের বংশমর্যাদা। দোরজি এই বংশের শেষ সন্তান। রানাবংশের শেষ রানা।

দোরজি বিয়ে-থা করেনি। করার দরকারও হয়নি। একে গুর্খা তেজ, তায় কন্দর্পকান্তি, সুতরাং ডাগর-ডাগর মেয়েরা তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলেছে; অথবা দোরজিই খেলিয়েছে। গুর্খা বলেই একই দিনে একাধিক কন্যাকে সুখের স্বর্গে পৌঁছে দিয়ে নিজে চম্পট দিয়েছে। বাৎস্যায়ন বেঁচে থাকলে শিষ্যের গুরুমারা বিদ্যে দেখে রোমাঞ্চিত হতেন।

দোরজির বাবা রানা সাহেব ব্যবসাটা ভালো বুঝতেন। রপ্তানির ব্যবসা। বিক্রির টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখতেন। শেষকালে এত টাকা জমল যে দোরজি পড়ল মহাফাঁপরে। হলিউডি কন্যাদের নিয়ে বাৎস্যায়ন প্রণীত শাস্ত্র চর্চা করেও এক জন্মে এত টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। তাই নগদ তিরিশ লক্ষ ডলার দিয়ে একটা বিরাট প্রাসাদ কিনল নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে। তার মধ্যে রইল আয়না ফিট করা খাট, বেডরুম, কড়িকাঠ পর্যন্ত আয়না ফিট করা আঠারোটা বাথরুম, সুইমিং পুল, ইটালি থেকে আমদানি করা মার্বেল প্যাভিলিয়ন ইত্যাদি-ইত্যাদি। দেখেশুনে হতভম্ব হয়ে গেল আমেরিকার রিয়েল এস্টেট এজেন্ট। বললে, নগদ তিরিশ লক্ষ ডলার বার করার ক্ষমতা কোনও মার্কিনি ধনকুবেরেরও নেই—ইন্ডিয়ান মহারাজার ছাড়া।

সেই থেকে দোরজির নামের আগে লেগে রইল মহারাজা খেতাবটাও। কিন্তু নিত্যনতুন স্ত্রীলোক সম্ভোগ করে তৃপ্তি পেল না মহারাজা দোরজি গুরুং রাণা। মাত্র আঠাশ বছর বয়স তার। নতুন-নতুন অ্যাডভেঞ্চার না পেলে খুশি এবং বাগ মানে না। তাই সুবাসিত নারীদেহের ভৌগোলিক ক্ষেত্রে বিস্তর দাপাদাপি করার পর বড় একঘেয়ে লাগল দোরজির। যযাতি কী করে যে হাজার বছর মেয়েছেলে নিয়ে ধাত কাটাত ভাবতে-ভাবতে একদিন ঠিক করলে স্পাই হবে।

সেই হল শুরু। এতদিন গুর্খারা সম্মুখ সমরে নাম কিনেছে, এবার শুরু হল অন্তরাল সমরের শুরু। ঠিক কোন রাষ্ট্রের হয়ে গুপ্তচরগিরি আরম্ভ করল দোরজি, তা প্রকাশ পেল না কোনওকালেই। কিন্তু স্রেফ চাকচিক্য, চালিয়াতি এবং সুন্দরী রমণী-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকায় তুলিনেই গুপ্তচর শিরোমণি হয়ে উঠল মহারাজ দোরজি গুরুং রাণাসাহেব।

এ-হেন দোরজিকেই দেখা গেল প্রায় ছুটতে-ছুটতে ঢুকছে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল থেকে তাকে তাড়া করেছে নাগরাজ্যের গুপ্তচররা। এর মধ্যে দুবার গুলিবর্ষণ এবং একবার বিষাক্ত ছুঁচ বর্ষণও হয়ে গেছে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে প্রতিবারই। প্রথম দুবার সাইলেন্সার লাগানো রিভলবারের গুলি প্রায় নিঃশব্দে হত্যা করেছে দুটি কুকুরকে—উত্তেজিত অবস্থায় আবদ্ধ থাকার সময়ে। তৃতীয়বার ব্লো-পাইপ নিক্ষিপ্ত বিষ মাখানো ছুঁচটি দোরজির কানের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে পাতাল রেলের গেন্ডারিনে ঢুকে গেছে।

সুতরাং আর চান্স নিতে রাজি নয় দোরজি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য নিয়ে ছুটে চলেছে সে। পকেটে রয়েছে একটা দেড় ইঞ্চি লম্বা কড়ে আঙুলের মতো মোটা অ্যালুমিনিয়ামের ডিবে। আফিংখোররা এ কৌটোয় আফিং রেখে রাখে। ডকুমেন্ট। লম্বা অস্ত্র নিয়ে বিশ্ববাসীকে কুপোকাত করার পরিকল্পনা।

মাইক্রোফিল্ম রিলে সিস্টেমে বেরিয়ে এসেছে নাগরাজ্যের বাইরে। নেপালের স্পাই হ্যান্ডওভার করেছে দোরজিকে। দোরজি হ্যান্ডওভার করবে কলকাতার স্পাইকে। তারপরেই তার ছুটি।

নাগরাজ্যের প্রেসিডেন্ট কিন্তু ঘুমিয়ে নেই। দুর্ধর্ষ নাগ স্পাইরা এর মধ্যেই নেপালের স্পাইকে খতম করেছে। কিন্তু ততক্ষণে অ্যালুমিনিয়ামের ডিবে দোরজির কাছে পাচার হয়ে গেছে। দোরজি যার কাছে নিয়ে চলেছে, সে এখন কোথায়?

স্বর্গে (যদি স্বর্গে ঠাঁই হয় স্পাইদের)। নাগ স্পাইরা রিলে সিস্টেম ফলো করছে তো, তাই সামনের লোককেও সরিয়ে দিয়েছে। দোরজি তা জানে না।

অতশত না জানলেও একটা জিনিস সে খুব ভালো করেই জানে। নাগ স্পাইরা দৈহিক নির্যাতনের ব্যাপারে ব্রহ্মাণ্ড-বিখ্যাত। যমদূতরাও সেই নির্যাতন দেখলে দেশ ছেড়ে চম্পট দেয়। সুতরাং নাগ স্পাইদের হাতে ধরা পড়ার চাইতে স্বেচ্ছায় স্বর্গ-নরকে যাওয়া ভালো।

তাই সব সময়ে গালের মধ্যে সুইসাইড অ্যাম্পুল রেখে দেয় দোরজি। আধ ইঞ্চি লম্বা পাতলা কাচের ভঙ্গুর অ্যাম্পুল। ভেতরে পটাসিয়াম সায়ানাইড। নাগ স্পাইরা তাকে ধরে ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার আগেই যাতে অবিলম্বে পটল তোলা যায় তার ব্যবস্থা।

ভিড়ের ডগা দিয়ে অ্যাম্পুলটা জন গণেশের ফাঁকে ঠেলে দিয়ে ছুটেছে দোরজি। সেদিন শুক্রবার। ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে ঢুকতে পয়সা লাগে না। তাই ওর কাউন্টারে দাঁড়াতে হল না। দাঁড়ালেই তো ছুটে আসত বিষ মাখানো ছুঁচ...টপাটপ সিঁড়ি টপকে ওপরের চাতালে উঠল দোরজি। বাঁ হাতে পড়ল লম্বা হল ঘর। ডাইনে-বাঁয়ে দু-সারি কাচের শো-কেস। হরেকরকম শিলীভূত প্রস্তর আর খনিজ প্রস্তর সাজানো সেখানে। একটা স্ট্যান্ডের ওপর পালিশ করা বোর্ডে সাদা হরফে লেখা ধূমপান নিষেধ।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তেড়ে ঢুকে পড়ল দোরজি। গোটা হল ঘরটা প্রায় ফাঁকা। ওদিকের প্রান্তে টুলে বসে দুজন কর্মচারী খোশগল্পে মত্ত।

দরজার ঠিক সামনে থেকেই আরম্ভ হয়েছে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হাঁড়। লক্ষ-লক্ষ বছর আগে যারা পৃথিবীর বুকে দাপিয়ে গেছে, সেইসব দৈত্যাকার প্রাণীদের দেহাংশ। প্রথমে দশ ফুট লম্বা দুটো ম্যামথের দাঁত। পাঞ্জাবের শিবালিক অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা। তার পিছনে অতিকায় কচ্ছপের মতো পিঁপড়ে-খেকো জীব। তারও পিছনে আরও কয়েকটি প্রকাণ্ড হাঁড়।

ম্যামথের প্রকাণ্ড মাথাটা দেখেই বুদ্ধিটা মাথায় এল দোরজির। নরুন-চেরা চোখের কোণ দিয়ে দেখে নিল আশেপাশে কেউ আছে কি না। কেউ নেই। দোরগোড়া ফাঁকা। ওপাশের দরজা পর্যন্ত তাকালেও ঠিক সেই মুহূর্তে কারও চাহনি দেখা যাচ্ছে না। ঘরের মধ্যে লোক দুটো পিছন ফিরে গল্পে মত্ত।

পকেট থেকে অ্যালুমিনিয়ামের খুদে ডিবেটা বার করে হাতে নিল দোরজি...

বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এবার শুরু হয়েছে প্রকাণ্ড সোপান সারি—ডাইনে আর বাঁয়ে। টপাটপ লাফ মেরে চৌষট্টিটা ধাপ পেরিয়ে ওপরে উঠে এল দোরজি। চওড়া বারান্দা দিয়ে প্রায় ছুটতে-ছুটতে পৌঁছল ম্যামাল সেকশনে। এখানে আর-একটা ছোট সিঁড়ি ফের নিচে নেমে গিয়েছে।

ঘরের এদিকে ঢুকল দোরজি—বেরোল ওদিকে। ময়দানের মতো প্রকাণ্ড ঘর। কিন্তু জ্যান্ত প্রাণী কেউ নেই। মিউজিয়ামের কোনও কর্মচারীও নেই। সারি-সারি দাঁড়িয়ে আছে মরা প্রাণী। ঝুলছে মাথার ওপর থেকে। বগড় দেখছে কাচের আলমারির মধ্যে দাঁড়িয়ে। ঘরের মাঝ বরাবর টানা পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছে কংকালের পর কংকাল। বড়-বড় হাতি, জিরাফ, গণ্ডারদের গায়ে এক কণাও মাংস নেই—শুধু হাড় আর হাড়।

দোরজির হাত এখন খালি। ডিবে চালান হয়ে গেছে হাতির মাথায়। একতলা দোতলায় ছুটোছুটির ফাঁকেই কাজ সেরেছে সবার অলক্ষ্যে। মূল্যবান ডিবে পাচার হয়ে গেছে হাতির কঙ্কাল করোটির খোকরে।

পিছন ফিরে দেখল দোরজি। নাগমুখগুলো এখনও আবির্ভূত হয়নি বারান্দায়। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে চোখ রেখেই পা দিল সিঁড়িতে এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা মোটাসোটা মহিলার ওপর। সেই মুহূর্তে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিল চর্বিথলথলে মহিলাটি।

আর-একটু হলেই পড়ে যেত দোরজি। টাল সামলাতে গিয়ে দু হাতে খাঁকড়ে

ধরল বাতাস। কিন্তু কপাল মন্দ দোরজির। তাই বাতাসের বদলে দু-হাতের থাবাটিতে ধরা পড়ল মহিলাটির...

সঙ্গে-সঙ্গে চটাং করে চড় পড়ল ডান গালে। সেইসঙ্গে অতি-অতি পরিচিত অতি শীতল তিরস্কার, বলাৎকার করতে শিখলি কবে থেকে?

সভয়ে দোরজী দেখল, স্থূলকায় মহিলা তারই ধাইমা!

সায়ানাইড-পর্ব

ধাইমা!

রাণাসাহেবের অতি আদরের একমাত্র পুত্র দোরজিকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিল যে, সেই ধাইমা!

নারায়ণী তার নাম। জন্ম অন্ধ্রের মাটিতে। কুতকুতে চোখ। থলথলে বপু। সারা দেহে মেদপদার্থের আধিক্য। স্নেহ তার মনেও। তাই আয়া হওয়া তার পেশা হলেও মায়ের মতোই স্নেহ দিতে পেরেছিল দোরজিকে।

নারায়ণী চিরকুমারী। বাচ্চার মা না হয়েও বাচ্চা মানুষ করতে পটিয়সী। রাণাসাহেবের পুত্র এই দোরজিকে বড়সড় করে দেওয়ার পর থেকে তার সুনাম ছড়িয়েছে বড়লোকি মহলে। রাজা-বাদশা, আমীর-ওমরা, সাহেব-সুবো ছাড়া কারও ছেলেপুলে মানুষ করার চাকরি নেয় না নারায়ণী।

নারায়ণীর রং কর্সা, ঠোঁট মোটা, চোখ ছোট, মাথায় বিড়ে খোঁপা, সাদা জমি কালো পেড়ে শাড়ি দিয়ে কষে পেটের ভুঁড়ি বাঁধা। বয়স তার পঁয়তাল্লিশ। শুধু বাচ্চাকাচ্চা মহলেই নয়, সব মহলেই দাপিয়ে চলা অভ্যেস নারায়ণীর। মনে-মনে তার বেজায় দেমাক, রাণাসাহেবের ছেলে মানুষ করার পর থেকেই আয়ামহলে সে রানি বললেই হয়। লাট-বেলাট ছাড়া কারও ছেলে নাকি ছোঁয় না নারায়ণী, চাট্টিখানি কথা নয়!

সেই নারায়ণীর পয়োধর খামচে ধরল এক ফোঁটা ছেলে দোরজি! ধার কি রক্তে আছে? চটাস করে চড় কষিয়ে দিয়ে কড়া গলায় ধমকে উঠল নারায়ণী, 'এ মেন্দি?' রেগে গেলে নারায়ণী মাতৃভাষায় কথা বলে। তেলুগুতে 'এ মেন্দি' মানে এ কী হল?

ভার সামলানোর জন্যে তখনও মুঠো আলগা করেনি দোরজি। সেই অবস্থাতেই শুকনো মুখে বললে তেলুগুতেই, আডেটপ্পুডু কিন্দ পড্ডানু, মানে, খেলতে-খেলতে পড়ে গেছি।

খেলা? মনে হল নারায়ণী এবার তিড়িং-তিড়িং করে নেচে উঠবে। 'চংলুলু' নিয়ে খেলা? কোত্থেকে শিখলি এই খেলা?

দোরজির অবস্থা তখন শেষ অবস্থায়। ফালতু কথা বলার সময় নেই। ধাইমার প্রচণ্ড চপেটাঘাতে তার সর্বনাশ হয়েছে। ডান গালের সুইসাইড অ্যাম্পুল গুঁড়িয়ে গেছে। পটাসিয়াম সায়ানাইড কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

অমন টুসটুসে লাল-লাল চেহারাও রং পালটাতে আরম্ভ করেছিল আসন্ন মৃত্যুর

ছায়াপাতে। কালকূট তার মরণখেলা শুরু করে দিয়েছে বেগুনি নীল রঙে। হাঁপাতে-হাঁপাতে রুদ্ধশ্বাসে বলল, নানি, তোমার হাতে ঘড়ি আছে। এক, দুই, তিন করে ষাট সেকেন্ড পর্যন্ত গুণে যাও। তার পরেই আমি মারা যাব।

মারা যাবি?

হ্যাঁ।

'কাদন্তি!' (না! না!)

হ্যাঁ। হ্যাঁ। গুণতে আরম্ভ করো।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল নারায়ণীর মতো ডাঁহাবাজ মেয়েও। দোরজির মুখচোখ মোটেই স্বাভাবিক নয়। নিশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। তাই সেকেন্ড গোনা আরম্ভ হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই এক...দুই...তিন...চার...

দু-হাতে নারায়ণীর কাঁধ খামচে ধরে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দোরজি। মৃত্যু আর বেশি দূরে নেই। প্রলয় নাচন জেগেছে রক্তে। জিভ জড়িয়ে আসছে, চোখে অন্ধকার নামছে। থেমে-থেমে অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করল দোরজি—পৃথিবীর বিপদ... মাইক্রোবিজম...মিউজিয়ামের সবচেয়ে...বড় হাতির কঙ্কালের মধ্যে...কাউকে বিশ্বাস কোরো না...হুঁশিয়ার...!

চোখ খোলা রেখেই মারা গেল দোরজি। ষাট সেকেন্ড গোনা শেষ হতেই মুখ তুলল নারায়ণী। দেখল, প্রাণহীন চোখে চেয়ে আছে দোরজী। ভাবল ভয় দেখাচ্ছে। তাই ফের 'কাদন্তি' বলে চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠে টেনে চড় হাঁকড়াল গালের ওপর। কাঠের পুতুলের মতো হেলে পড়ল দোরজির মৃতদেহ। সিঁড়ির ঠিক মাথায় আছড়ে পড়ল ধড়াস করে।

তখন সকাল দশটা বেজে দশ মিনিট। মিউজিয়াম সবে খুলেছে ভিড় হওয়ার কথা নয়। তবুও ভিড় জমে গেল চারধারে। বাইরের লোকই বেশি। বগলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল কয়েকজন নাগ ভদ্রলোকের নির্বিকার মুখ।

একজন সুড়ুৎ করে এগিয়ে এল সামনে।

বলল, মিঃ ডক্টর। বলেই হেঁট হল মৃতদেহের ওপর। ওস্তাদ ডাক্তারের মতই হাত বুলিয়ে নিল সর্বাঙ্গে, মাথার চুল থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত। বুট খুলে ছুঁড়ে দিল এক পাশে। বুক দেখার অছিলায় পকেটগুলো হাতড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো। বলল, উদাসীন কণ্ঠে, ডেড।

ডেড! দোরজি শুধুং মারা গেছে! নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না নারায়ণী। বিশ্বাস করতে পারল না চোখকে।

দোরজি। তার অতি আদরের দোরজি মারা গেছে? যাকে আঁতুড় থেকে বড় করেছে নারায়ণী, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ভেজা তোয়ালে পালটেছে, অলিভ অয়েল মাখিয়ে স্নান করিয়েছে, ট্যালকাম পাউডার মাখিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে, পারাম্বুলেটরে করে বেড়াতে নিয়ে গেছে, সেই দোরজী মারা গেল চোখের সামনেই?

অকস্মাৎ আঘাতে মানুষ পাথর হয়ে যায়। চোখে জল আসে না। নারায়ণীও শুকনো চোখে চেয়ে রইল প্রাণহীন দেহটার দিকে। দোরজি! দোরজি! দোরজি! তোকে আমি বুকের দুধটুকুই শুধু দিতে পারিনি, কুমারী মেয়ের বুকে কি দুধ থাকে রে?

ছোট ছোট ননী হাতে তুই কতবার খামচে ধরেছিস, মুখ ঘষেছিস, তখন তো কই চড় মারিনি!

আচ্ছন্নের মতো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নারায়ণী। দেওয়াল ধরে টলতে-টলতে নামল। প্যারাম্বুলেটর নিচে রেখে কী কুক্ষণেই না আজ ওপরে উঠেছিল। রোজই এ-সময়ে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে মিউজিয়ামের সামনে। আজ গুরুবার। পয়সা লাগবে না বলেই নারায়ণী উঠে এসেছিল ওপরে। কিন্তু এমনটা হবে তা কে জানত?

টলতে-টলতে বাইরে এসে দাঁড়াল নারায়ণী। বাচ্চাটা প্যারাম্বুলেটরে শুয়ে তখনও হাত-পা নেড়ে খেলা করছে। অন্যান্য আয়ারা পাশে দাঁড়িয়ে যে যার বাচ্চা নিয়ে। কিচিরমিচির করছে হিন্দি-মারাঠি-বাংলা-কন্নাড় ভাষায়।

বেলগুপ্রতাপ নারায়ণীর চোয়াল ঝুলে পড়ছে দেখেই কলকলানি বন্ধ হয়ে গেল বাকি চারজনের। ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইল, মুখে কথা সরল না।

ততক্ষণে ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে দারোয়ানদের মধ্যে। পুলিশ ঢুকছে গেট পেরিয়ে। নিভাননী, মাতঙ্গিনী, পটলানী আর নিতম্বিনী চারজনেই বুঝল ব্যাপার গুরুতর। একটা ঘোর সন্দেহ একই সঙ্গে উঁকি দিল চারজনেরই মাথায়—একা পেয়ে কেউ নারায়ণীর ইজ্জত নষ্ট করেনি তো?

তাই সন্দিগ্ধ চোখে চারজনে চাইল নারায়ণীর শাড়ি আর ব্লাউজের দিকে। কিন্তু ধস্তাধস্তির চিহ্ন তো কোথাও নেই। তবে কি...তবে কি...

ভাবতেই শিউরে উঠল নিভাননী, মাতঙ্গিনী, পটলানী আর নিতম্বিনী।

শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁটটা বুলিয়ে নিল নারায়ণী। বুকের কাপড়টা ঠিকই ছিল, তবুও ঠিক করে নিয়ে বললে ভাঙা গলায়, বাড়ি চল। পরে বলব।

রাসেল স্ট্রিট। রয়্যাল টার্ফ ক্লাবের কাছাকাছি একটা তিনতলা বাড়ি। সাদা রং। নীল জানলা। লাল কার্নিশ। বাড়ির সামনে টেনিস লন। তারপর আউটহাউস। একতলা।

নারায়ণী চুপ করে বসে ছিল আউটহাউসের একটা ঘরে। রাত হয়েছে। জানলা দিয়ে আকাশের একটা ফালি দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ার কথা নারায়ণীর। কিন্তু ঘুম আসছে না। কেবল ভেসে উঠছে একটা মুখ। মৃত্যুনীল ঠোঁট নেড়ে বলছে, পৃথিবীর বিপদ...মাইক্রোফিল্ম...মিউজিয়ামের সবচেয়ে...বড় হাতির কঙ্কালের মধ্যে...কাউকে বিশ্বাস কোরো না...হুঁশিয়ার!

হুঁশিয়ার...হুঁশিয়ার! শেষ কথাটা হাতুড়ির মতো বাড়ি মারতে লাগল মাথার মধ্যে। হুঁশিয়ার...হুঁশিয়ার...হুঁশিয়ার! কাঠ হয়ে গেল নারায়ণী। খসে পড়ল বুকের আঁচল। শোবার সময়ে ব্লাউজ-জামা পর্যন্ত পরে না সে। কখনও লজ্জা করে না। আজকে মনে হয় দেয়ালও যেন অন্ধকারের মধ্যে থেকে কুতকুত করে চেয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি বুকে কাপড় তুলে নিয়ে ফের ধমকে উঠল নারায়ণী—আবার?

হুঁশিয়ার!...হুঁশিয়ার...হুঁশিয়ার! মাথার মধ্যে সেই কথাটা হাতুড়ি পিটে চলল একটানা। —কেন? এত হুঁশিয়ার কিসের?

পৃথিবীর বিপদ!...পৃথিবীর বিপদ!...পৃথিবীর বিপদ!

ধুত্তোর পৃথিবীর বিপদ। আমি কী করব?

হাতির কঙ্কাল!...হাতির কঙ্কাল!...হাতির কঙ্কাল...!

হয়েছে-হয়েছে! কিন্তু কী আছে হাতির কঙ্কালে?

মাইক্রোফিল্ম! মাইক্রোফিল্ম! মাইক্রোফিল্ম!

আঃ! আঃ! অসহ্য! পেঁপোমিদি!

অর্থাৎ—থাম! থাম! ঢের হয়েছে!

কাউকে বিশ্বাস কোরো না—কাউকে বিশ্বাস—

আবার! বলেই কাপড় দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল নারায়ণী। সারাদিন পর এই প্রথম গঙ্গা যমুনা নামল দুই চোখ বেয়ে।

আঙুলকাটা-পর্ব

বউবাজারে ম্যাকমিলান কোম্পানির পাশ দিয়ে একটা সরু গলি গেছে অতীতের চায়নাটাউনের দিকে। এত নোংরা গলি হাড়কাটাগলির বস্তিতেও দেখা যায় না। এক পাশে নর্দমা, আরেক পাশে চার ফুট উঁচু জঞ্জালের স্তূপ। বছরের পর বছর পড়ে থাকায় জমে পাথর হয়ে গেছে।

গলিটা কিছু গিয়ে ডাইনে বেঁকেই আবার বাঁয়ে বেঁকেছে। এত সরু হয়ে গেছে যে বড়জোর একটা রিকশা চলতে পারে।

পাঁচমিশেলি জাতের মানুষরা দোকানপাট খুলে বসে আছে এখানে। জুতো সেলাইয়ের মেশিন চলছে ঘরঘর করে। অত নোংরার মধ্যেও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শিশুরা খেলা করছে রাস্তার ওপর। বুক-চ্যাপ্টা মেয়েরা হাঁটু পর্যন্ত খাটো পাজামা পরে ভাত রাঁধছে ছোট-ছোট উনুনে।

গলিটা যেখানে 'দ'-এর মতো বেঁকেছে, তারই ধারে কাছে গোটাদুই শুয়োরের মাংসের দোকান। মাছি ভনভন করছে কুচো মাংসের ওপর। সস্তায় প্রোটিন আহারের উত্তম ব্যবস্থা।

দোকানদার একজন বুড়ো নাগলোকবাসী। নামটা ধরা যাক—বাসুকি নাগ। তার চেয়ারের তলায় একটা কাঠের পাটাতন। পাটাতন তুললেই দেখা যাবে এক-সার সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালে। অর্থাৎ দোকানের ঠিক নিচেই একটা পাতাল ঘর। সে ঘরে ঢোকবার আরও-একটা রাস্তা আছে আস্তাকুঁড়ের বড় ড্রেনের মধ্যে দিয়ে। সেই পথ দিয়েই চারজন নাগলোকবাসী ঢুকে শুয়ে আছে পাতাল ঘরে।

পাঠক-পাঠিকা এদেরকে চেনেন। এরাই আজ সকালে বিষ তীর আর পিনের গুলি ছুড়েছিল দোরজিকে লক্ষ্য করে। এই ঘর তাদের গুপ্ত ঘাঁটি। তাই দেওয়ালে সাঁটা প্রেসিডেন্টের ছবি। তলায় ধূপ আর চর্বির মোমবাতি।

ছোট ঘর। দেওয়াল থেকে রেলগাড়ির বার্থের মতো কাঠের পাটাতন ঝুলছে। চারজন মাথার তলায় হাত দিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে সেই বার্থে। এক কোণে স্টোভে কড়া চাপানো। তাতে ফুটছে শুয়োরের মাংস। একটা চর্বির মোমবাতির জ্বলন্ত শিখায় দেখা যাচ্ছে বন্দুক, পিস্তল, বোমা, ছুরি আর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির স্তূপ।

চার স্পাইয়ের মুখে কথাটি নেই। নাগলোকবাসীদের চেহারায় কোনও অমিল দেখা যায় না। সব গরু যেমন একরকম, সব নাগও তেমনি একরকম।

যেহেতু এরা গুপ্ত সংঘের সদস্য, তাই এদের নামের মধ্যেও মিল রাখা হয়েছে। ওপরে যে বসে আছে দোকানদার সেজে, সে এদের দলপতি। আগেই বলেছি, নাম তার বাসুকি নাগ। অতএব, বাকি চারজনের নাম শেষনাগ, অনন্ত নাগ, কর্কোটক নাগ ও কদ্রু নাগ।

নামের এই অদ্ভুত কবিতার জন্যে পাঠক-পাঠিকরা নিশ্চয় বিরক্ত হচ্ছেন। আমি নাচার। উদ্ভট গল্পে উদ্ভট নামটাই স্বাভাবিক।

চারজনের মাথার মধ্যে চিন্তার টাইফুন ছুটছে, উদ্বেগের জলস্তম্ভ উঠছে, উৎকণ্ঠার নায়াগ্রা ঝরছে। চারজনই কাঠ হয়ে শুয়ে আছে ওই কারণেই। কড়াই খোলে যে নুন দেওয়া হয়নি, সে খেয়ালও নেই। নুন না দেওয়ার শাস্তি কিন্তু ভয়ানক। সেবার তো একজনের কান কাটা গিয়েছিল এই অপরাধে। বাসুকি নাগ বলে, তরকারিতে যে নুন খায় না, সে নেমকহারাম হতে চায়। সুতরাং, কাটো কান।

দলপতি বাসুকি নাগের এমনি আরও অনেক নিয়মকানুন আছে। সে-সবের ফিরিস্তি দিতে গেলে এ কাহিনি অন্য রাস্তায় চলে যাবে। এ মুহূর্তে দলপতির পদধ্বনি শোনবার প্রতীক্ষায় চার-চারজন নাগ স্পাই মড়াকাঠ হয়ে শুয়ে আছে যে-যার কাষ্ঠশয্যায়।

রাত নটা বাজতেই ঘটাংঘট করে খুলে গেল ছাদের পাটাতন। জুতো মসমসিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বাসুকি নাগ। চর্বির মোমবাতির আলোয় দেখা গেল তার ছাগলের চোখের মতো নিষ্প্রভ চোখ আর ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে ঝোলা গোঁফ। চেহারাটি শীর্ণ। নার্ভের ব্যারাম আছে। থেকে-থেকে নাক কুঁচকে ঘাড় ঝটকান দিয়ে যেন একটা অদৃশ্য মাছিকে তাড়ানোর চেষ্টা করে নাকের ওপর থেকে।

বাসুকি নাগ নেমে এল তিলমাত্র তাড়াহুড়ো না করে। তাড়াহুড়ো করা তার কুষ্ঠিতে লেখেনি। চাবির গোছা ঝুলিয়ে রাখল দেওয়ালের পেরেকে।

তারপর চাইল চার মূর্তির দিকে। ছাগল-চোখে চেয়ে থাকতে-থাকতে ঘাড় ঝটকান দিল হঠাৎ—সেইসঙ্গে নাক কুঁচকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল নাকের মাছিটা। চার মূর্তি তবুও নড়ল না।

এবার খানিকটা আঁচ করতে পারল বাসুকি নাগ। ছাগল-চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল শেষনাগের ওপর। পাঁচজনের এই স্পাই-কমিটির সে-ই ডেপুটি লিডার। দোরজি হত্যার ভার ছিল তার ওপরেই।

সূচাগ্র হল মার্বেল চাহনি। শীতল কণ্ঠে উচ্চারিত হল শুধু একটি নাম—শেষ!

ইয়েস স্যার! তড়াক করে বার্থ থেকে লাফিয়ে নেমেই খটাস করে উলটো সেলাম করল শেষ, মানে, শেষনাগ।

চেহারার দিক থেকে বাস্তবিকই কোনও তফাত নেই বাসুকির সঙ্গে শেষের। শুধু শেষের সঙ্গে কেন, অনন্ত, কর্কোটক, কদ্রুর চেহারাও অবিকল দলপতি বাসুকির মতো। অবিকল ওইরকম থ্যাবড়া নাক, পাঁশুটে মুখ, হাতলা দাঁত, কুতকুতে চোখ, ঝুলে গোঁফ। চোখগুলো যেন মার্বেলগুলি দিয়ে তৈরি। কঠিন নয়, কোমলও নয়, স্রেফ ভাবলেশহীন। খাঁটি গুপ্তচরদের চোখ যেরকম হয় আর কী। এ হেন শেষনাগও যেন থরথর করে কেঁপে

উঠল খুড়ো। বাসুকির সামনে। চর্বির মোমবাতি জ্বলতে লাগল পটপট শব্দে। সোঁ-সোঁ করে জ্বলতে লাগল স্টোভ। এমনকী দেওয়ালে টাঙানো প্রেসিডেন্টের ছবিটাও যেন কটমট করে চেয়ে রইল শেষের পানে।

বুঝতে আর বাকি রইল না বাসুকির। কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! শেষ তো কখনও কাজ শেষ না করে ফেরে না! তবুও হাত বাড়াতে হল সামনে। —দম দেওয়া হলদে পুতুলের মতো বলতে হল—ডিবেটা কোথায়?

পাইনি—শেষ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছাগল চোখের দিকে আর তাকাতেও পারছে না।

দোরজি কোথায়?

মারা গেছে।

কে মেরেছে?

আর জবাব নেই। বাসুকির পাঁশুটে আনন এতক্ষণে যেন লোহিত হল অবরুদ্ধ আক্রোশে। মুখের মধ্যে কড়মড় আওয়াজটা শুনেই ভয়ের চোটে চোখ বন্ধ করে ফেলল কাষ্ঠশয্যায় শায়িত বাকি তিনজন।

কে মেরেছে? দাঁত কড়মড়ানির ফাঁকে-ফাঁকে জিগ্যেস করেই ঝট করে ঘাড় ঝাঁকিয়ে নিল বাসুকি। সেই সঙ্গে কুঁচকোল নাক। নাকের অদৃশ্য অসভ্য বেয়াদব মাছিটা উড়েছে বলে মনে হল না। কেননা নাক কুঁচকোনোটা যেন বেড়ে গেল এরপর থেকেই।

উত্তেজিত হয়েছে বাসুকি। বাসুকি নাগের উত্তেজিত হওয়া মানেই...!

ঢোক গিলে বললে শেষ, আমরা চেষ্টা করেছিলাম। তিনবার অ্যাটেম্পট নিয়েছিলাম। তিনবারই ফসকেছি। কিন্তু তারপরেই দেখলাম সে মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে মিউজিয়ামের দোতলায়। বলে, পুরো ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করল শেষ। ডাক্তার সেজে পকেট হাতড়েও যে ডিবেটা পাওয়া যায়নি, তাও বলল বারবার ঢোক গিলতে-গিলতে।

ঘন-ঘন নাক কুঁচকোতে-কুঁচকোতে এবং ঘাড় ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বজ্রকণ্ঠে বাসুকি শুধু বলল, কাট্!

মানে, কাটো আঙুল!

বিদ্যুৎবেগে বাকি তিনজন নেমে এল কাঠের বাঙ্ক থেকে। ঘরের কোণ থেকে নিয়ে এল মাংস কাটার ইলেকট্রিক মেশিনটা। এতক্ষণ বাদে ঘরের একটি মাত্র পঁচিশ ওয়াটের বাল্ব জ্বালানো হল। প্লাগ পয়েন্টে টু পিন প্লাগটা ঢুকিয়ে দিয়ে সুইচ টিপতেই বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে লাগল ইস্পাতের ছুরি।

কাউকে কিছু বলতে হল না। শেষনাগ ভয়ার্ত চোখে যন্ত্রচালিতের মতো বাড়িয়ে দিল ডানহাতের কড়ে আঙুল। অনন্ত আর কর্কোটক দু-পাশ থেকে চেপে ধরল ওকে। কদ্রু ডানহাতের আঙুলটা ঢুকিয়ে দিল ঘুরন্ত ছুরির মধ্যে। বীভৎস চিৎকার করে উঠেই নেতিয়ে পড়ল শেষ। তার চাইতেও বেশি চেঁচাল বাসুকি, প্রেসিডেন্ট জিন্দাবাদ।

অনন্ত, কর্কোটক, কদ্রু বললে সমস্বরে, প্রেসিডেন্ট জিন্দাবাদ।

হৃষ্ট চোখে শেষের যন্ত্রণাবিকৃত মুখের দিকে চেয়ে রইল বাসুকি। অনেকক্ষণ পরে

বললে আবিষ্ট চোখে, বৎস, আজ থেকে তোমাকে ডেপুটি লিডার করা হল। ট্রান্সমিটার নিয়ে এখুনি নাগলোক হেডকোয়ার্টারকে জানিয়ে দাও, দেশের জন্যে সন্ত্রাসবাদীদের ছুরিতে একটা আঙুল খুইয়েছে শেষ নাগ।

ইয়েস স্যার—লাফ দিয়ে উঠে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির গাদা থেকে ট্রান্সমিটারটা খুঁজতে লাগল তক্ষক।

কালকের মধ্যেই খবর আনবে, দোরজির পকেট থেকে সিক্রেট ডকুমেন্টটা গেল কোথায়, নইলে—শেষ নাগের পানে অপাঙ্গে চেয়ে শেষ করল বাসুকি নাগ, ওই অবস্থা তোমারও হবে।

প্রেতাত্মা-পর্ব

নারায়ণী ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে-কাঁদতে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত তখন অনেক। দোরজির প্রেতাত্মাও খাইমাকে আর বিরক্ত না করে বেরিয়ে পড়ল গড়ের মাঠে। কিছুক্ষণ একটা জাহাজের চিমনিতে পা ঝুলিয়ে বসে থাকবার পর ইচ্ছে হল আরও পাঁচ বাড়ি ঘুরে আসার।

সঙ্গে-সঙ্গে সুড়ুৎ করে হাওয়ায় ভেসে চৌরঙ্গীতে এসে পড়ল দোরজি। ভূত হওয়ার যে এত মজা কে জানত। ইচ্ছে হলেই যেখানে খুশি যাওয়া যায়।

কিন্তু কার বাড়িতে হানা দেওয়া যায় এখন? শ'খানেক ঘুমন্ত মানুষগুলোকে ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ আছে কি? তার চাইতে বরং হাতের কাজ শেষ করা যাক। অ্যালুমিনিয়ামের ডিবেটা পাচার করা হয়েছে কঙ্কালের করোটিতে—এবার সেটাকে পাচার করতে হবে আশ্রমিতে। কিন্তু কীভাবে?

নারায়ণীর বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর চিরকালই গভীর আস্থা দোরজির। মোটা হলে কি হবে, খাইমার মাথাটা মোটা নয়। কিন্তু ওকে একটু হেল্প করা দরকার।

ঠিক এই সময়ে একটি দৃশ্য দেখে ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল দোরজির। মনোহর তড়াগের পাশেই যে ঐতিহাসিক গুমটি ঘর, তার মধ্যে দুটি মূর্তি অত নড়াচড়া করছে কেন?

এগিয়ে গেল দোরজি। অন্ধকারেও দেখতে পেল, একজন হিপি আর হিপিনী...দোরজি আর দাঁড়াল না। এ দৃশ্য কি দেখা যায়? হিপিগুলোকে দু'চক্ষে দেখতে পারেনি সে এই বেলেল্লাপনার জন্যে। কেল্লার র‍্যাম্পার্ট আর গঙ্গার ঘাট তো ওদের দৌলতে বৃন্দাবনধাম হয়ে উঠেছে। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ!

কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? নারায়ণীকে কীভাবে হেল্প করা যায়? আচ্ছা, সূক্ষ্ম শরীরে নারায়ণীকে একটু জ্ঞান দিলে হয় না? নিউইয়র্কের একটা থিয়সফিস্ট ঘাঁটিতে কিছুদিন লেকচার অ্যাটেন্ড করেছিল দোরজি। সেই থেকেই জেনেছিল, ঘুম মানে সাময়িক মৃত্যু। তখন মানুষের পিণ্ডদেহ, মানে সূক্ষ্মদেহটা, যার ওজন মাত্র একুশ গ্রাম, ভাগুদেহ, মানে স্থূল দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহটা একেবারেই বেরিয়ে এসে ভূত বা পেত্নি হয়ে যায়। যেমন দোরজির হয়েছে।

ভাবতে না ভাবতেই উল্কাবেগে বায়ুপথে বেরিয়ে গেল দোরজি। রাসেল স্ট্রিটের সেই অভিজাত ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখল সত্যি সত্যিই খাটের ধারে গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে ছায়ার মতো নারায়ণী। রক্ত-মাংসের নারায়ণী কিন্তু অঘোরে নাক ডাকাচ্ছে খাটের ওপর।

দোরজিকে দেখেই চমকে উঠল ছায়া নারায়ণী, তুই এসেছিস?

হাঁ, এসেছি। শোনো—হাতে সময় কম। ডিবেটা কঙ্কালের মাথা থেকে যে ভাবেই হোক উদ্ধার করতে হবে। তুমি একা পারবে না।

মাথা নাড়ল নারায়ণী—একা তো পারবই না। মাতঙ্গিনী, নিভাননী, পটলানী, নিতম্বিনীকে বলতে হবে।

তারা আবার কারা? অতগুলো 'নী' শুনে থমকে গেল দোরজি। তারপর একটু ভেবে বলল, ঠিকানাগুলো দাও তো।

কেন বল তো? সন্দিগ্ধ চোখে চাইল নারায়ণী। —এদের মধ্যে নিতম্বিনীর বয়সটা কিন্তু বড্ড কচি। ওদিকে নজর দিসনি বলে দিলাম।

জিভ কেটে দোরজি বলল, রাম বলো। ভূতের আবার নজর!

মাতঙ্গিনী-পর্ব

বেরিয়ে পড়ল দোরজি। মাতঙ্গিনীর বাড়ি গিয়ে দেখল সে ঘুমোচ্ছে। বয়স বছর আটত্রিশ। নামটা মাতঙ্গিনী হলেও মোটেই হস্তিনীর মতো চেহারা নয়। বরং ঠিক উলটো। খরগোশিনী বললে বেশ মানায়। নাকের ডগায় সরু স্টিল ফ্রেমের চশমাটা পর্যন্ত খুলতে ভুলে গেছে। শরীরটা ভালোই। মানে, মেয়েমানুষের শরীর যে রকম হওয়া উচিত আর কী।

কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরটা গেল কোথায়? ঘরের মধ্যে তো নেই। বারান্দাতেও নেই।

বারান্দার শেষে দেখা গেল খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সুড়ুৎ করে একটা কালো ছায়া ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

সাঁ করে তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গেল দোরজি। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকতেও হল না। উঁকি দিতেই মাত্র একুশ গ্রাম ওজনের পিণ্ড দেহটাও গরম হয়ে উঠল চক্ষের নিমেষে।

ঘরটা বড়। ঢলঢলে পিলো গদিমোড়া বিশাল খাটের কিনারায় দাঁড়িয়ে মাতঙ্গিনীর ছায়াদেহ। দুই চোখ তার ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে খাটের ওপরকার শৃঙ্গার দৃশ্য দেখে। সেইসঙ্গে হেঁচে চলেছে হাঁচ্চো...হাঁচ্চো...মাতঙ্গিনীর এই এক বদরোগ। অদ্ভুত অ্যালার্জি। মানুষের অনেকরকম অ্যালার্জি হয়—ধুলোয় অ্যালার্জি, চিংড়িতে অ্যালার্জি হয়, কাঁকড়ায় হয়, ডিমে হয়, কিন্তু পুরুষ মানুষে অ্যালার্জি কখনও শোনা গেছে কী?

মাতঙ্গিনী ভুগছে সেই অ্যালার্জিতে। পুরুষ মানুষের ছোঁয়া সে একদম সইতে পারে না। এমনিতে বেশ আছে। কিন্তু একবার কোনও পুরুষ তাকে ছুঁলেই আর রক্ষে নেই।

সঙ্গে-সঙ্গে মুখ লাল হয়ে যাবে, নাকের ডগা চুলকোবে, সর্দি গড়াবে এবং শুরু হবে হ্যাঁচ্চো...হ্যাঁচ্চো...হ্যাঁচ্চো!

অদ্ভুত এই অ্যালার্জির সূত্রপাত ব্যাঙ্গালোরের সেই হোটেলটা থেকে। তখন ভরাট যৌবন মাতঙ্গিনীর। তার ওপর সাউথ কানাড়ার মেয়ে। দেখতে-শুনতে টসটসে। বিয়ের পরেই ভরভাঙা বউকে ফেলে চীনদের সঙ্গে লড়তে যেতে হল বরকে। বোমডিলা থেকে ফিরতে-ফিরতে কেটে গেল একটি বছর। বউকে নিয়ে স্বামীদেবতা বেরোল ফুর্তি করতে। উঠল হামপনকট্টা হোটেলে।

ব্যাঙ্গালোরে আলু-পটলের মতই বারবনিতার ছড়াছড়ি এবং পনেরো আনা বনিতারই রসে ভরা আঙুরের মতো, দেখলেই কামড়াতে ইচ্ছে যায়। হামপনকট্টা হোটেলে প্রতি রাতে তারা আসে এবং দরজায় ধাক্কা দিয়ে জোর করে রাত কাটিয়ে যায়

সারাদিন ধকলের পর মাতঙ্গিনী শুয়েছে স্বামীকে নিয়ে। সবে ঘুম এসেছে। এমনসময়ে দরজায় ধাক্কা।

ঘুমজড়ানো চোখে স্বামী বললে, দ্যাখোগে, তোমার বর এল বোধহয়।

ঘুমজড়ানো চোখেই জবাব দিলে মাতঙ্গিনী, দূর! সে তো তুমি!

বলার সঙ্গে-সঙ্গে একইসঙ্গে দু-চোখের পাতা খুলে গেল দুজনের। দুজনেই কটমট করে তাকাল দুজনের পানে।

পরদিন থেকে অলিখিত ডিভোর্স হয়ে গেল স্বামী-স্ত্রীতে।

মাতঙ্গিনী বললে, মিনসে কম নয়। যুদ্ধ করবার নামে পরের বউ নিয়ে শুয়ে থাকত। আমার চোখকে ফাঁকি দেবে?

মাতঙ্গিনীর বর বললে, মাগি এক নম্বর বেবুশ্যে। আমাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে নিজে পাঁচ পুরুষ নিয়ে পড়ে থাকত। আমার চোখকে ফাঁকি দেবে?

সেই থেকে মাতঙ্গিনী পুরুষের ছোঁয়া একদম সইতে পারে না। সারা দেহ চুলকোতে থাকে, হাঁচি আসে!

সেই মাতঙ্গিনীই সূক্ষ্মশরীরেও হাঁচতে আরম্ভ করেছে মনিবের ঘরে ঢুকে। মনিব তার হেজিপেঁজি লোক নন। বিপত্নীক এবং মস্ত পলিটিক্যাল লিডার। অনেকগুলো ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। মালিকরা মোটা টাকা মাসোহারা দিয়ে ইউনিয়নগুলোকে হাতে রেখেছে শুধু তাঁকে হাত করে। দেশের লোক কিন্তু তাঁকে সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে এবং কালীদা বলতে অজ্ঞান হয়। কালীদা শুধু জে. পি. মানে জাস্টিস অফ পীস নন, আটত্রিশটা সোসাইটির প্রেসিডেন্টও বটে। কুকুর সমিতি থেকে নারী সমিতি পর্যন্ত সবাই কালীদাকে মাথায় রাখে। সর্বত্যাগী কালীদা তাই লর্ড সিন্‌হা রোডের প্রাসাদোপম ফ্ল্যাট বাড়ির বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে মাত্র তিনজন আয়া নিয়ে দেশের কাজ করেন। আয়াদের দরকার দ্বিবিধ কারণে। বালক পুত্রকে দেখাশুনা করবার জন্যে, দিনের বেলায়। রাত হলেই কিন্তু তাদের অন্য কাজ। কালীদার গা-হাত-পা টিপে দিতে হয়...ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেহসেবা সম্ভব হয়নি কেবল মাতঙ্গিনীকে দিয়ে। কিন্তু পুত্রকে মানুষ করায় তার জুড়ি নেই। একবার তাকে দিয়ে গায়ে তেল মালিশ করাতে গিয়ে সর্দিতে ভিজে গিয়েছিলেন কালীদা। সেই থেকে পালাক্রমে অন্য দুটি আয়াকে দিয়ে দেহটিকে নরম-গরম রাখেন,

নইলে দেশের কাজ হবে কী করে?

মাতঙ্গিনী বেচারি বিরক্ত হল এইসব দেখে। দূর! দূর! এ মেয়েকে দিয়ে আর যাই হোক ভিবে উদ্ধার হবে না।

নিতাননী-পর্ব

লর্ড সিন্‌হা রোডের মেয়েদের স্কুলের মধ্যে একটা রাধাচূড়া গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে রইল দোরজি। মন খুব খারাপ।

কালীচরণ জোয়ারদারের কাণ্ড-কারখানা দেখে দমে গিয়েছে দোরজি। কালীদার নামে দেশের লোক মূর্চ্ছো যায়। ধর্মসভা থেকে আরম্ভ করে রাজ্যসভা পর্যন্ত সর্বত্র তিনি পূজিত, বন্দিত এবং নমস্য।

দোরজিকে সব খবর রাখতে হয়। সে যে স্পাই।

কিন্তু তারও আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল কালীচরণের নারী সাধনা দেখে। তোবা! তোবা! দোরজি না হয় মার্কামারা লম্পট। তার তো ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। পেটে-মুখে তার এককথা। কিন্তু কালীচরণের সাত্ত্বিক মুখোশের অন্তরালে এ কাকে দেখে এল সে? এদের হাতেই দেশের ভার! এরাই দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে? ছোঃ ছোঃ ছোঃ।

সেই বিখ্যাত বয়ানটা বোধহয় এই দুরবস্থা কল্পনা করেই লিখেছিলেন নাগলোকের প্রেসিডেন্ট। কী যেন লাইনটা? ও হ্যাঁ...যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করে জনসাধারণ! কালীচরণের মতো ভণ্ডগুলোকে মা-কালীর সামনেই হাঁড়িকাঠে ফেলে বলি দেওয়া উচিত জনসাধারণের।

প্রেসিডেন্টের কথাটা মাথায় আসতেই সম্বিৎ ফিরল দোরজির। কালীচরণের কাণ্ড দেখে মনটা বিগড়ে যাওয়ায় অনেকখানি সময় নষ্ট হল বৃথাই। আর না। পাজি নাগ স্পাইদের হাত থেকে মাইক্রোফিল্মটা সরিয়ে ফেলতেই হবে। মরেও ছুটি নেই দোরজির। সে যে স্পাই!

সুতরাং হাওয়ার কালো কুয়াশার মতো ভেসে গেল সে পার্ক স্ট্রিটের দিকে। চৌরঙ্গী ম্যানসনের তিনতলার বারান্দায় নামল টুপ করে। পাঁচ রাস্তার সঙ্গমস্থলে ভিক্ষুকরূপী মহাত্মা দাঁড়িয়ে ছিলেন বিষণ্ণ মুখে। ভ্রূকুটি করলেন দোরজিকে দেখে। অত রাতেও রাস্তাঘাট নির্জন নয়। পা টলমলে নরনারীর স্খলিত হাসি ছাড়াও শোনা যাচ্ছে ধাবমান মোটরের শব্দ। বেচারি গান্ধীজিকে দেখে মায়া হল দোরজির। স্বপ্নের দেশের এ হালও তাঁকে দেখতে হচ্ছে।

চৌরঙ্গী ম্যানসনের এই তলায় থাকেন একজন গৃহী সাধক। যোগী শ্যামাচরণ স্টাইলে সাধনা করেন তিনি। মানে, ঘরে বউ-টউ সবই আছে। সেইসঙ্গে ঈশ্বর সাধনাও আছে এই পর্যন্ত তিনি যোগী শ্যামাচরণ। বাকিটা অন্যরকম। প্রায় দিল্লি-দিল্লি করতে হয়। নিউইয়র্ক-লন্ডন ছুটতে হয়। পাসপোর্ট বার করতে বেগ পেতে হয় না। যোগী লক্ষানন্দের নাম শুনলেই কাজ হয়ে যায়। লক্ষানন্দের নামে এত ভেলকি।

যোগীর ভক্তের সংখ্যা অগুন্তি এবং প্রত্যেকেই উচ্চমহলের জীব। পূর্বাশ্রমের পরিচয় জিগ্যেস করলে স্মিত হেসে যোগীবর শুধু বলেন, প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা? অর্থাৎ মায়াময় সংসারের কথা জানবার দরকারটা কী? বলার স্টাইলটা অবশ্য যোগীবর গম্ভীরনাথজীর কাছ থেকে ধার করা।

লোকে বলে, উনি নাকি আগে ছিলেন নিরঞ্জন যোগী। সম্বল ছিল কৌপীন, নারিকেলের খর্পর আর ক্ষৌরী যোগদণ্ড। অসামান্য ব্রহ্মজ্ঞান আর দেবৈশ্বর্য লাভ করেছেন সংসার আবেষ্টনীর বাইরে গহন অরণ্যে এবং বালুকা-গুম্ফায়।

সাধনার স্থিরভূমি লাভের পর সহজগম্য এবং দুর্গম সর্বতীর্থ পর্যটন করেন। তীব্রতম তপস্যায় মগ্ন হয়েছেন সংসারাশ্রমে প্রবেশ করে। সকাল-সন্ধে ধ্যানজপ, যোগসাধনা করেন, ত্যাগতিতিক্ষাময় জীবন যাপন করেন।

অসীম ক্ষমতার অধীশ্বর তিনি। কাস্টমস থেকে আরম্ভ করে চিড়িয়াখানা পর্যন্ত সর্বত্র তিনি যোগবলের ভেলকি দেখাতে পারেন। রহস্যজনক এই যোগবলভেলকির গোপন খবর রাখেন কয়েকজনই। মিসার করলে পড়ে তাঁদের অধিকাংশেই এখন সরকারি অতিথিশালায় জামাই আদর খাচ্ছেন।

মাকড়শার জালের মতো স্মাগলিংয়ের সূক্ষ্ম জাল দ্বারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যারা দেশ ও দশকে সর্বস্বান্ত করছে, যক্ষপতির রত্নপুরীর মালিক হয়ে বসছে, যোগী লঙ্কানন্দ তাদের হাতের পুতুল। গেরুয়া বসনের আড়ালে পাচার হয়ে যায় দেশের সম্পদ বিদেশে। সরকারি শোনপক্ষীরা জোর করে চোখ বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি নোট পকেটস্থ করে।

তাঁর সাম্প্রতিকতম কীর্তি হল, বিখ্যাত শিবপুরম নটরাজের মূর্তি পাচার। মূর্তিটি মেরামতের জন্যে পাঠানো হয় স্থপতির কাছে। লঙ্কানন্দের ভেলকিতে স্থপতি নকল করে নেয় মূর্তিটির। মূলটি দেয় লঙ্কানন্দকে, নকলটি মালিককে। এই সেদিন মূল মূর্তিটি তিনি বিক্রি করে এলেন নিউ ইয়র্কের এক ক্রোড়পতির কাছে, দশ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে!

ভারত সরকার অবশ্য মামলা দায়ের করেছে। কোটিপতির কাছে পনেরো লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ চেয়েছে। কিন্তু হালে পানি পাচ্ছে না। ক্রোড়পতি ভদ্রলোক সাফ বলে দিয়েছেন—শুল্ক মিটিয়ে দেওয়া যে-কোনও মাল কেনা যেতে পারে। বেআইনি কিছু নয়।

লঙ্কানন্দ তাই গৃহী-সন্ন্যাসী হলেও বিত্তবান। থাকেন চৌরঙ্গী ম্যানসনে দিশি সাহেবদের সঙ্গে গা ঘেঁষে। এইমাত্র তিনি বরানগরের এক ভক্তের বাড়ি থেকে ফিরেছেন। সেখানে একঘর লোকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছেন অকস্মাৎ পদ্মগন্ধের ভেলকি দেখিয়ে।

প্রকাণ্ড ডিমলার গাড়ি থেকে নেমেই তাই শোবার ঘরে ছুটলেন লঙ্কানন্দ। আঙিয়ার মধ্যে সেন্টের অ্যাম্পুলটা হাতের চাপে ভেঙেছে ঠিকই, গন্ধও ছড়িয়েছে, কিন্তু ভাঙা কাচে কোমরটা কেটে গিয়ে জ্বালা করছে খুবই।

সুতরাং শোবার ঘরে ঢুকেই গেরুয়া বসন নিক্ষেপ করলেন লঙ্কানন্দ। পায়ের কাছে খসে পড়ল আঙিয়া। সাক্ষাৎ ত্রৈলঙ্গস্বামী হয়ে গেলেন লঙ্কানন্দ।

আয়নার সামনে গিয়ে দেখলেন, ভাঙা কাচের টুকরোটা গেঁথে গেছে চর্বির স্তরে। রক্ত ঝরছে। জ্বালাও করছে।

শালা...! আপনমনেই গাল পাড়লেন লঙ্কানন্দ। হয়তো আরও কিছু রবের লাঙ্গুরেক্ট ছাড়তেন নির্জন ঘরে। কিন্তু তার আগেই পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল একটি মুখ।

নিভাননী। বছর তিরিশ বয়স। বর্গীদেশের মেয়ে। সারা গায়ে চর্বি কম, লালিত্যও কম, কিন্তু উগ্রতা বেশি। রং ময়লা হলে কী হবে, কাঁচুলীর কল্যাণে যে-কোনও পুরুষের বুকে ঢেঁকির পাড় ফেলাতে পারে।

এ হেন নিভাননীই গভীর রাতে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল ঘরে। লঙ্কানন্দের শিশুপুত্রকে ঘুম পাড়িয়ে মায়ের কাছে শুইয়েও তার ছুটি নেই।

লঙ্কানন্দ-ভার্যার কাজটাও তাকে করতে হয়। ক্লান্ত যোগীকে নইলে চাঙ্গা করবে কে? গিন্নি তো শ্যাম্পেন খেয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। পার্টি থেকে ফিরে শরীরে আর কিছু সয় না। হাজার হোক মেয়েমানুষের শরীর তো। নাচানাচি, ঢলাঢলি, চুমু খাওয়া-খাওয়ির পর কি আর ভালো লাগে? নিভাননী তাই লাল ঠোঁট নেড়ে বিনুনীর লালগোলাপ দুলিয়ে পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিল ভিতরে। দিগম্বর লঙ্কানন্দকে দেখে কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ বড়-বড় করে শুধু বললে, ক্যায়া হুয়া' বাবুজি? মানে, কী হল?

কাট গিয়া—যদ্দুর সম্ভব মার্জিত হিন্দিতে জবাব দিলেন লঙ্কানন্দ। ডেটল লাও। তুলা লাও। স্টিকিং প্লাস্টার লাও।

চকিতে উধাও হল মারাঠি নিভাননীর ললিত লবঙ্গলতা। ফিরে এল ক্ষণপরেই।

পরনে লাস্য আর কাঁচুলি হাতে তুলো, ডেটল, স্টিকিং প্লাস্টার।

দর্পণের সামনে দেবমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে শুভ্রদেহ মুণ্ডিতকেশ লঙ্কানন্দ। শিশুর মতই সরল হয়ে গেলেন নিভাননীর ননীঅঙ্গের পরশ পেতেই।

বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলল দোরজির প্রেতাত্মা।

বাকি রইল পটলানী আর নিতম্বিনী।

ময়দানের গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে ফের ভাবতে বসল দোরজি। ভাবনা নিজেকে নিয়ে নয়, পৃথিবীর বিপদ নিয়ে নয়, অ্যালুমিনিয়ামের ডিবে নিয়েও নয়। ভাবনা কেবল এই পোড়া দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভাগ্যিস ভূত হয়েছিল দোরজি। তাই তো দেখার সুযোগ ঘটল সমাজ শিরোমণিদের আসল চেহারা। গুম হয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর ফের হাওয়ায় গা ভাসাল দোরজি। বাকি আরো-দুজনের নৈশ-ক্রিয়া দেখবার পর পরবর্তী পন্থা স্থির করতে হবে।

পটলানী-পর্ব

পটলানী খাঁটি বাঙালি ঘরের মেয়ে। হেচলিশের দাঙ্গায় কনস্টেবলের তার বাবা কোতল হয়, মা ধর্ষিতা হয়ে নিখোঁজ হয়। পটলানীর বয়স তখন মেটে দশ। দেখতে-শুনতে

কোনওকালেই ভালো ছিল না। বিশেষ করে ঠিক সেইসময়ে সারা গায়ে খোস পাঁচড়ায় ছেয়ে থাকার ফলেই রেহাই পেয়েছিল নরপশুদের কামক্ষুধা থেকে।

তারপর অনেক জল গড়িয়েছে গঙ্গা দিয়ে। জোয়ার এসেছে পটলানীর শরীরেও। যৌবনে কুক্কুরীও ধন্য হয়, পটলানী তো হবেই।

সুখী জেলের বুকে হিন্দু মহাসভার নারী আশ্রমে থাকতে থাকতেই লাইনটা চিনেছিল পটলানী। একদিন তুমুল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দোতলার বারান্দা থেকে লাফিয়েও পড়েছিল। পালাতে পারেনি। টিনের চালা হুড়মুড় করে ভেঙে যাওয়ায় দৌড়ে এসেছিল পাড়ার ছেলেরা। কিশোরী পটলানীকে কোলে করে পাড়ার এক যুবক রিকশায় করে পৌঁছে দিয়েছিল ক্যাম্বেল হাসপাতালে।

সেই হল শুরু।

পাড়ার ছেলে। সুতরাং ঢিলে মোড়া চিঠি উড়ে এল আশ্রমের ছাদে। জবাবও এল সেইভাবে। তারপর একদিন পাখি উড়ে গেল আশ্রম থেকে। তারপর যা হয় তাই হল আর কী। কাশী থেকে হালকা হয়ে এসে নিষিদ্ধ পল্লীতে ঠাঁই নিল পটলানী। তারপর হল দেহ ব্যবসা।

তখন থেকেই আরম্ভ হল আর একটি চোরা-ব্যবসা। এ ব্যবসায়ে দেহটাকে দরকার বটে, কিন্তু পরের বোঝা বইবার ভয় নেই। শুধু ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই হল। বিভিন্ন ঢঙে বিভিন্ন নগ্নে ছবি উঠে যাবে একের-পর-এক। তবে হাঁ, স্ত্রী-অঙ্গে সুতোটি রাখা চলবে না। মাঝে-মাঝে পুরুষ মডেলের সঙ্গেও পোজ দিতে হবে। মাসে একবার মুভি ক্যামেরার সামনেও আদম-ঈভের নাটক অভিনয় করতে হবে।

পটলানীর ভালোই লাগে এসব। শুধু টাকার জন্যে নয়, রোমাঞ্চের জন্যে তো বটেই। বেশি সময়ও দিতে হয় না, একঘণ্টার মধ্যে হাজার খানেক টাকা, মন্দ কী? পটলানীর ইচ্ছে আছে, এই টাকা জমিয়েই মনের মতো বর কিনতে পারবে কোনও একদিন।

ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের বাড়ির একটি বাচ্চাকে সামলাতে হয় পটলানীকে। বাচ্চার মা ফিল্মের উঠতি নায়িকা। বাচ্চাটি তার কোলে এসেছে রহস্যজনকভাবে। বোম্বের বিখ্যাত ভিলেন-অভিনেতাকে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার একটি প্রেমপত্র লিখেছিল উঠতি নায়িকা সুরঞ্জনা। গদগদ ভাষায় জানিয়েছিল তার শরীরের ভাইটাল মাপগুলো—বুক ছত্রিশ ইঞ্চি, কোমর বত্রিশ ইঞ্চি এবং নিতম্ব ছত্রিশ ইঞ্চি। পাড়ার মেয়েরা তাকে 'চটপটি মশলা' বলে ডাকে। কেননা, যে-কোনও ব্যাটাছেলেকে চৌপাট করতে তার জুড়ি নেই। চৌপাট করে এসেছে সেই বালিকা বয়স থেকেই, যখন তার বুক গড়ের মাঠ ছিল। এখন তো ছোটনাগপুরের মালভূমি। কিন্তু পুরুষগুলোকে আর সহ্য হচ্ছে না। সব ভেড়া। একটা জব্বর-গব্বর পুরুষ চাই। বোম্বের বিখ্যাত ভিলেন নায়কের কাছে তার একটি মাত্র প্রার্থনা, বোম্বে-ব্র্যান্ড একটি বাচ্চা তার চাই-ই চাই!

বোম্বের বিখ্যাত নায়কের মনটি বড় নরম। দয়ার শরীর। পঞ্চাশ পাতার প্রেমপত্রের জবাবে লিখল ঊনপঞ্চাশ পাতার কবিতা। পরের দিন প্লেন থেকে অবতীর্ণ হল পরমকারুণিক ভিলেন মহাশয়।

তারপর চড়চড় করে ফিল্মের আকাশে ঠেলে উঠতে লাগল সুরঞ্জনা। একে

'চটপটি মশলা' তার বোম্বে-ভিলেনের বাচ্চার মা, খবরটা কাগজে কাগজে ফলাও করে ছড়িয়ে দিতেই বাজার গরম হয়ে উঠল, সেইসঙ্গে জনসাধারণের চাহিদা বেড়ে গেল সুরঞ্জনার।

বোম্বে-ব্র্যান্ড সেই বাচ্চাটিকেই মানুষ করে আমাদের পটলানী। সুরঞ্জনার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই এখন। পটাপট কনট্রাক্ট সই করছে এবং বটাপট ব্লাউজ খোলার শট তুলছে। আদমের সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো খেলায় ইভকেও যে টেক্কা মারতে পারে তা চুম-চুম খেলার মধ্যেই বুঝিয়ে ছাড়ছে। শুধু চোখের চেহারা দেখিয়েই বাজিমাত করছে, বাকিটুকুর দরকারও হচ্ছে না। পটলানীর তাই পোয়াবারো। ক্যামাক স্ট্রিটের ওপরতলার ফ্ল্যাটে বাচ্চা আগলাতে হয়। নিচের তলায় একটা স্টুডিও আছে। হরেকরকম ব্যবসার আড়ত সেখানে। রেডিও স্পট তুলতে ছুটে আসে বিজ্ঞাপনদাতারা। রেডিওতে যে ন্যাকামি গান শোনা যায়, বিবিধ যন্ত্রবাদ্যসহ তার উৎপত্তি এইখানেই। এ ছাড়াও আসে বিভিন্ন নরনারীরা। বাড়িতে তাদের এই মিলিমিটার প্রোজেক্টর আছে। দরকার শুধু ব্লু-ফিল্মের। মানে, পৃথিবীর সবচাইতে পুরোনো খেলার রুপোলি রূপায়ণের। সে ব্যবস্থাও হয়ে যায় পটলানিদের দৌলতে। রাতের বেলায় ফ্লাড লাইটের আলো জ্বালিয়ে বন্ধ স্টুডিওর ভেতর উঠে যায় নিষিদ্ধ ছবির পর ছবি। চিত্তাকর্ষক। রোমাঞ্চকর এবং বিস্ময়কর!

সেদিনও সেই ছবিই উঠছে। আর্জেন্ট অর্ডার এসেছে নেপাল থেকে। নেপাল থেকে চোরাচালান যাবে তিব্বতে, তিব্বত থেকে আরও ভেতরে। মোটা টাকার ব্যাপার। বিনিময়ে আসবে ফাউন্টেন পেন এবং সিগারেট লাইটার। দুটোই দু-নম্বরের পিস্তল। স্প্রিং টিপলেই গুলি বেরোবে।

পটলানী অবশ্য অতশত জানে না। হাজার টাকা নগদ পেয়েই নেমেছে দ্রৌপদীর ভূমিকায়। নাটকের নামও তাই। শেষের দিকে অবশ্য এমন সব দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে যা মহাভারতে নেই।

হেনকালে দ্বারদেশে আবির্ভূত হল একটি কালো ছায়া। মহারাজা দোরজি শুকং রাণাসাহেবের প্রেতমূর্তি। বিস্ফারিত চোখে দেখল পটলানীর নিতম্ব-নৃত্য, সারি সারি ফ্লাডলাইট, ক্যামেরা এবং দুঃশাসনের ভূমিকায় একজন নাগাল্যান্ডবাসীকে। দেখেই আর দাঁড়াল না দোরজি। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল ক্যামাক স্ট্রিট দিয়ে।

নিতম্বিনী-পর্ব

মনটা একেবারেই মুষড়ে পড়েছিল দোরজির। কী হবে নিশীথ রাতে এত ছুটোছুটি করে? ধাইমা নারায়ণীর মধ্যে যে মাতৃমূর্তি সে দেখেছিল, আশা করেছিল সব আয়ার মধ্যেই সেই জননী-রূপ দেখতে পাবে। কিন্তু এরা কারা? শিশুপালনের পেশা নিয়ে এ কী নেশায় বুঁদ রয়েছে এরা? আয়ারা পেটে সন্তান ধরে না, কিন্তু অন্যের সন্তান মানুষ করতে পারে যে-কোনও সন্তানবতীর চেয়ে। নারায়ণীকে দেখে এই বিশ্বাসই সৌধ রচনা করেছিল দোরজির মনের মধ্যে। বিশ্বাসের সেই সৌধ দেখতে-দেখতে চুরমার হয়ে গেল

মাতঙ্গিনী-নিভাননী-পটলাম্বার-নিশীথিনী রূপ প্রত্যক্ষ করার পর।

অপরিসীম বিষাদে মনটা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলেই উন্মাদের মতো ধেয়ে চলল দোরজি জনশূন্য পথ বেয়ে। থিয়েটার রোডে পড়তেই সম্বিত ফিরল। সামনেই একটা মেঘচুম্বী অট্টালিকা। তার পাশে একটা তিনতলা বাড়ি। নিতম্বিনীর আস্তানা।

ঢুকবে নাকি দোরজি? নিতম্বিনীর বয়স কম। হয়তো বাকি তিনজনের মতো পোক্ত না-ও হতে পারে। অল্পবয়স্কা বলেই হয়তো চোখে আদর্শের কাজল লেগে থাকতে পারে।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে শেষকালে মরিয়া হয়ে গেল দোরজি। যা থাকে কপালে, দেখাই যাক না সোমত্ত নিতম্বিনীর কাণ্ডটা।

ফলটা ভালোই হল। মর্ত্যের মায়া কাটাতে পারছিল না দোরজি। নিতম্বিনীর নিশীথ নাটক দেখেই সে মায়া কেটে গেল। নিমেষ মধ্যে ঊর্ধ্বস্তরের পিতৃলোকে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হল দোরজির সূক্ষ্মদেহ! নাটকটা এই ঃ—

নিতম্বিনী যার চাকরি করে তার নাম কমলেশ্বর। সোজা কথায় কমলেশ্বরের আয়া সে।

রাত দুটোর সময়ে কমলেশ্বরকে বাথটবের গরম জলে ডুবিয়ে স্পঞ্জ করে দিচ্ছিল নিতম্বিনী। কমলেশ্বর জলে ভাসমান খেলার নৌকোটাকে বারবার পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে উলটে দেওয়ার চেষ্টা করেও পারছে না।

স্পঞ্জ ঘষছে আর মুখ চালাচ্ছে নিতম্বিনী,—আস্তে! আস্তে! এত ছটফট করলে আমি পারি? একটু সুস্থির হয়ে থাকতে পারো না? নাও, সিধে হয়ে দাঁড়াও।

টলতে-টলতে বাথটবের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল কমলেশ্বর। নিতম্বিনী তার দুই বগলে মধ্যে দিয়ে হাত চালিয়ে টেনে হিঁচড়ে নামাল বাথরুমের মেঝেতে।

সিধে হয়ে কড়িকাঠের কাচের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গান গেয়ে উঠল কমলেশ্বর। আজকে একটু বেশি ঢুকু-ঢুকু হয়ে গেছে। বিলিতি মাল তো। বিষের জ্বালায় শালা স্কচ মেলাই ভার।

গা-মোছা সাঙ্গ হতেই কমলেশ্বরকে ঠেলে ঠুলে শোওয়ার ঘরে নিয়ে এল নিতম্বিনী। পালঙ্কের ওপর বসিয়ে দিয়ে এককাপ কফি রাখল সামনে।

এক হাতে কফির কাপ, আরেক হাতে নিতম্বিনীর কটি বেষ্টন করে স্খলিত কণ্ঠে বললে কমলেশ্বর, মাইরি বলছি, এবার এসো।

এখন না—কপট গম্ভীর কণ্ঠ নিতম্বিনীর, এখন আমি তোমার আয়া।

আর কতক্ষণ আয়া থাকবে নিতুমনি, সোনামণি, সোনারখনি? হিক।

যতক্ষণ না তোমায় বিছানায় শোওয়াচ্ছি। যা কনট্রাক্ট, তা করতে হবে তো।

তারপর?

তারপর আয়া হবে জায়া।

মানে? হিক!

বক্তুনি। বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নিতম্বিনী। চুমোয়-চুমোয় ভরিয়ে দিল কমলেশ্বরের মুখ, বুক।

বেচারা কমলেশ্বর! শৈশবেই মাতৃহারা সে। পিতৃদেব অনিলবরণ পিতার কর্তব্য

সুচারুরূপে সাঙ্গ করলেন। ফ্রিস্কুল স্ট্রিটের একটি নার্স অ্যাসোসিয়েশনকে স্ট্যান্ডিং অর্ডার দিয়ে রাখলেন, যত টাকা লাগে লাগুক, ভালো-ভালো আনি, খুড়ি, আয়া চালান দিতে যেন ত্রুটি না হয়।

অর্ডার দিয়ে বিলেত চলে গেলেন অনিলবরণ। বিলেতেই তাঁর কারবারবার।

এখান থেকে এক্সপোর্ট হয় বিলেতে—ভারত সরকারকে ফাঁকি দিয়ে সেই টাকায় বাইরের মাল স্মাগলড হয়ে আসে ইন্ডিয়ায়। কোটি-কোটি টাকার খেলা। বছরে একবার করে ইন্ডিয়া আসেন, ছেলের তদারকে। জাহাজের যাওয়া-আসার ভাড়াই দেন আঠারো হাজার টাকা।

যোগ্য বাপের যোগ্য ছেলে। কমলেশ্বর বড় হতেই আঞ্চলিক ব্যবসার তদারকি হাতে তুলে নিল স্বেচ্ছায়। অনিলবরণ মুগ্ধ হলেন পুত্রের কেরামতি দেখে। ব্ল্যাকমানির ভেলকি দেখিয়ে বোম্বের ফিল্ম মার্কেট দখল করা থেকে আরম্ভ করে কলকাতার ওপর চার-চারখানা জুয়েলারির দোকান খুলে বসা পর্যন্ত কোথাও কোনও ত্রুটি রাখল না কমলেশ্বর। গোল্ড কন্ট্রোলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবং সেন্ট্রাল এক্সাইজ, ইনকামট্যাক্স আর কাস্টমস অফিসারদের লাখ-লাখ টাকায় কিনে নিয়ে চুটিয়ে কালো টাকাকে সাদা বানিয়ে চলল কমলেশ্বর।

একটা বিষয়ে পিতৃভক্ত কমলেশ্বর পিতৃ-বাক্য লঙ্ঘন করল না কিছুতেই। অতি শৈশবে নার্স অ্যাসোসিয়েশনকে হুকুম দেওয়া ছিল, আয়ার অভাব যেন না হয়, টাকার অভাবও হবে না। অনিলবরণ বিস্মৃত হয়েছিলেন হুকুমের বৃত্তান্ত। বিস্মৃত হয়নি কমলেশ্বর। অর্ডারটিকে একটু শুধু মেজে-ঘষে নিয়েছিল। মানে, আয়াগুলোর বুক-কোমর-পাছার একটা মাপ বলে দিয়েছিল। বয়সটাও বেঁধে দিয়েছিল। তাই ক্রমাগত মুখ পালটাতে এসে ঠেকেছে নিতম্বিনীতে।

চাবির গর্তের ফাঁক দিয়ে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক দেখেই চোখ কপালে উঠে গেল দোরজির। যেটুকু মায়া ছিল মর্ত্যের প্রতি, তা অপসৃত হল নিমেষের মধ্যে। মুহ্যমানের মতো নেমে এল রাস্তায়।

আর না! আর না! এ পোড়া পৃথিবীতে আর না। কিন্তু কোথায় যাবে দোরজি? কোথায় গেলে শান্তি পাবে?

হেনকালে অতি মধুর স্বরে কে যেন ডাকল পিছন থেকে—বৎস, দোরজি!

চমকে পিছন ফিরল দোরজি। মঙ্গোলীয় চোখমুখে অপরিসীম বিস্ময় ফুটে উঠল বক্তাকে দেখে। জ্যোতির্ময় এক মূর্তি স্মিত হাস্যে চেয়ে আছেন তার দিকে। তার সারা অঙ্গ ঘিরে অপার্থিব আলোর বন্যা বইছে।

কে...কে আপনি? তোতলাতে আরম্ভ করল দোরজি।

আমি দেবদূত।

দেবদূত। আমার কাছে কী মতলবে?

বৎস, তুমি অনিত্য বস্তুর মোহে পড়ে মিছে কষ্ট পাচ্ছ। মর্ত্যের মায়ায় আর আবদ্ধ থেকো না। আমি তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছি। চল।

কোথায়?

স্বর্গে?

আমি স্বর্গে যাব? কাকে ধরতে কাকে ধরেছেন মশায়? জানেন আমি কী-কী পাপ করেছি?

জানি। চিত্রগুপ্ত সব বলেছে। কাদা মেখেছ বাইরে, অন্তরে ঢুকতে দাওনি। বুজরুকি করোনি, সৎ থেকেছ। তুমি অকপট অমলিন। তাই স্বর্গলোকের সবাই বসে আছে তোমার প্রতীক্ষায়।

ইয়ে...মানে...অপ্সরারাও?

নিশ্চয়—প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুললেন দেবদূত, তিলোত্তমা, রম্ভা, উর্বশী, সবাই তোমার দর্শন-প্রত্যাশায় ব্যাকুল বৎস। নাও, ধরো আমার হাত।

যন্ত্রচালিতের মতো হাত বাড়িয়ে দিল সোরজি। মুহূর্তের মধ্যে তার কৃষ্ণ কৃশ অবয়ব রূপান্তরিত হল জ্যোতির্ময় মূর্তিতে।

শূন্যে উঠলেন দেবদূত। হাতে হাত দিয়ে সোরজিও ধাবিত হল নক্ষত্রলোক অভিমুখে। তীব্র আলোকচ্ছটার মতই আকাশগঙ্গায় মিলিয়ে গেল দুটি নক্ষত্র। সোরজীর মহাপ্রয়াণ ঘটল। এ কাহিনিতে সে আর আসবে না।

আবার চক্রান্ত-পর্ব

ভোর চারটে।

কর্পোরেশন মেথর ঘড়াং-ঘড়াং ঝড়াং-ঝড়াং শব্দে জঞ্জালের গাড়ি ঠেলে নিয়ে এল ডাস্টবিনের ধারে। হাইড্রেনের মধ্যে দিয়ে সেই শব্দ কামান গর্জনের মতো নেমে এল পাতালকুঠুরিতে। সবার আগে ঝুলন্ত বাঙ্ক ছেড়ে ভূতলে অবতীর্ণ হল কঙ্ক, সদ্য পদোন্নতি পাওয়া ডেপুটি লিডার।

ফ্রেন্ডস! হাঁক পাড়ল রাসভ কণ্ঠে।

ভোরের নিদ্রা সকলেরই গাঢ় হয় এবং বিবিধ সুখকর স্বপ্ন ঠিক তখনি আবির্ভূত হয়। লিডার বাসুকি নাগও মোলায়েম মিষ্টি স্বপ্ন দেখে ফিক-ফিক করে হাসছে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে। এমনসময়ে রাসভ-নিনাদে নিদ্রাভঙ্গ ঘটল তার। বললে কর্কশ কণ্ঠে, ইউ ডার্টি পিগ—

ভ্রূক্ষেপ করল না কঙ্ক। শূকর চক্ষুকে যদ্দুর সম্ভব বৃহৎ করে বললে সোল্লাসে, স্যার, এইমাত্র স্বপ্ন দেখলাম সেই মেয়েটাকে—

কী! স্বপ্ন! মেয়েছেলে! সাম্রাজ্যবাদী অভ্যেস! বাসুকির নাক কুঁচকে গেল এবং আরম্ভ হয়ে গেল ঘাড় ঝটকানি।

আজ্ঞে বলছে কঙ্ক, সেই মেয়েটা। আধবুড়ি মাগিটা। সোরজি মরবার আগে যার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল

বেশ করেছিল! ইউ ডার্টি পাজি সাম্রাজ্যবাদী! তুমি তাকে স্বপ্ন দেখবে কেন?

স্যার, মাগিটা সোরজির পকেট মেরে দেয়নি তো?

ঠিক...ঠিক...ঠিক...ঠিক। কলের পুতুলের মতো সায় দিয়ে গেল বাকি চার চর। ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল বাসুকি।

বললে চিন্তিত কণ্ঠে, হতে পারে। সেই মাগি থাকে কোথায়?

এখুনি যাই খুঁজতে।

পেলেই হিড়-হিড় করে—

না-না—আবার বলল কঙ্ক। জবরদস্তি করার আগে—

চোপরাও! আজকে চাই মাগিটাকে। হাল ছাড়িয়ে নিলেই—

বিপদ গণল কঙ্ক। পরক্ষণেই উদ্ভাসিত হল পাঁশুটে মুখ বলল, মনে পড়েছে

কী মনে পড়েছে?

কালকেই আপনি বলছিলেন প্রেসিডেন্টের কথা 'কোট' করে, শত্রুর পেটের কথা জানতে হলে আগে তাকে আড়াল থেকে চোখে-চোখে রাখতে হয়।

বলেছিলাম? আমি? সন্দিগ্ধ চোখে চাইল বাসুকি নাগ।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারই বুদ্ধি। ডিবে যে নিয়েছে, তাকে আগে চোখে-চোখে রেখে জেনে নিতে হবে ডিবেটা কোথায়। হাল ছাড়ানো হবে তারপরেই।

বটে! আমি বলেছিলাম? তাহলে নিশ্চয় বলেছিলাম। মগজে ঘিলু ঠাসা আছে বলেই তো এত বুদ্ধি আসে যখন-তখন, কিন্তু ওই এক দোষ, মনে রাখতে পারি না। নিশ্চয় বাপ-চোদ্দোপুরুষদের কেউ সাম্রাজ্যবাদী ছিল।

তাহলে?

যা বলেছিলাম, তাই করো। নিজের বুদ্ধি খাটাতে যেও না। মাগিটার ওপর নজর রাখো। যাও। হুঙ্কার ছাড়ল বাসুকি।

হাসি গোপন করে নেমে এল কঙ্ক। মনে-মনে শুধু ভাবল, প্রেসিডেন্ট আর-একটু ভালো লোককে স্পাই-লিডার করলেই পারতেন। মাংসওলাকে দিয়ে কি কলেজে পড়া স্পাইদের খাটানো যায়? খাঁটি কথাই বলেছেন প্রেসিডেন্ট—সবজান্তা দেশপ্রেমিক হওয়া বিপজ্জনক...।

নারায়ণীর ঘুম ভাঙল একই সময়ে—ভোর চারটে বাজতেই। কী আশ্চর্য! বুদ্ধিটা হুস করে মাথায় এসে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। বিস্রস্ত কাপড়চোপড় সামলে গড়িয়ে নামল খাট থেকে। আড়াই মণ ওজন বপুর গড়গড়ানিতে খাটের পায়ার নিচে পাতা একটা আধলা ইট ভেঙে দুটো সিকিতে পরিণত হল।

অন্য সময়ে হলে তাই দেখে আর্তনাদ করে উঠত নারায়ণী। বড় পিটপিটে মেয়েমানুষ সে। ঘরদোর গোছগাছ রাখতে ভালোবাসে কোলের বাচ্চার মতোই। কিন্তু আজকে তার মন বড়ই উচাটন। খাসা বুদ্ধি মাথায় এসেছে। আর দেরি করা নয়।

শীতের সকালে ময়দানের রোদের মতো মিষ্টি রোদ কলকাতায় সত্যিই দুর্লভ। চৌরঙ্গী ম্যানসনের সামনে, গান্ধীজির স্ট্যাচুর বাঁয়ে, ট্রাফিক সিগন্যাল বাক্সের পিছনে ফাঁকা মাঠে প্যারাম্বুলেটর নিয়ে শিশুদের গায়ে রোদ লাগাতে আসে বেশ কিছু আয়া। সাহেবপাড়ার ন্যানির দল। কেউ ঘুরে বেড়ায়, কেউ বসে পরচর্চা করে।

পার্ক স্ট্রিটের দিকে একরাশ খোয়ার পাশেই নারায়ণী আয়া সমিতির আড্ডাস্থল। মেয়ো রোড প্রশস্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে সি.এম.ডি.এ. ইস্তক খোয়া ছোট-ছোট টিলার মতো সাজিয়ে রেখেছে এখানে। নারায়ণী, মাতঙ্গিনী, নিভাননী, পটলানী, নিভাখিনী গেল

হয়ে বসেছে ঠিক তার পাশে।

টিলার ওপাশে ঘাসের ওপর কুকুর-কুণ্ডলীর আকারে শুয়ে একজন ভবঘুরে। আর কেউ না চিনলেও শ্যেনচক্ষু পাঠক-পাঠিকারা ঠিক চিনেছেন তাকে। বক্র শুয়ে আছে ঘটকা মেরে। কানের কাছে অতি খুদে হেডফোন। তারটা ইটের খোয়ার মধ্য দিয়ে চলে এসেছে এদিকে। তারের শেষপ্রান্তে শক্তিশালী মাইক্রোফোন। খোয়া চাপা। নারায়ণীরা দেখতে পাচ্ছে না। টিলার ওপাশে কল্ককেও দেখা যাচ্ছে না।

গুরুত্বপূর্ণ মিটিং বসেছে আয়াদের। নারায়ণী তার তিমিমাছের মতো উদর নিয়ে সভাপতিনী হয়েছে। একটু আগেই সংক্ষেপে বলা হয়ে গেছে গতকালের ঘটনা। দোরজি হেজিপেঁজি ছোকরা নয়। রাণাবংশের ছেলে। মিথ্যে কথা তাকে সাজে না। মৃত্যুকালে সে টুকরো-টুকরো কথা দিয়ে যা বলেছে, তা জোড়া-তালি লাগালে একটাই মানে দাঁড়ায়। সে মানে এই—পৃথিবীর বিপদ আসন্ন। একটা গোপনীয় দলিল সবচাইতে বড় হাতির কংকালের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নারায়ণী যেন কাউকে বিশ্বাস না করে।

নারায়ণী চোখ বড়-বড় করে ঘোর ষড়যন্ত্রকারীর মতো বললে, দোরজি মরবার আগে গোপন দলিলের ঠিকানাটা শুধু আমাকেই বলেছে, আর কেউ তা জানে না। আমার কি উচিত নয় দলিলটা উদ্ধার করে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া?

সমস্বরে বললে চার আয়া, নিশ্চয়।

পরক্ষণে বলল মাতঙ্গিনী, কিন্তু কার কাছে? যথাস্থানে মানে কী?

নারায়ণী ধ্যাবড়া নাকছাবি খুঁটতে-খুঁটতে বলল, সেইটাই তো জানি না।

দোরজি তা বলেনি। শুধু বলেছে কাউকে বিশ্বাস কোরো না।

পুলিশকেও না? বললে নিতম্বিনী।

নিশ্চয়। নিভাননীর জবাব।

প্রধানমন্ত্রীকেও না? নিতম্বিনীর পাল্টা প্রশ্ন।

শুনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল পাঁচজনে। ভালো যুক্তি দিয়েছে নিতম্বিনী।

পাঁচজনেই প্রাইম-মিনিস্টারকে পুজো করে দেবীর মতোই।

পাঁচ মিনিটেই ঠিক হয়ে গেল পরিকল্পনা।

ঠিক দশটার সময়ে দরজা খুলল ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের।

সেদিন শনিবার। চার আনার টিকিট না কাটলেই নয়। নারায়ণী বাচ্চাগুলোকে নিয়ে একলা দাঁড়িয়ে রইল ফুটপাতে। সাক্ষাৎ দশভুজা যেন। একাই একশো বাচ্চাকে সামলাতে পারে।

তড়বড়িয়ে দোতলায় উঠে গেল বাকি চারজন। দুজন বাঁয়ের সিঁড়ি ধরে, দুজন ডাইনের সিঁড়ি ধরে। একই সঙ্গে ম্যামাল সেকশনের প্রকাণ্ড হল ঘরটার তিনটে দরজায় পৌঁছল নিভাননী, পটলনী আর নিতম্বিনী। দুজন মাত্র কর্মচারী দরজায় দাঁড়িয়ে খইনি টিপছিল। নিতম্বিনী আর পটলনী কবজা করল দুজনকেই।

ওদের চোখের বিদ্যুৎ, ঠোঁটের হাসি, আর দেহের বাঁক দেখেই খইনি টেপা বন্ধ করে ফেলেছিল বিহার-পুঙ্গবরা। আয়াদের পছন্দ সকলেরই। বিশেষ করে ডাগর-ডোগর

নরম-গরম মালাই হলে তো কথাই নেই। সুতরাং ঈষৎ খুনসুটিতেই ওষুধ ধরল। চওড়া বারান্দার কিনারায় সরে গেল দুজনে। নিভাননী এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে চোখ টিপল মাতঙ্গিনীকে।

অত সকালে বেশি লোক হয় না মিউজিয়মে। যে কজন এসেছে, তারা নিচের ঘর নিয়েই উৎসুক। ওপরে কেউ ওঠেনি।

মাতঙ্গিনী খরগোশিনীর মতো ধেয়ে গেল কঙ্কালগুলোর পাশ দিয়ে। পর-পর সাজানো মলিন হাড়ের সারি-সারি কঙ্কাল। অস্থিময় জীবগুলো যেন ভ্রুকুটি করে উঠল মাতঙ্গিনীর খরগোশ-দৌড় দেখে। ভ্রুকুটিই সার, উট নড়ল না, টেপির কাঁপল না, জিরাফ লাফাল না, সম্বর শিং নাড়ল না, টাকিন গা-ঝাড়া দিল না। মাথার ওপর ঝুলন্ত তিমি ল্যাজ আছড়াল না, দরজার দুপাশে রাখা চোয়াল দুটোও খটাস করে বন্ধ হয়ে গেল না। নারহোয়ালের খড়গও তেড়ে এল না।

ছুটতে-ছুটতে হাতিদের কঙ্কালের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল মাতঙ্গিনী।

কোন হাতিটা সবচেয়ে বড়? দোরজি বলেছিল, সবচেয়ে বড় হাতি। প্রথমেই রয়েছে বিকানীরের মহারাজার দেওয়া হাতির কঙ্কাল; তারপরের কঙ্কালটা দান করেছেন মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট; তার সামনেই একটা ভারতীয় হাতি, ১৮৭০ সালের উনিশে জানুয়ারি এম. এম. স্মিথ তাকে যমালয়ে পাঠিয়েছিলেন; অযোধ্যার রাজার দেওয়া হাতিটাও নেহাত ছোট নয়। আসাম জঙ্গলে কিশোরী হস্তিনীটাই একমাত্র খুদে হাতি এদের তুলনায়। চামড়ায় মোড়া, কঙ্কাল নয়। জলহস্তীটা দাঁড়িয়ে আছে সব শেষে।

ঘাবড়ে গেল মাতঙ্গিনী। হাতে সময় কম। একটু পিছিয়ে এসে বনমানুষদের আলমারিতে হেলান দিয়ে দেখল কার কঙ্কাল সবচেয়ে বড়।

সিদ্ধান্ত নিল একপলকেই। দৌড়ে গেল জলহস্তীর পাশ দিয়ে। হাঁচোড়-পাঁচোড় করে লাফিয়ে উঠল আসাম জঙ্গলের কিশোরী হস্তিনীর পৃষ্ঠদেশে। সবচেয়ে বড় হাতির কঙ্কালটা এসে গেল নাগালের মধ্যে।

চশমার আড়ালে চোখ চলতে লাগল পিচ্ছিল গতিতে। হাতিটা প্রকাণ্ড। কিন্তু পাঁজরগুলোয় হাত না দিয়েই বোঝা যাচ্ছে কিছু নেই ওখানে। কোমরের বিপুলকায় পেলভিক গার্ডেলটায় অনেক খুপরি আছে বটে, কিন্তু আঙুল ঢুকিয়েও তো কিছু পাওয়া গেল না। ল্যাজটাও নির্দোষ। বাকি রইল করোটি। ওখানে ফোকর অনেক। ফুটোফাটায় আঙুল গলিয়ে তন্ন-তন্ন করে দেখার পরেও কিন্তু ধুলো ছাড়া হাতে কিছুই উঠল না।

আচম্বিতে কোকিল ডেকে উঠল দরজায়। নিভাননীর সঙ্কেত। সব ঋতুতেই কোকিলের কুহু-কুহু আকুতিটা ওর কণ্ঠে ভালোই ফোটে। লাফ দিয়ে নামতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে ফেলল মাতঙ্গিনী। মেয়েদের শরীর তো...

পরক্ষণেই ছোট সিঁড়ি বেয়ে পঙ্গপালের মতো উঠে এল একপাল ছেলেমেয়ে। ঘরে ঢুকে ওরা দেখল তন্ময় চোখে হস্তীর পৌরুষ লক্ষ করছে মাতঙ্গিনী।

হুঁচিটা এল তারপরেই। পুরুষ হাতির কঙ্কাল কিনা!

খবর পৌঁছে গেল পাতালকুঠুরির নাগ স্পাই ঘাঁটিতে

স্যার—রিপোর্ট পেশ করে বলল বক্র, ওরা দেখে প্ল্যান করেছে।

কী প্ল্যান?

গোটা হাতিটা লুঠ করবে।

হ্যাঁ।

আজ্ঞে হ্যাঁ। ডকুমেন্টটা নিশ্চয় হাতির কঙ্কালেই কোথাও আছে। খুঁজে পাওয়া যায়নি। সুতরাং পুরো কঙ্কালটাই মিউজিয়ামের বাইরে চালান করবে।

কক্ষনো না। ঘাড় ঝটকান দিয়ে নাকের মাছি তাড়াতে-তাড়াতে হুঙ্কার ছাড়ল বাসুকি, ব্রেনগান, স্টেনগান, মেশিনগান, ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দাও মিউজিয়াম। হাতির কঙ্কাল আমার চাই।

কিন্তু স্যার—মুখ শুকনো করে বললে কঙ্ক, আপনি আর-একটা আরও ভালো প্ল্যান বাতলেছিলেন আজ সকালে।

আমি বাতলেছিলাম? সন্দিগ্ধকণ্ঠ বাসুকির, কখন?

আজ সকালে—অম্লান বদনে বলে চলল কঙ্ক, বলছিলেন যে, শত্রুকে দিয়েই কৌশলে কাজ হাসিল করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা দুশমনকে আড়াল থেকে সাহায্য করব আমাদেরই কাজ হাসিল করার জন্যে।

চোখের দৃষ্টি একটু নরম হল বাসুকির, তুমি যখন শুনেছ, তাহলে আমিই বলেছিলাম প্ল্যানটা। এ-প্ল্যান আমার মাথা ছাড়া আর কারও মাথায় আসবেও না। ব্রেনটা আছে হে, কিন্তু মেমারিটা কত্ত ফেল করছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রাতের জন্যে। ও-কে কঙ্ক, প্রেসিডেন্টের ছবি ছুঁয়ে শপথ করে যাও, ওই মাগিদের দিয়েই কঙ্কাল লোপাট করবে, ডিবে উদ্ধার করবে।

সোৎসাহে বলল অনন্ত নাগ, পাঁচজনকেই চুলের মুঠি ধরে টেনে আনবে এখানে। আমরাও তো পাঁচজন—বাকি কথাটা গিলে ফেলতে হল বাসুকি নাগের ছাগল চোখের শীতল চাহনি দেখে।

কংকাল লোপাট পর্ব

কি বিপদ!

মিটিং-এ সাব্যস্ত হল সবচেয়ে বড় হাতির কঙ্কালকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কী করে?

ধাবড়া নাকছাবি খুলিয়ে বুদ্ধি খেলে নারায়ণীর। সেদিন কিন্তু নাকের পাটায় জ্বলা ধরে গেল, তবুও বুদ্ধি এল না অত বড় হলঘর। লোক সবসময়ে গিজগিজ করছে। সুতরাং দিনের বেলায় কঙ্কাল কিডন্যাপিং তো সম্ভব নয়।

তা হলে? রাতের আঁধারেই জোড় খুলতে হবে রেঞ্চ, পাস, স্ক্রুড্রাইভার, হাতুড়ি দিয়ে। কিন্তু সে তো এক রাতের কাজ নয়। অন্ততপক্ষে দুটি রাত লাগবে। এক রাত্রে খুলতে হবে। আরেক রাত্রে হাড়গুলোকে বাইরে চালান করতে হবে কিন্তু প্রথম রাত্রে হাড়গুলো খোলবার পর রাখা যায় কোথায়? পরের দিন সকালে জোড় খোলা কঙ্কাল দেখতে হুলুস্থুল পড়ে যাবে মিউজিয়ামে। টনক নড়বে সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুমে।

সমস্যার সমাধানের জন্যে নিতম্বিনী একদিন ঢুঁ-ঢুঁ করে এল মিউজিয়ামের ঠিক পিছনেই সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুমের অফিসে। গোমড়ামুখো সশস্ত্র অফিসারদের দেখেই চম্পট দিল দূর থেকে। দরোয়ানের সঙ্গে ভাব জমিয়ে উঠল উলটোদিকের লিটন হোটেলের দোতলায়। এমনকী সদর স্ট্রিট চার্চের ভেতরেও হানা দিয়ে এল সমাধান সূত্রের আশায়। কিন্তু উঁকিঝুঁকি মারাই সার হল। সিকিউরিটি কন্ট্রোলকে বোকা বানাবার পথ আবিষ্কার করা গেল না।

সেই রাতেই বাসুকি নাগের কাছে রিপোর্ট পেশ করে বললে কঙ্ক, স্যার, আয়ারা ফাঁপরে পড়েছে। আমি ওদের হেল্প করতে চাই।

কীভাবে?—মাংস কাটা মেশিনটার ওপর হাত বুলোতে-বুলোতে শুধোল বাসুকি। সভয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল কঙ্ক।

পরের দিন সকালে ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেল সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুমে। কাগজের অফিস থেকে ছুটে এল ক্যামেরা কাঁধে ফটোগ্রাফাররা। পটাপট শাটার টিপল, ছবি তুলল। স্তম্ভিত দারোয়ানরা তিন-তিনটে দরজায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রুখে দিল উৎসুক জনসাধারণকে।

পরের দিন সকালে কাগজে ছবি আর খবর বেরোনোর আগেই মুখে মুখে টালা থেকে টালিগঞ্জে ছড়িয়ে গেল খবরটা। চি-চি পড়ে গেল সারা শহরে ময়দানে-ক্লাবে, রকে-বাজারে, রাস্তায়-হোটেলে। সবার মুখেই শুধু এক প্রশ্ন—আপনি নিজে দেখেছেন?

অবিশ্বাস হওয়ারই কথা ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি? দোতলা সমান উঁচু ম্যামাল সেকশনের বিরাট সিলিংটা লম্বায়-চওড়ায় কম নয় অত বড় কড়িকাঠে অতগুলো অদ্ভুত বচন একরাতে লেখা কি সম্ভব? সবই নাগলোকের স্লোগান।

কে বা কারা একরাতেই আলকাতরা সহযোগে বিখ্যাত স্লোগানগুলো লিখে দিয়ে গেছে কড়িকাঠের এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত পর্যন্ত কারা এরা? মানুষ না অমানুষ, না অতিমানুষ?

ফিসফিস করে বলল নারায়ণী, দেখেছিস তোরা?

হুবহু সেইভাবে ফিসফিস করে বলল চার আয়া, শুনেছি।

খোয়া টিলার ওপারে কানে হেডফোন লাগিয়ে ফিকফিক করে কেবল হাসতে লাগল কঙ্ক।

এ নিশ্চয় দোরজির কাণ্ড। বলল নারায়ণী। ভারি দুষ্টু ছিল ছেলেবেলায়।

তা হলে? রোমাঞ্চিত কলেবরে চার আয়ার প্রশ্ন।

ওরা মিস্ত্রি লাগিয়েছে। ভারা বেঁধে আলকাতরার লেখা তুলে ফের চুনকাম করবে। আমি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেছি। বড়-বড় তেরপল দিয়ে বাঁশের ফ্রেম বেঁধে তাঁবুর মতো করেছে, কঙ্কালগুলো ঢাকা রয়েছে তাঁবুর তলায়।

কদিন থাকবে? নিতম্বিনীর উৎসাহ যেন সবচাইতে বেশি।

আজ আর কাল।

চাপা কণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠল বাকি চারজনে, প্রাইম মিনিস্টার মাইকি, জয়!

রাত এগারোটা।

মেয়েদের বাথরুমের ভেতর থেকে একে-একে বেরিয়ে এল পঞ্চমূর্তি। ছায়ায় গড়া পাঁচটি নারী মূর্তি। কেউ মোটা, কেউ বেঁটে, কেউ পাতলা। কারও পরনে শুধু সায়া-ব্লাউজ। কেউ পরেছে পায়জামা-বডিস। স্ল্যাকস পরেছে নিতম্বিনী। শাড়ি-টাড়িগুলো পুঁটলি পাকিয়ে রাখা হয়েছে বগলের তলায়। যন্ত্রপাতির পুঁটলির মধ্যে।

পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এল পাঁচজনে। দোতলা নিস্তব্ধ। এইমাত্র টহল দিয়ে গেল রাতের পাহারাদার। তালাটাও টেনে দেখে গেছে। মিউজিয়ামের সব ঘরই রাতে তালাচাবি বন্ধ থাকে। ম্যামাল সেকশনের দরজাতেও তালা ঝুলছে।

পঞ্চমূর্তি মার্জারের মতো নিঃশব্দ চরণে এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। নারায়ণী টর্চ জ্বালল। মাতঙ্গিনী একতাড়া চাবি বার করল। কিন্তু চাবি লাগানোর দরকার হল না। বাঁ-হাতে তালাটা ধরতেই ফুস করে খুলে গিয়ে ঝুলতে লাগল কড়া থেকে। ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি? লোম খাড়া হয়ে উঠল সকলেরই। কান্না-কান্না স্বরে নিতম্বিনী বললে, দি...দি! ওই দ্যাখো!

ছায়ার মতো একটা বামন মূর্তি সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল বারান্দার অন্ধকারে। দেখতে অবিকল কঙ্কর মতো।

ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল নারায়ণী। দোরজির কাণ্ডকারখানা দেখে তারও গা ছমছম করছে, কিন্তু মুখে প্রকাশ করছে না। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে বসতে না বসতেই খুট করে শব্দ ভেসে এল দরজার কড়া থেকে। কে যেন তালা ঝুলিয়ে দিল কড়ায়।

ছুটে গেল নারায়ণী। দরজা টেনে দেখল, সত্যি-সত্যিই ফের তালা ঝুলছে বাইরে।

ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইল নারায়ণী। ছোঁড়ার বুদ্ধি আছে বটে। রাতের পাহারাদার টহল দিতে আসবে। তালা খোলা দেখলে সন্দেহ হতে পারে। তাই তালাটা ফের লাগিয়ে দিয়ে গেল দুষ্টু ছেলেটা। ভালোই হল। নিশ্চিন্ত মনে সারারাত তাঁবুর তলায় মোমবাতি জ্বেলে কাজ করবে পাঁচজনে।

সকালবেলা দোরজি যদি তালা খুলতে ভুলেও যায়, তাঁবুর মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা যাবেখন। মিস্ত্রিরা ভেতরে এসে যখন ভারায় উঠবে, তখনও চম্পট দেবে একে-একে।

নারায়ণী অত কথা কাউকে ভাঙল না। যা ভীতু মেয়েগুলো! টর্চের আলো ঘুরিয়ে একবার শুধু দেখে নিল চিত্রবিচিত্র কড়িকাঠটা। তারপর ঢুকে পড়ল তাঁবুর তলায়। বলল ফিসফিসে গলায়, ওলো ও হাতির বউ—

এখানে বলে রাখা দরকার, নারায়ণী আয়া সমিতির পাঁচ আয়া হিন্দি, কানাড়া, মারাঠি তেলুগু এবং বাংলা ভাষায় মোটামুটি রপ্ত। সকাল-সন্ধে এক আড্ডায় বসলে যা হয় আর কী।

'নারায়ণীর' ওলো ও হাতির বউ শুনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল বাকি চারজনে।

মাতঙ্গিনী বলল, কাকে বলছ?

তোকে।

আমাকে? আমি কি হাতির বউ?

তবে কি আমার বউ? মাতঙ্গ মানে হাতি। হাতির বউয়ের নাম মাতঙ্গিনী।

তা হলে তোমার বরের নাম পতঙ্গ আর তুমি পতঙ্গিনী, নারায়ণীর বিশাল বপুর দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল মাতঙ্গিনী।

কেন?

বা রে! আমার বরের নাম মাতঙ্গ হলে তোমার বরের নাম পতঙ্গ হবে না?

খিল খিল করে হেসে উঠল নিভাননী, পটলানি, নিতম্বিনী।

চুপ কর! ধমক দিল নারায়ণী, পেলকণ্ঠি!

গম্ভবস্য বর্গী ভাষায় হাসিভরা চোখে পটলানী আর নিতম্বিনীকে সাবড়ে দিল নিভাননী।

সিরিয়াস হল নারায়ণী, মাতু, তুই হালকা আছিস। ওঠ হাতির পিঠে।

আমি? আঁতকে উঠল মাতঙ্গিনী। দিদি, আমাকে বোলো না।

কেন?

হাঁচি আরম্ভ হবে যে!

হাঁচি! হাঁ হয়ে গেল নারায়ণী।

ফিক-ফিক করে হাসতে লাগল নিতম্বিনী, কঙ্কাল হাতিটা যে মদ্দা গো দিদি।

মাতঙ্গিনীর অদ্ভুত পুরুষ অ্যালার্জির কথা সকলেই জানে। তাই এক পলকেই বুঝে নিল নারায়ণী। বলল, মরণ! নিভা, তুই ওঠ। রেঞ্চ হাতে নে। টপ করে সায়া ব্লাউজ পরা নিভাননী উঠে পড়ল বাচ্চা হাতির পিঠে। রেঞ্চ দিয়ে খোল বল্টু। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চাড় মার, প্লাস দিয়ে পেরেক তোল।

কেরদানি আরম্ভ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। নিতম্বিনী বাঁশের মতো মোটা মোমবাতিটা রাখল কিশোরী হস্তিনীর গ্রীবাদেশে। কিছুক্ষণ রেঞ্চ নিয়ে কসরত করার পর হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল নিভাননী, দিদি, খুলছে না যে।

দেখি কোন দিকে ঘোরাচ্ছিস; আ মর! উলটোদিকে ঘুরিয়ে মরছ কেন? বাঁদিকে ঘোরা। আরও ঘোরা—খুলেছে?

খুটুর-খুটুর করে খুলে আসতে লাগল একটার পর একটা বল্টু, উপড়ে এল পেরেক, খসে গেল হাড়ের জয়েন্ট। একটার পর একটা হাড় হাতে হাতে নেমে এল নিচের পাটাতনে। পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখল নিতম্বিনী। পাঁজরগুলো কেবল লেগে রইল লোহার পাতে, খোলা সম্ভব নয় বলে। সব শেষে হাত দেওয়া হল ভীষণ ভারী মাথার খুলিটায়। নিভাননী বললে, আমার হাত কনকন করছে। পটলানী, তুই ওঠ।

পটলানী শুধু একটা পায়জামা আর একটা হিলহিলে বগলকাটা ব্লাউজ পরেছিল কাজের সুবিধের জন্যে। বলল, নামো তুমি।

কিশোরী হাতির পিঠ বেয়ে পিছলে নেমে এল নিভাননী। কিন্তু পাটাতনে পা ঠেকবার আগেই কাতরে উঠল উঃ বলে।

কী হল? চমকে উঠল নারায়ণী। তারপরেই দৃশ্যটা দেখে বললে কঠোর কণ্ঠে,

ও কী হচ্ছে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

বেচারা নিভাননী। জবাব দেওয়ার মতো দেহের অবস্থা তার নেই, গরম মোম তরল আকারে গড়িয়ে পড়ছিল হস্তিনীর পিঠ বেয়ে। পিছলে নামতে গিয়ে ব্লাউজটা উঠে যেতেই বিপত্তি। গরম মোম নরম জায়গায় লাগতেই...ঝটপট উঠে পড়ল পটলানী। হালকা শরীর তার। পাজামার দড়ির ফাঁসে ঝুলিয়ে রাখল প্লাস আর রেঞ্চ। স্ক্রুড্রাইভার রইল দাঁতের ফাঁকে। দু-হাতে ধরে নাড়া দিয়ে টানল গুরুভার করোটিটাকে।

জ্যান্ত হাতির মুণ্ডও আলগা হয়ে যেত ওই ঝাঁকুনির ঠেলায়। কঙ্কাল অত ধকল সইতে পারবে কেন? হাতাহাতি করে ভারী মাথাটাকে নামিয়ে দেওয়ার পর নিচে নামতে গিয়ে আবার একটা দুর্ঘটনা বাধিয়ে বসল পটলানী।

প্লাস আর রেঞ্চ ঝুলছিল পাজামার দড়ির ফাঁস থেকে। মুখের স্ক্রুড্রাইভার নারায়ণীর হাতে চালান করার পর দু-হাতে প্লাস আর রেঞ্চ ধরে টান মারল নারায়ণীকে দেওয়ার জন্যে।

অবশ্যম্ভাবী পরিণামটা এড়ানো গেল না। যুগপৎ টান পড়ায় ফস করে গিঁট খুলে গেল পাজামার। নিটোল-মসৃণ-পেলব-নিতম্ব বেয়ে সড়াৎ করে নেমে এসে পদতলে আশ্রয় নিল হতচ্ছাড়া পাজামাটা।

মোমবাতির নিষ্কম্প শিখাও যেন শিউরে উঠল সেই দৃশ্য দেখে।

খটাং করে স্ক্রুড্রাইভারটা খসে পড়ল নারায়ণীর হাত থেকে, গড়িয়ে গেল পাটাতনের তলায়।

দ্যাখ! দ্যাখ! বলল নিতম্বিনী।

নোদু! নোদু! কোরাস গাইল নিভাননী।

ভেলে! ভেলে! হাততালি দিল মাতঙ্গিনী।

কোমরে হাত দিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল নারায়ণী। বলল কঠোর কণ্ঠে, রগড় কত হল পটল? অসভ্যতার একটা সীমা আছে। এখানে কেউ ক্যামেরা নিয়ে বসে নেই।

চকিতে পাজামা তুলে নিয়ে মুঠিতে চেপে ধরে সড়াৎ করে নেমে এল পটলানী। বলল লজ্জিত মুখে, সরি

তখন ভোর চারটে। কাজ শেষ। হাতির কঙ্কাল থরে-থরে সাজানো নিচের পাটাতনে। বাঁশের কাঠামোর ওপর তেরপলের তাঁবুর তলায় শূন্যস্থানটা খাঁ-খাঁ করতে লাগল মোমবাতির আলোয়।

গা-হাত-পায়ের ধুলো ঝাড়তেই গেল খানিকটা সময়। এরপর পরতে হল বাইরে পরার শাড়ি। ততক্ষণে ঘড়ির কাঁটা পাঁচটার দিকে এগিয়েছে। শরীর আর বইছিল না। তাই পাটাতনের ওপর কুঁকড়ে-মুকড়ে টনটনে মাজা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল পাঁচজনে।

পাঁচ মিনিটও গেল না। রাজ্যের ঘুম নামল চোখে।

ঘুম ভাঙল মিস্ত্রিদের চড়া গলার কথায়। উঁকি মেরে দেখল নারায়ণী। কাচের স্কাইলাইটে রোদ পড়েছে। দরজা খোলা। রাজমিস্ত্রিরা ভারায় বসে আলকাতরা তুলছে। ঘরের এদিকে কেউ নেই। চোখ টিপে চার সঙ্গিনীকে বলে দিল নারায়ণী, কীভাবে একে-একে চটকান দিতে হবে দরজা দিয়ে।

সারাদিন দারুণ কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটল। ঝক্কি বড় কম নয়। কর্পোরেশন মোটর

গ্যারেজের বড়বাবুকে হাত করতে হল। একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি মোটা টাকায় বুক করা হল বুলিদের জন্যে। টাকায় সব হয়। সেইসঙ্গে একটু চোরাচাহনি মিশিয়ে দিল নিতম্বিনী। বস, কেল্লাফতে!

কমলেশ্বরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছুটি নিতে হয়েছে নিতম্বিনীকে। পর-পর কয়েকটা রাত শয্যাসঙ্গিনী হতে পারবে না কোনওমতেই। দিনের বেলাতেও আয়াগিরি করতে পারবে না শুনে কোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে টেলিফোন তুলে নার্স অ্যাসোসিয়েশনকে হুকুম করেছে কমলেশ্বর—দিন-তিনেকের মেয়াদে একজন আয়াকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বয়স পঁচিশের বেশি নয়। রং ময়লা হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু—

নিতম্বিনী তাকেও ধমকায়নি। ছুটি নিভাননীকেও নিতে হয়েছে। গিন্নিমার তিন-তিনটে নাইট-পার্টি বরবাদ হওয়ায় প্রচণ্ড চটেছেন। কিন্তু চাকরি থেকে জবাব দেওয়ার সাহস হয়নি। এই বাজারে বর গেলে বর পাওয়া যায়, কিন্তু আয়া গেলে—

মুখচোখ মিটিয়ে ফিসফিস করে শুধোল নারায়ণী, হ্যাঁ রে, পারবি তো?

ঠোঁট উলটে বলল নিতম্বিনী, কেন পারব না? কমলেশ্বরের গাড়ি চালিয়ে কোলাঘাটের হাওয়া খাওয়াইনি?

সে তো রেড রোডে চালিয়েছিস। ফাঁকা রাস্তা। আর এ হল অ্যাম্বুলেন্স।

খুব পারব। পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে একটা ড্রাইভিং শেখার বই কিনলাম তো ওই জন্যেই।

ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। আগের রাতের দৃশ্যই আর-একবার দেখা গেল। রাত এগারোটা বাজতেই রাতের পাহারাদার তালা টেনে দেখে যেতেই মেয়েদের বাথরুম থেকে লাইন দিয়ে বেরিয়ে এল পঞ্চ মূর্তি, রোগা-মোটা-খাটো-পাতলা। ডানহাতে টর্চ ধরে বাঁ হাতে তালাটা হাতে নিল নারায়ণী। গত রাতের মতো আপনা থেকেই তালা খুলে গিয়ে ঝুলতে লাগল কড়া থেকে।

একটু গা ছমছম করে অবশ্য। কিন্তু ভূতের ভয়টা এখন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া দেবতারা ওদের ভালোই করছে। ভয় কীসের?

সুতরাং তোড়েমোড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। তাঁবুর নিচে থরে-থরে সাজানো হাড়ের স্তূপে কেউ হাত দেয়নি।

বড়-বড় চটের থলি ঘরের কোণেই পড়ে ছিল। মিস্ত্রিদের বালি-সিমেন্টের থলি। দ্রুত হাতে হাড়গুলো চালান হল এইসব থলির মধ্যে। মাতঙ্গিনী গুনছুঁচ আর টোয়াইন সুতো দিয়ে নিপুণ হাতে সেলাই করে ফেলল মুখগুলো। রাত একটার মধ্যে কাজ শেষ। বস্তাগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হল বনমানুষের আলমারির গায়ে।

দরজার কাছে এগিয়ে গেল নারায়ণী। ও জানত আজকে আর বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাবে না দারোয়ান। বেরোতে হবে তো?

গিয়ে দেখল, অনুমানটা মিথ্যে নয়। ভারি বুদ্ধিমান ছেলে এই দারোয়ান। মরেও বুদ্ধিনাশ ঘটেনি। দরজায় তালাটা ঝুলছে খোলা অবস্থায়।

হাতে টর্চ নিয়ে অন্ধকারে গা ঢেকে নেমে গেল ছোট সিঁড়ি বেয়ে। একতলার বারান্দায় রাশি-রাশি প্রাচীন শিলার গা ঘেঁষে এগিয়ে গেল সামনের গেটে। হাতে চাবির

তেড়া। প্রথম গেটের তালাটা খুলতে পারলেই কেল্লাফতে। দ্বিতীয় গেটের ওপর দিয়ে ফুটপাতে নামিয়ে দেওয়া যাবে বস্তাগুলো।

হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল নারায়ণীর। নিজের অজান্তেই রাম-রাম ধ্বনি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

একটা খর্বকায় কৃষ্ণমূর্তি নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল ওদিককার অলিন্দে। জীবন্ত মমি নাকি? মিশরের মমির কফিন তো ওইদিকেই।

সোরজিও হতে পারে। মরেও শান্তি পাচ্ছে না ছেলেটা। আহা রে!

ঠক-ঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে তালায় হাত দিল নারায়ণী। দেখল তালাটা খোলা। বাইরের গেটের তালারও একই অবস্থা।

গেটের দুপাশে দুজন নাইট-গার্ড ঘাড় মুচড়ে বসে আছে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। মরেনি। ঘুমোচ্ছে। ক্লোরোফর্মের মিষ্টি গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

আনন্দের চোটে যেন বেলুনের মতো হালকা হয়ে গেল নারায়ণী। বিপুল বপু নিয়েও বায়ুবেগে উঠে এল দোতলায়। সারা মিউজিয়াম নিঝুম। সিকিউরিটি কন্ট্রোলের বাঘা-বাঘা নিশাচর রক্ষীরা কল্পনাও করতে পারেনি চুরি হচ্ছে ভেতর থেকে, বাইরে থেকে নয়।

প্ল্যানে খুঁত ছিল না কোথাও। পর-পর দুটো কোলাপসিবল গেট মহামতি সোরজির প্রেতাত্মা চিচিং ফাঁক করে রেখেছে। রক্ষীরা মায়ামন্ত্রে আচ্ছন্ন রয়েছে। এই তো সুযোগ।

খবর পেয়েই হরিণীর মতই লাফাতে-লাফাতে নেমে এল নিতম্বিনী। সদর স্ট্রিটের চার্চের সামনেই পার্ক করে রেখেছিল কর্পোরেশনের অ্যাম্বুলেন্স গাড়িখানা। ঝরঝরে গাড়ি। বডিতে লেখা—কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান। দুষ্ট ব্যক্তিরা অবশ্য আলকাতরা বুলিয়ে পৌ-এর জায়গায় চৌ করেছে। অর্থাৎ লেখাটা দাঁড়িয়েছে এখন—কলিকাতা চৌর প্রতিষ্ঠান। বানান যাই হোক, অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি তো। সুতরাং কেউ আর মাথা ঘামায়নি। এমনকী পুলিশ পর্যন্ত নির্বিকার থেকেছে অ্যাম্বুলেন্স দেখে। চার্চের সামনে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকাটা কিছু দোষের নয়।

মিউজিয়াম থেকে গুটি-গুটি বেরিয়ে এসে সুট করে সদর স্ট্রিটে ঢুকল নিতম্বিনী। চৌরঙ্গী রোড জনবিরল, কিন্তু গাড়িবিরল নয়। নক্ষত্র-বেগে ছুটে চলেছে গাড়ির পর গাড়ি। না দেখেও বলা যায়, প্রায় সব গাড়িই এখন ভ্রাম্যমাণ বৃন্দাবন কুঞ্জ। আদম-ইভের চলন্ত লীলা নিকেতন।

সদর স্ট্রিটের পাহারাদার সেই মুহূর্তে পার্টি পাকড়েছে। একটি পথের পতিতাকে ভয় দেখিয়ে ঘুষ আদায়ের চেষ্টায় ব্যস্ত। তাই দেখতেও পেল না নিতম্বিনীর ছায়ার মতো কৃশশরীর।

অ্যাম্বুলেন্সে উঠেই স্টার্ট দিল নিতম্বিনী। আনাড়ি পায়ে ক্লাচ ছেড়েই অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরতেই লাফ দিয়ে এগিয়ে এল ঝরঝরে ভ্যান। ইঞ্জিনের আচমকা গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে পাহারাদার সচকিত হল বটে, নড়ল না।

মিউজিয়ামের সামনে এসে দাঁড়াল অ্যাম্বুলেন্স। সাঁ করে বেরিয়ে এল নার্সবেশী

পটলানী আর মাতঙ্গিনী। স্ট্রেচার বার করে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

পাহারাদার শুধু দেখল আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা স্ট্রেচার নিয়ে দুজন নার্স বেরিয়ে এল মিউজিয়াম থেকে। আবার ঢুকল ভেতরে খালি স্ট্রেচার নিয়ে। বেরিয়ে এল লম্বমান রুগির পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে। আবার গেল। আবার এল। চতুর্থ স্ট্রেচারটি নিয়ে ওরা নেমে আসতেই হেলতে-দুলতে কাছে এসে দাঁড়াল কনস্টেবল। নিশীথ রাতে নার্স দেখে তার প্রাণে একটু আদিরসের সঞ্চার হয়েছিল। তাই মেল-নার্সের বদলে এত রাতে ফিমেল নার্স কেন স্ট্রেচার বইছে এবং কেনই বা রুগিদের মুন্ডু পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, তা নিয়ে খটকাও লাগল না।

পায়ে-পায়ে কাছে এগিয়ে আসতেই ধীরপদে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এল নারায়ণী। পিছনে নিভাননী। দুজনের পরনে মেট্রনের বেশ।

কী চাই? মিলিটারি জেনারেলের মতো কড়া গলা নারায়ণীর।

হকচকিয়ে গেল কনস্টেবল। আদিরস শুকিয়ে এল বিপুলকায়া নারায়ণীর উগ্রমূর্তি দেখে। গলা তো নয় যেন কাটারির কোপ। শিকারি গোঁফের ফাঁকে শেয়ালের মতো কাষ্ঠ হেসে বললে কনস্টেবল, হেঁ-হেঁ, এত রাতে—

খবরদার। গায়ে হাত দিলেই চেঁচাব!

আরে! আরে। চটছেন ক্যান?

ততক্ষণে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে নিতম্বিনী। পটলানী, মাতঙ্গিনী, নিভাননী উঠে বসেছে পিছনে। দৌড়ে গিয়ে সামনের সিটে বসে পড়ল নারায়ণী। গাঁ-গাঁ করে আর্তনাদ করল কর্পোরেশনের ভ্যান, তেতো ঘোড়ার মতো লাফ দিল সামনে এবং এক পাক ঘুরে ফুটপাতের ওপর দিয়ে টার্ন নিয়ে ছুটল সুরেন ব্যানার্জি রোডের দিকে।

শুধু একটা ঢোক গিলল কনস্টেবল তারাচরণ। খাণ্ডারনি মেয়েছেলে একেই বলে। ভাগ্যিস গায়ে হাত বুলোয়নি। নির্ঘাৎ রিপোর্ট হয়ে যেত।

তাড়া খাওয়া গরুর মতো লাফাতে-লাফাতে সুরেন ব্যানার্জি রোডে ঢুকে পড়ল চৌর, খুড়ি, পৌর প্রতিষ্ঠানের অ্যাম্বুলেন্স। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে স্টিয়ারিং ধরে রেখেছে নিতম্বিনী। পাশে বসে পথ-নির্দেশ দিচ্ছে নারায়ণী।

আচমকা একটা জঞ্জালের গাড়ি দেখা গেল পিছনে। এত রাতে জঞ্জালের লরি? কাক না ডাকলে তো মেথরদের ঘুম ভাঙে না।

পিছন দেখার আয়নায় লরিটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতেই ভুরু দুটো ইংরেজি এস এর মতো কুঁচকে ফেলল নারায়ণী। ধূর্ত চোখে ঝিলিক দিল দারুণ সন্দেহ। কর্পোরেশনের লরি। জঞ্জালও রয়েছে। রাস্তার আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে জঞ্জালের ওপর। দেখা যাচ্ছে শুধু মুন্ডুগুলো। একজন বসে আছে ড্রাইভারের সিটে। সাদা-সাদা পাঁশুটে চেহারা। মর্কটের মতো আকৃতি। বোতামের মতো চোখ। উঁচু-উঁচু হনু। বিদেশি বলেই মনে হচ্ছে!

জঞ্জালের লরিতে বিদেশি?

নিশ্চয় ছদ্মবেশী পুলিশ! হারামজাদা সেই কনস্টেবলটাই পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে পিছনে। ঠিক আছে! ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখোনি। টেরটা পাবে আজ এখুনি!

লালবাড়ির পাশ দিয়েই দু-দুটো কর্পোরেশন গাড়ি রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটল মৌলালীর দিকে। বাড়ির সামনে প্রহরারত আর্মড পুলিশ শুধু চেয়ে দেখল। অ্যাম্বুলেন্স এমনই একটা গাড়ি যা রাতবিরেতে রাস্তায় চললেও খুব স্বাভাবিক মনে হয়।

সতর্ক চক্ষু নারায়ণীর মুখ চলছে অবিরাম। নিতম্বিনীকে বলা হয়ে গেছে কী করতে হবে। এমনকী অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে পটলানী, মাতঙ্গিনী, নিতম্বিনীও জেনে গেছে তাদের পরবর্তী ভূমিকা কী।

নিশীথ নগরীর ট্রাফিকহীন সুরেন ব্যানার্জি শেষ হল। গেস্টেটনার সি. আই. টি.-র মোড় থেকেই কনভেন্ট লেনের মধ্যে দিয়ে পামারবাজারের দিকে ছুটল গাড়িদুটো। জঞ্জালের গাড়ির ড্রাইভার অনন্ত নাগ। পিছনে দাঁড়িয়ে কঙ্ক ওয়াকি টকি মারফত খবর দিচ্ছে বাসুকিকে। বাসুকি বসে আছে পাতাল কুঠুরির গোপন ঘাঁটিতে। —স্যর ওরা বেলেঘাটার দিকে যাচ্ছে, রিপোর্ট পেশ করল কঙ্ক। আমরা কী করব?

মূর্খ! পরম খুশিতে মোলায়েম গাল পাড়ল বাসুকি—পিছন ছাড়বে না। আজ রাতের মধ্যেই হাড় দখল করা চাই। প্রেসিডেন্ট জিন্দাবাদ!

প্রেসিডেন্ট জিন্দাবাদ!

পুলিশ থাকলে নিশ্চয় নম্বর নিয়ে রাখত। কিন্তু এত রাতে কে আর দেখছে। এই গেস্টেটনারের পাশ দিয়েই একনম্বর গোল্লা উড়ল অ্যাম্বুলেন্স। পামার বাজারে ঢুকে লেভেল ক্রসিং পেরোনোর সময়ে স্পিড কমাল না নিতম্বিনী। জানলে তো কমাবে। ফলে রাস্তার দু-হাত ওপর দিয়ে লাফাতে-লাফাতে চুনাগলির গলির সামনে ছিটকে এল ভ্যানটা। কাঁউমাউ চিৎকার শোনা গেল ভেতরে। পটলানী বলল, ওলো ও নিতু, এটা কমলেশ্বরের বিছানা নয়, আস্তে চালা।

নিতম্বিনী দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে স্টিয়ারিং কাটাচ্ছে তখন। বিপজ্জনক বাঁক। একটু বেচাল হলেই ডানদিকের খালে পড়তে হবে। রাস্তাটা যেখানে আচমকা বাঁয়ে ঘুরেছে, ঠিক সেইখানে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের একটা তারের কাটিম রয়েছে। মানুষ সমান উঁচু কেবল কাটিম। নিচে ইটের ঠেস। ঢালু জায়গা তো—গড়িয়ে নেমে যেতে পারে।

দুপুরবেলা মহড়া দেওয়ার সময়ে কাটিমটা দেখে গিয়েছিল নারায়ণী। নিতম্বিনী অ্যাম্বুলেন্স দাঁড় করাল কাটিমটার ঠিক সামনে। নারায়ণী হেঁকে বললে, মাতু, নিতু, পটল—কুইক।

অমনি দড়াম করে খুলে গেল অ্যাম্বুলেন্সের পিছনের দরজা। লাফ দিয়ে নামল মাতঙ্গিনী, নিতম্বিনী, পটলানী। তিনজনের হাতে হাতির তিনটে কঙ্কাল হাড়। ঊরুর হাড়। বেশ লম্বা এবং মজবুত।

পামার বাজার থেকে ঘড়াং-ঘড়াং আওয়াজ শোনা গেল। ফুল স্পিডে লেভেল ক্রসিং পেরোচ্ছে জঞ্জালের গাড়ি। সরু রাস্তা বেয়ে উঠে আসছে স্পিড না কমিয়েই—কাটিমের পাশে সঙ্কীর্ণ রাস্তাটার দিকে। ওদিক থেকে অ্যাম্বুলেন্স দেখা যাচ্ছে না। সরু রাস্তার আধখানা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে কেবল কাটিমটা। লরিটা গজ-দশেক তফাতে আসতেই হেঁকে উঠল নারায়ণী, স্টার্ট!

কাটিমের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল পটলানী আর মাতঙ্গিনী। নিচ থেকে ইটদুটো টেনে নিয়েই ফিরে গেল পিছনে। পরমুহূর্তে তিনজনেই হাতির হাড় দিয়ে একসাথে চাড় মারল কাটিমের তলায়।

ফলটা হল মারাত্মক। ঢালু রাস্তায় গড়িয়ে নেমে এল বিশাল হুইলটা। জঞ্জালের গাড়ি তখন একদম সামনে। ব্রেক কষবারও সময় নেই। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতো জায়গাও নেই।

আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে অনন্ত নাগ দেখল, কেবল জড়ানো কয়েক মণ ওজনের প্রকাণ্ড একটা হুইল কামানের গোলার মতো আছড়ে পড়ছে বনেটের ওপর। দু-চোখ বন্ধ করে ব্রেক কষল প্রাণপণে আর কোনও উপায় না থাকায়।

পরমুহূর্তেই লাগল ধাক্কা। রাস্তার কিনারা থেকে উলটে গিয়ে পাঁকভর্তি খালের জলে ছিটকে গেল জঞ্জালসহ গাড়িখানা।

পরের দিন সকালে আটটা বাজতেই রাজমিস্ত্রিরা এল ম্যামথ সেকশনে। মিউজিয়ামের একজন কর্মচারীও এল কাজ দেখতে। ছাদের ফোকরগুলো চুনকামে ঢাকা পড়েছে। এখন শুধু তেরপলের ঢাকনাগুলো খুলে নিতে হবে। কঙ্কালগুলোর আবরণ উন্মোচন করে দিতে হবে দশটার আগেই।

বাঁশের ফ্রেমের তলায় বাঁশে নারকেল দড়ি দিয়ে টাইট করে বাঁধা ছিল তেরপল ক-খানা। গিঁটগুলো খোলার পর একদিকের তেরপল ধরে হেঁইও বলে টান মারল মিস্ত্রিরা।

কর্মচারী ভদ্রলোক তখন সপ্রশংস চোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে। সড়সড় করে তেরপলটা ফ্রেমের ওপর দিয়ে পিছলে এপাশে নেমে আসার পর চোখ নামাল নিচে।

দেখল, হস্তীযূথ দাঁড়িয়ে যে যার জায়গায়। একটা ছাড়া। মাঝের জায়গাটা ফাঁকা। একটা কঙ্কাল হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

ভাবল, চোখের ছানির জন্যে দেখতে পাচ্ছে না। পকেট হাতড়ে চশমা বার করে লাগাল নাকের ডগায়, ফের তাকাল পাটি-পাটি করে অদৃশ্য কঙ্কালের দিকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ভীষণ সত্যটা মাথায় ঢুকল খুব আস্তে-আস্তে। বুঝল, সর্বনাশ হয়েছে! কঙ্কাল পালিয়েছে।

এরপর যদি ভদ্রলোকের চকচকে টাকের তিনখানি মাত্র চুল কাঁপতে-কাঁপতে দাঁড়িয়ে ওঠে, দোষ দেওয়া যায় কি?

তদন্ত-পর্ব

স্পেশাল ব্রাঞ্চ। ডি.সি.-র ঘর।

সি.পি.-র টেলিফোন পেয়ে যথারীতি ক্ষিপ্ত হয়েছেন বুলবুল বটব্যাল। তুখোড় অফিসার তিনি। কিন্তু কমিশনারের গলা শুনলেই কীরকম যেন হয়ে যান। যুক্তিগুলো গোলমাল হয়ে যায়।

এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হাতির কঙ্কাল উদ্ধারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে চাপানো হবে কেন, এই নিয়ে বৃথাই তর্ক করেছেন বুলবুল বটব্যাল। কিন্তু সি. পি. সাফ হুকুম দিয়েছেন,

স্পেশাল ব্যাপারের জন্যেই তো স্পেশাল ব্রাঞ্চ। সুতরাং...

সুতরাং যথারীতি টেবিলে ঘুসি মেরে লাফিয়ে উঠলেন বুলবুল বটব্যাল। শত্রুপক্ষ এবং অধস্তন কর্মচারীরা আড়ালে তাঁকে বুলবুল বটব্যাল নয়, বুলডগ বটব্যাল বলে ডাকে। নামকরণটা অকারণে হয়নি।

প্রথম প্রমাণ তাঁর চেহারাটা। থলথলে মাংস গোল হয়ে ঝুলে পড়েছে দু-ঠোঁটের পাশ দিয়ে। সারা মুখে যত্রতত্র ডেলা-ডেলা অব গজিয়ে উঠেছে। ভুরুর কার্নিশের তলায় চোখজোড়া অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং মর্মভেদী, চোখে চোখ রাখলেই রক্ত জল হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রমাণ তাঁর চরিত্রের মধ্যে। যা ধরেন, তা শেষ না করে ছাড়েন না, বুলডগের চোয়ালের মতো, কামড়ালেই চোয়াল আটকে যায়। কামকাতে না হওয়া পর্যন্ত খোলে না।

প্রমাণটা নতুন করে পাওয়া গেল কমিশনার টেলিফোন ছেড়ে দেওয়ার পরেই। টিনের ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা রাখা ছিল পায়ের ঠিক সামনেই। এটা তাঁর নিরানব্বইতম বাস্কেট। স্পেশাল ব্রাঞ্চের সামনের এলোমেলো বাগানের কাকগুলো পর্যন্ত জানে, বুলডগ বটব্যালের ক্রোধ প্রশমিত করতে হলে পায়ের কাছে নিত্যনতুন বাস্কেট রাখা চাই।

লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেই কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন বুলবুল বটব্যাল। চোখ দিয়ে দূরত্ব মেপে নিলেন। পরক্ষণেই ছুটে এসে প্রচণ্ড শট মারলেন বাস্কেটে। প্রদীপ ব্যানার্জি, চুনী গোস্বামীও সেই শট দেখলে বুলডগের পা জড়িয়ে ধরতেন।

দমাস করে দেওয়ালে আছড়ে পড়ে একেবারেই দুমড়ে-তুবড়ে পিণ্ডি পাকিয়ে গেল বাস্কেটটা। হাতে নিয়ে উলটে-পালটে দেখলেন বুলবুল বটব্যাল। এক শটেই ভেঙে চুরমার। সুতরাং রাগটাও নেমে আসতে লাগল থার্মোমিটারের পারার মতো

নিচের তলায় আওয়াজ পৌঁছতেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইল ইন্সপেক্টররা। এক সেকেন্ড এদিক-ওদিক হল না। প্রতিবারের মতো এবারেও ঠিক আধ মিনিটের মাথায় চাপরাশি এসে জানাল, বুলডগ কনফারেন্স ডেকেছেন।

পুলিশের টনক আগেই নড়েছিল। দোরজির রহস্যজনক মৃত্যু ভাবিয়ে তুলেছিল পলিটিক্যাল সেলকে। রাণাসাহেবের কাজ কারবার কারওরই অজানা নয়। উঁচু মহলের এজেন্ট বলে কেউ ঘাঁটাতে চায়নি। কিন্তু খবরা-খবর রাখত।

স্বনামধন্য সেই দোরজি শুরু অদ্ভুতভাবে সুইসাইড করল মিউজিয়ামে। কেন? কাদের ভয়ে? দেহ তল্লাশি করে কিছুই পাওয়া যায়নি। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নাকি কয়েকজন বিদেশি ঘিরে ধরেছিল তাকে। একজন বিদেশি ডাক্তারও নাকি সারা গায়ে হাত বুলিয়েছিল। কীসের সন্ধানে?

নাগ স্পাইনের তাড়া খেয়ে আত্মহত্যা করেছে দুর্ধর্ষ দোরজি—এইটুকুই শুধু জানা গিয়েছিল। অন্যান্য মহল থেকে কিন্তু চাপ পড়ছিল পুলিশের ওপর। মিনিস্টাররাও সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে নাগলোকের গন্ধ পাচ্ছিলেন।

তারপরেই কে বা কারা বরাবরতি ভেলকি দেখিয়ে গেল মিউজিয়ামের কড়িকাঠে। বাছাই-বাছাই বাক্যগুলি সযত্নে লিখে রাখল ইংরেজি, হিন্দি এবং বাংলায়। ফলে, আরও কড়া হল নাগলোকের গন্ধ।

তারপরেই সব গোলমাল হয়ে যেতে বসেছে। যে ঘরের ওপর অত নেকনজর টীনের চরদের, সেই ঘর থেকেই একটা হাতির কঙ্কাল পালিয়ে গেল নিশুতি রাতে! কেন? কীভাবে? কোথায়?

জাদুঘরে চুরির হিড়িক আরম্ভ হয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে। এই তো গত সেপ্টেম্বরে কলকাতা জাদুঘর থেকে চুরি যায় বেলেটা পাথরের মূর্তি। পরে তা উদ্ধারও করা হয়। তেরোজনকে হাতকড়া পড়িয়েছিল পুলিশ, তার মধ্যে ছিল ছজন দরোয়ান।

গত বছরেও অনেক শিল্পদ্রব্য চুরি গেছে কেন্দ্রীয় জাদুঘরগুলো থেকে। সবচেয়ে সাংঘাতিক চুরি হয়েছে দিল্লির জাদুঘরেই। ১৯৬৭ সালের মে মাসে কলকাতা জাদুঘর থেকে একটা মিনিয়েচার ছবি চুরি যায়। আজও তার পাত্তা মেলেনি। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪-এর জুলাই পর্যন্ত হায়দ্রাবাদের সালারজঙ্গ জাদুঘর থেকে উধাও হয় চোদ্দোটা মিনিয়েচার ছবি, একটা প্রসাধনী আধার, আর-একটা হাতির দাঁতের তৈরি মূর্তি। তার মধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে এগারোটি ছবি, বাকিগুলো আজও নিপাত্তা। ১৯৬৫ সাল থেকে দিল্লির জাতীয় জাদুঘর থেকে লোপাট হয়েছে একটা ছোট অপ্সরা মূর্তি, ১২০টা প্রত্নবস্তু হিসেবে বিবেচিত অলঙ্কার, সোনা ও রুপোর মুদ্রা, ১২৫টা জহরত নালন্দা জাদুঘর থেকে ১৬টা ব্রোঞ্জমূর্তি এবং সারনাথ থেকে একটা বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু আস্ত একটা হাতির কঙ্কাল তো কখনও খোয়া যায়নি! তাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। বিমূঢ় হল পুলিশ মহল।

পান থেকে চুন খসলেই দিল্লির দ্বারস্থ হন মুখ্যমন্ত্রী। হাতির কঙ্কাল পালিয়েছে জাদুঘর থেকে। অথবা কিডন্যাপড হয়েছে। সুতরাং একঘণ্টার মধ্যেই অ্যাডভাইস চাওয়া হল প্রধানমন্ত্রীর কাছে, টেলিফোন মারফত।

প্রধানমন্ত্রী সাদা টেলিফোন তুলে সব শুনে তো থ। সে কী কথা? সাপের কঙ্কাল হলে না হয় নাগলোকের একটা মোটিভ থাকত। যাই হোক, লাগাও তদন্ত। দরকার হলে বসাও কমিশন।

রিসিভার রেখেই প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী।

যথারীতি চাপ এসে পড়ল পুলিশ মহলে। বেগতিক দেখে ডি. সি. ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট কেটে বেরিয়ে গেলেন। বললেন, এসব স্পেশ্যাল ব্যাপার স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চেরই হ্যান্ডেল করা উচিত।

তাই একটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটকে লাথিয়ে পিণ্ডি পাকিয়ে স্যাঙাতদের তলব করলেন বুলবুল বটব্যাল। ছোটখাটো বক্তৃতার পর তার স্পেশাল টিম নিয়ে হাজির হলেন অকুস্থলে।

শ্রীকৃষ্ণের যেমন নারায়ণী সেনা, বুলবুল বটব্যালের তেমনি স্পেশাল টিম। শেয়ালের মতো ধূর্ত, বাঘের মতো ক্ষিপ্র, ঈগলের মতো লক্ষ্যভেদী।

ম্যামাল সেকশন।

বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বুলডগ বটব্যাল। আধবোজা চোখ। মুখে চুইংগাম। চওড়া চোয়ালটা নড়ছে বুলডগের চোয়ালের মতো।

সারা দেহে আর কোনও চাঞ্চল্য নেই।

সাঙ্গপাঙ্গরা ব্যস্ত যে-যার ডিউটি নিয়ে। বয়সে সবাই ছোকরা। কিন্তু যেন এক সুতোয় গাঁথা। বুলবুল বটব্যালের চার হাত-পা এই চারজনে। সাইন্স ম্যানেজমেন্টের তোয়াক্কা রাখেন না উনি। পুলিশ ট্রেনিং-এর ফার্স্ট হয়েদের নিয়ে দল গড়েছেন ওসাবা পাকড়ের জন্যে।

ফণী সেন ঘরের মেঝে মাপছে ফিতে দিয়ে। ছোট-ছোট চৌকোণা বর্গক্ষেত্র আঁকা হয়েছে খড়ি দিয়ে। এক-একটা ঘরের এক-একটা নম্বর। নম্বর মাফিক আলাদা আলাদা খাম রয়েছে পকেটে। এক-একটা চতুষ্কোণ বর্গ থেকে ধুলোর নমুনা নিয়ে নম্বর মিলিয়ে খামে রাখছে ঘাড় হেঁট করে।

তরুণী লাহা এগিয়ে এল তারপরেই। কোন চতুষ্কোণ ঘরে কী-কী পাওয়া গেল, তার ফিরিস্তি করে নিলে নোটবুকে।

শুরু হল মাকু লাহিড়ীর পর্যবেক্ষণ। আঙুলের ছাপ আবিষ্কারে জুড়ি নেই তার। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিল যাবতীয় সন্দেহজনক ছাপ-ছোপের।

ফাইনাল টাচ দিল সীমান্ত দত্ত। জীবন্ত কম্পিউটার বললেও চলে তাকে। মুখে-মুখে হিসেব করে বলে দেয় দুরূহ সমস্যার গাণিতিক সমাধান। হাতের চেটোয় ওজন করে জানিয়ে দেয় কোন জিনিসের কত ওজন। বুলবুলের নাখিব ধারায় ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটগুলো যে সেকেন্ডে সাড়ে ছত্রিশ মাইল বেগে ধাবিত হয়, এ আবিষ্কারও তার। চরকির মতো সে ঘুরতে লাগল ঘরময়। হাতের নোটবইয়ে উঠে গেল মনের হিসেব।

একঘণ্টার মধ্যেই শেষ হল তদন্ত। ডেরায় ফিরে এলেন বুলবুল। স্পেশাল টিমকে আরও একঘণ্টা সময় দিলেন রিপোর্ট তৈরি করে ফেলার জন্যে।

একঘণ্টা পর।

পায়ের কাছে একটা নতুন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট নিয়ে বসে আছেন বুলবুল বটব্যাল। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ মুখে চুইংগাম। চোয়াল যাচ্ছে-আসছে স্টিম ইঞ্জিনের পিস্টনের মতো।

স্পেশাল টিম বসে আছে সামনের চারখানা চেয়ারে।

আচম্বিতে রোলকল করলেন বুলবুল। ফণী, তরুণী, মাকু, সীমান্ত।

ইয়েস স্যার! ইয়েস স্যার! ইয়েস স্যার! ইয়েস স্যার!

রিপোর্ট রেডি?

ইয়েস স্যার! একবার নবাব এল সমস্বরে।

একে-একে বলে যাও।

ধুলো পরীক্ষার ফোরেনসিক রিপোর্ট গড়গড় করে পেশ করল ফণী সেন। ধুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো এইরকম :

অমুক-অমুক বর্গক্ষেত্রের ধুলোর মধ্যে ময়দানের গন্ধ আছে, থাকাটাই স্বাভাবিক। কেননা, মিউজিয়াম থেকে বেরোলেই তো ময়দান। অমুক-অমুক বর্গক্ষেত্রে ময়দানের ধুলোর সঙ্গে ইটের গুঁড়োও মিশে আছে। তার মানে চৌরঙ্গী ম্যানসনের ঠিক উলটোদিকের

ময়দান মাড়িয়ে তস্কররা হাতির কঙ্কাল চুরি করতে এসেছিল। এ ছাড়াও আছে মেয়ে-মেয়ে গন্ধ, ছেলে-ছেলে গন্ধ নয়। সংখ্যায় তারা পাঁচজন। কেননা, পাঁচ রকম আলাদা-আলাদা গন্ধ মিশে আছে ধুলোর মধ্যে। কমলালেবুর সেন্ট আছে দু রকমের। জেসমিন আর কনক। বেয়োনি সেন্ট। সুতরাং চোর নয়, চোরনীর হানা দিয়েছিল মিউজিয়ামে এবং তাদের অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়—একজনের ছাড়া। কেননা তার আছে ফ্রেঞ্চ হোয়াইট দিমুভার ব্যবহারের অভ্যেস আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হল দুটি পাউডারের গন্ধ। ফণী সেনকে অবশ্য নিতে পাউডার দুটোর নাম অক্লেশে বলে দিতে পারে।

কী নাম? ফলাফলের কণ্ঠস্বর বুলবুলের।

জ্যাক্সো বেবি পাউডার আর কলগেট বেবি পাউডার।

হোয়াট! ভুরু কুঁচকে গেল বুলবুলের। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, বেবি পাউডার? আর ইউ শিওর?

হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর, স্যার। স্থির চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন বুলবুল। চেয়ে রইল ফণী সেনও। একই সন্দেহ হাতুড়ির বাড়ি মারতে লাগল দুজনেরই মগজের কোণে-কোণে। সন্দেহটা উদ্ভট, অবাস্তব কিন্তু...

চোখ বুজে ফেললেন বুলবুল, তরুণী—

শুরু হল তরুণীর রিপোর্ট—গোছা-গোছা চুল পেয়েছে সে ঘরময়। অমুক-অমুক বর্গক্ষেত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে মেয়েছেলের চুল। একটা চুলের কাঁটা পড়ে ছিল অমুক বর্গক্ষেত্রে। মোম পাওয়া গেছে রাশি-রাশি। মেঝেতে, পাটাতনে আর কিশোরী হস্তিনীর পৃষ্ঠদেশে। গরম মোম জমে শক্ত হয়ে রয়েছে। আর পেয়েছে একটা স্ক্রুড্রাইভার, তাতে দাঁতের দাগ। নাটবল্টুর মাথায় অদ্ভুত কতকগুলো আঁচড় দেখেছে তরুণী। বল্টুগুলো উলটোদিকে ঘুরিয়ে খুলতে গিয়েছিল চোর অথবা চোরনী তাই এঁকে গিয়েছিল। পরে অবশ্য ঠিক দিকে ঘোরানো হয়। অর্থাৎ চোর অথবা চোরনী ভারী আনাড়ি, বল্টু খুলতেও জানে না। ছকোণা মাথাগুলো তাই গোল হয়ে গেছে উলটো চাপের ফলে।

উলটোদিকে স্ক্রু ঘুরিয়েছিল? চোখ খুললেন বুলবুল। —আনাড়ি চোর?

আজ্ঞে হ্যাঁ। স্ক্রুড্রাইভার ছোট, সস্তা। এ কাজের উপযুক্ত নয়।

চোখ বুজলেন বুলবুল, মাকু—

তৈরি হয়েই ছিল মাকু লাহিড়ী। ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে পড়া পানের কষ তর্জনী দিয়ে মুছে নিয়ে শুধু একটা কথাই বলল সে। আর এমনই সে কথা, যে শোনামাত্র চোখ খুলে হুংকার ছাড়লেন বুলবুল, ইয়ার্কি হচ্ছে না কি?

আজ্ঞে না স্যার—রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া এইরকম হবে আন্দাজ করেই তৈরি হয়েছিল মাকু। কাঠগোঁয়ারের মতো বলল, ইয়ার্কি করব কেন? যা সত্যি, তাই বললাম।

মকু বি সিরিয়াস—মুখ লাল হয়ে গেল বুলবুলের।

আপনি ক্রস চেকিং করতে পারেন। হাতির কঙ্কাল যারা চুরি করেছে, তাদের মধ্যে একজন তরুণী ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাচ্চা হাতিটার পিঠে।

কী বললেন? ল্যাংগুয়েজ? ও-কে, বস। ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বলছি। একজন ন্যুড গার্ল হাতির পিঠে-চেপে কঙ্কালের জোড় খুলেছিল। তার বিয়ে হয়নি। কিন্তু একজন

উপপতি আছে।

অহি সে মাকু, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

কী করব স্যার। আপনিই বলেছেন ফ্যাক্টের ওপর রং চড়াতে নেই। ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট, নো অনুমান। হাতির গায়ে-গলায় মোমের ওপর স্পষ্ট বোঁটার ছাপ রয়েছে।

শাট আপ ইউ ফুল! হোয়াট ডু ইউ মিন বাই—

বৃন্ত, স্যার। ইংরেজিতে নিপল বলতে পারেন। অমন নিপল কুমারী মেয়ের ছাড়া কারও হয় না। তারপর যখন শুনলাম বেবি পাউডারের গন্ধ পাওয়া গেছে, পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্যটা। আমাদের গায়েই সস্তা সেন্ট আর বেবি পাউডারের গন্ধ পাওয়া যায়। এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলছি, স্যার। উপপতি জিনিসটা আমাদের মধ্যেই আকছার—

গেট আউট। উঠে দাঁড়াল মাকু। ও-কে, সিট ডাউন। বসে পড়ল মাকু। সীমান্ত, হোয়াট হ্যাভ ইউ গট টু সে?

পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্য সমর্থন করে আমি আমার ভাষণ রাখছি, ইউনিয়ন লিডারের ঢং-এ শুরু করল সীমান্ত। —আমি গবেষণা করে দেখেছি দাঁতের দাগ থেকেই লিঙ্গ, মুড, বয়স, সবই বলা যায়। আরও-একটু ক্লিয়ার করছি স্যার, জু-জুইভিয়ারের ওপর দাঁতের দাগটা আমার চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের পর্দাটা সরিয়ে দিয়েছে—

কাবা কাটো, সীমন্ত।

অই-অই স্যার। দাঁতের দাগটা মেয়েছেলের। কমবয়েসি মেয়েছেলে।

কী করে বুঝলে?

মানুষের চোয়াল, বুলডগের চোয়াল আর কুমিরের চোয়াল কখনও এক হতে পারে না স্যার। আপনি যদি মানুষের চোয়ালকে x ধরেন, আপনার চোয়াল হবে তা হলে y—

আমার চোয়াল! মানে?

প্রমাদ গণল সীমান্ত। বুলডগের চোয়াল y হবে বলতে গিয়ে বুলবুলের চোয়ালকে y বলে ফেলেছে উত্তেজিত মুহূর্তে। বড় অঙ্কে যারা পণ্ডিত হয়, ছোট অঙ্কে তারাই ভুল করে বেশি। সীমান্তও কথার অঙ্কে ভুল করেও সামলে নিল পর মুহূর্তেই—ওটা একটা ক্যালকুলাসের অঙ্ক, স্যার। বুঝবেন না। কিন্তু ওই যা বললাম, একটা মেয়ে হালকা মুড়ে ন্যাংটো হয়ে হাতির কঙ্কাল চুরি করেছে, এই হল আমার রিপোর্ট।

গুম হয়ে রইলেন বটব্যাল। আর চেঁচালেন না। চুইংগাম চিবুতে-চিবুতে বললেন আত্মসমাহিত ভাবে, চারজনের রিপোর্ট থেকে তা হলে সিদ্ধান্ত যা দাঁড়াচ্ছে, তা এই : পাঁচজন আগা কঙ্কাল চুরি করে নিয়ে গেছে। তাদের একজন আনাড়ি। বল্টু খুলতে জানে না। আর একজন বিবস্ত্রা এবং রুষ্টা! আর একজন—

আপনার মতো মোটা—সাত তাড়াতাড়ি বললে সীমান্ত, মেঝের মোমের ওপর এইমাত্র আপনি দাঁড়িয়েছিলেন। আপনার ওজন দু-মণ সাঁইত্রিশ সের তিন ছটাক। পাশের মোমের ছাপটাও হুবহু একই ওজনের, এক ছটাক কম। অর্থাৎ পাঁচটা মেয়ের একজন ভীষণ মোটা, আপনার সাইজের।

শাট আপ, রাস্কেল। শরীর নিয়ে কটাক্ষ একদম সইতে পারেন না বুলবুল বটব্যাল।

ঠিক এই সময়ে ঝনঝন করে বাজল টেলিফোন। ফোন করছেন ডি. সি. ট্রাফিক। বুলবুলের চিরশত্রু। কিন্তু একই কলেজের বন্ধু। শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠে অন্তরটিপুনি দিলেন ভদ্রলোক, বুলবুল নাকি? একটা খবর আছে। কাল রাত্রে দুটোর সময়ে মিউজিয়ামের সামনে একটা অ্যাম্বুলেন্সে পাঁচটা মেয়েছেলে হৈচৈ করে অনেক মালপত্র তুলেছে। তোমার ওই হাড়গোড় বোধহয় খবর পেয়েছ?

ততোধিক শ্লেষ মেশানো কণ্ঠে বললেন বুলবুল, বাসি খবরের জন্যে ধন্যবাদ। পাঁচজনের একজন যে আমার মতো মোটা সে খবর পর্যন্ত পেয়ে গেছি। আরও শুনবে? ওদের আড্ডা চৌরঙ্গী ম্যানসনের সামনে ইটের পাঁজার পাশে।

চোয়াল ঝুলে পড়ল ডি. সি. ট্রাফিকের। বেল টিপে ডেকে পাঠালেন রাতের চৌকিদারকে, খবরটা বুলবুল বটব্যালকে আগেই দেওয়ার অমার্জনীয় অপরাধে কী বেকায়দায় ফেলা যায় তাকে, সেই প্যাঁচই কষতে লাগলেন ঠোঁট কামড়ে।

শীতের রোদ লুটিয়ে পড়েছে তিনতলা বাড়ির ছাদে। পাশের মেঘ ছোঁওয়া অট্টালিকার চোদ্দোতলার জানলায় হুমড়ি খেয়ে রয়েছে একজন প্রৌঢ়া। চোখে দূরবিন। প্রৌঢ়া জাতে পার্শি। স্বামীর বয়স পাঁচ বছর কম। টাকার জোরে বিয়ে। স্বামীটি তাই মনুষ্যধর্মধারী মেষ বললেই চলে।

দূরবিন কষছে প্রৌঢ়া আর রানিং কমেন্টারি শোনাচ্ছে স্বামীরত্নকে। ঘরের মাঝখানে ইজিচেয়ারে শুয়ে রিডার্স ডাইজেস্ট পড়ছে ভদ্রলোক। চোখটা বইয়ের পাতায়, কানটা স্ত্রীর কথায়।

...কাশ্মীরি ডাব্বা পাতলা মেয়েটা। শুয়ে পড়েছে। পরনে সায়া-ব্লাউজ ছাড়া কিছু নেই। কী অসভ্য, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ছোঁড়াটাকে বুকের ওপর টেনে নিয়েছে! কী বেহায়া! ছোঁড়াটার জামা খুলে নিচ্ছে মেয়েটা! ও গড! মেয়েটাও...আর দেখা যাচ্ছে না... আবার...আবার...জনি..জনি..আমার শরীর কীরকম করছে!

পেশেন্ট লিভারের সুরে বলছে জনি, ডার্লিং, আর দেখো না। কাম হিয়ার। তোমার শরীরটা যে বড্ড খারাপ গো। আতু-আতু গলা প্রৌঢ়র।

নেভার মাইন্ড। জনি ব্র্যান্ডিটা কোথায়?

তিনতলার ছাদে আকাশ-মুখো শুয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে মস্ত ভেংচি কাটল নিতম্বিনী।

জাল গুটোনো-পর্ব

ঠিক সেই মুহূর্তে চৌরঙ্গী ম্যানসনের সামনের মাঠে বসে বিরক্ত কণ্ঠে বললে নারায়ণী, নিতু ছুঁড়ির আক্কেলটা দেখলি? ফাঁক পেলেই হাওয়া।

যা বলেছ দিদি। বলল পটলাক্ষী, অত কীসের বুঝি না। নিতুর যেন বেশি-বেশি।

তুই কী? ধোয়া তুলসীপাতা?

পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছেন উনি। টিপ্পনী কাটল নিভাননী। পাহাড়-প্রমাণ

ঘোরার অপর দিকে কানে হেডফোন লাগিয়ে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল কাকু। বেলেঘাটার অ্যাকসিডেন্টে তার একটা আঙুল ভেঙেছে। বাসুকি তাই মাসে কাটা মেশিন দিয়ে আঙুলটা কাটতে গিয়েও রেহাই দিয়েছে। কিন্তু কেন পাহারায় পঞ্চ আমার পিছনে। হাড়গুলো এই মুহূর্তে কোথায়, তা জানতেই হবে।

কিন্তু বৃথাই উৎকর্ণ হয়ে থাকা। আশপাশে হরেকরকম সরস গল্প জুড়েছে। শুনতে ভালোই লাগছে কঙ্কর। আরও শুনতে ইচ্ছে যাচ্ছে। কিন্তু কাজের কথা একটিও কানে আসছে না হাড় নিয়ে কোনও প্রসঙ্গই উত্থাপন করছে না চারজনে।

নারায়ণী হঠাৎ ইঙ্গিতে এদিক-ওদিক দেখিয়ে বললে, মাতু, আজকে এত লোক কেন রে এখানে?

অপাঙ্গে দেখে নিল মাতঙ্গিনী। ডাইনে, বাঁয়ে, পিছনে তিনজন অদ্ভুত ভিখিরি বসে রোদ পোহাচ্ছে আপন মনে।

নারায়ণী খুঁত-খুঁতে গলায় বললে, কোনওদিন তো দেখিনি। পুলিশ নাকি?

নিস্তারিণী বললে, মনে হচ্ছে।

নারায়ণী বললে, দাঁড়া, মুখে নুড়ো জ্বেলে দিচ্ছি। বোস তোরা

বলেই উঠে পড়ল মাটিতে হাতের ভর দিয়ে। মেয়ো রোডের দিকে পা বাড়াতেই একজন ভিখিরি এল পিছন-পিছন।

হাত দোলাতে-দোলাতে আর খানিকটা এগোল নারায়ণী। ভিক্ষুকবেশী পুলিশচরও আঠার মতো লেগে আছে পিছনে। মুচকি হেসে একটা চক্কর দিয়ে ফের পুরোনো জায়গায় ফিরে আসতেই তিনজনই প্রশ্ন করল একসঙ্গে, কী বুঝলে?

পুলিশ স্পাই!

পুলিশ স্পাই! খ্যাঁক করে উঠল বাসুকি নাগ।

কেঁচোর মতো কুঁচকে গেল কদ্রু নাগ, তাহলে হাঁ, পুলিশ ওদের পিছু নিয়ে ফেলেছে। এখন উপায়?

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, বিজ্ঞের মতো বলল বাসুকি। মানে, পুলিশকে দিয়ে মাগিগুলোকে মার খাওয়ানো। তা হলেই হাড়ের ঠিকানা বেরিয়ে যাবে।

হাড়গুলো কি আর বেরোবে? কাষ্ঠ হেসে বললে, কদ্রু

আলবাৎ বেরোবে। ডিনামাইট ফাটিয়ে বার করব।

পুলিশ লকআপ।

ভীষণ চেঁচামেচি চলছে। তিনটে প্যারাসুটের তিন-তিনটে শিশু তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে খিদের জ্বালায়। পটলমণি ফণী সেনের জামা মুঠো করে ঠাস-ঠাস করে চড় মেরে চলেছে দু-গালে।

তরণী লাহাকে চেয়ারে বসিয়ে মাতঙ্গিনী জেরা করছে সামনে দাঁড়িয়ে। অনর্গল কথার তুবড়ির মধ্যে একটা কথাও বলতে পারছে না তরণী। ভাষাটা মারাঠি—ফলে তরণী বিলকুল বিমূঢ়। নিস্তারিণীও মাতৃভাষায় বাপান্ত করছে মাকু লাহিড়ীর। এক বর্ণও বুঝতে পারছে না মাকু। কিন্তু মুখখানা শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছে। এক কোণে চেয়ারে বসে

এই ভীষণ হট্টগোলের মধ্যেও প্রশান্ত বদনে মাকুবাবু বসে আছে। কিন্তু মার্শাল নারায়ণী সঙ্গিনীদের প্রতাপ দেখে সে বিলক্ষণ সন্তুষ্ট। সীমান্ত শুধু ঠকঠক করে কাঁপছে। তাই নারায়ণীর সঙ্গে টক্কর না দিয়ে একটা পুরো ফিডিং বোতল হাতে কান্না থামানোর চেষ্টা করছে বাচ্চাগুলোর।

হট্টগোলের জন্যে দায়ী প্রিন্ট এক্সপার্ট মধু নাইডু। আয়াদের মাঠ থেকে এনে সে পাঁচজনেরই নিপল-প্রিন্ট নিতে গিয়েছিল ফিংগার প্রিন্ট নেওয়ার মতো, মেঝের ওপর প্রিন্টটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার তো?

আর তারই ফলে এই বিপত্তি।

হেলকানে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ছুটে এলেন বুলবুল বটব্যাল। আওয়াজ শুনে উনি ভেবেছিলেন বুঝি নকশাল বিপ্লবীরা অফিস অ্যাটাক করেছে। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই যখন দেখলেন তাঁর অতি বিখ্যাত, অতি দুর্ধর্ষ, অতি প্রচণ্ড স্পেশাল টিমের এ-হেন শোচনীয় অবস্থা, তখন কিছু না ভেবেই ছাড়লেন তাঁর বিখ্যাত বুলডগ হাঁক। মানে, একইসঙ্গে যেন কামান, বোম আর বজ্র গর্জে উঠল কণ্ঠের মধ্যে।

এ-হাঁক শুনলে কেবার পেনের অবসান ঘটে, বিনা ধাইয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু মেয়েদের কেউই ফিরে তাকাল না তাঁর দিকে। অসহায় চোখে কেবল চেয়ে রইল ফণী, মাকু, তরণী, সীমান্ত।

দু-হাতে মুঠি পাকিয়ে বুলডগের মতো চোয়াল সঞ্চালন করলেন বটব্যাল। পরক্ষণেই মনে পড়ল একটা পুরোনো টেকনিক। এবার আর একদম চেঁচালেন না। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, ব্যাপার কী?

অমনি সব চুপ। শুধু প্যানপ্যান করে চলল বাচ্চাগুলো।

এক সেকেন্ডও নষ্ট করলেন না বুলবুল। ছোট্ট কথা ছুড়ে দিলেন নারায়ণীকে লক্ষ করে, সব জেনে ফেলেছি। হাড়গুলো কোথায় বললেই ছেড়ে দেব।

নারায়ণী আরও ছোট্ট করে জবাব দিলে, জানি না।

তা হলে লকআপ থেকে ছাড়ব না

তা হলে আমরাও চেঁচাব। বাচ্চাদের ন্যাশনাল হবার জন্যে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ব। চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রিটের পাঁচশো আয়াকে জড়ো করে কেলোর কীর্তি করব। হাড় খাব, মাস খাব, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব। ডেকে এনে সেইজন্য করার জন্যে পুলিশ ডাকব।

পুলিশ! শরীরের ভূগোল কাঁপিয়ে অট্টহাসি করলেন বুলবুল।—বাছা, সাদা পোশাক পরলেও আমরাই পুলিশ। স্পেশাল পুলিশ। বুলডগ মুখখানা নারায়ণীর চ্যাপ্টা মুখের সন্নিকটে এনে আরেক দফা অট্টহাসি করলেন।

নারায়ণীর হাতের কাঁটা স্তব্ধ হল, নাসিকা কুঞ্চিত হল এবং ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে কচাং করে কামড়ে ধরল বুলবুলের খ্যাবড়া নাক।

বিকট চিৎকার, প্রকাণ্ড লাফ এবং ঠাস-ঠাস চপেটাঘাতের শব্দ। নারায়ণী যুদ্ধবিদ্যায় বিলক্ষণ বিশারদ। সে জানে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

রক্তাক্ত নাক চেপে ধরে এবং চড় খেতে-খেতে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন বুলবুল। অতিশয় মিষ্টি কণ্ঠে এবার বলল স্থূলকায়া নারায়ণী, মনে থাকবে

কে? মা শিখিয়ে দিয়েছিল, চুমু খেতে এলেই মিনসেদের নাক কামড়ে দিবি। কেমন দিয়েছি?

তবে রে! নারায়ণীর চুলের মুঠি ধরতে গেলেন বুলবুল।

কিন্তু কোথায় নারায়ণী? চক্ষের পলক ফেলবার আগেই সরে গেছে নাগালের বাইরে এবং একইসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে পাঁচ-পাঁচটা নারীকণ্ঠ, ঠিক যেন বৈদিতি অর্গান বাজছে ছোট্ট ঘরের মধ্যে—পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ! সেইসঙ্গে পোঁ ধরেছে বাচ্চাদের সানাই।

জীবনে এরকম পরিস্থিতিতে পড়েননি বুলবুল। ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে রোলকল করলেন বিষম ভীষণ বিকট কণ্ঠে—ফণী! মাকু! তরণী! সীমান্ত!

ইয়েস স্যার! ইয়েস স্যার! ইয়েস স্যার! ইয়েস স্যার!

বিদেয় করো! বিদেয় করো! বিদেয় করো! বিদেয় করো! বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো।

গাড়ি তো নেই, স্যার।

বাঁ-হাতে নাক খামচে ধরে ডানহাত পকেটে পুরলেন বুলবুল এবং দুখানা দশ টাকার নোট উড়িয়ে দিলেন হাওয়ায়, নেবোও ট্যাক্সি।

রামকিঙ্কর! হাঁক পাড়ল ফণী।

বায়ুবেগে খাঁদা রামকিঙ্কর আবির্ভূত হল দোরগোড়ায়। মুখখানা তার অতি কদাকার। এককালে নাকটা টিকলো ছিল। কিন্তু ক্রমাগত বক্সিংয়ের মার খেতে-খেতে নাকটা চ্যাপ্টা হয়ে মুখের আধখানা জুড়ে বসেছে। নারী বিক্ষোভ আর ছাত্র বিক্ষোভ ঠেকাতে রামকিঙ্করের জুড়ি নেই। মুখ দেখেই নাকি পিঠটান দেয় ছেলেমেয়েরা।

রামকিঙ্কর! মেয়েগুলোকে রাস্তায় বার করে দাও।

মাতঙ্গিনীর হাত ধরল রামকিঙ্কর, সঙ্গে-সঙ্গে ফুঁসে উঠল নারায়ণী, খবরদার।

মাতঙ্গিনী কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নিল না। চড় পর্যন্ত মারল না। বিহ্বলভাবে চেয়ে থেকে বলল গদগদ কণ্ঠে, না-না দিদি, ওকে কিছু বোলো না।

কেন রে? অত আহ্লাদ কীসের? ভুরু কুঁচকালো নারায়ণী।

বলছি।

ঘোর কাটতে অনেকক্ষণ লাগল মাতঙ্গিনীর। তারপর বাহ্যে হয়ে যা বলল, তা সত্যিই রোমাঞ্চকর। এই প্রথম পুরুষ মানুষের পরশ পেয়েও অ্যাঁচ-অ্যালার্জিতে ভোগেনি মাতঙ্গিনী এবং রামকিঙ্করই সেই পুরুষ।

বেচারা! সব শুনে মন্তব্য করল নিতম্বিনী।

ছুটতে-ছুটতে নিজের ঘরে ফিরে এলেন বুলবুল। নতুন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা টেনে এনে রাখলেন ঘরের মাঝখানে। পিছিয়ে গিয়ে যন্ত্রণা-আবিল চোখ দিয়ে মাপলেন দূরত্ব এবং দৌড়ে এসেই প্রচণ্ড কিক মারলেন বাস্কেটের মধ্যপ্রদেশে...

শুধু একটা জিনিস ওঁর জানা ছিল না। নাকের যন্ত্রণায় অতটা খেয়ালও করেননি। নিরানব্বইটা বাস্কেট চুরমার হওয়ার পর তিতিবিরক্ত হয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শততম বাস্কেটটাকে বেশ মজবুত করে বানিয়েছিলেন। যাতে শত পদাঘাতেও চূর্ণ না হয়। লোহার বাস্কেট তো...।

তাই অমন একখানা পদাঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রণায় প্রায় কেঁদে ফেললেন বুলবুল। কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার বড় সাংঘাতিক জিনিস। গোড়ালিতে হাড় বলে আর কিছু আছে বলে মনে হল না।

বুলবুল বটব্যাল যখন হাসপাতালে পায়ে প্লাস্টার বেঁধে শয্যাশায়ী, ঠিক তখনি উল্টোডাঙ্গার রেললাইনের পাশে গত দাঙ্গায় আগুন লাগানো পোড়া, পরিত্যক্ত এবং বিগ্রহহীন মন্দিরে গুটি গুটি প্রবেশ করল দুজন আধুনিক দার্শনিক। দুজনেরই মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। দুজনেই ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ ফেস্টিভ্যালে ঘুরে এসেছে। দুজনেরই বিশ্বাস, তাদের প্রতিভার উপযুক্ত মাঠ এই পোড়া দেশে নেই। তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে শখের পথ পরিক্রমাকে বেছে নিয়েছে।

এদের একজন কবি। আধুনিক। নিবাস বালিগঞ্জে। লিকলিকে চেহারা। তার সারাদিনের কাজ হল পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পর্যায়ক্রমে হাত পাতা। সিগারেট, সিদ্ধি, আধুলি চেয়ে-চিন্তে নিয়ে বাকি সময়টা মাঠে-ঘাটে বসে কাব্যচর্চা করা। ম্যাকমিলান নাকি একখানা কাব্যগ্রন্থ প্রায় নিয়েই ফেলেছে। কিন্তু দশ বছরেও প্রেসে দিতে পারছে না নানান ঝঞ্ঝাটে

হেনকালে কবিবরের সঙ্গে দেখা হল বেঁটে বক্কেশ্বর ইঞ্জিনিয়ারের। যাদবপুর থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার। নিবাস মুচিপাড়ায়। মাথার মধ্যে পলিটিক্সের পোকা ঢোকার পর থেকেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে রাস্তায়। হেড অফিসে গণ্ডগোল তো। তাই চেয়ে-চিন্তে খায়দায়, বিড়ি ফোঁকে, বাকি সময়টা দেওয়ালে সাঁটা খবরের কাগজ পড়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শোনায় ইয়ংম্যানদের। বক্তৃতা শুনলে কিন্তু বোঝা যায় না হেড অফিসে গোলমাল আছে।

দুই মূর্তিমানে বিনা যুদ্ধেই সন্ধি হয়ে গেল প্রথম দর্শনেই। একজন কবি, আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু জীবনদর্শন এক। দর্শনটা সারকথায় হল, হট্টমন্দিরে শোওয়া এবং চেয়ে-চিন্তে খাওয়া। আরও সার কথায় পরমহংস হওয়া। নির্বিকার, নির্লিপ্ত, নির্বিকল্প।

দুই দার্শনিক ভোরবেলা উঠেই ভাঁড়ের চা ভাগাভাগি করে খেয়েছে। তারপর দেওয়ালের দৈনিক পড়ে দেশের বর্তমান হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে-না-হতেই প্রাকৃতিক বেগ চাপায় ভাঙা মন্দিরটিতে প্রবেশ করেছে

কী নেই পোড়া দেউলের ভেতরে? পরিত্যক্ত গৃহ থাকলেই গরু মোষ ছাগল এমনকী মানুষ পর্যন্ত প্রাতঃক্রিয়া সেরে যায় নিরিবিলিতে। এ শহরের দস্তুরই তাই। আগেই বলেছি, দুই দার্শনিকেরও সেরকম একটা গোপন অভিপ্রায় ছিল। গোময় এবং প্রায়-শিলীভূত মনুষ্য বিষ্ঠা দেখে শরীরটা পুলকিতও হয়েছিল। কিন্তু ঘোর সন্দেহ হল কোণের অন্ধকারে স্তূপীকৃত বস্তুগুলো দেখে।

চোরাই মাল নাকি? স্মাগলার আর ওয়াগন ব্রেকারদের গোপন গুদাম? কৌতূহল সামলাতে পারল না বেঁটে ইঞ্জিনিয়ার। মুখ খুলল একটা বস্তার এবং...খবরের কাগজের শিরোনামটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। পরমহংস হলেও ইঞ্জিনিয়ারের চোখকে ফাঁকি

দেওয়া এত সহজ নয়। হাতির হাড় নিঃসন্দেহে।

কবিবরের বিষয়-বুদ্ধি জাগ্রত হল নেহাতই অকস্মাৎ। সহসা মনে পড়ল পুরস্কারের অঙ্কটা। দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ। খবরটা নিকটস্থ থানায় পৌঁছে দিলেই টাকাটা চলে আসবে।

ফলে চোখ গোল-গোল হয়ে উঠল সর্বত্যাগী দুই দার্শনিকের। সত্যিই অপার মহিমা এই সিলভার টনিকের। কবিবরের চোখে ঘনিয়ে এল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। ধাপ্পাবাজ ম্যাকমিলান থেকে কাব্যগ্রন্থটা এনে নিজেই ছেপে ছেড়ে দেবে বাজারে। ইঞ্জিনিয়ারের মানসপটে ভেসে উঠল ইউটোপিয়া মানে রামরাজ্য সৃষ্টির স্বপ্ন।

মাথায় উঠল প্রাতঃক্রিয়া। গুজুর গুজুর ফুসুর-ফুসুর শলাপরামর্শ করে ইঞ্জিনিয়ার রওনা হল পুলিশ ফাঁড়ি, অহিভূষণের পাহারায় রইল কবিবর।

শয্যাশায়ী বুলডগ খবর শুনেই উঠে বসলেন এবং পরমুহূর্তেই বিষম যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সীমান্ত দত্ত আহা আহা করে বললে, আপনি শুয়ে-শুয়েই শুনুন স্যার। লোকটা মা কালীর দিব্যি করে বলছে, চোরাই কঙ্কালের আস্তানায় এখুনি নিয়ে যাবে।

সিংহ গর্জন (সিংহ+ষাঁড়) করলেন বুলবুল, আমিও যাব।

আপনি?

হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমি হ্রাইটার্স হেঁটে মরব, লেপোর মারবে বই ওটি হতে দেব না পুরো অপারেশনটা আমার।

কিন্তু আপনার পা...

ড্যাম ইওর পা! নার্স-নার্স, হুইল চেয়ার আনো। আমি বেরোব। আরে রাখো ডাক্তার...আমার পা আমি বুঝব।

নারায়ণী বললে, সময় হয়েছে। সব তৈরি...

তৈরি। বুক চিতিয়ে নারায়ণী সৈন্ত দাঁড়াল সামনে।

বাচ্চারা?

গাড়ির মধ্যে।

চট? গুনছুঁচ? পাটের দড়ি? খড়? প্যাকিং কেস? আলকাতরা? বুরুশ?

গাড়ির মধ্যে।

যাও, চট নিয়ে ফের মুড়ে সেলাই করবি। নিত্য, প্যাকিং কেসে খড় দিয়ে ঠাসবি। পটল, পেরেক দিয়ে প্যাকিং কেসের ডালা আটকাবি। নিত্য, আলকাতরা দিয়ে বাক্সের গায়ে লিখবি—টু দি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া। রেল পার্সেল বুকিং করব আমি। তারপর দেখি হাড়ের ভেতর থেকে কী জিনিস উদ্ধার করেন প্রধানমন্ত্রী।

তা হলে উঠে পড়ি?

উঠে পড়ো।

ঝপাঝপ নার্সবেশী আজ্ঞাবাহিনী উঠে পড়ল ভ্যানের মধ্যে। নিতম্বিনী কোলের ওপর ড্রাইভিং বুক বিছিয়ে ধরল স্টিয়ারিং হুইল। ভোঁ করে বেরিয়ে গেল প্রকাণ্ড গাড়িটা।

দেখা গেল, গাড়ির গায়ে লেখা একটা বিস্কুট কোম্পানির নাম।

খবর পেয়েই বাসুকি লাফিয়ে উঠল ড্রাইভারের আসনের পাশে। নাকের মাছি তাড়িয়ে এবং ঘাড় ঝটকান দিয়ে শুধোল কদ্রুকে, সাবমেশিন গান, স্টেন-গ্রোয়ার, হাতবোমা আর ধোঁয়া-বোমা নেওয়া হয়েছে?

ইয়েস স্যার।

শোনো আর যেন মাগিগুলো না পালায়। যে ভাবেই হোক ওদের পিণ্ডি চটকাব আজ। কদ্রু—

স্যার?

যদি ওরা আবার পালায়, স্পেশাল কাট বানিয়ে ছাড়ব তোমায়। বুঝেছ?

ইয়েস স্যার। বলেই ঘ্যাচাং করে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল কদ্রু।

দড়াম করে মাথার পিছনটা ঠুকে গেল বাসুকির। পরক্ষণেই ব্রেক চাপল আচমকা। ধাঁই করে মাথা ঠুকল কি-বোর্ডে। দেখতে-দেখতে কালসিটে পড়ে গেল বাসুকির কপালে।

আড়চোখে দেখে নিয়ে বলল কদ্রু—লাগল?

ইউ পিগ!

জবাব দিল না কদ্রু। ফুল স্পিডে বেরিয়ে গেল সামনের দিকে। দেখা গেল গাড়ির গায়ে লেখা রয়েছে একটা ব্যাটারি কোম্পানির নাম।

শ্যামবাজারেই বিস্কুট কোম্পানির ভ্যানের নাগাল ধরে ফেলল ব্যাটারি কোম্পানির ভ্যান। লেভেল ক্রসিংয়ের ওপর দিয়ে তুরুক নাচ নাচতে-নাচতে ছুটল নাগেদের গাড়ি।

বাসুকি তার মধ্যেই বললে, আস্তে-আস্তে! খ-ব-র-দা-র! সা-ম-নে-র ভ্যান যে-ন চো-খে-র বা-ই-রে-না-যা-য়।

আবার মোক্ষম ব্রেক কষল কদ্রু। আবার বাসুকির কপাল ঠুকল দড়াম করে এবং ফুলে উঠল দশ সেকেন্ডেই। আবার নির্বিকার কণ্ঠে শুধাল কদ্রু, লাগল?

ইউ পিগ!

ভাঙা মন্দিরের সামনেই ডালিম গাছ। বিস্কুট কোম্পানির ভ্যান দাঁড়িয়ে পড়ল তার তলায়। জায়গাটা স্মাগলার আর ওয়াগন ব্রেকারদের স্বর্গরাজ্য। ওদিকে রেললাইন। তবুও জনসমাগম নেই। মন্দির মধ্যস্থ বিষ্ঠাস্তূপের নারকীয় দুর্গন্ধে রাস্তার কুকুর পর্যন্ত দিনমানে কাছে ঘেঁষতে চায় না। বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে নাকি? নারায়ণীর প্রশ্ন।

হ্যাঁ। ঝাঁকুনি আর দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি যাই আগে। তোরা আসবি পরে।

হেলতে-দুলতে শুভ্রবসনা মেট্রনবেশী নারায়ণী অন্তর্হিত হল বিষ্ঠা-মন্দিরে। ক্ষণ পরেই শোনা গেল ভয়ার্ত চিৎকার। বিকট গলায় কে যেন ককিয়ে উঠল। পরক্ষণেই উল্কাবেগে মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বিচিত্র মূর্তি। মুখভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। কবিবরের দিবানিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে বিষম যন্ত্রণার মধ্যে এবং চোখের সামনে নারায়ণীর ঢাকা-মুখের স্কু-চেহ দেখেই...

মিচকি-মিচকি হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এল নারায়ণী। কিন্তু মার্শালের মুখে হাসি জিনিসটা সচরাচর দেখা যায় না। তাই উৎসুক কণ্ঠে সুধোল নিতম্বিনী, দিদি, লোকটা অত চেঁচিয়ে উঠল কেন? কী করেছ ওকে?

যুযুৎসু ঝেড়েছি!

কিন্তু কী ধরনের যুযুৎসু, তা আর ভাঙল না নারায়ণী।

ব্যাটারি কোম্পানির গাড়িটা ভি.আই.পি. রোড ছেড়ে উঠে এসে দাঁড়াল মাটির গাদার আড়ালে।

তিমি কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে উৎকট গম্ভীর গলায় বললে বাসুকি, বন্ধুগণ, এই আমাদের শেষ খেলা। হাড়গুলো লুঠ করার পর ভ্যানে চাপিয়ে যাব মারহাট্টা ডিচের পাড়ে। আমি রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে বলে দিচ্ছি, এখুনি যেন একটা সাবমেরিন গঙ্গায় ঢুকে বাগবাজার খালের মধ্যে দিয়ে এদিকে চলে আসে। ইন্ডিয়ার ফাঁকিবাজ নেভি এখনও নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়। ওরা জানতেও পারবে না নাকের ডগা দিয়ে হড়্‌পাচার হয়ে যাচ্ছে নাগলোকে—সেইসঙ্গে আমরাও।

ঢোক গিলে বলল কক্র, কিন্তু স্যার, আসবার সময়ে আপনি যে প্ল্যানটার কথা বলছিলেন, সেটার কী হবে?

কী প্ল্যান? মনে পড়ছে না তো—

বলছিলেন যে, ইন্ডিয়ান নেভি যত ফাঁকিবাজই হোক না কেন, খালের এত কম জলে সাবমেরিন ঢুকতে পারবে না কিছুতেই। তাই রাত না-হওয়া পর্যন্ত আমরা যেন তক্কে-তক্কে থাকি। তারপর মেয়েগুলোর মুখ বেঁধে ফেলে রেখে হাড়গুলো ভ্যানে চাপিয়ে পালিয়ে যাব ক্যেজারগঞ্জের দিকে। সাবমেরিনে চাপব ওইখানেই—সবার চোখের আড়ালে।

বলেছিলাম নাকি? নিশ্চয় বলেছিলাম। এখন খাসা প্ল্যান এ-ব্রেন ছাড়া তোমার গুয়োর ব্রেনে নিশ্চয় আসেনি। ঠিক আছে। আগের প্ল্যানমাফিক বসে থাকো সবাই গাড়ির মধ্যে।

আর্মড পুলিশ ঘিরে ধরল গোটা মন্দিরটাকে বেশ কিছুদূর থেকে। তখন সবে সন্ধে নামছে। খান দশেক কালো রেডিও-ভ্যান কালান্তক যমের মতো ওৎ পেতে আছে মন্দির লক্ষ করে।

একটা ভ্যানের পিছনে কাঠের পাটাতন ঢালু করে লাগিয়ে দিল কনস্টেবলরা। গড়গড়িয়ে নেমে এল ক্রোম হুইলচেয়ার। তাতে বুক চিতিয়ে বসে বুলবুল বটব্যাল—বনের বাঘের মতো মুখমুখে চেহারা।

চাঙা কবিরকে দেখা গেল ঠিক তখনি। পাঁই-পাঁই করে বেরিয়ে এল ইটের গাদার আড়াল থেকে, নক্ষত্রবেগে ছুটল বড় রাস্তার দিকে।

কিন্তু রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল খাঁটি ইঞ্জিনিয়ার, এ কী কবির? পালাচ্ছ কেন?

চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল কবিরের। সেই অবস্থাতেই বললে দম আটকানো গলায়, হিড়িম্বা! হিড়িম্বা! নার্সের ড্রেস পরে হিড়িম্বা! তারপর দুরন্ত পাখার ব্লেডের মতো লিকলিকে পায়ে ছোটার বেগে অদৃশ্য।

বুলবুল বটব্যাল লোডেড রিভলভারটা বার করে রাখলেন কোলের ওপর। অন্ধকারেও বনবকরাশ চোখে দেখে নিলেন কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। কালো রেডিও-ভ্যানগুলো অন্ধকারে মিশে গেছে। চতুর্দিক থেকে গিরগিটির মতো সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এগিয়ে চলেছে বুকে হেঁটে।

চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। আচম্বিতে নারীকণ্ঠে তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল মন্দিরের ভেতর থেকে। ওরে রে মিনসে!

সঙ্গে-সঙ্গে আঁউ-আঁউ করে বিকট চেঁচিয়ে উঠল একটা পুরুষকণ্ঠ। সেইসঙ্গে বিদেশি খিস্তি। বায়ুবেগে বাইরে ছুটে এল কয়েকটা মূর্তি।

লাইট! বিশাল হুঙ্কার হাঁক ছাড়লেন বটব্যাল।

দপ-দপ করে জ্বলে উঠল দশটা রেডিও-ভ্যানের মাথায় দশটা সার্চলাইট। দশ-দশটা মিনি সূর্য যেন। নিমেষ মধ্যে দিন হয়ে গেল মন্দির এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। আলোক বন্যায় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও খর্বকায় মূর্তিগুলো হেঁট হয়ে খরগোশের মতো দৌড়াল মাটির ঢিলা লক্ষ করে।

চকিতে সব কিছুই দেখা হয়ে গেল বুলবুল বটব্যালের। পাঁচজনই বিদেশি। সবার পিছনে নাক চেপে যে দৌড়চ্ছে, তার বয়স একটু বেশি।

হেনকালে আস্ত একটা হাতির হাড় হাতে বেরিয়ে এল অসুরদলনী নারায়ণী। বাসুকির নাক কামড়ে নিয়েও তার রাগ মেটেনি।

বুলডগ বটব্যাল শিউরে উঠলেন সেই দৃশ্য দেখে। প্লাস্টার-ঢাকা নাকের ডগায়।

হাত বুলিয়ে পরক্ষণেই ছাড়লেন দু-নম্বর বজ্রনাদ—ফায়ার!

আচম্বিতে কালিপটকার গুদোমে আগুন লাগল যেন। দুম-দাম গুলিবর্ষণ বন্ধ হলে ধোঁয়া আর ধুলোর মধ্যে দিয়ে দেখা গেল, বিদেশি কজন পুতুলের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

আগেই শিখিয়ে রেখেছিলেন বুলবুল—বুলেটের ধারাবর্ষণে শুধু পায়ের সামনে ধুলোই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, গায়ে টিপ করা হয়নি।

রাজভবন। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে চায়ের আসরে নারায়ণী আয়া সমিতির পাঁচজনের গলায় 'উত্তম জীবন রক্ষা' পদক ঝুলিয়ে দিলেন রাজ্যপাল—৭৫ কোটি জীবন রক্ষার জন্যে। মেয়েদের এত সাহস সচরাচর দেখা যায় না। সোনার মেডেল পেলেন বুলবুল বটব্যাল, দক্ষ পুলিশ অফিসারের স্বীকৃতি হিসেবে। এর পরেই পাবেন প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেল এবং আই.পি.এস. সম্মান।

হাততালির চটপটি থামতেই নারায়ণী বললে, আসল মালটা কোথায়? হাতির হাড়ের মধ্যে সেই জিনিসটা পাওয়া গেছে তো?

না, পাশ থেকে জবাব দিলেন বুলবুল।

তা হলে কি দোরজি মিথ্যে বলেছিল?

মোটেই না, বুলডগ মুখে যদ্দুর সম্ভব মধুর হাসি হেসে বললেন বুলবুল, দোরজী বলেছিল মিউজিয়ামের সবচেয়ে বড় হাতির কঙ্কালের মধ্যে দেখতে। যেহেতু দোতলায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, তোমরা লুঠ করলে দোতলায় হাতির কঙ্কালটাকে।

সবচেয়ে বড় হাতি তো সেই ঘরেই।

আরে না মিউজিয়ামের সবচেয়ে বড় হাতির হাড় দেখে দেবতারা যা বুঝিয়েছিলেন, সে জিনিস দোতলায় নেই। একতলায়। ভূতত্ত্ব বিভাগে ঢুকতেই প্রাগৈতিহাসিক ম্যামথ হাতির করোটির হাঁচটা মনে পড়ছে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ।

ডিবেটা ছিল সেই করোটিরই ওপর ফোকরে। বুঝলে?

বলে নারায়ণীর মুখের সন্নিকটে মুখ এনে পান খাওয়া দাঁত বার করে হাসলেন বুলবুল। অমনি নারায়ণীর চাহনি নিবদ্ধ হল তার দাঁতের নাগবসানো নাকের ডগায়। বিদ্যুৎবেগে নাক সরিয়ে নিলেন বুলবুল বটব্যাল।

নাগলোক চক্রান্ত শেষ-পর্ব

নাগলোকের প্রেসিডেন্ট লিখছেন—সায়ান্স ইন্সটিটিউটের জিওফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তাকে লম্ফন অস্ত্রটার একটু রদবদল করব ঠিক করেছি। একজন ইম্পিরিয়ালিস্ট গুর্খা, পাঁচজন অয়া আর ইন্ডিয়ার একজন পুলিশ অফিসারের নষ্টামিতে ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছে আমার অত সাধের লম্ফন অস্ত্র।

কিন্তু এত সহজে ছাড়ছি না আমি লম্ফন-অস্ত্রই ফের প্রয়োগ করব—তবে নিচের দিকে। মানে, ছ'ফুট উঁচু মঞ্চ থেকে না লাফিয়ে মাটি থেকে লাফিয়ে পড়ব সাগরের জলে। পঁচাত্তর কোটি নাগলোকবাসী একযোগে প্রশান্ত মহাসাগরে লাফিয়ে পড়লে জল উথলে উঠবে, দ্বীপময় দেশগুলো ডুবে যাবে, সাম্রাজ্যবাদীরা নাকানিচোবানি খাবে। পৃথিবী আমাদের মুঠোয় আসবে। আপনি শুধু হিসেব করে বলুন—কবে কখন, কোন সেকেন্ডে জোয়ারের জল সবচাইতে বেশি ঠেলে ওঠে। ঠিক তখনি আমি পঁচাত্তর কোটি নাগলোকবাসীকে হুকুম করব প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ঝাঁপ দিতে...

মোমের হাত

প্রথম পরিচ্ছেদ : সিপারস্কোপ

পাহাড়ে ঘেরা আশ্চর্য সেই উপত্যকায় যেতে হলে আকাশ পথে যাওয়াই শ্রেয়। মেঘের আড়াল থেকে চোখে পড়বে চারদিকে বরফের মুকুট-পরা উন্নত পর্বতশীর্ষ। পাহাড়ের কোলে পাইনের অরণ্য। উইলো আর আখরোট গাছের সমারোহ। তারপর সমতল উপত্যকা। মাঝখান দিয়ে বইছে খরস্রোতা পাহাড়ি নদী। অজস্র পপলার ছিমছাম তন্বী দেহ নিয়ে দুলছে মৃদু সমীরণে। সাদা পানকি ফুলের থোকায়, হলুদ ফুল আর রক্তপলাশের মতো টুকটুকে রাঙা পাহাড়ি ফুলের দৌরাত্ম্যে সে এক বিচিত্র রঙের খেলা বরফ-ঘেরা সেই সমতল ভূমিতে।

বাসরুটও আছে। পাঠানকোট থেকে সিধে রাস্তায় যাওয়ার পর শুরু হবে পাকদণ্ডী। কঠিন পাহাড়ের বুক খুঁড়ে সুদীর্ঘ টানেল। কোথাও ডিনামাইট ফাটিয়ে পাহাড় উড়িয়ে সঙ্কীর্ণ পথ। এক মিনিটও দিয়ে চলার উপায় নেই। মুহূর্তে-মুহূর্তে বাঁক নেওয়া আর দুলে-দুলে ওপরে ওঠা আর নিচে নামা। কোথাও বুনো ক্যাকটাসের জঙ্গল, কোথাও ফণিমনসার অরণ্য, কোথাও পাইন, উইলোর মধ্যে কুয়াশা আর মেঘের আনাগোনা। বিপদসঙ্কুল পথে চোখে পড়বে কর্মব্যস্ত সৈনিকপুরুষদের। নতুন-নতুন রাস্তা বানাচ্ছে তারা। ঘনঘন যাতায়াত করছে মিলিটারি কনভয়।

ভয়ানক অথচ সুন্দর এই পথ পরিক্রমার পর নয়নাভিরাম সেই উপত্যকার প্রবেশপথেই ঝুলন্ত একটা সেতুর দু-মুখে দাঁড়িয়ে সঙিনধারী সান্ত্রি। নিষিদ্ধ এই উপত্যকায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিবির পড়েছে উপত্যকায়। সেতুর মুখে তাই এত কড়া পাহারা।

উপত্যকা তো নয়, যেন স্বর্গোদ্যান! বাতাস সেখানে স্নিগ্ধ, পাখির গান সেখানে সুরেলা। বাংলাদেশ থেকে অনেক—অনেক দূরের তুষার-কন্যা বেষ্টিত আশ্চর্য সুন্দর সেই নন্দনকাননকে কেন্দ্র করেই নিবিড় হয়ে উঠেছিল এক প্রেতরহস্য। পাতলা ফিনফিনে একটা মোমের হাত। অশরীরীর মোমের হাত।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি গবেষণা ব্যর্থ হতে বসল [illegible] আবির্ভাবে, রহস্যময় মোমের হাতের ক্রিয়াকলাপে। সারা ভারতের ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্ভর করছিল অত্যন্ত গোপনীয় সেই গবেষণার ওপর। ফলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী চিন্তিত হলেন। হালে পানি পেল না কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদপ্তর এবং আর্মি ইনটেলিজেন্স। শেষকালে টনক নড়ল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর।

বাংলার প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্রর ডাক পড়ল তখনি।

বিচিত্র এই কাহিনিরও শুরু তখন থেকেই, ভূস্বর্গ এই উপত্যকাকেই কেন্দ্র করে।

তারপর?

তারপর, ইন্দ্রনাথ রুদ্রের জীবন-বসন্তের স্বপ্ন, কস্তুরী মতো গোপন বেদনা, মুকুলিত

যৌবনের আশা আর ভরা হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস দিয়ে গড়া তিলোত্তমা মানস-প্রেয়সী রূপ নিয়েছিল অন্ধকারের ভেতর থেকে, অধরস্পর্শে উন্মাদ করেছিল ইন্দ্রনাথকে, কিন্তু তবুও ধরা দেয়নি আলিঙ্গনে—অন্ধকারে গড়া প্রেয়সী মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে...সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেছে সমস্ত রহস্য। পঞ্চমবাহিনীর শক্তিশালী চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছেই...

গোড়া থেকেই শুরু করা যাক রোমাঞ্চকর সেই কাহিনি।

মেঘের কোল দিয়ে উড়ছিল হেলিকপ্টারটা।

মিলিটারি হেলিকপ্টার। পাঠানকোটের সামরিক এয়ারপোর্ট থেকে উঠেছে আকাশে। পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে উড়ে চলেছে নিষিদ্ধ সেই অঞ্চলে, যেখানে আকাশ সুন্দর, পাহাড় সুন্দর, অরণ্য সুন্দর, সুন্দর সবকিছু।

চালকের পাশে বসে একজন মাত্র আরোহী। গৌরবর্ণ সুদীর্ঘ তনু। স্বপ্নালু চোখ। সরু গোঁফ। কটসউলের মোলায়েম পাঞ্জাবির ওপর আলগোছে এলিয়ে দামি কাশ্মীরি শাল।

কবিজনোচিত চেহারা আকর্ষণবিস্তারী। কিন্তু পাঠক নিশ্চয় চিনেছেন তাকে। আকৃতি কোমল হলেও প্রকৃতি যার বজ্রকঠিন, যার ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তিতে সারা ভারত উদ্ভাসিত, এ সেই বিখ্যাত পুরুষ, প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

একাই বেরিয়েছে ইন্দ্রনাথ। মহিষাদলের রাজবাড়িতে ফিরে আংটি সমেত কড়ে আঙুল আবিষ্কারের পর, যে বিস্ময়কর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তার সমাধান করার পর হাতে কোনও কাজ ছিল না। বন্ধুবর মৃগাঙ্ক রায় সপত্নী গেছে দার্জিলিংয়ের হিমেল হাওয়া সেবন করতে। ঠিক এই সময়ে বিশেষ ডাকবার্তা এল রহস্য-উপত্যকা থেকে।

তক্ষুনি যাত্রা করতে পারেনি ইন্দ্রনাথ। টেলিগ্রাম এবং তার পরে পাওয়া কয়েকটি চিঠিরও মর্মার্থ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও বেশ কটা দিন বিভিন্ন প্রেতচক্রে যোগদান করেছে। সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিতে আনাগোনা করেছে। প্রেততত্ত্ববিদদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়েছে। শুধু নাওয়া-খাওয়ার সময় ছাড়া দিবারাত্র অশরীরী-রহস্য নিয়ে পড়াশুনা করেছে। আত্মার অবিনশ্বরতা নিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গবেষণা করেছে। এমনকী বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ানের শাগরেদিও করেছে।

তারপর পাড়ি জমিয়েছে হিম উপত্যকার পথে।

ভৌতিক ব্যাপারে মাথা গলাতে চায়নি। অথচ কর্তব্য আর কৌতূহলের তাড়নায় মাথা না ঘামিয়েও পারেনি।

বিকট গর্জন করে বেগে উড়ে চলেছে হেলিকপ্টার। নিচে দেখা যাচ্ছে সবুজ পাহাড় আর সাপের মতো আঁকাবাঁকা পাকদণ্ডী। ভোরের সূর্য তখনও প্রখর হয়নি। সোনালি কিরণে আরও অপরূপ দেখাচ্ছে নিচের পাহাড়ি ঝর্নার রুপোলি রূপ।

নড়েচড়ে বসল ইন্দ্রনাথ। রুমাল বার করে মুখ মুছে নিলে। ঠান্ডা হাওয়ায় শিরশির করছে কষদাঁতটা। আবার না ভোগান্তি শুরু হয়। সন্তর্পণে জিভের ডগা বুলিয়ে নিলে নিচের সারির বাঁ-দিকের একদম পিছনের কষদাঁতটার ওপর। আসবার আগেই ডেন্টিস্টকে দিয়ে সাময়িকভাবে ফিলিং করে এনেছে দাঁতটা। পোকায় খাওয়া দাঁত। ফেলে দিলেই আপদ চুকে যায়। কিন্তু ডক্টর মুখার্জির দয়ামায়ার শরীর। তাই অসীম ধৈর্য সহকারে দীর্ঘদিন ধরে দাঁতটাকে যথাস্থানে বসিয়ে রেখেছেন।

ইন্দ্রনাথের অবস্থা এদিকে সঙ্গিন। দাঁত তো নয়, যেন একটা তাজা বোমা—যে-কোনও মুহূর্তে ফাটবে আর কাঁদিয়ে ছাড়বে তাকে, দাঁত থাকতে যে দাঁতের মর্যাদা দেখেনি।

ডক্টর মুখার্জি শোনেননি। বলেছেন, 'কিস্সু হবে না। যদিও বা কিছু হয় তো পাঠানকোটে ডক্টর মালহোত্রার শরণ নেবেন। দু-মিনিটে ঠিক হয়ে যাবে। মালহোত্রা আমার বন্ধু। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

দু-পায়ের ফাঁকে রাখা ব্রিফকেসটায় হাত বুলিয়ে নেয় ইন্দ্রনাথ। ডক্টর মালহোত্রার ঠিকানা সযত্নে সে রেখে দিয়েছে কেসের মধ্যে। ঠিকানা তো নয়, যেন কামাখ্যা দেবীর মন্ত্রপূত তাবিজ। কষদাঁতের অসহযোগিতা শুরু হলেই ছুটতে হবে ডেন্টিস্টের কাছে। দাঁতের যন্ত্রণা যে কী জিনিস, তা যে ভুগেছে সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। বার দুয়েক এমনি যন্ত্রণায় সারারাত ছটফট করেছে ইন্দ্রনাথ। উঃ, সে কী কষ্ট। তাই এই নিয়ে অষ্টমবারের মতো ব্রিফকেস খুলে চিঠিখানা বার করে আর-একবার পড়ে নিলে ইন্দ্রনাথ। যেন দাঁতব্যথার মহৌষধ সেই চিঠি। চিঠি পড়তেই শিরশিরানি অনেকটা কমে আসে।

দন্ত-মহৌষধি শেষ হলে খোলে আর-একটি চিঠি।

চিঠির প্রতিটি ছত্রে আতঙ্ক, শিহরণ ও রহস্য। বহুবার পড়েছে ইন্দ্রনাথ। প্রতিবারেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছে পত্রলেখকের মূর্তি। সৌম্যকান্তি প্রৌঢ়। চওড়া চোয়াল। একমাত্র চোয়ালের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায় মানুষটির চরিত্রের অপরিসীম দৃঢ়তা। মাথার চুল ধবধবে সাদা। পড়তে-পড়তেই মনের চোখে দেখেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র দুই চোখে নিঃসীম উদ্বেগ নিয়ে দ্রুত চিঠি লিখছেন ডক্টর চন্দ্রচূড় মহলানবীশ—ভাষাতত্ত্ববিদ্ হিসেবে যিনি শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও প্রতিষ্ঠিত।

চিঠিখানা এই রকম ঃ

প্রিয় ইন্দ্রনাথ,

তোমার বন্ধু মৃগাঙ্ক রায়ের কলমের দৌলতে আর খবরের কাগজের কৃপায় ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্রের কীর্তিকলাপের খবর আমি রাখি। কলেজ-জীবনে ইউনিয়নের পাণ্ডাগিরি করার সময় অবশ্য উত্তরকালের ইন্ডিয়ান-শার্লক হোমস্ হওয়ার মতো কোনও প্রতিভা তুমি দেখাতে পারোনি।

আজ যে সমস্যা নিয়ে তোমার দ্বারস্থ হচ্ছি, তা শুধু অসাধারণ বললে কম বলা হবে। এ সমস্যায় রহস্য আছে। সে-রহস্য এক অশরীরীকে নিয়ে। সোজা কথায়, ভৌতিক রহস্য।

অধৈর্য হয়ো না। আমি জানি তুমি ভূতের ওঝা নও। ভূতপ্রেত আমি বিশ্বাস করি কী করি না, তা নিয়ে তর্কও করতে চাই না।

কিন্তু বর্তমান প্রহেলিকা নিছক অশরীরী রহস্য কী শরীরী চক্রান্ত, তা নির্ণয় করার জন্যেই তোমার শরণ নিচ্ছি।

কয়েক সপ্তাহ ধরে ভেবেছি, তোমাকে এর মধ্যে জড়াব কিনা। কিন্তু পরিস্থিতি এমনি ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমি আর কোনও পথ দেখতে পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত ভূতের ওঝাই যদি ডাকতে হয়, তবে তার আগে তুমি এসো। এসে প্রমাণ করে যাও এ রহস্যে মানুষের হাত নেই।

সব কথা আমি চিঠির মধ্যে লিখতে পারছি না। তবে জেনে রাখো, যা ঘটেছে এবং ঘটছে, তার পরিণাম এতই সুদূরপ্রসারী যে, নয়াদিল্লির আসনসুদ্ধ টলেছে। ভূত-লীলার সঙ্গে-সঙ্গে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসছে আমাদের সবাকার মাথার ওপর। মনে রেখো, সে বিপদ যখন আসবে, তখন রেহাই পাবে না কেউই—না আমি, না তুমি। পরিস্থিতির ভয়াবহতা এই থেকেই আঁচ করে নিতে পারবে। বেশি বলার দরকার নেই।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হেতু এর বেশি আর কিছু কাগজে-কলমে জানাতে আমি অপারগ। উপন্যাসের শার্লক হোমস্ নিশ্চয় এরকম পরিস্থিতিতে এ কেস অ্যাকসেপ্ট করত না। কিন্তু ইন্ডিয়ান শার্লক হোমস্ করবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। কেননা, এ কেসের সঙ্গে আন্তর্জাতিক দরবারে ভারতের ভবিষ্যত বহুলাংশে নির্ভর করছে।

সংক্ষেপে, তোমাকে আমাদের দরকার। একান্তই দরকার। তুমি আমাদের শেষ অবলম্বন—খোলাখুলিই বললাম।

হাতে যদি কোনও কাজ থাকে, দেশের মুখ চেয়ে তুমি তা ছেড়ে আসবে। বুঝতেই পারছ, চেষ্টার ত্রুটি আমরা করিনি। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি সব দিক দিয়েই। এখন আমরা দিশেহারা। সময়ও কমে আসছে—আসছে ভয়ঙ্কর এক সম্ভাবনা। তাই, তোমাকে আমাদের চাই-ই চাই। যে-কোনও কেসই হাতে থাকুক না কেন, জানবে তার চাইতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনা।

আর-একটা কথা। তোমার সমস্ত খরচপত্র আমরা বহন করব। পারিশ্রমিক বাবদ তা উল্লেখ করতে দ্বিধা বোধ করলে, যাতায়াত এবং আনুষঙ্গিক খরচ হিসেবে আমরা তা ধরে দেব।

এ চিঠি পাওয়ার পর ফ্লাই করবে দমদম থেকে। দিল্লি থেকে তোমাকে এখানে নিয়ে আসার বিশেষ ব্যবস্থা হবে। তোমার কর্মক্ষেত্র হবে অবশ্য দিল্লিতেই।

টেলিগ্রাম মারফত তোমার সম্মতি পেলে আশ্বস্ত হব।

ইতি—আশীর্বাদক
চন্দ্রচূড় মহলানবীশ

পুনশ্চ ঃ এ চিঠিকে নিছক ব্যক্তিগত অনুরোধ মনে কোরো না। ভারত সরকারের উচ্চতম মহল থেকেও নির্দেশ এসেছে তোমাকে তলব দেওয়ার।

চিঠিখানা নামিয়ে চিন্তাকুঞ্চিত ললাটে দিগন্তের তুষারমৌলী গিরিশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। লতাপাতা আঁকা শালের প্রান্ত উড়তে লাগল কাঁধের ওপর। রুক্ষ চুলের গোছা পরম সোহাগে জড়িয়ে ধরতে চাইল কপাল, চোখ আর গাল।

উচ্চতম মহলটি কে? প্রেসিডেন্ট, না প্রাইম মিনিস্টার? অনেক ভেবেছে ইন্দ্রনাথ। উত্তর পায়নি। কিন্তু সে জন্যে হাত গুটিয়ে বসে থাকতেও পারেনি। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে যেটুকু সময় গেছে, তারপরেই শুরু হয়েছে যাত্রা। সঙ্গে এনেছে শুধু একটি যন্ত্র—স্নিপারস্কোপ

অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারে গড়া মূর্তি দেখার যন্ত্র!

মিনিট পাঁচেক পরেই অতিকায় টেরোড্যাকটিলের মতো পাখসাট-হাওয়া তুলে ভূমিস্পর্শ করল হেলিকপ্টার। দু-মিনিট পরেই মিলিটারি এয়ারপোর্ট ছেড়ে বেগে উধাও হয়ে গেল একটা জিপ।

এলুমিনিয়াম 'হাট' পৌঁছে ড্রেসিং টেবিলের ওপর একটা চিঠি পেল ইন্দ্রনাথ।

ভায়া ইন্দ্রনাথ,

হাত-মুখ ধুয়ে চাঙ্গা হয়ে নাও। তারপর সিধে চলে এসো আমার দপ্তরে। মনে রেখো, বিপদের আর বেশি দেরি নেই। ইতি—

চন্দ্রচূড় মহলানবীশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ প্রফেসর বিক্রম বক্সীর প্রেতিনী-কন্যা

ঠিক আধ ঘণ্টা পরে ডক্টর চন্দ্রচূড় মহলানবীশের অফিসে হাজির হল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

অফিস না বলে তাকে বাগানবাড়ি বললেই মানায় ভালো। অজস্র রঙের টিউলিপে ছাওয়া আর কেয়ারি-করা পথ এসে শেষ হয়েছে পোর্টিকোর নিচে। সিঁড়ির দুপাশে পেতলের ঝকমকে টবে বসানো মরশুমি ফুলের শোভা। তারপরেই মুলায়েম গালিচা পাতা অলিন্দ।

অফিস ঘরটা গলিপথেরই একপ্রান্তে। পেতলের ফলকে লেখা ঃ প্রিন্সিপাল, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস স্কুল।

একখণ্ড বিশাল কাচ ঢাকা ঝকঝকে তকতকে টেবিলের তিন দিকে বসেছিলেন মোট চারজন পুরুষ।

গদিমোড়া রিভলভিং চেয়ারে স্বয়ং চন্দ্রচূড় মহলানবীশ। আগের মতোই খাসতুল মুখচ্ছবি। ইন্দ্রনাথকে দেখেই আনন্দের রোশনাই জ্বলে উঠল শান্ত, স্বচ্ছ দুই চোখে।

বাঁ-দিকে বসে কাঠখোট্টা চেহারার একজন মিলিটারি অফিসার। মুখের মধ্যে কমনীয়তার চিহ্নমাত্র নেই। কদম-ছাঁট চুল, বলিরেখাঙ্কিত রুক্ষ মুখ, ঈগলের চোখ। বয়েসে প্রৌঢ়।

ডানদিকে অপেক্ষাকৃত কম বয়েসি আরও দুজন পুরুষ। একজনের চোখ তির্যক, নাক থ্যাবড়া। বর্মি, কী তিব্বতি, কী খাসিয়া, তা বলা মুশকিল। মুখ ভাবলেশহীন। তৃতীয়জন একবার শুধু মাথা তুলে ইন্দ্রনাথের আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিলেন।

আবহাওয়া থমথমে। যেন এইমাত্র এখানে ঝড় বইছিল। স্তব্ধ হয়েছে ইন্দ্রনাথের আবির্ভাবে।

বাগাড়ম্বরের ধার দিয়েও গেলেন না চন্দ্রচূড় মহলানবীশ। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'জেন্টেলমেন, ইনিই ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ইন্দ্রনাথ, ইনি জেনারেল বরকতি। ইনি মিস্টার আচাও, আই. পি. এস., সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ

ইনভেস্টিগেশন। আর ইনি মিস্টার রাজবাহাদুর কদম, ডিরেক্টর, সেন্ট্রাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো।'

জেনারেল বরকতি নামধারী কাঠখোট্টা প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে উঠে নীরসকণ্ঠে শুধু বললেন, 'প্লেনে অসুবিধে হয়নি তো?' তিব্বতি অথবা বর্মি অথবা খাসিয়া ভদ্রলোক, নাম যাঁর মিস্টার আচাও, এমন জোরে করমর্দন করলেন যে, হাড় গুঁড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। আর রাজবাহাদুর কদম একবার শুধু ফিক করে হেসে আবার চোখ নামিয়ে বসলেন।

অভ্যর্থনার মধ্যে সৌজন্যের অভাব নেই, অভাব শুধু উষ্ণতার, আন্তরিকতার।

একমুহূর্তেই উপলব্ধি করল ইন্দ্রনাথ, এরা তাকে চায় না। মনে পড়ল, ডক্টর মহলানবীশের চিঠি। 'বাধ্য হয়েই সব দিক দিয়েই'। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চতম মহলের চাপ এবং ইন্দ্রনাথের আগমন।

তাই বুঝি এই নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা।

মৃদু হেসে মাথা হেলিয়ে সবাইকে অভিবাদন জানায় ইন্দ্রনাথ। গতিক সুবিধের নয়। উপস্থিত প্রত্যেকেই এক-একজন কেষ্ট-বিষ্টু। এবং প্রত্যেকেই হার মেনেছেন। এরপরেও ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে ডাকা, মানে বুঝতে হবে জল সত্যিই ঘুলিয়েছে।

আসন গ্রহণ করল ইন্দ্রনাথ।

চেয়ারের পিছনে পিঠ ছেড়ে দিয়ে বললেন ডক্টর মহলানবীশ, 'জেন্টেলমেন, হাতে সময় কম, তাই সোজা কাজের কথা পাড়ছি। ইন্দ্রনাথ রুদ্র, প্রফেসর বিক্রম বক্সীর নাম শুনলে প্রথমেই তোমার কী মনে হয়?'

এক লহমা চিন্তা করল ইন্দ্রনাথ। পরমুহূর্তেই দ্বিধাহীন স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'সিবারনেটিকস'।

চকিতে বাকি তিনটে মুখ একসঙ্গে ঘুরে গেল ইন্দ্রনাথ রুদ্রের দিকে—যেন সুইচ টেপার সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁকানি খেল তিন-তিনটে কলের মানুষ।

শঙ্কায় কালো হয়ে ওঠে জেনারেলের মুখ।

ডক্টর মহলানবীশ আবার শুধোলেন, 'অপারেশন নটরাজ-এর নাম কি শোনা আছে?'

'না।'

শঙ্কামুক্ত হলেন জেনারেল—আবার কঠোর দৃষ্টি দিয়ে এল নির্দয় চোখে।

শুধু অপলকে তাকিয়ে থাকেন মিঃ আচাও আর রাজবাহাদুর কদম।

মহলানবীশ বললেন, 'তুমি তো জানোই সিবারনেটিকস বিশ্বের বিজ্ঞানে নতুন সংযোজন। অথচ এরই মধ্যে এই সম্পর্কে গবেষণা করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী। জীবন্ত প্রাণী আর কলকব্জার মধ্যে সংযোগসূত্র সম্পর্কে এঁর জ্ঞান অপরিসীম। জম্মুর সরকারি কলেজে হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন। ছেড়ে দিয়ে সিমলাতে যান, নিজের ল্যাবরেটরিতে গবেষণার জন্যে। প্রথমে একাই গবেষণা করছিলেন নিজস্ব করেকটা থিওরি নিয়ে। তারপরেই দেখা গেল, এ রিসার্চের ফলাফল যদি অন্য কোনও রাষ্ট্রের হাতে পৌঁছয়, তা হলে তারা পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হবে—কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা বাহিনীকে দুর্ভেদ্য করে তোলার দরুন।

'এ অবস্থায় ভারত সরকার চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই আয়োজন

হল যুক্ত গবেষণার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। আর প্রফেসর বিক্রম বক্সীর সঙ্গে চুক্তি অনুসারে পত্তন হল অপারেশন নটরাজ-এর। এই ছবিটা তোলা হয়েছিল তখনি।'

মসৃণ টেবিলের ওপর দিয়ে গ্লসি পেপারে এনলার্জ করা একটা ফুলসাইজ ফোটোগ্রাফ টোকা মেরে পিছলে দিলেন চন্দ্রচূড় মহলানবীশ।

বৈজ্ঞানিক বিক্রম বক্সী। সিংহের মতো কেশর। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দুই চোখ। অসম্ভব চওড়া কপাল। আর অত্যন্ত রুক্ষ মুখচ্ছবি। দেখলে ভয় হয়।

টোকা মেরে ফোটোটা ফিরিয়ে দিলে ইন্দ্রনাথ।

আবার শুরু করলেন মহলানবীশ, 'অপারেশন নটরাজ নিয়ে যা বললাম, তার বেশি আর কিছু বলতে পারব না। বলার দরকারও হবে না। শুধু জেনে রাখো, জেনারেল বরকাকতি এই প্রজেক্টের চার্জে আছেন। অপারেশন নটরাজ সাকসেসফুল হওয়ার সমস্ত দায়িত্ব তাঁর।'

চুপ করলেন মহলানবীশ। নখ দিয়ে টেবিলটপের ওপর আঁচড় কাটতে-কাটতে বললেন, 'তুমি তো জানো, এ ধরনের সিরিয়াস প্রজেক্টে গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব কতখানি। তাই প্রথম থেকেই সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। অপারেশন নটরাজ শুরু হওয়ার আগেই প্রফেসর বিক্রম বক্সী, তাঁর পরিবার, আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের অত্যন্ত গোপন ডোসিয়ার তৈরি হয়ে গেছে। এমনকী প্রফেসরের স্বর্গীয় পিতার কুলজিও পাওয়া যাবে এই ডোসিয়ারে। প্রজেক্টের মেরুদণ্ড হলেও, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে প্রফেসর বক্সী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সংবাদ আমরা সংগ্রহ করেছি এবং রেকর্ড করেছি—অবশ্য সবই তাঁর অজ্ঞাতসারে।'

'কেন?' এই প্রথম কথা বলল ইন্দ্রনাথ।

নিষ্পলক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বরকাকতি, আচাও, কদম।

চোখে চোখ রেখে বললেন চন্দ্রচূড় মহলানবীশ, 'কারণ, প্রফেসর বিক্রম বক্সী জ্ঞানবৃদ্ধ বটে, কিন্তু অন্যান্য দিকে শিশুর মতোই অবুঝ আর তেমনি একগুঁয়ে। তার ওপর দারুণ রগচটা।'

'তাতে কী?'

'প্রফেসর মনে করেন না, তাঁর কোনও নিরাপত্তার দরকার আছে। এবং যেদিন উনি জানতে পারবেন, তাঁর নামে আমরা ডোসিয়ার করেছি, সেই দিনই হয়তো অপারেশন নটরাজের ইতি ঘটবে।'

'তারপর?'

'প্রফেসর বিজ্ঞানতপস্বী বটে, কিন্তু আমোদপ্রিয়। সিনেমা থিয়েটার, এককথায় শহরের আকর্ষণ ছাড়তে তিনি নারাজ। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গেই এইখানেই তাঁর প্রভেদ। তিনি শুধু গ্রন্থকীট নন, জীবনকে রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করতে জানেন। এই বৃদ্ধ বয়েসেও। তাই তাঁর স্বাধীনতায়, অবাধ চলাফেরায় কারও হস্তক্ষেপ উনি একেবারেই বরদাস্ত করেন না। ফলে, অবাধ্য শিশুর মতই এক মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী। কিছু জিগ্যেস করবে?'

'প্রফেসর কি এখনও প্রফেসারি করছেন?'

'না। জম্মুর কলেজ ছেড়েছেন অনেক দিন আগেই। দিল্লির পৈতৃক বাসভবনে

শুরু করেছিলেন সিবারনেটিকস নিয়ে রিসার্চ। গভর্নমেন্ট প্রস্তাব করেছিল, পিয়াসে শক্ত নিয়ে—' বলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন মহলানবীশ, 'এভাবে খেলনাবেসাতির রিসার্চ করা ঠিক নয়। তাই গোটা ল্যাবরেটরিকে তুলে আনা হোক অপারেশন নটরাজের হেডকোয়ার্টার এই ভ্যালিতে।'

ক্ষণিক বিরতি দিয়ে থেমে-থেমে বললেন মহলানবীশ, 'কিন্তু প্রফেসর রাজি হননি।'

'তা হলে?'

'অপারেশন নটরাজের কাজকর্ম এখানেই চলছে। ওঁর রিসার্চ চলছে দিল্লিতে। ব্যাপক আর জটিল এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে এখানে। মাঝে-মাঝে আসেন প্রফেসর।'

'কিন্তু তাতে তো কাজের অনেক অসুবিধে—'

মুখের কথা লুফে নিয়ে বললেন মহলানবীশ, 'ঠিক তাই! কিন্তু কে তাঁকে বোঝাবে? বদমেজাজি রাশভারী পুরুষ। ফস করে চটে গিয়ে হয়তো সব ছেড়েছুড়ে দিলেন। তখন?'

'এ তো মস্ত সমস্যা।'

নিগূঢ় হাসি হাসলেন মহলানবীশ। মেঝের ওপর রাখা ব্রিফকেসটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আসল সমস্যা কিন্তু এটা নয়।'

কথার সুরে এমন কিছু ছিল, যেন জাদুমন্ত্র বলে আতঙ্কিত থমথমে হয়ে উঠল ঘরের পরিবেশ। অসম্ভব ভয়ঙ্কর কিছুর সম্ভাবনায় টান-টান হয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ রুদ্রের শরীরের প্রতিটি স্নায়ু।

ব্রিফকেসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ খাদে নামিয়ে এনে মৃদু কণ্ঠে বললেন মহলানবীশ, 'বিক্রম বক্সীর সংসার খুবই ছোট্ট। স্ত্রী আর একমাত্র মেয়ে ময়না। বয়স বছর তেরো।'

'বুড়ো বয়েসের মেয়ে?'

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলেন মহলানবীশ।

বললেন, 'তাই ছিল নয়নের মণি। মেয়ে অন্ত প্রাণ। বাইরে সিংহের প্রতাপ, মেয়ের কাছে যেন খরগোশ-শিশু। মাস তিনেক আগে হঠাৎ ম্যানেনজাইটিসে মারা গেল ময়না। প্রচণ্ড শোকে দিন কয়েক পাগলের মতো হয়ে রইলেন প্রফেসর। আমরা শঙ্কিত হলাম। কিন্তু আশ্চর্য তাঁর মনোবল। কয়েক দিনের মধ্যেই দ্বিগুণ উৎসাহে ডুব দিলেন রিসার্চ ওয়ার্কে—সামলে নিলেন নিজেকে। ঋষির মতই কর্মযোগের মধ্যে দিয়ে ভুলতে চাইলেন পার্থিব শোক। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আর ঠিক তখনি—'

চুপ করলেন মহলানবীশ। যন্ত্রচালিতের মতো একযোগে মাথা ঘুরে গেল বরকাকতি, আচাও, কদমের। প্রত্যেকেরই দৃষ্টি এবার চন্দ্রচূড় মহলানবীশের ওপর।

ঈষৎ ঝুঁকে বসলেন মহলানবীশ। অদ্ভুত স্বরে বললেন, 'আর ঠিক তখনি আবির্ভাব ঘটল তাঁর মৃতা কন্যার। এক প্রেতচক্রে ফিরে এল তাঁর মেয়ে। শুধু ফিরে এল নয়, তার হাতের একটা মোমের দস্তানা উপহার দিয়ে গেল প্রফেসরকে। মোমের সেই দস্তানাটাই এখন তাঁর নয়নের মণি হয়ে উঠেছে। প্রেতচক্রেও নিয়মিত মেয়ের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে, অপারেশন নটরাজের কথা ভুলতে বসেছেন। এই হল ময়নার ফোটো—মৃত্যুর কিছুদিন আগে তোলা।'

ব্রিফকেসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল আর-একটা এনলার্জমেন্ট।

ছিপছিপে একহারা একটি মেয়ে। যেন নন্দলাল বসুর আঁকা একখানা ছবি। টানা টানা চোখ—অত অল্প বয়সেও তা নিখুঁত। তিলফুলজিনি নাসা। নাসিকারন্ধ্র ঈষৎ স্ফুরিত—যেন অভিমান তার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গিনী। ঠোঁটের রেখা অত্যন্ত স্পষ্ট, অত্যন্ত সুন্দর—যেন অজন্তার দেওয়ালে আঁকা আর্য সুন্দরীর অধরোষ্ঠ।

ময়নার দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ মায়া—যেন সজীব দুটি চোখ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মোমের হাত

ইন্দ্রনাথ জিগ্যেস করল, 'মৃত্যুর ওপার থেকে এসে ময়না শুধু কথাই বলেছে, না দেখা দিয়েছে?'

'দুটোই ঘটেছে।'

'মিডিয়াম কে?'

চশমাটি খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন মহলানবীশ। বললেন, 'এ সম্বন্ধে আমার কাছে দুটো রিপোর্ট আছে। একটা আমার লোক মারফত। অপরটা মিস্টার আচাও অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন মারফত। দুটো রিপোর্টেই যথেষ্ট মিল আছে। কাজেই সময় সংক্ষেপ করার জন্য বলব শুধু সারাংশটুকু।'

'মিডিয়ামের নাম মুকরি মাস্ক্যারেনি। স্বামীর নাম ডেভিড মাস্ক্যারেনি। নাম শুনেই বুঝছ, খ্রিস্টান। মুকরির অনেক গুণ। সে ভেনট্রিলোকুইস্ট—ভূতের গলায় কথা কইতে পারে। অস্বাভাবিক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির লক্ষণ শুধু আঙুল দিয়ে ছুঁয়েই মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলে দিতে পারে, বহুদূরের ঘটনা স্পষ্ট দেখতে পায়। অলৌকিক ক্ষমতা তার। ঘরের মধ্যে ভূতের আবির্ভাব ঘটিয়ে ভেল্কি দেখাতে পারে, টেবিল উলটে দিতে পারে। এমনকী এক্টোপ্লাজম দিয়ে ভূতকে সশরীরে হাজির করাতে পারে।'

একটানা গড়গড় করে বলে দম নিলেন মহলানবীশ। তারপর আবার শুরু করলেন, 'মুকরির অতীত খুব ভালো নয়। কিছুদিন শ্রীঘর বাস হয়েছিল। ভারতের কোথাও ঘুরতে বাকি রাখেনি স্বামী-স্ত্রী। কলকাতাতেও ছিল বহুদিন। প্রেতচক্রে নামডাক আছে দুজনের। তাই দিল্লিতে জাঁকিয়ে বসতে বেশি সময় লাগেনি। তবে এদের চক্রে জানাশোনা লোক ছাড়া কেউ হাজির থাকতে পারে না। শুধু সুপারিশ হলেই চলে না। ইন্টারভিউ দিতে হয়। অনেকেই নাকচ হয়ে যায় ইন্টারভিউর সময়ে।'

বিড়বিড় করে ইন্দ্রনাথ বললে, 'সেটা একান্তই দরকার।'

'কী বললে?'

'কিছু না। চক্র হপ্তায় ক'বার বসে?'

'তিনবার। প্রতি বৈঠকে বারো থেকে চোদ্দোজনের বেশি থাকে না।'

'প্রফেসর বিক্রম বক্সী এদের খপ্পরে পড়লেন কী করে?'

'মাস চারেক আগে মাস্ক্যারেনিদের তরফ থেকে খবর এল প্রফেসরের কাছে যে পরলোক থেকে তাঁর নামে নাকি একটা বার্তা পৌঁছেছে তাদের চক্রে।'

'বোগাস!' নাসিকা গর্জন করে অকস্মাৎ ফেটে পড়লেন জেনারেল।

'খবরটা প্রফেসরের কাছে কে নিয়ে এল?' সিধে তাকিয়ে জানতে চাইল ইন্দ্রনাথ।

চশমাটা তুলে নিয়ে চোখে পরলেন মহলানবীশ। মটমট করে আঙুল মটকালেন। তারপর সামান্য হেসে বললেন, 'আমারই এক উৎসুক ভক্ত সে-জন্যে দায়ী। জন্মান্তরবাদ আর প্রেততত্ত্বে ছোকরার অগাধ বিশ্বাস। মাস্ক্যারেনিরা এখানে বৈঠক শুরু করার পর থেকেই ছোঁড়া ওখানে ভিড়েছিল। নেহাতই আহাম্মক। সদাশিব ছেলে। ধুতির ওপর গলায় বোতাম এঁটে এখনও শার্ট পরে। অত্যন্ত নিরীহ, কিন্তু দারুণ ভূতবিশ্বাসী।'

'ইডিয়ট!' এবার চাপা গর্জন করে উঠলেন মিঃ আচাও।

কাষ্ঠহাসি হেসে মহলানবীশ বললেন, 'এই ছোকরাই উপযাচক হয়ে প্রথমে প্রফেসরকে একটা চিঠি লেখে। প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে চায়। পরলোক থেকে তাঁর নামে আসা বার্তাটা সামনাসামনি বলতে চায়।

'প্রথমে প্রফেসর কোনও আমল দেননি। তারপর আবার পত্রাঘাত। নির্বোধের উৎসাহ একটু বেশিই হয়। এবার প্রফেসর দেখা করলেন বটে, কিন্তু খুব পাত্তা দিলেন না। কিন্তু ছিনে জোঁকের মতো লেগে রইল আমার ছাত্রটি। নাম তার রঘুনাথ পোদ্দার। রঘুনাথ জানালে, তাঁর মরা মেয়েই সেদিন এসেছিল প্রেতচক্রে। ময়নার প্রেতাত্মা যা বলেছে, তার মধ্যে তার শৈশবের এমন কতকগুলো ঘটনা ছিল, যা শুনে কৌতূহলী হলেন প্রফেসর। শুধু যাচাই করে দেখার জন্যেই একটা চক্রে আসতে রাজি হলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বেঁকে বসলেন। আজ পর্যন্ত কোনও চক্রে তিনি হাজির থাকেননি। একা প্রফেসরই গেছেন।

প্রথম দিন রঘুনাথের সঙ্গে প্রেতচক্রে এসে ময়নার প্রেতাত্মাকে না দেখতে পেলেও তার উপস্থিতির প্রমাণ পেলেন প্রফেসর। যেভাবেই হোক, ময়নার গলা নকল করে শোনাল মুকরী। সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলেন প্রফেসর। মন বিশ্বাস করতে না চাইলেও কানকে তো অবিশ্বাস করা যায় না। এইরকম দোটানায় গেল কয়েকটা বৈঠক। তারপরেই মোক্ষম প্রমাণ পেলেন প্রফেসর—মরা মেয়ে যে আবার ফিরে এসেছে, এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই রইল না তাঁর।'

'কী প্রমাণ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মহলানবীশ, 'ময়না বক্সীর হাত।'

'কী!' বিদ্যুতাহতের মতো সিধে হয়ে বসল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। 'জ্যান্ত হাত, না—'

'না, মোমের হাত। মোমের ছাঁচে গড়া ময়নার হাত। কোনও তফাত নেই। সেদিন প্রেতচক্রে সশরীরে দেখা দেয় ময়না। আগে থেকেই দুটো ডেকচিতে তরল মোম আর ঠান্ডা জল ছিল। ময়না বললে, বাবা, আমি আবার ফিরে এসেছি। বিশ্বাস করো বাবা, আমি ফিরে এসেছি। তোমার জন্যে বড্ড মন-কেমন করে। তাই থাকতে পারি না, না-এসে পারি না। যদি এখনও তোমার অবিশ্বাস থাকে, তাই আমার আসার প্রমাণ রেখে যাচ্ছি।' বলেই প্রেতাত্মা ঝপ করে হাত ডুবিয়ে দেয় তরল মোমে—তারপরেই ঠান্ডা জলে। পরক্ষণেই কে যেন আলতো করে চুমু খেয়ে যায় প্রফেসরের গালে। ঘরসুদ্ধ লোক শুনতে পায় প্রেতিনী ময়নার কণ্ঠ, বাবা, আমি যাচ্ছি। আবার আসব।' আলো জ্বলে উঠতেই দেখা গেল দুটো ডেকচির মাঝে পড়ে দস্তানার মতো একটা মোমের ছাঁচ। তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে হাতটার ওপর থেকে। স্বচ্ছ হাত। ছোট্ট—ময়নার হাতের মাপের। সরু কব্জি। আঙুলগুলো ঈষৎ বেঁকানো—যেন বাবাকে ইঙ্গিতে ডাকছে নিজের কাছে। দেখেই, কান্নায় ভেঙে পড়লেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী।'

'ঘরে আলো ছিল প্রেতাত্মার আবির্ভাবের সময়?'

'না; ঘুটঘুটে অন্ধকার।'

'এত খবর কার কাছে পেলেন?'

'রঘুনাথ পোদ্দারের ডায়ারি থেকে। অতি উৎসাহী তো। তাই যা দেখে, শোনে—সবই লিখে রাখে ডায়ারির পাতায়।'

আপন মনেই বলে ইন্দ্রনাথ, 'সত্যি-সত্যিই কি আর দেখে? অতি বিশ্বাসের দরুণ মনে-মনে ভেবে নেয়।'

ইন্দ্রনাথের মন তখন হু-হু করে পিছিয়ে গেছে ষাট বছর আগেকার একটি ঘটনায়। ষাট বছর আগে স্যার আর্থার কোনান ডয়েলও বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেছিলেন এমনি একটা মোমের হাত দেখে। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, যিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা শার্লক হোমসের স্রষ্টা, যাঁর ক্ষুরধার বিশ্লেষণী বিচার-বুদ্ধির কাছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডও উপকৃত, সেই তীক্ষ্ণধী মানুষটিও প্রতারিত হয়েছিলেন প্রেতাত্মার মোমের হাত দেখে। তরল মোমে হাত ডুবিয়ে জলে ডোবালে তা শক্ত হয়ে যায়। তখন ছাঁচটা না ভেঙে হাত বার করে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সজীব মানুষের ক্ষেত্রে। প্রেতাত্মার হাত বাতাসে গলে মিলিয়ে যায়—পড়ে থাকে শুধু মোমের স্বচ্ছ শক্ত একটা গোটা হাত—মণিবন্ধের সরু অংশটাতেও এতটুকু চিড় চোখে পড়ে না।

ডিটেকটিভ কাহিনির সম্রাট কোনান ডয়েল প্রেত বিশ্বাস করতেন, মোমের হাতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ইন্দ্রনাথ রুদ্র জানে কীভাবে আগে থেকেই গড়া একটা মোমের ছাঁচ হাজির করে ঠকানো হয়েছিল স্যার ডয়েলকে।

কিন্তু চন্দ্রচূড় মহলানবীশের কেস নিশ্চয় অত সহজ নয়। হলে এতগুলি বিশেষজ্ঞ নাকানি-চোবানি খেয়ে যেতেন না এবং তারও ডাক পড়ত না।

নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে জিগ্যেস করে ইন্দ্রনাথ, 'হাতটার ফোটো আছে?'

'আছে।'

নিঃশব্দে ব্রিফকেস থেকে চারটে গ্লসি এনলার্জমেন্ট বার করে এগিয়ে দিলেন মহলানবীশ।

বিভিন্ন কোণ থেকে তোলা কিশোরী-হস্তের কয়েকটি আলোকচিত্র। সব মিলিয়ে একটা থ্রি-ডাইমেনশনাল ছবি মানস-চক্ষে ভেসে ওঠে। আঙুলগুলি ঈষৎ বক্র—যেন আহ্বান জানাচ্ছে। নিখুঁত মোমের ছাঁচ। সরু মণিবন্ধ, করতল, হাতের পেছন দিক এবং অঙ্গুলিসঙ্কেত—সব মিলিয়ে তা জীবন্ত, যেন রক্তমাংসেরই একটা হাত অতর্কিতে ধরা পড়েছে কঠিন মোমের খাঁচায়—তারপর হাত বাতাসে গলে মিলিয়ে গেছে, রয়ে গেছে শুধু স্বচ্ছ ছাঁচ।

সরু মণিবন্ধ অটুট রেখে বাঁকা আঙুল সিধে করে জীবন্ত কোনও মানুষের পক্ষে হাত বার করে আনা সম্ভব নয়।

একটার-পর-একটা ছবি দেখতে-দেখতে মনে-মনে শিউরে ওঠে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

কিন্তু ছবিগুলোর মধ্যে আরও কিছু ছিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইন্দ্রনাথ তাই চোখের কাছে আনে ফোটোগুলো...আর...আর...নামহীন আতঙ্কে শিরশির করে মেরুদণ্ড।

ঠিক তখনি টেবিলের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে ক্ষুদ্র একটা বস্তু এগিয়ে দেন চন্দ্রচূড় মহলানবীশ। হাতলওলা একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস।

যন্ত্রচালিতের মতই আতস কাচটা তুলে নেয় ইন্দ্রনাথ রুদ্র। চোখ আর ফোটোগ্রাফের মাঝে রেখে ফোকাস করতেই সত্য হয়ে ওঠে তার আশঙ্কা। যা ভেবেছে তাই। শুধু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নয়, প্রতিটি আঙুলের ডগায় চক্রাকৃতি রেখা। আঙুলের রেখা। অত্যন্ত সুস্পষ্ট সেই রেখা।

ভয়ার্ত চোখ তুলে তাকায় ইন্দ্রনাথ, ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠে বলে, 'একী! এ যে আঙুলের রেখা!'

ম্লান হেসে বললেন মহলানবীশ, 'হ্যাঁ, আঙুলের রেখা।'

'কার?'

'ময়নার। প্রফেসরের মেয়ের।' অকস্মাৎ যেন হাজার পাউন্ড বোমার মতই ফেটে পড়লেন সেন্ট্রাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরোর ডিরেক্টর রাজবাহাদুর কদম। এই প্রথম কথা বললেন তিনি এবং তা এমনই প্রচণ্ড আর আবেগ দিয়ে যে ক্ষণেকের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

'বলছেন কী মশাই? তাও কি সম্ভব?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মহলানবীশ, 'মিস্টার কদম নিজে একজন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট। আঙুলের এই ছাপ ময়না বক্সীর—কোনও সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।'

'একবার নয়, বারবার মিলিয়ে দেখেছি আমরা,' বললেন রাজবাহাদুর কদম। 'আসল ছাপের বড় এনলার্জমেন্টের পাশে এ ফোটো রাখলে এতটুকু তফাত ধরতে পারবেন না আপনি।' তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই শেষ করেন মিঃ কদম।

আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ওপর চোখ রাখে ইন্দ্রনাথ। বলে, 'রেখাগুলো মোমের ছাঁচের ওপরে, না ভেতরে? ছবি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।'

'ভেতরে। ছবিতে ভালো দেখা না গেলেও, স্বচ্ছ মোমের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়।'

হঠাৎ একটা সম্ভাবনা খেলে যায় ইন্দ্রনাথের মস্তিষ্কে। চোখ তুলে তীব্র কণ্ঠে শুধোয়, 'ময়নার দেহ কি—'

মাথা নাড়তে-নাড়তে বিষাদাচ্ছন্ন চোখে বলেন মহলানবীশ, 'ভায়া, কী জিগ্যেস করবে, তা জানি। না, যা ভাবছ, তা নয়। ময়না বক্সীকে গোর দেওয়া হয়নি। হিন্দু মতেই দাহ করা হয়েছিল মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই।'

রাজবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে চকিতে জিগ্যেস করলে ইন্দ্রনাথ, 'ময়নার আঙুলের ছাপ আপনি পেলেন কোত্থেকে? কী দেখে এ ছবির সঙ্গে মেলালেন?'

'আমাদের সিকিউরিটি রেকর্ড থেকে। গুরুত্বপূর্ণ যে-কোনও সরকারি প্রজেক্টে জড়িত সকলের আঙুলের ছাপ রেকর্ডে রাখা হয়। অপারেশন নটরাজের শুরুতেই প্রফেসর, তাঁর স্ত্রী আর মেয়ের আঙুলের ছাপও আমরা রেখে দিয়েছিলাম।'

সূচাগ্র দৃষ্টি মেলে তবুও তাকিয়ে থাকে ইন্দ্রনাথ।

সে দৃষ্টির অর্থ বোঝেন রাজবাহাদুর কদম। বলেন, 'ফাইল থেকে বিশেষ এই ছাপটি যে কী করে হারাল—'

বাধা দিয়ে বললেন মহলানবীশ, 'পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে এখন আর লাভ কী? ইন্দ্রনাথ, প্রফেসর বিক্রম বক্সীর মতো বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মরা মেয়ের ফিরে আসার ব্যাপারটা বিশ্বাস করা একটু আশ্চর্য নয় কি?'

'মোটেই আশ্চর্য নয়।' নির্বিকার কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ।

'বলেন কী মিস্টার,' প্রায় হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন জেনারেল বরকাকতি। 'ঢুল পাকিয়ে ফেলার পর এই আহাম্মুকি—'

চট করে ফিরে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ইন্দ্রনাথ, 'জেনারেল বরকাকতি, এর আগে কোনও প্রেতচক্রে হাজির থাকার দুর্ভাগ্য হয়েছে কি?'

'মরে গেলেও কোনওদিন যাব না।'

অট্টহাস্য করে বললেন মিঃ আচাও, 'মিস্টার রুদ্র আপনার প্রেতাত্মার প্রেতচক্রে উপস্থিতির কথা জিগ্যেস করছেন না। সশরীরে কোনওদিন হাজির ছিলেন?'

হো-হো করে হেসে ওঠে ঘরসুদ্ধ সবাই। থতমত খেয়ে গিয়ে রেগে কেশে বললেন জেনারেল, 'না।'

শ্রাগ করে বলল ইন্দ্রনাথ, 'একদিন হাজির হবেন। তা হলেই দেখবেন, বিশ্বাস না এসে যায় না। ভালো কথা, ময়না বক্সীর মোমের হাত তো তার বাবার কাছে। এ ছবিগুলো তুললেন কোত্থেকে?'

'রঘুনাথ পোদ্দারের দয়ায়।' বললেন মহলানবীশ। 'প্রফেসরকে ভূতের আসরে টেনে এনে যতটা অন্যায় সে করেছে, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করছে। প্রফেসরের হেপাজত থেকে রঘুনাথই হাতটা নিয়ে আসে নিজের বাড়িতে। আমরা ছবি তুলি সেইখানেই।'

একটু থেমে কনুইয়ে ভর দিয়ে থেমে-থেমে বললেন মহলানবীশ, 'ইন্দ্রনাথ, হুবহু এইরকম আর-একটা হাত তৈরি করতে পারবে?'

'না।' সাফ জবাব দিয়ে দেয় ইন্দ্রনাথ। 'এক্ষুনি তো পারবই না।'

'আমরাও পারিনি। ভেবেছিলাম, অনেক প্রতারণা তো দেখেছ, হয়তো এ জিনিসও তোমার অজানা নয়।'

মহলানবীশের কথার সুর এবার ইঙ্গিতপূর্ণ। হুঁশিয়ার হয়ে যায় ইন্দ্রনাথ। ওজন-করা স্বরে বলে, 'এখন হয়তো নয়। তবে যদি সময় পাই, মাত্রোয়ানিদের দু-একটা বৈঠকে হাজির থাকার সুযোগ পাই—'

'ঠিক কথা।' সুরে সুর মিলিয়ে বললেন মহলানবীশ। 'সময় পেলে হয়তো সম্ভব। কিন্তু তা ক্রমশ কমে আসছে। প্রবলেম তো সেইটাই। সময় সংক্ষিপ্ত, অথচ আসল যে সমস্যার জন্যে তোমাকে ডেকেছি, তারও সম্ভাবনা দিনকে-দিন প্রকট হয়ে উঠছে...'

'আসল সমস্যা?' ঈষৎ ভুরু তোলে ইন্দ্রনাথ। 'এতক্ষণ যা বললেন, তা কি তা হলে'—

'বৈরিচক্রিকা।' অকস্মাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন মহলানবীশ। মুহূর্তের মধ্যে পালটে গেল ঘরের আবহাওয়া। পলকের মধ্যে পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠল বাকি তিনজনের মুখাবয়ব। আসন্ন ভয়ঙ্কর কিছুর সম্ভাবনায় যেন ঝিমি-ঝিমি বেজে উঠল বিপদ ডঙ্কা।

মেঘমন্দ্র কণ্ঠে বললেন চলচ্চিত্র মহলানবীশ, 'ইন্দ্রনাথ, একটা মোমের হাতের রহস্যভেদ করার জন্যে তোমাকে আমরা আহ্বান জানাইনি। চিঠিতে তোমাকে যা লেখা হয়নি, তা এখন শোনো। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তোমাকে স্মরণ করেছেন—কারণ, ধীরে-ধীরে, অনেক দিন ধরে, মাকড়শার জালের মতো ভয়াবহ একটা ষড়যন্ত্র অপারেশন নটরাজকে ঘিরে ধরছে। অপারেশন নটরাজ যদি সফল হয়, শুধু এশিয়ায় নয়, সমগ্র বিশ্বে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে ভারত—মিসাইল ছুড়েও এ-দেশের মাটিতে আঁচড় কাটা যাবে না। আর যদি ব্যর্থ হয়, অন্য অন্য দেশে কেউ সফল হয়—তা হলে আসবে ভারতে ঘোর দুর্দিন। সংক্ষেপে বলছি আমি।' বলে ব্রিফকেস থেকে কয়েকটা কাগজ বার করে চোখ বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'এক্ষেত্রেও আমরা আশাতীত সাহায্য পাচ্ছি আমাদের মূর্খ বন্ধু রঘুনাথ পোদ্দারের কাছ থেকে। প্রেত-পাগল রঘুনাথ প্রতিটি প্রেত-চক্রের পূর্ণ বিবরণ লিখে রাখে নিজের ডায়রিতে। তারই ফটো কপি এই রিপোর্ট। তাই প্রতিটি প্রেতচক্রের প্রতিটি ঘটনা, এমনকী প্রতিটি সংলাপও আমরা জেনেছি।

'ফলে, প্রফেসর বিক্রম বক্সী প্রেতচক্রে হাজির হওয়ার পর যা-যা ঘটেছে, তা আমরা জানি। ময়নার প্রেতাত্মা কী বলেছে, তাও জানি। প্রথমে ময়নার বিদেহী আত্মা নরলোকের রূপ পরিগ্রহ না করেই বাবার সঙ্গে কথা বলত। তারপর আবির্ভাব ঘটল অশরীরীর, আর তার হাতের। সবসুদ্ধ ঊনচল্লিশটা ভাষণের ফুল রিপোর্ট পেয়েছি—প্রফেসরের উদ্দেশে তাঁর মেয়ের মেসেজ। সমস্ত পড়ার দরকার নেই—কাগজপত্র দিচ্ছি, পরে দেখে নিও। শুধু একটা কথাই বলব। এই ঊনচল্লিশটা ভাষণ পড়বার পর শুধু একটা আশঙ্কাই প্রত্যেকেরই মনে দেখা দেবে। সে আশঙ্কা এই : অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আর অত্যন্ত শক্তিমান একটা দল ধীরে-ধীরে প্রফেসর বিক্রম বক্সীর মন দখল করার চেষ্টা করছে। তাঁর চিন্তাধারার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এমনভাবে জমি তৈরি হচ্ছে, যাতে স্বেচ্ছায় একদিন অপারেশন নটরাজের সিক্রেট বিক্রি করে দিতে পারেন প্রফেসর, অথবা তার চাইতেও যা ভয়ঙ্কর—হয়তো নিজের হাতেই গোটা প্রজেক্টটাকেই বিপথে চালিয়ে দিতে পারেন।'

কনকনে বরফ-স্রোত নেমে যায় ইন্দ্রনাথ রুদ্রের শিরদাঁড়া বেয়ে।

দম নিয়ে আবার শুরু করলেন মহলানবীশ, 'ময়না বক্সীর ডায়ালগ যেমন ইনটেলিজেন্ট, তেমনি সংযত। ধাপে-ধাপে কথার বাঁধুনি দিয়ে প্রফেসরের মন জয় করার চেষ্টা হয়েছে। অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে প্রফেসর নিজেও ধীরে-ধীরে অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছেন। একটা কথা ঠিক যে, এ সংলাপ, এ ভাষণ যাদের মাথা থেকেই বেরুক না কেন, মাত্রোয়ানিদের মগজ থেকে বেরোয়নি, বেরোতে পারে না।'

'ভৌতিক মগজ থেকেই?' অস্ফুট কণ্ঠে বলে ইন্দ্রনাথ।

'প্রায় তাই।' বললেন মহলানবীশ। 'সাইকোলজিক্যাল হ্যানো-ত্যানোর চাইতে অনেক শক্তিশালী, অনেক কার্যকরী। প্রথমে লেকচারটা আগেই বললাম। অনুনয়ের সুরে বাবাকে বলছে ময়না, তিনি যেন তার প্রেতাত্মার আবির্ভাবকে বিশ্বাস করেন। যাওয়ার সময়ে বিশ্বাস উৎপাদনের প্রথম প্রমাণও রেখে যায়—একটা জলেভেজা মোমের হাত। কিছুদিন চলল এই ভৌতিক আলাপচারি। মাঝে-মধ্যে দেখা যেতে লাগল যেন আলোর কণা দিয়ে গড়া অস্পষ্ট এক কিশোরী মূর্তিকে...নিষ্প্রভ লাল আলোয় কিশোরী এসে আদর করে গেল বাবাকে...কিন্তু ছুঁতে পারলেন না প্রফেসর...হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল ময়নার প্রেতাত্মা স্বয়ং...ছুঁলেই নাকি এখানে আসা তার বন্ধ হবে। ইহজগতে আর মরজগতে জীবনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অনেক কথাই বলল ময়না। তারপর থেকেই নিয়মিত আসতে লাগলেন প্রফেসর। মেয়েকে দেখার জন্যে, তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। এ-জন্যে নিশ্চয়

মোটা পারিশ্রমিকও দিতে হয়েছে তাঁকে। কেননা, বায়হীন প্রেতাত্মাকে কায়া ধার দিতে গিয়ে মুকবী মাল্রোয়ানির ঈশ্বরদত্ত শক্তির অনেকটা খরচ করতে হবে।

'মাসখানেক পর থেকেই ভায়ালগে পরিবর্তন আসা শুরু হল। পরলোকে এতদিন দিব্বি সুখে ছিল ময়না, কিন্তু এখন আর নেই। ইহজগৎ থেকে আরও অনেক ছেলেমেয়ে এসেছে, তারাও খুব অসুখী। বর্তমান পৃথিবীর যুদ্ধং দেহি মনোভাব, হাড় লড়াই, ক্রমাগত রণপ্রস্তুতি আর পৃথিবীব্যাপী মহাশূন্যের ওপরের বাসিন্দাদেরও উদ্বিগ্ন করেছে। কারও মনে শান্তি নেই। এক জায়গায় বলছে ময়না, বাবা, তুমি তো আমাকে সুখে রাখতে চাও, তাই না? কিন্তু তোমার একেবারে অপকর্মের জন্যে তো আমি সুখে থাকতে পারছি না। তুমি বলতে, আমাকে সুখে রাখার জন্যে তুমি সব করতে পারো। আমি বলি ওরা যদি আসতে দেয় তো আবার আসব।'

'স্কাউন্ড্রেল!' গর্জে ওঠেন মিঃ আচাও।

'এরপরের বৈঠকে এসে অন্য সুরে কথা বলতে থাকে ময়না ঃ ওরা নাকি ওকে আসতে দিতে চায়নি। জোর করে এসেছে ময়না। প্রফেসর এখন যা নিয়ে মেতেছেন, তা নাকি পৃথিবীর সর্বনাশ করবে। শান্তি তো আসবেই না, বৃদ্ধি পাবে কষ্ট, মানুষে-মানুষে বিরোধ, দ্বন্দ্ব। প্রতিটি মানুষকে অপরিসীম যন্ত্রণার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী। শুধু ইহজগতের মানুষ নয়, লোকান্তরিত আত্মারাও কষ্ট পাবে, ব্যথা পাবে, যন্ত্রণা ভোগ করবে। এরপর থেকে একটা নির্দিষ্ট রূপ নিতে শুরু করেছে অপারেশন নটরাজ-বিরোধী প্রচার। দিনে দিনে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনওদিন প্রফেসরের বার্তালাপতে সরাসরি আক্রমণ করা হয়নি। কিন্তু একটু-একটু করে সন্দেহের বীজ রোপণ করা হয়েছে অন্তরের কন্দরে। সন্তান স্নেহে অন্ধ হয়ে একটু একটু করে তিনি অন্য চিন্তা করতে শুরু করেছেন এবং ততই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তাঁর সর্বনাশা চিন্তাকে। বিবাহ আবির্ভাব ঘটেছিল ময়নার এখন সে ভয় দেখাতে শুরু করল। ওরা নাকি চায় না, ময়না আসুক এ জগতে। এই সে চলে যাবে চিরতরে—আর দেখা হবে না বাবার সঙ্গে। ছায়াপথের অনেক...অনেক দূরে শান্তির সন্ধানে যাবে সে আর ওরা।'

সহসা জেনারেল বরকাবতির দিকে ফিরে শুধোলে ইন্দ্রনাথ, 'আচরণ সম্পর্কে ইদানীং প্রফেসরের কোনও ঔদাসীন্য কি লক্ষ করেছেন?'

'না করলে আমরা এত ভাবছিই বা কেন, আর আপনাকেই বা ডাকব কেন।' বিরক্তিক্ত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন। 'এত মিটিং-সিটিং না করে একদিনেই প্রফেসরকে সমঝিয়ে দিতে পারি, আগুন নিয়ে খেলা করার বিপদ কী।'

যেন এই কথাটার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন মিঃ আচাও। কথার খেই তুলে নিয়ে বললেন একই সুরে, 'আমিও তাই বলি। পিকিং কি করাচিতে প্রফেসর পাড়ি জমাবার আগেই একুনি মাল্রোয়ানিদের বাড়ি সার্চ করা উচিত। কলের ওঁতোয় ভূত পালাবে। প্রফেসরেরও চোখ খুলবে।'

দুজনের কারওর কথার জবাব না দিয়ে ইন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে বললেন মহলানবীশ, 'অনেক কষ্টে এঁদের বুঝিয়ে ধরে রেখেছি। এঁরা যা বলছেন, এরকম পরিস্থিতিতে তা হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। মাল্রোয়ানিদের বাড়ি সার্চ করে আমরা কী পাব জানি না। কিন্তু প্রফেসরের সঙ্গে তাঁর মেয়ের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে। আর

যারা এ-কাজ করবে, যারা তাঁর মেয়েকে মরার পরেও ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তাঁর কাছ থেকে, তাদের কোনওমতেই তিনি ক্ষমার চোখে দেখবেন না। বাপ আর মেয়ের এই অলৌকিক সম্পর্ক গায়ের জোরে ছিঁড়তে গেলেই তাই হিতে বিপরীত হবে। অপারেশন নটরাজের দফারফা হবে।'

ঠোঁটের কোণ বেঁকিয়ে অনেকটা ভেংচি কাটার মতই অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে টিবিয়ে-টিবিয়ে বললেন জেনারেল বরকাবতি, 'পিকিং বা করাচিতে সিক্রেটটা পৌঁছে গেলে বিশ্বের বর্তমান ভারসাম্যেরও দফারফা হয়ে যাবে।'

যেন লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুতের মতই সম্ভাবনাটি ক্ষণেকের জন্যে অসাড় করে তোলে সকলের মস্তিষ্ককে। 'রুপোর চেনটা' খুলে ইন্দ্রনাথের দিকে নাড়তে-নাড়তে চেষ্টাকৃত সহজ কণ্ঠে বললেন চন্দ্রচূড় মহলানবীশ, 'ইন্দ্রনাথ, তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধকে এখনও ঠেকিয়ে রাখা যায় যদি আর একটা মোমের হাত তৈরি করে প্রফেসর বিক্রম বক্সীকে উপহার দিতে পারো।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ মাল্রোয়ানীদের প্রেত-ভবন

'এবার বলুন দিকি, আমার কাছ থেকে আপনি এক্জ্যাক্টলি কী আশা করেন? মানে, আমাকে দিয়ে কী করাতে চান?' ডক্টর চন্দ্রচূড় মহলানবীশকে প্রশ্ন করল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

ঘরে তখন দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। অনেক বাদানুবাদ, অনেক উত্তপ্ত আলোচনার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিচের সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিয়েছেন ভারত সরকারের তিন জাঁদরেল অফিসার।

ইন্দ্রনাথ কারও তাঁবেদারি পছন্দ করে না। কাজেই স্বাধীনভাবেই তদন্ত করতে দেওয়া হবে ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে। ইন্দ্রনাথের প্রথম লক্ষ্য হবে মাল্রোয়ানিদের প্রেতচক্র-রহস্য ভেদ করা।

সামরিক বিভাগ আর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর নিষ্ক্রিয় থাকবে না। তারা প্রফেসর বিক্রম বক্সীর গতিবিধির ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখবে—কিন্তু কোনওরকমেই তাঁকে উত্যক্ত করা চলবে না।

প্রতিদিন সকাল আটটায় আর রাত আটটায় মিঃ আচাওর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখবে ইন্দ্রনাথ। এ ছাড়াও যদি কোনও জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, আচাও-এর সহযোগিতা ইন্দ্রনাথ সর্বদাই পাবে।

ঘর ফাঁকা হয়ে যাওয়ার পর অতঃপর প্রশ্ন করল ইন্দ্রনাথ। তক্ষুনি কোনও জবাব দিলেন না মহলানবীশ। জানলার মধ্যে দিয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন দিগন্তের পানে—যেখানে বরফ-ছাওয়া পাহাড়ের ওপর অরুণ-কিরণ আরও উজ্জ্বল, আরও প্রখর।

তারপর মুখ ফিরিয়ে প্রশান্ত চোখ মেলে বললেন, 'ইন্দ্রনাথ, বিক্রম আমার বন্ধু। ওকে তুমি বাঁচাও।'

'তাই নাকি!' সত্যি সত্যিই অবাক হয়ে যায় ইন্দ্রনাথ।

'বিক্রম বক্সী আমার পুরোনো বন্ধু। বছর তিরিশ আগে ওর সঙ্গে আমার প্রথম

আলাপ ঘটে আশুতোষ মিউজিয়ামে। এরাও তা জানে। তাই সরকারি-সূত্রে এরা যখন আমার কাছে এল সাহায্যের আশায়, তখন আমি উদ্বিগ্ন না হয়ে পারি না। উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম এদের প্ল্যান শুনে। এদের প্ল্যানমাফিক কাজ হলে প্রতিটি ভারতবাসী প্রফেসর বিক্রম বক্সীর নাম শুনে ঘৃণায় মুখ বাঁকাবে। বিক্রমের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু উনি যে-পথে চলেছেন, সে-পথে এটাই তো ওঁর প্রাপ্য।'

'জানি, জানি,' বেদনা-করুণ মুখে বললেন মহলানবীশ, 'কিন্তু ভুলে যেও না, সে আমার তিরিশ বছরের বন্ধু। তার মতো সাচ্চা মানুষ এ দুনিয়ায় বেশি নেই ইন্দ্রনাথ। কিন্তু মেয়ের শোকে ও পাগল হতে বসেছিল। ঠিক সেই সময়ে প্রেতাত্মার দেখা পাওয়ায় ও এখন মোহান্ধ, বেহুঁশ, মাথার ঠিক নেই। ওর হুঁশ ফিরিয়ে আনতে হলে পশুশক্তি প্রয়োগ করলে চলবে না। হাজার হোক বৈজ্ঞানিক তো—যুক্তি কখনও অস্বীকার করে না।'

নীরব হলেন মহলানবীশ। ক্ষণকাল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর অদ্ভুত স্বরে বললেন, 'সেই জন্যেই বলছিলাম, মোমের হাতটার মতো হুবহু আর-একটা হাত ঠিক ওই পরিবেশে যদি তৈরি করতে পার, তবেই ওর নেশা ছুটবে।'

'কিন্তু—'

'কোনও কিন্তু নয়, ইন্দ্রনাথ। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। আর সে মানুষ বুদ্ধিমান হলে তো কথাই নেই। তুমি বুদ্ধিমান। আর সেই জন্যেই এদের খপ্পর থেকে বিক্রমকে রক্ষা করার জন্যে তোমাকে ডেকেছি। এ-জন্যে অবশ্য আগেই প্রাইম মিনিস্টারের সম্মতি আদায় করেছি। মাস্ক্রোয়ানিদের প্রেতচক্রের পিছনে যে মাথা কাজ করছে, তাকে তোমাকে আবিষ্কার করতেই হবে। তাদের চক্রান্ত ফাঁস করতেই হবে। ময়নার সংলাপ আসলে যে কাদের সংলাপ, তা আমাদের জানতেই হবে। ইন্দ্রনাথ, তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। বিক্রম বক্সীকে বাঁচাতেই হবে।'

অকৃত্রিম ব্যাকুলতা ভাস্বর হয়ে ওঠে বৃদ্ধের দুই চোখে। বিনম্র কণ্ঠে বলে ইন্দ্রনাথ, 'আমি আমার যথাসাধ্য করব, স্যার। কথা দিচ্ছি।'

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকার পর সহজ কণ্ঠে বললেন মহলানবীশ, 'আমার দিক থেকে তোমার জন্যে কী করতে পারি বলো?'

'মাস্ক্রোয়ানিদের বৈঠকে আমি হাজির হতে চাই।'

'সেটা খুব কঠিন হবে না। তোমার নাম, ধরো, ফাল্গুনী রায়। উত্তরবুক রঘুনাথ পোদ্দারকে একটা চিঠি দিচ্ছি। তাতে লেখা থাকবে, ফাল্গুনী রায় আমার পুরোনো ছাত্র। ব্যাচেলর। কিন্তু প্রচুর সম্পত্তির মালিক। কিছুদিন আগে ফাল্গুনী রায় যাকে বিয়ে করবে মনস্থ করেছিল, হঠাৎ সে মারা যায় মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেরিব্রাল হেমারেজ হওয়ায়। তারপর থেকেই ফাল্গুনী রায়ের মনে আর শান্তি নেই। দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ায় পাগলের মতো। রঘুনাথ যদি তাকে কোনওরকম সাহায্য করতে পারে, তা হলে বিশেষ উপকৃত হব। রঘুনাথ এদিক দিয়ে ইতিমধ্যে মাথামোটা। বাকিটা তোমাকে অভিনয় করতে হবে। তোমার যে অনেক টাকা আছে, এ-কথাটা মাস্ক্রোয়ানিদের কানে একবার উঠলেই কাজ হবে। তারপর—'

'তারপর মনে-মনে গড়ে নেব আমার প্রেয়সীকে। দেখা করতে চাইব তার

প্রেতাত্মার সঙ্গে, এই তো?' হাসি মুখে বললে ইন্দ্রনাথ, 'আমি রাজি। টাকার টোপ ফেললে সবই সম্ভব।'

দিল্লি।

পূর্বব্যবস্থা মতো একটা রেস্তোরাঁয় রঘুনাথ পোদ্দারের সঙ্গে দেখা হল ইন্দ্রনাথের।

রঘুনাথের চেহারা আর সাজসজ্জা দেখলে পঞ্চাশ বছর আগেকার বাংলার তরুণের ছবি মনে পড়ে যায়। তেল-চকচকে চুলে লম্বা সিঁথি। পাকানো গোঁফ। গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি। চুনোট-করা ধুতি। পালিশ-করা ছুঁচোলো পাম্প শু।

চন্দ্রচূড় মহলানবীশের চিঠিখানা পড়ে অত্যন্ত সিরিয়াস ভঙ্গিতে চোখ তুলে তাকাল রঘুনাথ।

'কদ্দিন হল?'

কথাটা শুনতে পেল না ইন্দ্রনাথ। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত কোলের ওপর রেখে পলকহীন চোখে সামনের দিকে তাকিয়েছিল সে। শূন্য দৃষ্টি।

গলা খাঁকরে আবার জিগ্যেস করল রঘুনাথ, 'মারা গেছেন কদ্দিন আগে?'

চমক ভাঙল ইন্দ্রনাথের। ঈষৎ চমকে উঠল।

'কিছু বলছেন?'

'বলছি যে, উনি মারা গেছেন কবে?'

'কবে? ঠিক বলতে পারব না...তবে বছর খানেক তো বটেই! মনে হয় এই সেদিন...কী যেন হয়ে গেল...তারপর দিনে-রাতে কিছুতেই তাকে ভুলতে পারি না। কত রাত ঘুমোতে পারি না...ঘুমোলেই স্বপ্নে দেখি তাকে...কথা বলতে পারছে না আইভি...কাছে আসতে চাইছে...আসতে পারছে না...অবরুদ্ধ বেদনায় দু-হাত বাড়িয়ে কী যেন বলতে চাইছে...ঠোঁট কাঁপছে...চোখে জল...আইভি...আইভি...আমি যে আর পারছি না—'

চোখে জল এসে যায় ইন্দ্রনাথের। অব্যক্ত বেদনায় করুণ হয়ে ওঠে মুখচ্ছবি, কান্নার মতই ভেঙে পড়তে চায় কণ্ঠ।

আবেগ জিনিসটা সংক্রামক। রঘুনাথ নিজেও আর সংযত থাকতে পারে না। সহানুভূতির কণ্ঠে বলে, 'ফাল্গুনীবাবু, শান্ত হন। মাস্টারমশাইয়ের চিঠি নিয়ে যখন এসেছেন, তখন আমি আমার যথাসাধ্য করব। স্বপ্নে যখন আপনার প্রেয়সীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তখন তাঁর কণ্ঠ আপনি শুনতে পাবেন।'

'কণ্ঠ শুনতে পাব?' বিহ্বল কণ্ঠ ইন্দ্রনাথের।

'শুধু কণ্ঠস্বর কেন, আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হলে দেখাও পেতে পারেন।'

দুই হাতে রঘুনাথের দু-হাত জড়িয়ে ধরে ইন্দ্রনাথ, 'বলুন, বলুন, তা কী করে সম্ভব?'

বিজ্ঞের মতো হেসে বললে রঘুনাথ, 'সম্ভব, সবই সম্ভব। আপনাদের আধুনিক বিজ্ঞান আর কতটুকুরই বা সন্ধান পেয়েছে? আপনি হিন্দুর ছেলে, জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করেন নিশ্চয়?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। ডেভিড মাস্ক্রোয়ানির সঙ্গে ফাল্গুনী রায়ের ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে দেবে রঘুনাথ। তারপর?

তারপর, প্রিয়া-মিলন। স্বপ্ন-দৃষ্ট আইভি মল্লিকের প্রেতশরীরে আবির্ভাব এবং ফাল্গুনী রায়ের সঙ্গে কথোপকথন।

পুরোনো দিল্লির সবজিমণ্ডী

কুখ্যাত বাইজী পল্লী থেকে কিছু দূরে একটা তিনতলা বাড়ি। ফটকের পর একফালি বাগান। তারপর কয়েক ধাপ সিঁড়ি।

চারটে বাজতে পাঁচ মিনিটের সময়ে লোহার ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। ডেভিড মাল্লোয়ানির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চারটের সময়ে।

কলিংবেল টেপার আধ মিনিটের মধ্যেই ফটকের ওপাশে এসে দাঁড়াল মুশকো চেহারার এক ব্যক্তি। ঘাড়ে-গর্দানে, এক্মাথা জোড়া টাক—চুলের চিহ্নমাত্র নেই। থ্যাবড়া নাক। ছোট চোখ। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর কালো প্যান্ট। সব মিলিয়ে কুস্তিগীর পালোয়ানের মতো চেহারা।

'কাকে চাই?'

'আমার নাম ফাল্গুনী রায়। মিস্টার মাল্লোয়ানির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'ভেতরে আসুন।'

ভেতরে, মানে ঘরের ভেতরে নয়। একটা অপরিসর গলিপথে ইন্দ্রনাথকে দাঁড় করিয়ে সামনের হলঘরে ঢুকল গাঁট্টাগোট্টা লোকটা। ওপাশের আর-একটা দরজা দিয়ে উধাও হল বাড়ির ভেতরে।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলে ইন্দ্রনাথ। গলিপথে একটি মাত্র মান্ধাতা আমলের ল্যান্ডস্কেপ ছাড়া আর কিছু নেই। পুরোনো ছবির ওপর পুরু ধুলোর স্তর।

পেঁয়াজ আর রসুন ভাজার গন্ধ ভেসে এল নাসিকারন্ধ্রে। সেইসঙ্গে কাচের বাসন নাড়াচাড়ার শব্দ।

মনে-মনে হাসে ইন্দ্রনাথ। আর পাঁচটা গেরস্ত বাড়ির মতই পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা মন্দ নয়।

মসমস শব্দে কে যেন এগিয়ে আসছে হলঘরের মধ্যে দিয়ে। পরমুহূর্তেই পর্দা সরে গেল। চৌকাঠের ওপর ছবির মতো স্থির হয়ে দাঁড়াল এক সুদীর্ঘ পুরুষ। চওড়া চোয়াল। মাথার মাঝখানে মসৃণ টাক ঘিরে বলয়াকার কেশগুচ্ছ। বলিরেখাঙ্কিত ললাট। তীক্ষ্ণ নাসা। চারকোল গ্রে কলারের মূল্যবান টেরিন সুট আর স্পটেড নেকটাই।

একবার তাকাতে ইচ্ছা যায়, চোখ ফেরানো যায় না—এমনি ব্যক্তিত্ব।

'গুড আফটারনুন, মিস্টার ফাল্গুনী রায়।'

যেন অর্গানের রিডে দশ আঙুল খেয়ে গেল, এমনি গমগমে কণ্ঠস্বর। অকৃত্রিম বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে ফাল্গুনী রায় ওরফে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এমন আশ্চর্য কণ্ঠ আর প্রখর ব্যক্তিত্ব দিয়ে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মনেও বিশ্বাস উৎপাদন করা এমন কিছু কঠিন বস্তু নয়।

হুঁশিয়ার হয়ে যায় ফাল্গুনী রায়। ডেভিড মাল্লোয়ানি আর যাই হোক, নির্বোধ নয়। এই মুহূর্ত থেকে চিন্তার রাজ্যেও উপস্থিত হোক, প্রেয়সী বিধুর ফাল্গুনী রায়—অন্তর্ধান ঘটুক গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্রের।

ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি টেনে এনে বললে ফাল্গুনী, 'গুড আফটারনুন।'

'ভেতরে আসুন।'

হলঘরে প্রবেশ করে দুজনে। আরামকেদারায় বসার পর স-সঙ্কোচে বলে ফাল্গুনী রায়, 'এ শহরে আমি আগন্তুক। তবুও আমার সঙ্গে আপনি দেখা করতে রাজি হয়েছেন শুনে—'

আবার অর্গান বেজে ওঠে, 'রঘুনাথ পোদ্দারের কোনও বন্ধুই এ বাড়িতে আগন্তুক নয়। তাঁর বন্ধু আমাদেরই বন্ধু। আমার নাম ডেভিড মাল্লোয়ানি। আপনি এসেছেন আমাদের সাহায্যের আশায়। চার্চ অফ দি হোলি ওয়ান অ্যান্ড কাইন্ড জেসাস বিশ্বাসীকে কখনও বিমুখ করেনি।'

অর্থহীন গালভরা শব্দগুলো নামের গুরুগম্ভীর উচ্চারণে ফাল্গুনী রায়ের মাথা ঘুরে যায়। আর, অন্তরের কন্দর থেকে সজাগ হয়ে ওঠে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ধাপ্পা, সমস্তই ধাপ্পা। কিন্তু ডেভিডের সঙ্গীতময় কণ্ঠে তা পরম সত্য হয়ে মুহূর্ত মধ্যে যেন বিস্ময়কর পরিবর্তন আনল ঘরের পরিবেশে।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে বললে ফাল্গুনী রায়, 'আপনার অসীম দয়া।'

প্রশান্ত-কণ্ঠে বললে ডেভিড, 'আমাদের ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু তার মধ্যে যদি কিছু সম্ভব হয়, নিশ্চয় করব।'

টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে দুই করতালুর মধ্যে মাথা রেখে বসল ফাল্গুনী রায়। দুই চোখে তার বেদনাই দৃষ্টি। কিন্তু অন্তরে পাক খাচ্ছে চিন্তার ঘূর্ণি। টেবিলের ঠিক কেন্দ্রে চাইনিজ জেডের একটা সিগারেট বক্স। কাশ্মীরি আখরোট কাঠের তৈরি ড্রাগন-খোদাই মশলার বাক্স। রোজউডের ওপর হাতির দাঁতের কাজ করা ছাইদানি। মোরাদাবাদি টেবিল ল্যাম্প। আর-একটি সুন্দরী তরুণীর আলোকচিত্র। ওপরে লেখা—অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মিস্টার আর মিসেস মাল্লোয়ানিকে দিলুম'।

ফাল্গুনী রায় ভাবছিল, আইভি মল্লিকের সঙ্গে তার শেষ দিনটি। কল্পনার চোখে দেখছিল চকিতচঞ্চল। সেই আঁখি, সেই গোপন হাসি, লোধারুণ আনন, বঙ্কিম ভুরু, কপট কলহ, যৌবনরঙ্গ। গোধূলির আঁধারে আইভির শিথিল কবরীর মিষ্টি সৌরভ—স্মৃতিতে আবেগ-মধুর হয়ে আসে দুই চোখ।

'সিগারেট খান, সহজ হতে পারবেন।' বলেই, পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বার করে খটাং করে খুলে ধরলে ডেভিড।

'ধন্যবাদ। আমি পাইপ খাই। কিন্তু এখন নয়।'

'এখনও শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি দেখছি।'

চোখ তুলল ফাল্গুনী রায়। সমবেদনার কোমল স্পর্শে সজল চোখে অব্যক্ত বেদনা, 'আমি পারি না, কিছুতেই ভুলতে পারি না।'

'অসঙ্কোচে সব বলুন আমার কাছে।'

বলল ফাল্গুনী রায়। থেমে থেমে, টুকরো-টুকরো ঘটনা বর্ণনা করে, অসংলগ্ন আবেগরুদ্ধ ভাষায় রচনা করল আইভি মল্লিকের সম্পূর্ণ কাল্পনিক আলেখ্য।

বলল ফাল্গুনী রায়। কিন্তু ভাবল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। আইভি মল্লিকের তন্বী নীলাম্বরী রূপ কল্পনার সঙ্গে-সঙ্গে সমানে ভাবতে লাগল মাইক্রোফোনটা লুকনো আছে কোথায়? চাইনিজ জেডের সিগারেট বক্সে? ডেভিড এখান থেকে সিগারেট অফার না করে সোনার

সিগারেট কেস খুলেছিল। টেবিল ল্যাম্পেও থাকতে পারে। টেপরেকর্ডে উঠে যাচ্ছে আইভি মল্লিকের সমস্ত খুঁটিনাটি। এমনও হতে পারে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কুস্তিগীর পালোয়ানটা খাতা-পেন্সিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথবা, অন্য ঘরে কান খাড়া করে আইভি মল্লিকের যাবতীয় তথ্য মুখস্থ করে নিচ্ছে মিডিয়াম মহিলা স্বয়ং

একহাতে জেডের সিগারেট বক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল ডেভিড। খট করে খুলে যেতেই ভেতরে দেখা গেল কয়েক সারি সিগারেট। অমূলক আশঙ্কা। মাইক্রোফোন এখানে নেই। তবে কি ছবির ফ্রেমে আছে? চেয়ারের পেছনেও থাকতে পারে। আজকাল আলট্রা-সেন্সিটিভ মাইক্রোফোনে দশ ফুট দূর থেকেও ফিসফিস করে কথা বললে ধরা পড়ে।

বাইরে কিছু প্রকাশ পেল না। আবিষ্ট ফাল্গুনী রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল তার নিখাদ ভালোবাসার কথা। ফুলের মতো নিষ্পাপ প্রেয়সীর কথা। জ্যোৎস্নাশুভ্র রাতে রুপোলি আলোয় ধোওয়া ছাদে বসে আইভির মোমের মতো ধবধবে সুন্দর নরম মুখটির গভীর প্রেমে ছলো-ছলো কালো নয়ন দুটি দেখে মনে হতো—মিথ্যে, মিথ্যে, সব মিথ্যে—সত্য শুধু ওই দুটি গভীর ভ্রমর-কৃষ্ণ আঁখি।

আর সত্যিই একদিন সব মিথ্যে হয়ে গেল—দুনিয়ার সব আনন্দ-সুখ ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। আইভি মারা গেল।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ফাল্গুনী রায়।

অবশেষে নৈঃশব্দ ভঙ্গ হল অর্গান-কণ্ঠে। সহানুভূতি-স্নিগ্ধ দরদি স্বরে বলল ডেভিড মাহ্রোয়ানি, 'মিস্টার রায়, চার্চ অফ দি হোলি ওভেন অ্যান্ড কাইন্ড জেসাস আপনার জন্যে যথাসাধ্য করবে। প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটানোর জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে আমার স্ত্রী। শুধু আইভি মল্লিকের কথাই শুনতে পাবেন না, তাঁকে দেখতেও পাবেন। তাতে প্রচণ্ড চাপ পড়বে মিডিয়ামের ওপর, কিন্তু ওর ক্ষমতা আছে, ও পারবে।'

আশা-প্রদীপ্ত উদ্বিগ্ন চোখ তোলে ফাল্গুনী রায়। আর উৎকর্ণ হয় ইন্দ্রনাথ রুদ্র—এবার আসছে অর্থের প্রসঙ্গ। কত টাকা হাঁকবে ডেভিড? দুশো? পাঁচশো? না, তারও বেশি?

'মিস্টার রায়, মিসেস মাহ্রোয়ানির দেবদত্ত অসামান্য ক্ষমতার বলে এই বাড়িতে অনেক আশ্চর্য কাণ্ড এর আগে ঘটেছে। প্রেতাত্মার মজলিশ বসবার পর এমন সব অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যে অনভ্যস্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তা সহ্য করতে পারে না। আমাদের বৈঠকে দেহহীনা স্ত্রী এসে আলিঙ্গন করে গেছে বিপত্নীক স্বামীকে। অশরীরী মেয়ে এসে আদর করে গেছে শোকসন্তপ্ত বাবাকে। একবার একটা হারানো দলিলের সন্ধান দিয়ে লাখ টাকার সম্পত্তি ফিরিয়ে এনেছে ছোট একটি ছেলের প্রেতাত্মা। অনেক অঘটনই ঘটে এখানে। সবই সম্ভব হয় মিডিয়ামের ভগবান দত্ত শক্তিবলে। কিন্তু সেজন্যে আমরা কানাকড়িও গ্রহণ করি না। আমরা সবাই যিশুর সেবক।'

চোখেমুখে অপরিসীম উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে তোলে ফাল্গুনী রায়। অন্তরাল থেকে ইন্দ্রনাথ রুদ্র মুচকি হাসে। ভনিতাটা মন্দ না।

'আপনি রঘুনাথ পোদ্দারের বন্ধু। তার ওপর মানসিক কষ্ট আপনার চরমে উঠেছে। তাই হোলি চার্চে সামান্য কিছু দান করার অনুরোধ করব আপনাকে। সামান্য অর্থ। দশের সেবায় সে টাকা ব্যয় করা হবে।'

'কত?' ব্যাকুল কণ্ঠ ফাল্গুনী রায়ের।

'দশ হাজার।'

আর একটু হলেই মুখোশ খসিয়ে আঁতকে উঠত ইন্দ্রনাথ রুদ্র। অত কষ্টে মুখভাব অবিকৃত রাখে ফাল্গুনী রায়। ঠগ-শিরোমণি বলে কী? দশ হাজার? কলকাতার প্রতারকরা শ-পাঁচেক পেলেই বর্তে যেত।

'আমি রাজি।' আনন্দোজ্জ্বল মুখে বললে ফাল্গুনী রায়। মনে-মনে ভাবলে, প্রেতাত্মাকে দেখতে পাওয়ার গ্যারান্টি যখন পাওয়া যাচ্ছে—তখন দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

'দানের অর্থ কিন্তু আমরা নগদ গ্রহণ করি।' বলল অর্গানকণ্ঠ।

'তাই হবে।'

'আগামী কাল রাতে আমাদের চক্র বসছে। রাত নটায়। এই কার্ডটা সঙ্গে আনবেন।'

বলে, ড্রয়ার থেকে একটা ছাপানো কার্ড বার করল ডেভিড। ওপরে উঁচু উঁচু হরফে লেখা : চার্চ অব দি হোলি ওভেন অ্যান্ড কাইন্ড জেসাস। তলায় লিখল, 'একজনের প্রবেশপত্র। ডেভিড মাহ্রোয়ানি।'

ক্ষণকাল পরেই সর্দজিমণ্ডীর জনবহুল পথ দিয়ে হাঁটতে দেখা গেল দশ হাজার টাকার চিন্তায় আকুল ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : চীনের বোমা

লাল চীনের হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরিত হল হিমালয়ের ওপারে। এপারে থরথর করে কেঁপে উঠল লোকসভা।

ঠিক সেই সময়ে টেবিলের ওপর দিয়ে মিঃ আচাও এগিয়ে দিলেন দশ হাজার টাকার একটা বান্ডিল।

টাকা স্পর্শ করল না ইন্দ্রনাথ। বলল, 'আমি কিন্তু শুধু এ-জন্যে আসিনি।'

'তবে?'

'অপারেশন নটরাজ সম্বন্ধে আমি আরও কিছু জানতে চাই।'

তেরছা চোখের পাতা একটুও কাঁপল না। আচাও শুধোল, 'কী জানতে চান?'

'সিবারনেটিকস, প্রফেসর বিক্রম বক্সী আর অপারেশন নটরাজের মধ্যে সম্পর্ক-সূত্রটা কী ধরনের?'

চোখ নামিয়ে নখ দিয়ে কিছুক্ষণ কাচের ওপর আঁচড় কাটল মিঃ আচাও। তারপর বলল, 'বিশ্বের আধুনিকতম বিজ্ঞান হল সিবারনেটিকস—যার সর্বাধুনিক নাম বায়োনিকস। সিবারনেটিকস-এর বিশাল পরিধির মধ্যে আসে যন্ত্রের যান্ত্রিকতা আর জীবন্ত প্রাণীর সজীবতা নিয়ন্ত্রণ। সাধারণের ভাষায় আমাদের প্রত্যেকের দেহে আছে ওয়ান হানড্রেড মিলিয়ন মিলিয়ন অটোমেটিক সিবারনেটিক কোষ—প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে পেয়েছে নিজের কাজ, ভবিষ্যতের প্রোগ্রাম। প্রফেসর বিক্রম বক্সী অবশ্য যন্ত্রের যান্ত্রিকতা কনট্রোল করা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন।

'পৃথিবীর আরও ছটা দেশে এ সম্পর্কে রিসার্চ চলছে। তার মধ্যে আছে ব্রিটেন, আমেরিকা, ইটালি, রাশিয়া। কিন্তু বহুদেশের চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছেন প্রফেসর বক্সী। ইলেকট্রনিকস-এর চরম ব্যবহার যে সম্ভব, তা নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন উনি। ফলে, গ্রহে-উপগ্রহে নির্দেশ পাঠানো থেকে শুরু করে রোবট সৃষ্টি রহস্যও ওঁর করায়ত্ত।'

'কিন্তু অপারেশন নটরাজের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

'মিসাইলের নার্ভাস সিসটেম আর মেকানিক্যাল ব্রেন যত জটিল হচ্ছে, যতই মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রের কাছাকাছি এসে পৌঁছচ্ছে, ততই তাকে কন্ট্রোল করার সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মিসাইলের ভেতরে যে আদেশ টেপ করা থাকে, সেই আদেশের রদবদল করার পন্থা আবিষ্কার করেছেন প্রফেসর। ফলে, তিনি ঘরে বসে রেডিও মারফত মিসাইলকে টেপের আদেশ অমান্য করাতে পারেন, এমনকী উলটোমুখে ঘুরে যেতেও বাধ্য করাতে পারেন।'

'মাই গড! এ যে ব্রহ্মনিনাদী শক্তিশেলকেও ফিরিয়ে দেওয়া!'

'ঠিক তাই। বুমেরাঙের নতুন সংস্করণ। ক্ষেপণাস্ত্রকে যে পাঠিয়েছে, তার হাতেও ফেরত দেওয়া যাবে, অথবা ভারত মহাসাগরেও আছড়ে ফেলা যাবে। সাধারণ জেটকে যেদিকে খুশি চালানো যাবে—পাইলট অসহায় অবস্থায় দেখবে প্লেন নিয়ন্ত্রণ করছে এক অদৃশ্য শক্তি।'

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা সম্ভাবনা খেলে যায় ইন্দ্রনাথের মস্তিষ্কে, 'আচ্ছা, এই জন্যেই কি চীনের বোমা ফাটানো সত্ত্বেও ভারত সরকার পারমাণবিক বোমা বানাতে চাইছে না?'

এ প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না মিঃ আচাও। কিন্তু নীরবতা থেকেই ইন্দ্রনাথ অনুমান করে নিলে, গভর্নমেন্টের সুদৃঢ় প্রতিরক্ষানীতির প্রকৃত শক্তি কোথায় নিহিত।

মিঃ আচাও বললেন, 'ভেবে দেখুন, সিবারনেটিকসের মৌলিক কৌশল রহস্য যখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হবে, তখন রাতারাতি বন্ধ হয়ে যাবে মিসাইল-রেস। মানুষ আর আকাশযুদ্ধে সাহসী হবে না। যদিও বা লড়াই হয়, তা হবে সেকেলে হাতাহাতি যুদ্ধ। পৃথিবীর সমস্ত দেশে আসবে শান্তি—সমৃদ্ধি ঘটবে দ্রুত লয়ে। কিন্তু গভর্নমেন্টের এই শুভ প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্যে অস্থির হয়েছে বিদেশি চক্রচক্র। সাফল্য যখন হাতের মুঠোয়, ঠিক তখনি, প্রফেসরেরই অস্ত্রনিক্ষেপ শুরু হল প্রফেসরের ওপরে।'

'তার মানে?'

'সিবারনেটিকস! এবার অন্যদিক—জীবন্ত প্রাণীকে দূর থেকে কন্ট্রোল করা।'

'বলছেন কী মশাই?'

'ঠিকই বলছি। প্রফেসরের নার্ভাস সিসটেম আর ব্রেনের সঙ্গে যোগাযোগের একটা পথ কেউ বার করে ফেলেছে। প্রফেসরের দেশপ্রেম, দেশানুগত্য, কর্মনিষ্ঠা, সততা, বিচক্ষণতা, বিবেক—মগজের মধ্যে ঢুকিয়ে এই সবকটা সৎ গুণকেই বিপরীত পথে পরিচালনা করার জন্যে শত্রুপক্ষ একটির পর একটি আদেশ পাঠিয়ে চলেছে। কাজ হচ্ছে ধীরে...কিন্তু প্রফেসরের মতো শক্তিশালী মগজকেও বাধ্য করা হচ্ছে...আদেশ আসছে গবেষণার গুপ্ত রহস্য দেশের বাইরে পাচার করে দেওয়ার জন্যে...আদেশ আসছে এক্সপেরিমেন্টে গলদ সৃষ্টি করে অপারেশন নটরাজকে বানচাল করে দেওয়ার জন্যে।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ প্রেতাবতরণ বৈঠক

রাত নটা।

প্রেততত্ত্বাধিবেশন কক্ষে পৌঁছল নীরবেই এক যুবক। দুই চোখে তার প্রিয়াবিয়োগ-বিধুর উদাস দৃষ্টি। নাম ফাল্গুনী রায়।

ভৌতিকতন্ত্রের উপযুক্ত ঘর। ঘরের কোণে একটা ক্যাবিনেট। বেশ বড় ক্যাবিনেট। চৌকোণ। লম্বায় চওড়ায় দশ ফুট। ক্যাবিনেটের ছাদ প্রায় ঘরের ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। পুরু ভারী কালো পর্দা ঝুলছে সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত—এই হল ক্যাবিনেটের প্রবেশপথ।

চৌকোণা জায়গাটিতে আসবাবপত্রের বিশেষ বাহুল্য নেই। একটি মাত্র কাশ্মীরি আখরোট কাঠের টেবিল—তিনটি পায়াতে অপূর্ব কারুকাজ। পাশে একটা চেয়ার। টেবিলের ওপর একজোড়া খঞ্জনি, একটা মন্দিরে আরতি করার পুরুত-ঘণ্টা, ক্ষুদ্রাকার ট্যাম্বুরিন—জিপসি নাচের সময়ে যেমনটি দেখা যায়, কথার বলার টিনের চোঙ, এককোণে একটা অর্গান।

ক্যাবিনেটের দু পাশে দুটি জানলা। জানলায় পর্দা নামানো। একটি জানলার নিচে একসারি সুইচ। সুইচের পাশেই একটা বড় আকারের ক্যাবিনেট রেডিওগ্রাম। অটোমেটিক রেকর্ডচেঞ্জার।

ঘরের এদিকের দেওয়াল ঘেঁষে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো মোট ডজনটি চেয়ার।

ফাল্গুনী রায়ের বিষাদমাখা মুখোশের অন্তরালে হুঁশিয়ার ইন্দ্রনাথ রুদ্র একটু হাসল। নতুন কিছুই নেই। বিশ্বের সব প্রেততত্ত্বানুশীলন কক্ষে যে সাজসজ্জা দেখা যায়, এখানেও তাই। ক্যাবিনেট রাখা একান্তই দরকার। নতুবা মেটিরিয়ালাইজেশন মিডিয়ামদের সব জারিজুরিই ফাঁস হয়ে যায়। মিডিয়ামের দেহজাত তেজোময় একটোপ্লাজম আহরণ করে তার সঙ্গে আত্মার শক্তির মিশ্রণ ঘটে বিস্মিত দর্শকদের সামনে আবির্ভূত হয় প্রেতমূর্তি। কেউ আসে জ্যোতির্ময় রূপ নিয়ে, কেউ আসে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন নির্বোধ রূপ নিয়ে। কালো পর্দার অন্তরালে নিশ্ছিদ্র তমিস্রার মধ্যে গোপন থাকে মৃতাত্মাদের পার্থিব দেহধারণের চাঞ্চল্যকর রহস্য।

প্রখর ব্যক্তিত্ব নিয়ে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে ডেভিড মাস্ক্রোয়ানি। আশপাশে বারোজন স্ত্রী-পুরুষ। ভরাট কণ্ঠের গলায় সূক্ষ্ম শরীর আর স্থূল শরীরের পার্থক্য বোঝাচ্ছিল ডেভিড। ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে সবাই তাই শুনছে।

আবার হাসি পায় ফাল্গুনী রায়ের। কথা যত কম বোঝে, অবুঝরা ততই ভক্তি করে। সুচতুর ডেভিড সে তথ্য ভালোভাবেই জানে। তাই এই অশাস্ত্রবাক্যের অবতারণা।

অভ্যাগতদের মধ্যে প্রফেসর বিক্রম বক্সী নেই।

ফাল্গুনী রায়কে দেখেই সাদরে অভ্যর্থনা জানাল ডেভিড মাস্ক্রোয়ানি। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে স্লাইডিং দরজা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী।

নিমেষে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা নেমে এল ঘরের মধ্যে। কিন্তু কারও দিকে তাকালেন না প্রফেসর। ধীরপদে গিয়ে বসলেন অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো চেয়ারের ঠিক মাঝখানটিতে।

অসাধারণ মূর্তি প্রফেসর বিক্রম বক্সীর। সিংহের কেশরের মতো একমাথা ধবধবে

সাদা চুল বিন্যস্ত। প্রশস্ত ললাটে অসামান্য প্রতিভা আঁকা। অসম্ভব তীক্ষ্ণ তীব্র দুই চোখ। দৃঢ় চিবুক। চওড়া চোয়াল। মাংসল মুখ। কিন্তু টিকোলো নাক।

মলিন বেশবাস। প্যান্টে অসংখ্য ভাঁজ। ফতুয়ার মতো সুতির বুশশার্ট। শার্টের পকেটদুটো বুকের কাছে না থেকে তলপেটের কাছে। সব মিলিয়ে সিংহের মতো বিচক্ষণশালী অগোছালো এক বৈজ্ঞানিক—যাঁর ধীশক্তির ওপর নির্ভর করছে ধরাগোলার্ধের শান্তি। নৈঃশব্দ্য। প্রেত-বৈঠকের সবচেয়ে সংবেদনশীল উপাদান নিঃশব্দতা নেমে আসে কক্ষমধ্যে। ইঙ্গিতে চেয়ারের দিকে সবাইকে যেতে নির্দেশ দেয় ডেভিড মাস্ত্রোয়ানি—যেন কথা বললেই তীব্রতম মুহূর্তের গতিশীলতা ব্যাহত হবে।

প্রফেসরের পাশেই বসল ডেভিড। ফাল্গুনী রায়ের ডাইনে রইল ডেভিড আর বামে রঘুনাথ পোদ্দার। সবকটা চেয়ার ভর্তি হয়ে যাওয়ার পর ঘরে ঢুকল সেই কুস্তিগীর পালোয়ান সদৃশ লোকটা। নীরবে গিয়ে দাঁড়াল সুইচবোর্ড আর রেডিওগ্রামের পাশে।

ফিসফিস করে শুধোল ডেভিড মাস্ত্রোয়ানি, 'মিস্টার রায়, এর আগে কোনও প্রেত-আহ্বায়ক বৈঠকে যোগ দিয়েছেন?'

ভীত গলায় বললে ফাল্গুনী রায়, 'না।'

'ভয়ের কোনও কারণ নেই, মিস্টার রায়,' কোমল কণ্ঠে বললে ডেভিড, 'মনে রাখবেন, প্রেত-বৈঠকে যারা বসবে, কোনওরকম চিন্তা না করে মনকে তাদের শূন্য রাখতে হয়। মন যেন অপেক্ষা করে কোনও কিছুকে গ্রহণ করার জন্যে। কিন্তু আপনার অন্তর জুড়ে রয়েছে আইভি মল্লিক। কাজেই মনকে আপনি চিন্তাশূন্য করতে পারবেন না।'

'না, পারব না।' যন্ত্রচালিতের মতো প্রতিধ্বনি করল ফাল্গুনী রায়।

'সেক্ষেত্রে আপনি তাঁর কথাই ভাবুন। তাঁকেই ধ্যান করুন। তাহলেই আপনার চিন্তার সূক্ষ্ম কম্পন পৌঁছবে পৃথিবী আর প্রেতলোকের বর্ডারল্যান্ডে—যে সীমানাদেশ আসলে কম্পনের সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। যেন একটা ইথার বা আকাশের নদী। নিরপেক্ষ এই অবস্থাটিকেই আপনারা, হিন্দুরা বলেন বৈতরণী, পারসিকরা বলেন চিনবাত্রিজ, মুসলমানরা বলেন সিরাৎ।'

আবার নৈঃশব্দ্য। প্রফেসর আত্মস্থ। রঘুনাথ পোদ্দার সম্মোহিত চোখে শুনছে ডেভিডের সারগর্ভ বক্তৃতা। আর, মনে-মনে ইন্দ্রনাথ রুদ্র ভাবছে, পাকা অভিনেতা বটে। সঙ্কেতপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে নৈঃশব্দকে কীভাবে খেলাতে হয়, কীভাবে আবেগঘন দৃশ্যের লয়গতি নিয়ন্ত্রিত করতে হয়—সে-আর্টে ওস্তাদ আর্টিস্ট ডেভিড মাস্ত্রোয়ানি।

'মিস্টার রায়, আপনার চিন্তার কম্পন দিয়ে আপনার প্রেয়সীর বিদেহী আত্মাকে কম্পন-অঞ্চল থেকে আকর্ষণ করতে হবে—এ দায়িত্ব পুরোপুরি আপনারই! জানেন তো, ভালোবাসা কোনও মোহ নয়, ভালোবাসা দুটি আত্মার আকর্ষণ। তার কার্যক্ষেত্র জড়জগতে নয়, তার বিকাশ আত্মার মাঝে। প্রেম একটা অপার্থিব শক্তি, দুটি আত্মার মাঝে স্বর্গীয় আকর্ষণ।'

সচেতনতা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে আবিষ্ট হয়ে পড়তে থাকে ফাল্গুনী রায়। অর্গানকণ্ঠ তো নয়, যেন যাদুকণ্ঠ। সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করছে মস্তিষ্কের কোষে-কোষে। যেন, রাগ কলাবতীর একটা বন্দিশ শুরু হয়েছে স্বপ্ন-বিহ্বল চেতনায়...চূড়ান্ত বিপর্যয় আর দুরন্ত বিচ্ছেদের সময়েও বেজেছিল সংগীতের এই টুকরোটি...আর আজ...

গুরুভার পদশব্দ শোনা গেল স্লাইডিং ডোরের বাইরে। ঘরে ঢুকল মিডিয়াম—মিসেস মুকরি মাস্ত্রোয়ানি। বিপুল কলেবর। চর্বির ভাঁজ ঘাড়ে, গালে এবং সর্বত্র। ছোট-ছোট দুই চোখে অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, বাসনা আর কামনা সুপরিস্ফুট।

মাথার চুল চুড়ো করে ওপরে বাঁধা। চূড়ামণি রূপের আসল উদ্দেশ্য ইন্দ্রনাথ রুদ্র জানে। ছোটখাটো অনেক জিনিস লুকিয়ে রাখা যায় মাথার চুড়োয়—তাই বুজরুক মহিলা মিডিয়াম মাত্রই এহেন রূপ নিয়ে দেখা দেয় প্রেত-বৈঠকে।

থপ-থপ করে কাপিয়ে অগ্রস্থ চেয়ারে গিয়ে বসল মুকরি। বলল, 'কিছু আছে?'

তৎক্ষণাৎ চেয়ারের সারির সামনে এসে দাঁড়াল পালোয়ান লোকটা। মুখ-আঁটা কয়েকটা খাম সংগ্রহ করে রেখে দিলে মুকরির সামনের তিনপায়া টেবিলের ওপর।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র জানে খাম আর কাগজ মাস্ত্রোয়ানিদের দেওয়া। কেক্ফামধ্যেই ছোট্ট চিরকুটে লেখা রয়েছে মৃতাত্মাদের কাছে শোকসন্তপ্ত আত্মীয় পরিজনের নানান প্রশ্ন। অন্ধকার যখন গাঢ় হবে, অন্ধকার যখন ইন্দ্রিয়ের কাজগুলোকে স্তব্ধ করে দিতে সাহায্য করবে, সুমিষ্ট সংগীত যখন বৈঠকীদের মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ নিশ্চল অবস্থায় হাজির করবে, ঠিক তখনি কালো পর্দার আড়ালে পেনসিল টর্চ জ্বালিয়ে খামের ওপর দিয়েই প্রশ্নগুলো পড়ে নেবে ভণ্ড মিডিয়াম...

'কে বাঁধবেন আমাকে?' বললে মুকরি।

ঠেলা দিয়ে ডেভিড বললে, 'যান আপনি।'

'আমি? কেন?' বিমূঢ় কণ্ঠ ফাল্গুনী রায়ের।

'মিডিয়ামকে চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে আসুন।'

'তার কী দরকার?'

কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল মুকরি, 'সিয়াঁস শেষ হলে বলবেন তো মুকরি ভণ্ড, মুকরি জালিয়াত? বাজে কথা শুনতে রাজি নই আমি। নিজের হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেখুন সত্যিই প্রেতাত্মার ভর হয় কিনা আমার ওপর।'

'না, না, না!' যেন মহা বিড়ম্বনায় পড়ে ফাল্গুনী রায়। মনে-মনে বলে ইন্দ্রনাথ রুদ্র, বাপু হে, আমি বাঁধলে কি আর দড়ি দিয়ে বাঁধব? দড়ির বাঁধন গলে বেরিয়ে আসা অনেক সহজ। কিন্তু সুতো দিয়ে তোমার বুড়ো আঙুল আর কব্জি বাঁধলেই সব পাঁয়তাড়া ফাঁস হয়ে যাবে। একটু জোর দিলেই পট করে ছিঁড়বে সুতো—

অগত্যা রঘুনাথ পোদ্দার উঠে গিয়ে চেয়ারের সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধল মুকরি মাস্ত্রোয়ানিকে। বেশ মোটা দড়ি।

ফিরে এসে ফাল্গুনী রায়ের কানে-কানে বলে রঘুনাথ, 'বুঝলেন ফাল্গুনীবাবু, প্রত্যেকবার শেষ পর্যন্ত আমাকেই বাঁধতে হয়।'

ডেভিড আর রঘুনাথ দুদিক থেকে ফাল্গুনী রায়ের হাত ধরল। চোদ্দোজন বৈঠকী প্রত্যেকেই পরস্পরের হাতে হাত রেখে যেন এক হয়ে গেল...এবার শুরু হবে চোদ্দোজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা...

খসখসে গলায় বললে মুকরি, 'আজ বেশি দেরি হবে না...বেশ বুঝতে পারছি, ওরা ভিড় করে রয়েছে...আসতে চাইছে...আমার আবেশ আসছে...'

ফিসফিস করে সগর্বে বললে ডেভিড, 'অত্যন্ত পাওয়ারফুল আমাদের মিডিয়াম।

প্রথমেই ভর করবে পাইড প্রেতাত্মা রুক্মিণী। রুক্মিণী মধ্যপ্রদেশের এক রাজকুমারী তার চেষ্টাতেই—'

আলো কমছে। সুইচবোর্ডের রেগুলেটরে হাত রেখেছে সুশ্রী জোয়ানটা। ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে ঘরের আলো। ঘরের কোণে-কোণে জাগ্রত হচ্ছে অন্ধকারের দানোরা। নিভে গেল আলো ভয়ানক, ভয়ানক! কালো—কালো—সমস্ত কালো। ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে, সেই আকাশের মতো কালো—ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো—তিমির-তুফানের ওপর যেন সন্ধ্যার রক্তিমা...রুধিরপরতন্ত্রতার মতোই একটা অস্পষ্ট লাল আভা...কোথায় তার উৎস, তা অদৃশ্য...অথচ তা পরিব্যাপ্ত সারা ঘরময়, কিন্তু এত ম্লান, এত নিষ্প্রভ, এত ম্রিয়মান যে একহাত দূরেও কিছু দেখা যায় না...আঁধার যেন আরও ভয়াল হয়ে উঠেছে এই রক্ত রূপে! কিন্তু ইন্দ্রনাথ রুদ্রর অজানা নয় রক্তাভ মিশ্রিত তমিস্রার প্রকৃত রহস্য।...

বহুদূর থেকে ভেসে-আসা পার্বত্য নির্ঝরিণীর মতোই শোনা গেল জলতরঙ্গের মৃদু অথচ আশ্চর্য সুরেলা সংগীত রেডিওগ্রাম চালু হয়ে গেছে।

সংগীত যে কী ব্যাপক দোতনার জন্মদাতা, তা সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হাড়ে-হাড়ে টের পেল ফাল্গুনী রায়। চোখের সামনে ভেসে উঠল এক ঝলমলে স্বপ্ন...ভেসে উঠল গ্রাম বাংলার অনিন্দ্য শ্যামলতা...ভেসে উঠল মোমের মতো সুন্দর, পদ্মের মতো অপরূপ আইভি মল্লিকের আনন...কল্পনায় গড়া সব কিছুই যেন অকস্মাৎ আছড়ে পড়ল সংগীত-বিহ্বল চেতনার ওপর!

মনের পর্দায় তিল তিল করে গড়ে উঠল কল্পনার তিলোত্তমা। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে সজল আকাশের মতোই ছলছলে তার আঁখি, ঠিক তেমনি চোখ-জুড়োনো, হৃদয়-ভরানো, ছায়া-মাখা নয়ন পল্লব গলায় তার কুন্দফুলের মালা, কপোলে শ্বেতচন্দনের ছাপ, হাতে অশোকের মঞ্জরী, কবরীতে কিংশুক ফুল আর মাথায় বাসন্তী রঙের ওড়না। কল্পনার তানে-তানে মনের বীণার সবকটা সোনার তার যখন উতলা, ঠিক তখনি স্তব্ধ হল জলতরঙ্গের সুমিষ্ট সঙ্গীত।

ক্যাবিনেটের দিক থেকে ভেসে এল অস্পষ্ট কাতর গোঙানি, ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ যেন অপরিসীম যন্ত্রণায় বন্ধনাবস্থায় ছটফট করছে মিডিয়াম।

কিন্তু আশ্চর্য হল না ফাল্গুনী রায়। সংগীতের সুযোগ নিয়ে যে কৌশলে ম্যাজিশিয়ান হুডিনির মতোই দড়ি খুলে বেরিয়ে এসেছে মুকরী, তা ইন্দ্রনাথ রুদ্রর অনায়ত্ত নয়। সংগীতের প্রয়োজন তো শব্দটুকুগুলো ঢাকবার জন্যেই।

ভৌতিক ঘটনাটা ঘটল এর পরেই।

গোঙানির শব্দ ধীরে-ধীরে ক্ষীণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই বেজে উঠল খঞ্জনি এবং আচম্বিতে কালো পর্দার ওদিক থেকে ঝমঝম শব্দে শূন্যপথে ভেসে এল আলোময় ট্যাম্বুরিন।

নিবিড় অন্ধকারের মাঝে ফসফরাসের দ্যুতি ছড়িয়ে ঘরময় জিপসি নাচের ছন্দে একপাক ঘুরে এল ভৌতিক ট্যাম্বুরিন। তারপর শূন্যপথেই অন্তর্হিত হল ক্যাবিনেটের অন্দরে।

হাজার ভোল্টের শক পাওয়ার মতোই সবাই যখন স্তম্ভিত, শিহরিত, ঠিক তখনি শোনা গেল আর-একটা নতুন শব্দ।

টিনের চোঙার মধ্যে দিয়ে কথা কইছে এক নারী কণ্ঠ। প্রেতিনী রুক্মিণীর কণ্ঠ।

এরপর যেসব অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটল, তার বিস্তারিত বর্ণনার দরকার নেই—কারণ তা মূল কাহিনির সঙ্গে সম্পর্করহিত। চালক প্রেতাত্মা রুক্মিণীর সহায়তায় মুখবন্ধ চিঠিগুলোর ভেতরের প্রশ্ন কটার জবাব পাওয়া গেল একে-একে। এমনকী দুজন সদ্যমৃতা প্রেতিনী-স্বরে কথাও কয়ে গেল উপস্থিত প্রিয়জনের সঙ্গে। তারপর...তারপর এল ফাল্গুনী রায়ের পালা।

'ফাল্গুনী রায়—ফাল্গুনী রায়!' অপার্থিব কণ্ঠে যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল রুক্মিণীর আহ্বান।

স্বপ্ন-বিহ্বল ফাল্গুনী রায় প্রথমটা শুনতে পায়নি। আইভি মল্লিকের কল্পনায় গড়া ভোরের তারার মতো মুখের পাশে বারবার ফুটে উঠছে আর-একটি মুখ রেখা...ইন্দ্রনাথ রুদ্রের উৎসর্গিত যৌবনের দীর্ঘশ্বাস দিয়ে তা গড়া—এতকাল পরেও যা অম্লান।

'ফাল্গুনী রায়—ফাল্গুনী রায়!' দূর হতে দূরে সরে যাচ্ছে নারীকণ্ঠ।

ডেভিড মাস্ক্রেয়ানির কনুইয়ের খোঁচায় সম্বিৎ ফিরে পেল ফাল্গুনী রায় : 'মিস্টার রায়, আপনাকে ডাকছে।'

'আমাকে?'

'ওই শুনুন।'

'ফাল্গুনী রায়—ফাল্গুনী রায়!'

'এই যে আমি—এই যে আমি!' নিঃসীম ব্যাকুলতায় ভেঙে পড়ে ফাল্গুনী রায়।

'আপনার এক পরিচিতা এসেছেন, অপেক্ষা করছেন।'

'কই? কোথায়? আইভি—আইভি!'

গতির উচ্ছলতার মধ্যেও প্রয়োজন যতির নির্মমতা তাই আবার শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ। অসহ্য উৎকণ্ঠা।

তারপর...

'ফাল্গুনী—ফাল্গুনী!'

অন্ধকারের দিগন্ত থেকে ভেসে আসে কার বীণাকণ্ঠ। সুমিষ্ট স্বরে যেন সরোদের ঝঙ্কার।

যেন হাজার-হাজার দামামা বেজে উঠল ফাল্গুনী রায়ের মাথার মধ্যে।

অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে উঠে বললে আকুল কণ্ঠে, 'কে! কে! কে!'

'আমি, আমি গো—তোমার আইভি!' সুরেলা কণ্ঠে এ কোন রাগিণীর সঙ্কেত?

'আইভি—আইভি—কোথায় তুমি?'

'এই যে গো, এই যে আমি!'

'কোথায়, কোনদিকে?'

পেছন থেকে ঠেলা দিয়ে ফিসফিস করে বললে ডেভিড, 'এগিয়ে যান, ক্যাবিনেটের মধ্যে।'

পা বাড়াল ফাল্গুনী রায় এবং সেই মুহূর্তে যেন তাকে পথ দেখানোর জন্যেই বার দুয়েক ঈষৎ উজ্জ্বল হয়েই আবার স্তিমিত হয়ে গেল অদৃশ্য লাল আভা।

কিন্তু ওইটুকুই যথেষ্ট। জ্যা মুক্ত শরের মতো বেগে কালো পর্দার দিকে ধেয়ে গেল ফাল্গুনী রায়। হাতড়াতে-হাতড়াতে ঢুকল ভেতরে।

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে বললে, 'আইভি—আইভি—কই তুমি?'

'এই তো আমি, এই তো!'

পরমুহূর্তেই কার মৃণালভুজ বেষ্টন করে ধরল ফাল্গুনী রায়ের কণ্ঠ—নিমেষে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে কে যেন ওর গালে গাল রেখে সঘন নিশ্বাসে বললে বাতাসের মতো সুরে, 'তুমি শুধু সুন্দর নও ফাল্গুনী, তুমি অনুপম। তাই তো তোমায় ভোলা যায় না।'

বজ্রাহতের মতো আড়ষ্ট দেহে দাঁড়িয়ে রইল ফাল্গুনী রায়। মুহূর্তের জন্য বুঝি চিত্তশক্তিও লোপ পেল।

ঠিক তখনি প্রেত-প্রেয়সীর স্নিগ্ধ-শীতল নিবিড় অধরস্পর্শে সম্বিৎ ফিরে পেল ফাল্গুনী রায়। অন্ধকারের মধ্যেই আঙুল বুলিয়ে অনুভব করতে গেল নবনীত কোমল সুকুমার এই দেহলতাটি সত্যই এক্টোপ্লাজম দিয়ে গড়া, না—

অস্ফুট হাসির শব্দে খানখান হয়ে ভেঙে গেল নীরবতা, এবং পরমুহূর্তেই যেন বাতাসে গলে মিশে গেল কণ্ঠলগ্না তন্বী বরাঙ্গনা।

সেই নিশ্ছিদ্র আঁধারে বিমূঢ়ের মতো একা দাঁড়িয়ে রইল ফাল্গুনী রায়। মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপরেই হাতড়াতে লাগল ক্যাবিনেটের মধ্যে। হাতে ঠেকল চেয়ারে বাঁধা মিডিয়াম মুকরির দেহ। আঙুল-স্পর্শেই বুঝল সারা মুখ তার ঘামে ভেজা, দেহ আড়ষ্ট শক্ত কাঠের মতো—আর সর্বাঙ্গ ঘিরে দড়ির বাঁধন...

আর্তচিৎকার করে পর্দা ঠেলে ছুটে বেরিয়ে এল ফাল্গুনী রায়। অন্ধকারে হাতড়াতে-হাতড়াতে কোনওমতে এসে বসল নিজের চেয়ারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ ময়না বক্সীর প্রেতমূর্তি

সেই মুহূর্তে এক হয়ে গেল দুটো বিভিন্ন সত্তা। আচ্ছন্নের মতো বসে রইল ইন্দ্রনাথ রুদ্র আর ফাল্গুনী রায়। দু-জনেই সমান উত্তেজিত, সমান বিচলিত, সমান অভিভূত।

কে এই আইভি মল্লিক? ফাল্গুনী রায়ের আইভি মল্লিক তো কল্পনার প্রেয়সী। কিন্তু এইমাত্র নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে যে কৃশ কিন্তু কোমল দেহটি শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে আগুন সঞ্চারিত করে গেল, সে তো কল্পনা নয়? তবে কি ফাল্গুনী রায়ের চিন্তার কম্পন সূক্ষ্মলোকে প্রবল আলোড়ন তুলেছে? ব্যাকুলতায় সাড়া দিয়েছে কোনও সহৃদয় প্রেতিনী? অথবা মায়ায় আবদ্ধ কোনও মৃতাত্মা—অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই যাকে যেতে হয়েছে অনন্ত অন্ধকারময় প্রেতলোকে?

মেয়েটির দীর্ঘচ্ছন্দ দেহে হিল্লোল আছে, আছে পায়রার বুকের মতো উষ্ণতা। অধরে আছে মুহূর্তে নেশা ধরিয়ে দেওয়ার মাদকতা। অনভিজ্ঞতার শরম নেই, জড়তা নেই—আছে জাদু। কী যেন হয়ে গেল। নিঃশেষে নিজেকে সঁপে দেওয়ার ইঙ্গিত এল নিবিড় ছোঁয়ার মধ্যে দিয়ে। এবং আত্মবিস্মৃত হল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

অন্ধকারের মধ্যে থেকেই অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে এক লহমার মধ্যে অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল সে—রেখে গেল শুধু দুর্বিসহ স্মৃতি, আর-এক আশ্চর্য সৌরভ।

হ্যাঁ, সৌরভ। ইন্দ্রনাথ রুদ্রর বিবশ চেতনা এখনও রিমঝিম করছে, মিষ্টি অথচ হালকা এই সুগন্ধে।

গন্ধটা ফরাসি ল্যাভেন্ডারের।

কে এই নিঃশঙ্কিনী?

একটা বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ইন্দ্রনাথ রুদ্রের। প্রিয়া-মিলনের সময়ে মুকরি মাজেয়ানি চেয়ারেই বাঁধা ছিল।

ঘরের একমাত্র স্লাইডিং ডোর ভেতর থেকে বন্ধ। ওই চেহারার কোনও মেয়ে ঘরের মধ্যে নেই।

নিঃশব্দতা। ক্যাবিনেটের দিক থেকে ভেসে আসছে কেবল অস্পষ্ট গোঙানি। আচম্বিতে আবার শোনা গেল চালক প্রেতাত্মার কণ্ঠ। চোঙার মধ্যে দিয়ে কথা কইছে রাজকুমারী রুক্মিনী, 'ময়না, তুমি এসেছ?'

উত্তরে কাচের বাসন ভাঙার মতো তীক্ষ্ণ কিন্তু সুমিষ্ট হাসির জলতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে ঘরময়।

সঙ্গে-সঙ্গে যেন এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তির তড়িৎস্পর্শ লাগে প্রফেসর বিক্রম বক্সীর দেহে—একই উন্মাদনা শ্বাসে-প্রশ্বাসে রক্তে ও স্নায়ুতে অনুভব করে ইন্দ্রনাথ রুদ্রও।

রুক্মিনী বলে, 'ময়না এসেছে, ময়না এসেছে।'

সিধে হয়ে বসলেন প্রফেসর।

ঝমঝম করে বেজে উঠল ট্যাম্বুরিন। আস্তে-আস্তে ক্ষীণ হয়ে এল সে শব্দ।

তারপর আবার নৈঃশব্দ।

ফিসফিস করে কে ডাকলে, 'বাবা! বাবা!'

আলোময় প্রেতচ্ছায়াকে দেখা গেল তারপরেই।

থিয়েটারের স্টেজ-লাইটের মতো ঘরের রক্ত-অন্ধকারেও সামান্য পরিবর্তন এসেছিল। ক্যাবিনেটের বাইরে কালো পর্দার সামনে হঠাৎ নিবিড় তিমির উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফসফরাসের ম্লান আভায়। স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না। চোখে পড়ল শুধু জ্যোতির্ময় কিশোরীমূর্তি। ফিকে রশ্মি দিয়ে আঁকা তার দেহরেখা—যেন কালো মখমলের ওপর ঝলমলে জরির কাজ। পা মুড়ে মেঝের ওপর বসে কিশোরী। মুখের দুপাশ ঘিরে খোলা চুল এলিয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর। অন্ধকারে এর বেশি আর কিছু দেখা সম্ভব হল না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী।

কিশোরী বললে, 'বাবা, কাছে এসো। আমার চুমু নেবে না?'

'যাই মা!' পা বাড়ালেন প্রফেসর।

'কিন্তু আমাকে ছুঁয়ো না, বাবা। তা হলে ওরা আর আসতে দেবেন না। কত কষ্টে যে এবার আসতে হয়েছে!' দীর্ঘশ্বাসের শব্দ।

ক্যাবিনেটের মধ্যে থেকে তখনও ভেসে আসছে মৃদু কাতরানি।

মরা-মেয়ের আলোকময় প্রেতমূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন প্রফেসর। কিশোরীর মুখ এগিয়ে এল সামনে।

পরক্ষণেই, 'বাবা গো বুরুশ!'

সশব্দে হেসে উঠলেন প্রফেসর এবং মহল।

প্রফেসর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি নিয়ে জীবিতকালেও বুঝি এমনিভাবে হেসেছে বাপ-বেটিতে—আজকের হাসির মধ্যে যেন তারই স্মৃতি।

শিউরে ওঠে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায় ফাল্গুনী রায়ের।

'বাবা, ওঁরা আজ আমার ওপর খুব রেগেছেন। ওঁরা পুণ্যাত্মা। ওঁদের কথা আমাকে মানতে হয়। ওঁরা বলেছেন, এখন থেকে যদি তাঁদের কথা তুমি শোনো, তবেই আমাকে আসতে দেওয়া হবে। কেন, তা বলেননি। বলেছেন, তুমি বুঝবে না।'

'মহলা, কী বলছিস, মা!'

'বাবা, তোমার জন্য বড় মন-কেমন করে আমার। তুমি ওঁদের কথা শোনো। তুমি মনে করলেই আমার আসার পথ খোলা থাকবে। ওঁরা পৃথিবীর মঙ্গল চান। আর একটা কথা বলতে বলেছেন তোমাকে।'

'কী, মা?'

'তুমি নাকি তোমার ভাইয়ের হাতের পুতুল। বুঝলাম না এ-কথার কী মানে।'

'আমি বুঝেছি।' প্রফেসরের কণ্ঠে বিস্ময়।

'আসি, বাবা! এবার আমাকে যেতে হবে।'

'আবার আসবি তো?'

'জানি না। তুমি ওঁদের কথা শুনলেই আমাকে ওঁরা আসতে দেবেন। তুমি তো আমাকে সুখে রাখতে চাও, তাই না বাবা? ওঁরা ডাকছেন। চললাম। বাবা, আমার কথা ভুলো না।' ক্ষীণ হয়ে এল কণ্ঠ এবং পরমুহূর্তে অন্ধকারে মিশে গেল কিশোরী-মূর্তি।

অকথা যন্ত্রণায় অকস্মাৎ গুঙিয়ে উঠল মিডিয়াম। যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, বুকটা ফেটে পড়তে চাইছে একফোঁটা বাতাসের জন্যে।

হাতড়াতে হাতড়াতে পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলেন প্রফেসর।

আর, একটা হালকা অথচ মিষ্টি সুগন্ধ ভেসে এল ইন্দ্রনাথ রুদ্রের নাসিকারন্ধ্রে। ফরাসি ল্যাভেন্ডারের গন্ধ।

অইভি মল্লিকের দেখে যাওয়া এ সুগন্ধ প্রফেসর নিয়ে এলেন কোত্থেকে?

'আলো।' আচম্বিতে ভগ্নকণ্ঠের সবকটা দিয়ে বলে উঠল : 'আলো'।

চমকে উঠল সবাই। দপ-দপ করে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। নিমেষে অন্তর্হিত হল ছায়ার মায়া।

একলাফে ক্যাবিনেটের সামনে গিয়ে কালো পর্দা সরিয়ে দিল ডেভিড।

আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় ছটফট করছে মুক্তার মাড়োয়ারি। রক্তবর্ণ দুই চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বুকের ওপর এলিয়ে পড়া মাথাটা ক্রমাগত দুলছে এপাশে-ওপাশে। জিভ বেরিয়ে পড়েছে। ঘামে সর্বাঙ্গ সিক্ত।

ঘরে আর কেউ নেই। যারা ছিল, তারা উবে গেছে কর্পূরের মতো। টেবিলের ওপর আগের মতোই সাজানো রয়েছে বাদ্যযন্ত্রগুলো।

'আজকের মতো মিডিয়ামের শক্তি ফুরিয়েছে।' বললে ডেভিড, 'আর না, দড়ি খুলুন মিস্টার পোদ্দার।'

তৎক্ষণাৎ অনুগত অনুচরের মতো হুকুম তামিল করল রঘুনাথ পোদ্দার। আর 'কোথায় আমি!' জড়িত গোঙানি নিয়ে চোখ খুলল মুক্তার মাড়োয়ারি।

শেষ হল প্রেতাবতরণ বৈঠক।

সন্ধানী চোখে এদিক-ওদিক তাকাল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। কিন্তু সাদা চোখে গুপ্তপথের হদিশ পাওয়া গেল না।

গুটি-গুটি দরজার দিকে এগোয় ইন্দ্রনাথ। আলো জ্বলা মানেই এখনি ছেঁকে ধরা হবে তাকে। অজস্র প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হবে। সাড়ম্বরে শোনাতে হবে তার পূর্বকাহিনি এবং সদ্য অভিজ্ঞতার রোমহর্ষক বিবরণ।

কিন্তু আইভি মল্লিকের স্মৃতি-জড়ানো আবেগ-মধুর মিষ্টি এই আমেজটুকু এভাবে নষ্ট হতে দিতে চায় না ফাল্গুনী রায়।

তাই পা বাড়ায় দরজার দিকে—

কিন্তু আহ্বান আসে পিছন থেকে : 'মিস্টার রায়, আপনাকে বলতেই ভুলে গেছি, 'সিঁয়াস' শেষ হলে পর আমরা একটু খানাপিনা করি। এতে আমাদের আত্মার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।'

আবার সেই গালভরা কথা। কিন্তু ইন্দ্রনাথ রুদ্র জানে খানাপিনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী। খাওয়া-দাওয়াকে উপলক্ষ করে অনর্গল কথা বলানো এবং অতীতের বহু তথ্য সযত্নে সংগ্রহ করা। পরবর্তী প্রেতবৈঠকের আবার চমক দিতে হবে তো?

মুখে আপ্যায়িত হওয়ার হাসি হেসে বলে, 'বেশ তো।'

এর পরের ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। প্রফেসর বিক্রম বক্সীর সঙ্গে পরিচয় হল ফাল্গুনী রায়ের। কিন্তু আলাপ জমল না। কারণ, তখন তিনি অন্যমনস্ক। কী এক চিন্তায় তন্ময়।

আগামী সোমবার আবার আসবার কথা ছিল ফাল্গুনী রায়ের। পথে বেরিয়ে কিছুদূর যেতে-না-যেতেই হঠাৎ পিছন থেকে ভেসে এল কার পদশব্দ। দ্রুত পা চালালে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। পিছনের শব্দও দ্রুত হল। গতি মন্থর করলে ইন্দ্রনাথ। কিন্তু পিছনের শব্দ দ্রুতই রইল।

নিঃসন্দেহে কেউ তার পিছু নিয়েছে। তাকে ধরবার চেষ্টা করছে। কোমরের নিকষ অটোমেটিকটায় হাত বুলিয়ে নিলে ইন্দ্রনাথ।

পরক্ষণেই পিছন থেকে হেঁকে উঠল একটা পুরুষ কণ্ঠ, 'ফাল্গুনীবাবু, ও ফাল্গুনীবাবু!'

কণ্ঠস্বর প্রফেসর বিক্রম বক্সীর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : প্রফেসর বিক্রম বক্সীর পারলৌকিক বক্তৃতা

'আরে মশাই, আপনি যে দেখছি আমার পথেই চলেছেন!' হাঁফ ধরে গেলে বললেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী।

রাত তখন বারোটা।

এত রাতে পথের মাঝে হঠাৎ উপযাচক হয়ে প্রফেসর যে তাকে ডেকে বসাবেন,

তা ভাবতেই পারেনি ইন্দ্রনাথ রুদ্র। কিন্তু দৈবাৎ সুযোগ যখন এসেছে, তখন তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। আলাপ জমাতে হবে প্রফেসর বিক্রম বক্সীর সঙ্গে।

বললে, 'কদ্দূর আপনার বাড়ি?'

'এই তো, দুটো মোড় ঘুরেই। আপনি উঠেছেন কোথায়?'

হোটেলের নাম বলল ইন্দ্রনাথ।

'সিঁরুসে এই প্রথম এলেন। লাগল কীরকম?'

'মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন।'

'স্বপ্ন নয় মশায়, স্বপ্ন নয়। ও-দেশের অনেক সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির সঙ্গে পত্রালাপ করেছি আমি। মাস্ত্রোয়ানিরা আর যাই হোক, ভণ্ড নয়।'

ভণ্ড নয়! কী বলতে চান প্রফেসর? কিন্তু বৃদ্ধের নিরীহ মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। অথচ শেষ কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু এতই স্পষ্ট যে কান এড়ায় না। মাস্ত্রোয়ানিদের প্রেততত্ত্বানুশীলন সম্পর্কেই ফাল্গুনী রায়ের মুখ থেকেই কিছু শুনতে চান প্রফেসর।

হুঁশিয়ার হয়ে যায় ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ইঙ্গিতটুকু এড়িয়ে গিয়ে পালটা প্রশ্ন করে, 'প্রফেসর, আমার অজ্ঞতা মাপ করবেন। কিন্তু আপনিই বোধহয় বিশ্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক—যিনি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী?'

চকিতে চোখ তুললেন প্রফেসর। পরমুহূর্তেই সামনে তাকিয়ে বললেন, 'মোটেই না। স্যার উইলিয়াম ক্রুক্সের মতো নামকরা বৈজ্ঞানিকও পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর মিডিয়াম ছিলেন মিসেস ফ্লোরেন্স কুক্। এ ছাড়াও লন্ডনের এস. পি. আর. সংসদে অনেক নামকরা বৈজ্ঞানিকও পরলোক নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন।'

'তাই নাকি?' মনে মনে বলে ইন্দ্রনাথ রুদ্র, সর্বনাশ! পরলোকতত্ত্ব গবেষণার গোটা ইতিহাসটাই প্রফেসর পড়ে ফেলেছেন দেখছি!

'উপনিষদ-টুপনিষদ পড়া আছে?'

'আজ্ঞে না।'

'কঠোপনিষৎ হল উপনিষদের অন্যতম কাব্যিকগ্রন্থ। জানেন কি, স্যার এডুইন আর্নল্ড এই গ্রন্থটিই 'সিক্রেট অফ ডেথ' নাম দিয়ে অনুবাদ করে জগৎজোড়া নাম কিনেছেন?'

'বটে!' এবার সত্যি-সত্যিই বিস্মিত হয় ফাল্গুনী রায়।

'অলৌকিকতাকে শিক্ষিত মানুষ এখন দেখতে চান দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক আর বৈজ্ঞানিক ভাবে। অথচ এর কোনওটিতেই আমরা পোক্ত নই। সুতরাং অলৌকিক ঘটনাকে গাঁজাখুরি আখ্যা দিয়ে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করি। এদিকে আসুন।' একটা মোড় ঘুরলেন প্রফেসর। বললেন, 'গীতাতেই আছে মানুষের আত্মা অবিনাশী। অস্ত্রের দ্বারা একে ছেদন করা যায় না, আগুনে একে পোড়ানো যায় না, বাতাস একে শুকিয়ে ফেলতে পারে না, আর জলেও একে ভেজানো যায় না। এডুইন আর্নল্ড (?) এই শ্লোকটারই একটা সুন্দর পদ্যানুবাদ করেছিলেন ইংরেজিতে। সেকথা থাক, আজকের বৈঠকে আপনিই সবচাইতে সৌভাগ্যবান।'

'কেন?'

'এতদিন আসছি আমি, কিন্তু একদিনও পর্দার ওদিক থেকে ডাক এল না। ময়নাকে তেমনভাবে আনতেও করতে পারলাম না।'

কথার সুরে ঈর্ষা জড়িয়ে রয়েছে না?

'তা সত্যি। আইভিকে যে আবার দুহাত দিয়ে ছুঁতে পারব, এত কাছ থেকে কথা বলতে পারব, তা ভাবতেও পারিনি।'

'ছুঁয়ে কী বুঝলেন?' এবারে আর ইঙ্গিত নয়, স্পষ্ট প্রশ্ন।

বিহ্বল কণ্ঠে বললে ফাল্গুনী, 'কী করে বলি? সূক্ষ্মদেহ কি এইরকমই হয়? ছুঁতে-না-ছুঁতেই হাতের মধ্যে গলে মিশে গেল।'

'উনিই এসেছিলেন তো?'

'তাই তো মনে হল।'

'জোর করে হ্যাঁ বলতে পারছেন না কেন?'

এ কী অস্থির কৌতূহল? মাস্ত্রোয়ানিরা সত্যিই খলিফাত কি না যাচাই করে নেওয়ার জন্যেই তা হলে ফাল্গুনী রায়ের পিছু নিয়েছেন প্রফেসর, গায়ে পড়ে আলাপ করেছেন। যাঁর ওপর আধখানা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, এ হেন সতর্কতা তাঁকেই শোভা পায়।

নিশ্চুপ থাকে ফাল্গুনী রায়।

পীড়াপিড়ি করেন না প্রফেসর। বরং মৌনতাই তাঁর সূক্ষ্ম সন্দেহটাকে আরও ঘনীভূত করে তোলে।

আর একটা মোড় ঘুরে প্রফেসর বললেন, 'এসে গেছে আমার বাড়ি। চলুন, কফি খেয়ে যাবেন।'

'এত রাতে?'

'কফি তো রাতেই দরকার।'

আর দ্বিরুক্তি করল না ফাল্গুনী রায়। অচিরেই এসে পৌঁছল প্রফেসর বিক্রম বক্সীর পৈতৃক ভিটের সামনে।

বাড়ি তো নয়, সুবিরাট গোয়ালিয়রি স্টাইলের প্যালেস। মার্বেল, মোজেক, কংক্রিট আর ভেনিসিয়ান শার্শির বিচিত্র পারিপাট্য।

একতলায় প্রফেসরের নিভৃত বীক্ষণাগার। পাশে পরপর কয়েকটি ঘর। একটি ঘরে ফাল্গুনী রায়কে বসিয়ে কফির আয়োজন করতে অন্য কক্ষে গেলেন প্রফেসর।

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। দেওয়াল আলমারি-ঠাসা অগুন্তি কেতাবের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলে। আধুনিক বিজ্ঞান সিবারনেটিকস—সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ গ্রন্থ নেই।

ফিজিওলজি আর মেক্যানিক্স—এই নিয়েই সিবারনেটিকস। সুতরাং বই যা আছে, সব এই দুটি বিজ্ঞানের ওপর। অ্যানাটমি, নার্ভ সিস্টেম, ইলেকট্রনিকস, কম্পিউটার, অটোমেশন ইত্যাদি।

এক কোণে বুক-সমান উঁচু তেপায়ার ওপর কাচের বাক্সে সাজানো একটা মোমের হাত। স্বচ্ছ, নিটোল। আঙুলগুলো ঈষৎ বক্র—যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ময়না বক্সীর প্রেতিনী-হস্ত।

খুঁটিয়ে দেখার আগেই পদশব্দ শোনা গেল। প্রফেসর ঘরে ঢুকলেন। ট্রে-র ওপর নেসক্যাফে, এক পট গরম জল, চিনি।

'সুর নেই, ক-কঁকে শব্দ!'

'মন্দ কী।'

কয়েক মিনিট চায়ের-পেয়ালায় টুংটাং শব্দে গেল। তারপর—

'তা হলে মিস আইভি মল্লিক আর এসেছিলেন?'

আবার সেই প্রশ্ন:

'আমার তাই বিশ্বাস।' হুঁশিয়ার কণ্ঠ ফাল্গুনী রায়ের।

'মেটিরিয়ালাইজড, মানে এক্টোপ্লাজমে গড়া দেহ?'

'বোধহয়।'

'গলার স্বর?'

'আইভির বলেই মনে হল। ফিসফিস করে কথা কইছিল তো।'

'আর ছোঁয়া?'

এবার আর ভুল নয়। অপরিসীম উৎকণ্ঠার অভিব্যক্তি প্রফেসরের চোখে মুখে।

'আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিল আইভি—' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ ফাল্গুনী রায়ের।

'রক্ত-মাংসের দেহের মতোই?'

মোক্ষম প্রশ্ন। এই একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রফেসরকে সংশয়মুক্ত করা চলে, আবার সংশয়াচ্ছন্নও করা চলে। কিন্তু মোহভঙ্গ করানোর জন্যেই আগমন ইন্দ্রনাথ রুদ্রের। অতএব—

'রক্ত-মাংসের দেহের মতো।' জবাব দেয় ফাল্গুনী রায়।

'কোনও গন্ধ পেয়েছেন? মিষ্টি গন্ধ?'

'ল্যাভেন্ডারের।'

'ময়না কিন্তু আমাকে ছুঁতে দেয় না। তবে একটা গন্ধ পাই। আচ্ছা, অতীতের এমন কথা শুনলেন, যা আপনারা দুজনে ছাড়া আর কেউ জানেন না?'

'শুনেছি।'

কয়েক সেকেন্ড সব চুপ।

তারপর কফির পেয়ালা নামিয়ে রাখলেন প্রফেসর। তেপায়ার ওপর রক্ষিত কাচের বাক্সটার সামনে গিয়ে অপলকে তাকিয়ে রইলেন মোমের হাতটার দিকে।

যেন স্বগতোক্তি করছেন, এমনিভাবে চোখ না ফিরিয়েই বললেন, 'আমার মেয়ে ময়নার ডানহাতের মোমের ছাঁচ। বছরখানেক আগে অল্প বয়েসে মারা গেছে ময়না। এ ছাঁচ তার প্রেতাত্মার। অন্তরে সংশয় ছিল। ভেবেছিলাম প্রতারণা। তাই মরণের পর দেহধারণের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রেখে গেছে ময়না।'

ফাল্গুনী রায়ের দিকে চকিতে তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন প্রফেসর। কিন্তু ফাল্গুনী এরই মধ্যে দেখে ফেলেছে, প্রফেসরের চোখ ভেজা-ভেজা।

সিংহের চোখে জল! এর পিছনে কতখানি অন্তর্দাহ লুকিয়ে আছে, তা সম্ভবত শশক হলেও ফাল্গুনী রায় আন্দাজ করে নিল।

'বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বললেন কেন?'

'কারণ, ময়নার শরীর চিতার ওপরে রেখে পঞ্চভূতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ এ ছাঁচের আঙুলের ছাপ ময়নার। হাতে নিয়ে দেখুন, নইলে বুঝবেন না।'

চাবি দিয়ে ডালা খুলে ছাঁচটা বার করে দিলেন প্রফেসর। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের

দরকার হল না। আঁকাবাঁকা রেখা, ফাঁস রেখা, প্রতিটি রেখাই স্পষ্ট ফুটে উঠেছে স্বচ্ছ মোমের গায়ে।

যথাস্থানে ফিরে গেল মোমের হাত। ডালা বন্ধ করে বললেন প্রফেসর, 'মোমের হাত কিন্তু নতুন নয়। এর আগেও দেখা গেছে। জানেন সে কাহিনি?'

'না।'

'১৯১০ সালে ভিয়েনার [illegible] প্রথম আবির্ভাব ঘটে মোমের হাতের। জাল মোমের হাত। কোনান ডয়েলও ঠিক এইভাবে ধোঁকা খেয়েছিলেন। চল্লিশ বছর আগে বোস্টন মিডিয়াম মার্জোরি অবশ্য আরও এগিয়েছিল। আঙুলের ছাপ ফুটিয়েছিল ছাঁচের গায়ে। কিন্তু পরে দেখা গেল ছাপটা ডেন্টিস্টের আঙুলের। জীবিত ডেন্টিস্ট।'

স্তম্ভিত হয়ে রইল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করেছেন বৃদ্ধ বিক্রম বক্সী। নকল প্রেতাত্মার মোমের হাত নিয়ে প্রতারণার পূর্ব ইতিহাস উনি জানেন। কী প্রক্রিয়ায় সেসব হাতের সৃষ্টি, তাও জানেন। পুরোনো কোনও প্রক্রিয়া দিয়েই যে ময়নার মোমের হাত সৃষ্টি সম্ভব নয়, তাও জানেন। এ-হেন জ্ঞানবৃদ্ধকেও প্রেতবিশ্বাসী করে তুলেছে মাস্ত্রোয়ানিরা! আশ্চর্য!

মুখে বলে ফাল্গুনী, 'আচ্ছা, ভূতের টাম্বুরিন বাজানো—'

'ওটা স্রেফ নষ্টামি। অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্যে মুকরি মাস্ত্রোয়ানির ওসব ভেলকি পুরোনো হয়ে গেছে।'

আবার চমকে ওঠে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। বুড়ো বলে কী? মাস্ত্রোয়ানির কিছুটা খাপ্পা ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছেন। ঘায়েল হয়েছেন শুধু এই মোমের হাতে।

'যত খাপ্পাই থাকুক, মুকরি মাস্ত্রোয়ানির দৈবদত্ত ক্ষমতা আছে।' বললেন প্রফেসর। 'এ ক্ষমতা সবার থাকে না। আমি চেষ্টা করেছিলাম। আমার নেই। প্রেতাত্মাদের শরীর ধারণের একমাত্র উপায় হল মিডিয়াম। এদিক দিয়ে জুড়ি নেই মুকরির।'

'আচ্ছা, ময়না কেন বলল, আপনি আপনার ভাইয়ের হাতের পুতুল?'

'কথাটা ময়না বলেনি, বলেছেন ওঁরা।' খুব আস্তে-আস্তে বললেন প্রফেসর, কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা থেকে বোঝা গেল, রুদ্ধ একটা আক্রোশ শতফণা বিস্তার করে তাঁর মনের ভেতর ফুঁসে-ফুঁসে তড়পাচ্ছে।

বললেন, 'ছেলেবেলা থেকেই আমি দাদার কথায় ওঠ-বোস করতাম। আমার স্ত্রী তাই রাগাত, আমি নাকি আমার ভাইয়ের হাতের পুতুল। দাদা সংসার ত্যাগ করেছেন অনেকদিন—এখন সন্ন্যাসী। ওঁরা অবশ্য কথাটা বললেন অন্য কারণে, আমাকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার জন্যে।'

'ওঁরা, মানে কি প্রেতলোকের বাসিন্দারা?' নিরীহ কণ্ঠে শুধোয় ফাল্গুনী রায়। 'কিন্তু প্রেতলোক বলে সত্যিই কি কিছু আছে?'

'আছে।' ভরাট গলায় বললেন প্রফেসর। 'উপনিষদে প্রেতলোকের অন্ধকারের বর্ণনায় বলা হয়েছে, সেখানে অনন্তকাল অন্ধকার বিরাজ করে। আধুনিক বিজ্ঞানে আয়রন স্টারকে বলা হয় আঁধারের জগৎ। সূর্য, চন্দ্র, তারকারা সেখানে আলো দেয় না। আজকের বিজ্ঞানীরা এখনও কোনও হদিশ পায়নি। অথচ হাজার-হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ বলে গেছেন :

অসূর্যা নামতে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ।।'

বলে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন প্রফেসর। আলাপ আর জমল না। কিছুক্ষণ পরেই রাত একটায় বিদায় নিল ফাল্গুনী রায়।

রাস্তায় নেমেই পাওয়া গেল ট্যাক্সি। এবং তারপরেই হিমেল হাওয়ায় কনকন করে উঠল দাঁতের গোড়া।

শুরু হল অসহ্য দন্ত-যন্ত্রণা।

টেবিলের ওপর দিয়ে কতগুলো গ্লসি ফোটোগ্রাফ ছুঁড়ে দিলেন মিঃ আচাও। বললেন, 'চব্বিশ ঘণ্টা মাস্ত্রোয়ানিদের বাড়ির ওপর পাহারা দিচ্ছে আমার চর। ও বাড়িতে যারা ঢোকে, যারা বেরোয়, তাদের প্রত্যেকের নাম-ধাম থেকে শুরু করে এই ছবি পর্যন্ত, সমস্তই আমরা সংগ্রহ করেছি।'

একে-একে ফোটোগুলো দেখল ইন্দ্রনাথ। বিস্মিত হল গোছার মধ্যে নিজের ফোটো দেখে। মোট তিনটি ছবি। প্রথম দিন গেলা পাঁচটার সময়ে বাড়িতে প্রবেশ করছে। তারপর, প্রেতবৈঠকের দিন রাত্রে বাড়িতে ঢোকবার আর বেরোবার সময়ে। নৈশালোকচিত্র তোলা হয়েছে ইনফ্রা রেড আলোর সাহায্যে।

'এদের মধ্যে কিশোরী বা তরুণী কেউ আছে কি?' প্রশ্ন করেন আচাও।

'দেখতে পাচ্ছি না।'

'তা সত্ত্বেও আপনি বলবেন, গত রাতে আপনাকে বাহুবন্ধনে বেঁধেছে অহিভি মল্লিক। ধরপুষ্ট লোকের সামনে দেখা দিয়েছে ময়নার প্রেতাত্মা?'

'তা বলব বইকী।'

'অসম্ভব!' টেবিলের ওপর প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করে হুঙ্কার ছাড়েন আচাও।

শান্ত কণ্ঠে বলে ইন্দ্রনাথ, 'অসম্ভবকে সম্ভব করাই হল ওস্তাদ বুজরুকদের কাজ। ফসফরাস মাখা জ্যোতির্ময় মূর্তি আর চোঙার মধ্যে দিয়ে বিকৃত স্বরে কথা বলার বুজরুকি যখন ধরেছি, তখন বাকিটুকুও ধরব। বাড়ির ভেতর যারা থাকে, তাদের খবরাখবর নিয়েছেন?'

'তা না নিয়ে কি আর বসে আছি?' প্রায় খেঁকিয়ে ওঠেন আচাও। আবার কয়েক তাড়া কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'নিন, পড়ুন। ডেভিড আর মুকরি ছাড়া আর মাত্র দুটি প্রাণী থাকে ও-বাড়িতে। ভূতপূর্ব কুস্তিগীর লছমন সিং। ফৈজাবাদে দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্যে একবার জেলে গেছিল। আর আছে মেরি ব্রাগাঞ্জা। গোয়ানিজ মেয়ে। সংসারের সব কাজ সে-ই করে।'

'চমৎকার।'

'বৈঠকের সময়ে যদি হানা দিতে পারতাম, সবকটাকে একটানে তুলতাম জালে।'

মৃদু হাসে ইন্দ্রনাথ, 'অত সোজা নয়। দু-চারটে গুপ্তপথ তো আছেই। গিয়ে দেখবেন, পাখি উড়েছে। মাঝখান থেকে প্রফেসরের সঙ্গে মেয়ের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হবে। তিনিও আপনাদের ক্ষমা করবেন না, অপারেশন নটরাজেরও ইতি ঘটবে।'

'ভণ্ডামি তো ফাঁস হবে।'

'নাও হতে পারে। এ-জন্যে একমাত্র দাওয়াই হল কণ্টকে নৈব কণ্টকম।'

'তার মানে?'

'তার মানে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। প্রফেসরের কাজ হয়েছে মোমের হাত। হুবহু আর-একটা মোমের হাত যদি তৈরি করতে পারি—'

'যদি! যদি! যদি!' আবার বিস্ফোরণ ঘটে মিঃ আচাওর।

কান ঝালাপালা হয়ে গেল এই 'যদি' শুনতে-শুনতে। না, মশাই, আর না। আমিও আপনার সঙ্গে সামনের বৈঠকে যাব।'

'আপনি যাবেন?'

'কেন যাব না? কথায় বলে, আশ আর সরষে, না পিষলে রস কীসে?'

'কিন্তু টাকা লাগবে।'

'সরকার দেবে।'

'বেশ, আগামী সোমবার আমরা দুজনেই যাতে যেতে পারি, সে ব্যবস্থা করব কাল।'

নবম পরিচ্ছেদ : জাদুর দোকান ও নুরজাহান

পুরোনো দিল্লির একটা জনহীন রাস্তা।

বাড়িটা বুনোহাতির জীর্ণ কঙ্কালের মতো সামনে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। সাবেক কালের সৌধ। সর্বাঙ্গে বার্ধক্যের মেচেতার দাগ নিয়ে লুপ্তশ্রী।

নিচের তলায় জাদুর দোকান। কুয়াশার মতো ময়লার স্তরে অস্বচ্ছ কাচের মধ্যে ভেতরে দৃষ্টি চলে না। চললে দেখা যেত সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিল, আর সারি-সারি আলমারিতে সাজানো বিস্তর বস্তু—পেশাদার স্টেজ ম্যাজিশিয়ানদের জাদুর সামগ্রী।

তিন পুরুষের ব্যবসা। কিন্তু আর চালাতে পারছেন না বৃদ্ধ সুলতান। একসময়ে সুলতান কোম্পানির নাম বিলেত পর্যন্ত ছড়িয়েছিল—এখান থেকে মাল চালান যেত ডেনমার্ক, লন্ডন, নিউইয়র্কে।

কিন্তু সুদিনের সূর্য এখন অস্তমিত। যেন জাদুকরি ডাইনির প্রভাব পড়েছে জাদুমহলের ওপর। ঘরে-ঘরে তাই স্তূপীকৃত বিচিত্র জাদুর সামগ্রী—ধুলোর পুরু পর্দায় ঢাকা।

কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে ধরল পাজামা-পরা পরিচারক।

কার্ডটা এগিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ। নামের তলায় কালিতে লেখা একটি পংক্তি—জাদুকর সরকারের বিশেষ বন্ধু।

ডাক পড়ল তক্ষুনি। সসম্মানে ভেতরে নিয়ে গেল পরিচারক। ছোট ঘরের একপ্রান্তে গালিচা-মোড়া কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ির ওপরে চাতালের ডান দিকেই সুবিশাল একটা ঘর। কড়িকাঠ থেকে মেঝে পর্যন্ত মস্ত আয়না। আয়নার মধ্যে দিয়ে এক বৃদ্ধ তাকিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথ রুদ্রের পানে।

প্রতিফলনের রেখা অনুসরণ করে বৃদ্ধের সম্মুখীন হল ইন্দ্রনাথ। রকিং চেয়ারে আড় হয়ে শুয়েছিলেন সুলতান। বুক থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা অপূর্ব সুন্দর কারুকাজ করা

মহার্ঘ কাশ্মীরি শালে ঢিলা জোব্বার গলায় ঝোলে রেশমী-সুতোর অলঙ্করণ। মাথায় জরির কাজ করা লক্ষ্ণৌই টুপি।

'সেলাম আলেকুম। সরকার সাহেবের অনেকদিন কোনও ইত্তিলা পাইনি। ভালো আছেন তো?'

নীল মখমলের কুশন মোড়া কাষ্ঠাসনে বসতে-বসতে ইন্দ্রনাথ বললে, 'ভালোই আছেন। দরকার পড়লেই আপনার দোকানে আসতে বলেছিলেন। তাই এলাম।'

'ভালোই করেছেন। অন্যত্র গেলে মিথ্যে হয়রান হতো। বলুন কী চাই?'

'আমি.' একটু থেমে, 'একটা মোমের হাত তৈরি করাতে চাই।'

আর্তনাদ করে উঠল রকিং চেয়ার। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে দুলতে-দুলতে পুনরাবৃত্তি করলেন সুলতান, 'আপনি একটা মোমের হাত তৈরি করতে চান।'

'নিরেট নয়। ফাঁপা। কোথাও জোড় থাকবে না।'

আবার প্রতিবাদ উঠল রকিংচেয়ারের তৈলহীন সন্ধিস্থল থেকে, 'নিরেট নয়। দস্তানা। কোথাও জোড় থাকবে না। খুব কঠিন নয়। কী জন্যে চাই?'

'প্রেতাত্মার পার্থিব দেহধারণ প্রমাণ করার জন্যে।'

'প্রেতাত্মার পার্থিব দেহধারণ প্রমাণ করার জন্যে।' তোতাপাখির মতো আউড়ে গেলেন বৃদ্ধ।

'আস্ত হওয়া চাই, জোড় থাকবে না, সবার চোখের সামনে বসাতে হবে। আঙুলের ছাপ থাকবে।'

প্রতিধ্বনি ফিরে এল সুলতানের অটোমেটিক স্বরযন্ত্র থেকে, 'আঙুলের ছাপ থাকবে।' পরক্ষণেই সচকিত চাহনি মেলে, 'মিডিয়াম র‍্যাকেটে আছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'বোস্টনে একজন মিডিয়াম থাকত। কী যেন তার নাম? ও হ্যাঁ, মার্জোরি। সে একবার মোমের হাত করেছিল বটে। কিন্তু সে তো বহুদিনের কথা।'

'জানি। কিন্তু সে ছাঁচে আঙুলের ছাপ ছিল জীবিত মানুষের। আমার মোমের দস্তানায় যার আঙুলের ছাপ থাকবে, সে মারা গেছে।'

'আপনার মোমের দস্তানায় যার আঙুলের ছাপ থাকবে, সে মারা গেছে!'

'হ্যাঁ। বানাতে পারবেন কি?'

'বানাতে পারব কি?'

অতিকষ্টে বিরক্তি দমন করে নেয় ইন্দ্রনাথ রুদ্র। পুনরাবৃত্তি করা বৃদ্ধ সুলতানের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে এবার আর নতুন প্রশ্ন না করে তন্নিষ্ঠ হয়ে কী ভাবতে লাগল বুড়ো।

টিকটিক করে ঘুরে চলে সময়ের কাঁটা। নৈঃশব্দ্য ভেঙে কিছু একটা বলার প্ল্যান আঁটছে ইন্দ্রনাথ, এমন সময়ে ঝনঝন করে উঠল কলিংবেল।

সিধে হয়ে বসলেন সুলতান। চকচক করে উঠল দুই চোখ। নিচের তলায় দরজা খোলার শব্দ হল। কে যেন উঠে আসছে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। চাতালের ওপর দিয়ে এগিয়ে এল পদশব্দ।

পরমুহূর্তে দোরগোড়ায় আবির্ভূত হল ছবির মতো এক অপরূপ মূর্তি।

মখমল আসনে বসে দেওয়ালে প্রলম্বিত মুকুরে প্রতিবিম্বের দিকে হতবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

পরনে ফিকা সবুজ রেশমী চুড়িদার পাজামা। পরে জাফরানি রঙের আংরাখা, আর মাথায় আসমানী রঙের ফিনফিনে ওড়না।

কাশ্মীরি আপেলের মতো রাঙা টুকটুকে কপোল, আর যেন হাতির দাঁত কুঁদে গড়া মুখশ্রী। হিল্লোল দেহলতা। ধীরে-ধীরে রক্তিম ঠোঁটে ভেসে ওঠে সূক্ষ্ম রেখালিখা, দুর্বোধ্য হাসির একটু ধারা।

শশব্যস্তে বললেন বৃদ্ধ, 'আমার মেয়ে, নুরজাহান।'

পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল নুরজাহান। দর্পণের প্রতিবিম্ব সশরীরে এসে দাঁড়াল সামনে। ছোট্ট এতটুকু তন্বী মূর্তি। কিন্তু দেহবল্লরীর কোথাও খুঁত নেই। সুঠাম, সুন্দর। বাতাস ভারী হয়ে ওঠে উগ্র বিদেশি অঙ্গরাগের মূর্ছাকর গন্ধে।

বৃদ্ধ বললেন, 'নুরজাহান, ইনি ইন্দ্রনাথ রুদ্র। সরকার সাহেবের লোক।'

অঞ্জলি প্রথায় হাত তুলে নমস্কার করল নুরজাহান। বলল, 'নমস্কার, সরকার সাহেবের লোক আমাদের লোক।'

পরিষ্কার বাংলা! উচ্চারণে কোথাও বিজাতীয়তা নেই। কিন্তু যেন সামান্য ধরা-ধরা কণ্ঠের সুরলালিত্য যেন কোথায় গিয়ে বেধে যাচ্ছে।

বিস্মিত কণ্ঠে বলে ইন্দ্রনাথ, 'আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন?'

'বাংলাদেশে দীর্ঘদিন আমাকে থাকতে হয়েছে।' কুন্দদন্তের ঝিকিমিকি হাসি হেসে বলে অপরূপা।

'নুরজাহান পাগলা পাশার সঙ্গে চার বছর ম্যাজিক দেখিয়েছে। পাশার স্টেজ-অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল নুরজাহান। অনেক দেশ ঘুরেছে।' বললেন বৃদ্ধ সুলতান ঃ 'চাকরি ছেড়ে দিল অ্যাকট্রেস হবে বলে।'

আনত মুখে ওড়নার একটা কোণ আঙুলে পাকায় নুরজাহান।

বৃদ্ধ বললেন, 'ফরমাশ নিয়ে এসেছেন মিস্টার রুদ্র, একটা মোমের আস্ত দস্তানা চাই। আঙুলের ছাপ থাকবে। মরা-লোকের আঙুলের ছাপ।'

'লাইব্রেরিতে দেখিয়েছ?'

'না তো!' আকস্মিক প্রশ্নে থতিয়ে যান বৃদ্ধ।

'লাইব্রেরিটা আগে দেখে এসো।'

স্থির চোখে বললেন সুলতান, 'তা না হয় যাচ্ছি। মেহমানের জন্যে কফি-বিস্কুট ব্যবস্থা কর।'

'বলে দিচ্ছি।'

সৌজন্য প্রকাশ করে ঘর থেকে বিদায় নেয় পিতাপুত্রী। একলা বসে কাঁচি মুখে দেয় ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মনে-মনেই বলে, শাবাশ নির্মিকা লেড়কি! বাপকে কথা বলতে না দিয়ে কায়দা করে সরিয়ে দিলে বটে, কিন্তু মোমের হাত তৈরির ম্যাজিক তোমাকে বলতেই হবে।

জাদুমহলের লাইব্রেরি-কক্ষ।

প্রায় হাজার দুই বই ঠাসা বর্মা-সেগুন কাঠের ভারী-ভারী আলমারির মধ্যে। সমস্ত

জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত। পুরাকালের ডাকিনীতন্ত্র থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের মঞ্চ-কৌশল পর্যন্ত—সুদীর্ঘকালের সমগ্র জাদুরহস্যই বিধৃত এখানে।

রোষকষায়িত-লোচনে কন্যার দিকে তাকিয়েছিলেন বৃদ্ধ সুলতান। আর ফণিনীর মতো শাণিত চোখে ফুঁসছিল নূরজাহান। 'তোমার কি ভীমরতি ধরেছে? ও কে জানো?'

'কে?'

'গোয়েন্দা, গোয়েন্দা! আঙুলের ছাপসমেত মোমের হাত চাইতে এসেছে!'

'এ বাড়িতে গোয়েন্দা কেন আসবে? মোমের গ্লাভস নিয়ে কী দরকার ওর? তুই সেবার বললি, কোনও ঝামেলা হবে না, তাই দিলুম। তবে কি তোর জন্যেই পুলিশ নজর দিয়েছে আমার ওপর? কী করিস তুই? কার কাজ করিস?'

ক্রোধকম্পন মুখে গর্জে উঠল নূরজাহান, 'তাতে তোমার কী? কাজ করেছ, দশগুণ পারিশ্রমিক পেয়েছ। আমি কাজ করি, টাকা পাই। ব্যস, মিটে গেল।' এবার আর ধরা গলায় কথা বলছে না সুন্দরী নূরজাহান—স্বরমাধুর্যেও আর বাধা নেই।

এক পর্দা গলা চড়িয়ে রাগে কাঁপতে-কাঁপতে জবাব দিলেন সুলতান, 'গোড়াতেই বলেছিলাম, কোনও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমি নেই। কথা দিয়েছিলি, ঝামেলা-টামেলা কিছু হবে না। কোনও প্রশ্ন করিনি—বন্ধুদের জন্যে যা করতে বলেছিলি, করে দিয়েছি। এখন এ লোকটা বাড়ি বয়ে এসেছে কেন? কী মতলবে বাইরে ঘুরিস তুই?'

অপরিসীম অবজ্ঞায় নির্মম মুখে বললে নূরজাহান, 'মাথা তোমার খারাপ হয়েছে, তা না হলে দশ হাজার টাকার কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলবে কেন। ওই কাজের জন্যে নগদ দশ হাজার কেউ দেয়? টাকাটা না পেলে তোমার হাল কী হতো, ভেবেছ? বেশি কথা বোলো না, চুপ করে থাকো। লোকটা কে, আমাকে জানতেই হবে।'

'কী করে জানবি?'

'সঙ্গে বেরোব।'

'তোর সঙ্গে ও বেরোবে কেন?'

আবার সেই দুর্বোধ্য হাসি হাসল নূরজাহান। বলল, 'বেরোবে। তুমি শুধু কথা তুলবে দিল্লি শহরটা পুরো দেখা আছে কি না। তারপর ওকে রাজধানী দেখানোর ভার আমি নেব।' শেষ করল দাঁতে দাঁত পিষে, 'সেই সঙ্গে জাহান্নমটাও!'

ঈষৎ স্ফুরিত রক্তবর্ণ ওষ্ঠে মোনালিসার হাসি দুলিয়ে জীবন্ত পোর্ট্রেটের মতো ঘরে ঢুকল নূরজাহান। পিছনে অশীতিপর বৃদ্ধ সুলতান।

রকিংচেয়ারে বসে দুলতে-দুলতে আনমনে বললেন সুলতান, 'না, মিস্টার রুদ্র। অনেক খুঁজলুম। সে বইটা পেলুম না। আপনি যা চাইছেন, তা পারতুম, যদি কেতাবটা পাওয়া যেত।'

পোড়া 'কাঁচি'টা ছাইদানীতে ফেলে মুখ তুলল ইন্দ্রনাথ। প্রশান্ত দৃষ্টিতে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না।

সবুজ মখমলের জরিদার পায়জামার মিঠে শব্দ তুলে সামনের কুশনে এসে বসল নূরজাহান। শঙ্খের মতো সাদা কাঁধ দেখে রাজহাঁসের গ্রীবার কথা মনে পড়ে যায় ইন্দ্রনাথের।

'মিস্টার রুদ্র, দিল্লিতে নতুন এসেছেন নিশ্চয়?' প্রশ্ন করলেন সুলতান।

'হাঁ।'

'পুরো শহর দেখেছেন?'

'না।'

'সে কী!'

ঠিক তখনি ভ্রমরকৃষ্ণ দুই নয়নে বিদ্যুৎকটাক্ষ হেনে মুখ খুলল নূরজাহান। প্রস্তাবনাটা এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই এবং সানন্দে রাজি হল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। মেঘ না চাইতেই জল। এ সুযোগ কি ছাড়া যায়?

স্থির হল, সেই দিনই অপরাহ্নে জাদুমহল থেকে একসঙ্গে বেরোবে নূরজাহান আর ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ গুপ্তচর মহল

মরালছন্দে পুরোনো দিল্লির গলিঘুঁজির মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল নূরজাহান।

চিন্তার ঘূর্ণিঝড় পাক দিচ্ছে ক্ষুদ্রকায়া রূপসীর মস্তিষ্কে। অনেক স্বপ্ন, অনেক সাধ, অনেক বাসনা নিয়ে এ সংসারে এসেছিল নূরজাহান। শৈশবে মায়ের মুখে শুনত জাদুমহলের কক্ষে-কক্ষে নওরোজ-উৎসবের গল্প। লাখো রোশনাইয়ের ছটায় অমরাবতীর মতো ঝলমল করত জাদুমহল। বাতির আলোয়, আতরের গন্ধে, হাস্য-পরিহাসে মহফিল জমত মর্মর প্রাসাদে।

কিন্তু শুধু গল্পই শুনল নূরজাহান। অতীতের প্রেত-শীর্ণ কঙ্কালের মতো এ পুরীতে কোনও সাধই তার মিটল না। ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল বাসনার আগুন।

যৌবনের সিংহদ্বারে উপনীত হল নূরজাহান। দেহে-মনে এল রঙের জোয়ার। মাতৃহীনা কন্যার কোনও স্বপ্নই সফল করতে পারলেন না মন্দভাগ্য সুলতান।

ধীরে-ধীরে সংসারের রূঢ় সত্য উন্মোচিত হল নূরজাহানের সামনে। জানল, এ দুনিয়ায় কেউ কিছু দেয় না, ছিনিয়ে নিতে হয়। শিধা, সরল পথে বৈভব আসে না, আসে বহু বিচিত্র চোরাপথে।

সুতরাং, রাতারাতি নয়, আস্তে-আস্তে মৃত্যু ঘটল এক নূরজাহানের। জন্মাল আর-এক নূরজাহান। নীতিবোধ যার কাছে উদ্দেশ্য-সাধনের অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়

দীর্ঘ চার বছর ভাগ্যান্বেষণে বহু দেশ পর্যটন করল জাদুকরসঙ্গিনীরূপে। অর্জিত হল অজস্র অভিজ্ঞতা, কিন্তু যা তার আশৈশব কামনা—সেই ঐশ্বর্য মরীচিকাই রয়ে গেল।

অবশেষে অভিনেত্রী হওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে দিল্লিতে ফিরে এল নূরজাহান। সুঅভিনেত্রী হতে গেলে যে গুণপনার দরকার, সবই তার ছিল। ছিল রূপ, ছিল নৈপুণ্য। ছিল না শুধু সহিষ্ণুতা। বাধা এলেই ফুঁসে উঠত তার শিরায় তাতারিণী-রক্ত।

অতএব মঞ্চ ত্যাগ করল নূরজাহান।

কিন্তু অর্থ চাই, অর্থ চাই, অনেক অর্থ!

ঠিক তখনি এল অর্থ। বন্যার তোড়ের মতো নিমেষে সমস্ত অভাব ঘুচে গেল

কাশ্মীরি-ললনা নূরজাহানের। কড়া মদ আর উগ্র বিষের মিশ্রণের মতই অর্থের নেশায় বুঁদ হয়ে রইল দিনের-পর-দিন।

সেই অর্থ-স্রোতেই আজ বন্ধ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই শঙ্কার মেঘ ঘনিয়েছে সুন্দরীর মস্তিষ্ক-গগনে। অত্যন্ত শক্তিশালী একটা গুপ্তচর-চক্রের বেতন-ভোগী কর্মী সে। সীমিত বুদ্ধি নিয়ে জেনেছে তারা কারা, কী তাদের মূল অভিপ্রায়। পঞ্চমবাহিনীর সম্ভাবনা নিয়ে কোনও মাথাব্যাথাই নেই তার—ভাবনা শুধু তার নিজের বেতন নিয়ে। চক্রীরা জাল গুটোলেই আবার সেই অভাবের করাল বৃত্তি।

সামনেই সেই আস্তাবল। চুনবালি খসে-পড়া তোরণের মধ্যে ছোট্ট আঙিনায় কয়েকটা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে। তারপর গোটা দুই খাটিয়া। খাটিয়ার পর সরু গলিপথ।

খাটিয়ায় বসেছিল এক মুসলমান যুবক। পারিপাট্যহীন পোশাক। বিশৃঙ্খল চুল। রাঙা চোখ। যুবকের নাম শেখ ওহদা।

সোজা সামনে গিয়ে দাঁড়াল নূরজাহান ঃ 'ওহদা, খোদাবক্স আছে?'

পাথরের মতো অপলক চোখে তাকিয়ে রইল ওহদা। সে-চোখে পূর্ব-পরিচয়ের বাষ্পও নেই।

'খোদাবক্স আছে?' আবার জিগ্যেস করে নূরজাহান।

'না ডাকলে নিজে থেকে এখানে আসার হুকুম তোমার ওপর নেই। কেন এসেছ?'

এ হুকুমের কোনওদিন অন্যথা হয়নি। সাহসও হয়নি। কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র।

'সে কৈফিয়ত খোদাবক্সের কাছে দেব। আছে সে?'

'না।'

বাধা পেয়ে দর্পিতা সর্পিনীর মতোই ফুঁসে উঠল নূরজাহান। অসহিষ্ণু কণ্ঠে তীব্র স্বরে বললে, 'দেখা আমাকে করতেই হবে। ভীষণ দরকার।'

ক্ষণকাল স্থির চোখে তাকিয়ে বললে শেখ ওহদা, 'একঘণ্টা পরে এসো। দেখি, এর মধ্যে যদি এসে পড়ে।'

নূরজাহান জানে, হাতে একঘণ্টা সময় নেওয়ার মূল তাৎপর্য। হুঁশিয়ার চক্রী এরা। পেছনে গুপ্তচর নিয়ে এসেছে কি না, তা পরখ করার জন্যেই ফিরিয়ে দেওয়া হল তাকে।

একঘণ্টা অতিক্রান্ত হতেই আবার তোরণ পেরিয়ে খাটিয়ার সামনে এসে দাঁড়াল নূরজাহান।

এবার দড়ির খাটিয়ার ওপর বসে মাথা নিচু করে ভাঙা ব্লেড দিয়ে নখ কাটছে এক প্রৌঢ়। পরনে নিখুঁত বিলিতি পোশাক। মাথায় সোনালি জরি-গোলাম-মহম্মদী টুপি।

মুখ না তুলেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হেলিয়ে সরু গলিপথটা দেখিয়ে দিলে প্রৌঢ়—চক্রীমহলে যার নাম খোদাবক্স।

নির্দেশিত পথে পা বাড়াল নূরজাহান। গলির পর আবার একটা চত্বর। তিন দিকে টালির ছাউনির নিচে গোটা দশেক রুগ্ন জিরজিরে ঘোড়া। মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা টাঙ্গা।

জুতোর মসমস শব্দ তুলে এল খোদাবক্স। উঠে বসল গাড়োয়ানের আসনে। নূরজাহান বসল পাশে।

'কেন এসেছ?' নীরস কণ্ঠ খোদাবক্সের। দৃষ্টি সামনে প্রসারিত।

'ফাল্গুনী রায় বলে একটা লোক মাহ্রোয়ানিদের বৈঠকে সেদিন এসেছিল। ডেভিড

বলল, পার্টি খুব শাঁসাল। আমাকে তার মরা লাভারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।'

'টাকা নিয়েছে?'

'নিয়েছে।'

'কত?'

'দশ হাজার।'

'এত টাকা পেয়েও টাকার লোভ গেল না? বারণ করা সত্ত্বেও...তারপর?'

'লোকটা আজ খাবার বাড়ি এসেছিল।'

'কেন?'

'মোমের হাত তৈরি করে দিতে হবে—মরা মানুষের আঙুলের ছাপ থাকা চাই।'

'তুমি চিনলে কী করে?' সচকিত চোখে বন্দুকের গুলির মতো প্রশ্ন ছুড়ল খোদাবক্স।

'বৈঠকের আলো নিভে যেতেই কৌতূহল হয়েছিল। তাই ভালো করে দেখেছিলাম। সেই জন্যেই খাবার সামনে দেখামাত্রই চিনেছি। এই তার আসল নাম।' বলে কার্ডটা এগিয়ে দিল নূরজাহান।

সাপের মতো হিসিয়ে উঠল খোদাবক্স ঃ 'ইন্দ্রনাথ রুদ্র! ইয়া আল্লা!'

'আপনি চেনেন?'

'কে না চেনে? বাংলার তুখোড় ডিটেকটিভ। সরকারি মহলে খুব খাতির। ম্যাজিশিয়ান সরকার কে?'

'খাবর বিশেষ বন্ধু।'

'ইন্দ্রনাথ রুদ্র সম্বন্ধে আর কী জানে?'

'আজ রাতেই সব জানব।'

'কীভাবে?'

'শহর দেখাবার নাম করে পেট থেকে কথা আদায় করে নেব। সোমবার আবার বৈঠক আছে তো। আবার যদি আসে, তৈরি হতে হবে।'

'কিন্তু এতে বিপদ আছে।' সন্দিগ্ধ কণ্ঠ খোদাবক্সের।

'জানি।'

'সব জেনেও আগুন নিয়ে খেলতে ভয় হচ্ছে না?'

'যার নুন খাই, তার স্বার্থ আগে—জান পরে।'

'আচ্ছা, তুমি এসো। পিছনের দরজা দিয়ে বেরুবে। বাঁ-দিকের প্রথম রাস্তা দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়বে। পিছন ফিরে তাকাবে না। পিছনে চর লাগলে আমার লোক তার ব্যবস্থা করবে। আর, সোমবার সকালে চিরকুট মারফত স্পেশাল অর্ডার পেলেও পেতে পারো—সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

গাড়ি থেকে নেমে এল নূরজাহান। পেছন ফিরে তাকাল না। কিন্তু কাঠের জীর্ণ ফটকটার সামনে পৌঁছতেই কানে ভেসে এল খোদাবক্সের হিমশীতল ইস্পাত কণ্ঠ ঃ 'তুমিও হুঁশিয়ার থেকো নূরজাহান। আমাদের চোখ রইল তোমার ওপর।'

পথে পা দিল নূরজাহান এবং এই প্রথম নিঃসীম শঙ্কায় অবশ হয়ে এল তনুমন। না এলেই ভালো হত এখানে...না গেলেই ভালো হতো ফাল্গুনী রায়ের সঙ্গে।

অনেক পেছনে ছায়ার মতো লেগে রইল একটা কালো তাওয়ার গাড়ি!

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রফেসর-গৃহিনী কাত্যায়নী

রাত গভীর হয়েছে।

দুই করতলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে ভাবছিলেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী। অদূরে তেপায়ার ওপর রক্ষিত মোমের হাতে পড়েছে টেবিল ল্যাম্পের তির্যক রশ্মি।

আরামকেদারার পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর-গৃহিনী কাত্যায়নী দেবী। লালপেড়ে চওড়া শাড়ি। ধবধবে ফর্সা কপালে সিঁদুরের টিপ। বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি।

পদশব্দে ধ্যানভঙ্গ হল না প্রফেসরের। কতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন কাত্যায়নী। মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, 'শুনছ!

প্রফেসর শুনতে পেলেন না।

'ওগো শুনছ!'

চমকে হাত নামালেন প্রফেসর ঃ 'ও, তুমি। বসো। তোমাকেই খুঁজছিলাম—'

'কেন?'

'সোমবার চলো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়? সেইখানে?'

'হ্যাঁ, মাস্ত্রোয়ানিদের বৈঠকে।'

'না।'

'এখনও তোমার বিশ্বাস হল না?'

'এ বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়।'

'মনে পড়ে তোমার, নীলগিরির ডাকবাংলোয় সেই মাকড়শাটার কথা? বিষাক্ত মাকড়শা—যার কামড়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ময়না ঘুমোচ্ছিল। তিন বছর তখন বয়স ওর। ঘরে ঢুকে দেখি বালিশের ওপর ওত পেতে বসে রয়েছে মাকড়শাটা। আমরা চেঁচাতেও পারিনি, পাছে ঘুম ভেঙে যায় ময়নার। একটু নড়লেই আর নিস্তার নেই। পা টিপে-টিপে গিয়ে আর-একটা বালিশ দিয়ে চেপে মেরেছিলাম মাকড়শাটা। ময়নার ঘুম ভাঙেনি। পরেও এ ঘটনা তাকে বলিনি—তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানত না। কিন্তু ময়না সেকথা জানে।'

'তোমাকে বলল বুঝি?' ফস করে প্রশ্ন করে বসেন কাত্যায়নী।

'হ্যাঁ, বলল। গত হপ্তার বৈঠকে। আমার ইচ্ছাশক্তি ও উপলব্ধি করেছিল, তাই নড়েনি কিন্তু সমস্ত জানে। বলো, তা কী করে সম্ভব? যে ঘটনা তুমি আমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির জানা সম্ভব নয়, তা ময়না জানল কী করে?'

চুপ করে রইলেন কাত্যায়নী।

'মা হয়ে মেয়েকে দেখতে চাও না, কথা বলতে চাও না—কীরকম মা তুমি?'

'কেন দেখতে চাই না, সে তুমি বুঝবে না!' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ কাত্যায়নীর।

'হিন্দুর মেয়ে তুমি, অথচ আত্মার যে মৃত্যু নেই, এ তত্ত্বে বিশ্বাস নেই, আশ্চর্য!' ধীরে-ধীরে কঠোর হতে থাকেন প্রফেসর।

কাত্যায়নী এবার ভেঙে পড়েন ঃ 'হ্যাঁ, আমি হিন্দুর মেয়ে। ভগবানে বিশ্বাস রাখি, বিশ্বাস রাখি আত্মার অবিনশ্বরতায় আর পুনর্জন্মবাদে। কিন্তু কেন, কেন তুমি মায়ায় আটকে

রাখছ ময়নাকে? কেন তাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছ না? কেন তাকে নতুন জন্ম নিতে দিচ্ছ না? আমি মুখ্যু মানুষ কিন্তু এটুকু বুঝি, যে গেছে, তাকে এ জগতে বারবার টেনে আনা উচিত নয়। বরং তার নামে ভালো কাজ করে তার ঊর্ধ্বগতির সাহায্য করা উচিত।'

স্তব্ধ কঠিন মুখে শোনেন প্রফেসর। তারপর বলেন, 'বিয়ের পর থেকে কোনওদিন আমরা পৃথক হইনি। যা করেছি, একসঙ্গে করেছি। তাই আমি শেষবারের মতো অনুরোধ করছি, সোমবার আমার সঙ্গে এসো।'

নৈঃশব্দ্য। বুক কেঁপে ওঠে কাত্যায়নীর। দীর্ঘদিন ধরে একটা অদৃশ্য প্রাচীর তিল-তিল করে গড়ে উঠছে দু-জনের মধ্যে। সে-প্রাচীর আজ একেবারে ধূলিসাৎ করার অথবা কায়েমি করার ভার তাঁরই ওপর ছেড়ে দিলেন বৃদ্ধ স্বামী।

দু-হাতে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কেঁদে ফেললেন কাত্যায়নী ঃ 'না, না, না, আমি পারব না।'

আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে প্রফেসর বললেন, 'যাও, শুয়ে পড়ো। আমার রাত হবে।'

চোখ মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কাত্যায়নী। পিছু ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, পাকাপোক্ত হয়ে গেল অদৃশ্য প্রাচীরটা।

সিঁড়ির ওপর পায়ের শব্দ না মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। এলেন ল্যাবরেটরি-কক্ষে। দেওয়ালে গাঁথা একটা সিন্দুকের সাংকেতিক হরফ ঘুরিয়ে খুললেন ভারী পাল্লাটা। ভেতর থেকে বেরোল একটা চামড়ার কিটব্যাগ। নিচের তাক থেকে একটা মোটা ফাইল, নোটবই আর বেশ কিছু কাগজ বার করে রাখলেন কিটব্যাগে। কাবার্ডের ড্রয়ার খুলে কিছু ডকুমেন্ট এনে ঠেসে দিলেন ব্যাগের মধ্যে।

সবশেষে, লৌহসিন্দুকের একদম পিছনের গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে বার করলেন একটা অদ্ভুত বস্তু। আকারে মুরগির ডিমের মতো। কাচ আর ধাতু দিয়ে তৈরি খোলস।

ক্ষণকাল অনিমেষ নয়নে হাতের তেলোয় রাখা বিচিত্র ডিমটার দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী। ধীরে-ধীরে নিগূঢ় হাসিতে রহস্যময় হয়ে উঠল তাঁর ভয়াল সিংহমুখ।

সিন্দুক বন্ধ করে দিয়ে একটা খাড়ন দিয়ে কিটব্যাগটাকে বেশ করে মুড়ে নিলেন প্রফেসর। এদিক-ওদিক তাকিয়ে লুকিয়ে রাখলেন দেওয়াল আর টেবিলের মাঝের সঙ্কীর্ণ ফাঁকটাতে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ অভিসার-রহস্য

চোখের কোলে সুর্মার রেখা টানতে-টানতে গুন-গুন করে গজল গাইছিল নূরজাহান।

মনের আশা মিটিয়ে আজ সেজেছে সুলতান-তনয়া। সাচ্চার কাজ-করা জরির আংরোখার ওপর ফিকা সবুজ রেশমি ওড়না। সর্পিল বেণীতে নার্গিস ফুল গোঁজা। সুচারু নাকে এককণা নক্ষত্রের মতোই একরতি হীরের ঝিকিমিকি জেল্লা।

নূরজাহান গাইছিল :

আগার হো সাকে তো মোহোব্বাত না করনা।
মোহোব্বাত মে লেকিন্ শিকায়াত না করনা।।

এ গজল এর আগেও কতবার গেয়েছে নূরজাহান। কিন্তু এমন করে তো গায়নি! এত ভালোও লাগেনি। শিরায়-শিরায় যেন অনুরণিত হচ্ছে আখতারী বেগমের সুরেলা কণ্ঠ।

তিনটে বাজতে আর দেরি নেই। দরজা খুলে রেখেছে নূরজাহান। এখুনি এসে পড়বে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র! বাংলার শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা। গোয়েন্দাও এত সুন্দর হয়? এমন মানুষের জাসুস না হয়ে নবিশ হওয়াই উচিত ছিল। মির্জা গালিবের একটা বয়েৎ মনে পড়ে যায় নূরজাহানের।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র! জ্বলন্ত মোমের মতই প্রিয়দর্শন। স্বপ্নময় দুই চোখে শিল্পীর তন্ময়তা। শুধুই কি তাই? প্রেমের মদিরতাও কী তার সঙ্গে মিশে নেই?

কিন্তু চড়া পর্দায় সেতারের ঝনঝনানির মতো এ কোন সুর আজ শিরায়-শিরায় অনুরণিত হচ্ছে নূরজাহানের? কইতাং-এর ভয়, অপযশের ভয়, কলঙ্কের ভয় আর সে করে না। যা করার, তা সেই করবে কিন্তু...কিন্তু...

অর্থের তো আর তার অভাব নেই। অর্থ ছাড়া আর কিছুর কামনাও করেনি। সংগোপনে নিজের অজান্তেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এ কোন বাসনাকে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল নূরজাহান?

একেই কি বলে যৌবনের ক্ষুধা? একেই কি বলে আশনাই?

আবরু তো অনেকদিনই গেছে। এ জীবনে খসম কোনওদিন হবে কি না তাও জানা নেই। কিন্তু হিম্মৎ যখন আছে, তখন এ সাধেও বাদ সেধে লাভ কি? যার ধমনীতে তাতারিণীর রক্ত প্রবাহিত, কামনার ধনকে এইভাবেই সে চিরদিন লুটে এনেছে।

প্রসাধন শেষ। আজিমের পানে শূন্য দৃষ্টি মেলে এইসব কথাই ভাবছিল সুন্দরী নূরজাহান। শূন্যতা বুঝি তার অন্তরেও। এত পেয়েও এত শূন্যতা? হু-হু করে ওঠে মনটা। নিজেকে বড় একলা, বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়।

চমক ভাঙল কলিংবেলের কর্কশ শব্দে।

সে এসেছে।

ত্বরিৎ পদে চাতালে গিয়ে দাঁড়াল নূরজাহান। সিঁড়ির গোড়ায় এসে দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে স্মিতমুখে অভিবাদন জানাল ইন্দ্রনাথ রুদ্র, 'বন্দেগী শাহজাদী!'

ইন্দ্রনাথের পরনে আজ চিকনের কাজ করা লক্ষ্ণৌয়ী পিরান, কাঁধের ওপর থেকে পা পর্যন্ত এলিয়ে ফিরোজা রঙের জামিয়ার। পায়ে জরিদার নাগরা। টানা-টানা চোখে দুর্নিবার আহ্বান।

'তৈরি?'

'জি হাঁ।'

'তবে আর দেরি নয়। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।'

শুরু হল যাত্রা, আর-এক আশ্চর্য অভিনয়। ভালোবাসার অভিনয় তো কতবার করেছে নূরজাহান। অন্ধকার কক্ষে কাঞ্চনী রাতের কণ্ঠলগ্না হয়েও ভাবান্তর ঘটেনি। রাতের

আঁধারে যে অভিনয় এত সহজ মনে হয়েছিল, দিনের আলোয় তা এত কঠিন হবে, তা কি জানত!

মন বলে, নূরজাহান, তুমি মরেছ!

বিবেক বলে, মরো, কিন্তু কর্তব্য ভুলো না!

আর ইন্দ্রনাথ? দ্বিধাহীন স্থিরসঙ্কল্প তার চিত্ত। দেশের শত্রুদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করার জন্যে যে-কোনও অভিনয় করার জন্যেই তৈরি তার মন।

পুরোনো দিল্লির বহু ঐতিহাসিক স্থানে গেল ট্যাক্সি, দেখা হল অনেক কিছুই। ট্যাক্সির দুলুনিতে ঘুচে গেল মধ্যের ব্যবধান, দেহের তড়িৎস্পর্শে সহজ স্বচ্ছন্দ হল সম্পর্ক। ভগ্নস্তূপে হাত ধরাধরি করে ছুটোছুটি করল ছেলেমানুষের মতো। লালকেল্লার প্রাচীরে বসে ষোড়শী চাপল্যে গাইল :

গাল গুলাবি ওঁঠ গুলাবি
চেহরে পে হুস্নে ম্যাহতাবি
জানসে মারে জিনকা চাহে।।

আবৃত্তি করল দেওয়ানিখাসের দেওয়ালে লেখা নূরজাহানের সেই বিখ্যাত লাইন কটি : অগর ফিরদৌস বরুয়ে জামিনস্ত, হামিনস্ত-হামিনস্ত-হামিনস্ত।

যদি পৃথিবীতে কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে তা এইখানেই, তা এইখানেই, তা এইখানেই।

সন্ধ্যা হল। ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল আলোকোজ্জ্বল রেস্তোরাঁর সামনে। শহরের সেরা রেস্তোরাঁ। আঁধারের সূচনাতেই যেখানে জমে ওঠে সুরা এবং সুরের মহফিল। মাদক নেশায় ঝিম হবার জন্যে জমায়েত হয় রাজধানীর কুবেরেরা।

নিভৃত একটি প্রকোষ্ঠে কোমল কুশনের ওপর স্খলিত বিদ্যুৎলতার মতো গা এলিয়ে দেয় মদালসা সুলতান তনয়া।

পাশে বসে নিবিড় কণ্ঠে শুধোয় ইন্দ্রনাথ, 'কী খাবেন? কফি?'

'উঁহু।'

'শরবত?'

'সাদা, না রঙিন?'

হেসে ওঠে ইন্দ্রনাথ। 'যদি বলি রঙিন? আপত্তি আছে?'

'জানি না।' নয়নে চাঞ্চল্যপূর্ণ কটাক্ষ হানে কুহকিনী নূরজাহান।

শ্যাম্পেনের অর্ডার দেয় ইন্দ্রনাথ। নিজের জন্যে জিন উইথ লাইম অ্যান্ড বিটার।

এক পেগ। দু পেগ। তিন পেগ।

শ্যাম্পেনের পাতলা নেশায় ছলছল করে ওঠে নূরজাহানের দুই আঁখি। রহস্য-সঙ্কেত আঁকা অতলান্ত হাসি ভাসে অধরের প্রান্তে।

একান্ত সান্নিধ্যটি বসে গাঢ় কণ্ঠে বলে ইন্দ্রনাথ, 'মোনালিসা।'

'কী?'

'মোনালিসা! মোনালিসা! মোনালিসা!'

চম্পকাঙ্গুলি বুকে ঠেকিয়ে বলে মদালসা, 'আমার নাম?'

'হ্যাঁ, তোমার নতুন নাম। আজ থেকে তুমি আমার মোনালিসা।'

'ভাগ্যিস, মোমের দস্তানা খুঁজতে এসেছিলে, তাই তো পেলে মোনালিসাকে।'

'তা ঠিক।'

'কিন্তু মোমের দস্তানা নিয়ে কী করবে বলো তো?'

'শখ। যদি পাই তো আলমারিতে সাজিয়ে রাখব। মাঝে-মধ্যে শখের প্রদর্শনী করে চমকে দেব বন্ধু-বান্ধবদের।'

ছুট! মনে-মনে বলে নূরজাহান। বিলকুল ঝুট বাত!

'লিসা, মোমের দস্তানার বদলে পেলাম মোমের মানুষ।'

বিসমিল্লা! এত মিষ্টি কথাও কইতে পারে বাংলার গোয়েন্দারা!

'মোমের মানুষ যখন পেয়েছি, তখন মোমের দস্তানাও পেয়ে যাব। তাই না লিসা?'

আল্লা মেহেরবান! সে তোমার নসিব! কিন্তু মোমের দস্তানা হাতে পেলে মোমের মানুষকে ভুলতে তোমার এক সেকেন্ডও লাগবে না বঙ্গালিবাবু, তবে নূরজাহানের রক্তে তুমি আগুন ধরিয়েছ, এত সহজে তো তোমার রেহাই নেই।

'লিসা, তুমি কি বোবা হয়ে গেলে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে নূরজাহান, 'না হয়েও তো রেহাই নেই। মন উজাড় না করতে পারার যে কী কষ্ট—'

'এর পরেও মনে কুলুপ এঁটে রাখতে মন চায়?' আলতো হাতে স্বেদযুক্ত মনা সঙ্গিনীর সুচারু চিবুকটি তুলে ধরে ইন্দ্রনাথ।

চড়া সুরে বাজতে বাজতে আচম্বিতে যেন তার ছিঁড়ে গেল সোনার বীণার। আর সামলাতে পারল না নূরজাহান। সিরাজির পেয়ালা শূন্য, শূন্য তার অন্তর। কিন্তু এই বিরাট শূন্যতা, উদগ্র যৌবনের এই বিরাট রিক্ততাকে ভরিয়ে নেওয়া যায় আনত মুখের ওই সরস ওষ্ঠপুট দিয়ে...

পরক্ষণেই পদ্মের ডাঁটার মতো বাহুপাশে বাঁধা পড়ে ইন্দ্রনাথ রুদ্র...থরথর কম্পিত অধরে অধর মিশে এক হয়ে যায় দুটি দেহ।

অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন দু-চোখে ঘুম এল না ইন্দ্রনাথ রুদ্রের। হোটেলের নির্জন শয়নকক্ষে পায়চারি করল অনেকক্ষণ। শরীরের প্রতিটি কোষে এক বিচিত্র সুখাবহ স্মৃতির আবেশ...এ আবেশ ঝেড়ে ফেলতে চায় না ইন্দ্রনাথ রুদ্র। লাভ কিন্তু অধর মিলনের চকিত স্পর্শে ক্ষণিকের জন্যে বিহ্বল হলেও পরমুহূর্তে দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তিমির রহস্যের একটি প্রান্ত।

আইভি মল্লিককে আবার ফিরে পেয়েছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। পেয়েছে নূরজাহানের মধ্যেই। আইভি-নূরজাহান একই ছলনাময়ীর বিভিন্ন রূপ।

কিন্তু আজ রাতের মতো দূরে থাকুক সে আবিষ্কার—দেহের অণু-পরমাণুতে জেগে থাকুক শুধু স্মৃতির বিহ্বলতা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : বিষ-আংটি

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে প্রথমেই ইন্দ্রনাথের মনে পড়ল আজ সোমবার। মাস্ত্রোয়ানিদের প্রেতাকর্ষণ বৈঠক আছে রাত্রে। মিঃ আচাওকে কথা দেওয়া আছে, তাঁকেও

নিয়ে যাবে সঙ্গে।

তারপরেই মনের পটে ফুটে উঠল একটি মুখ। কপোতকান্তি নূরজাহানের মুখ। জলের আয়নায় প্রতিবিম্বের মতো কাঁপতে-কাঁপতে মিলিয়ে গেল সে মুখ—সে-স্থলে ফুটে উঠল কল্পনায় আঁকা আইভি মল্লিক।

আইভি মল্লিক আর নূরজাহান। কোনও প্রভেদ নেই দুজনের অধরের ছোঁয়াতে, নেই আবেগের তীব্রতায়, নেই বাহুপাশের উষ্ণতায়।

প্রভেদ শুধু উচ্চতায়। অন্ধকারেও অনুভব করেছে ইন্দ্রনাথ, আইভি মল্লিক দীর্ঘাঙ্গী। কিন্তু নূরজাহান অস্বাভাবিক খর্বকায়া। তবে জাদুকরী নূরজাহানের কাছে সেটা একটা বড় সমস্যা নয়। বাক্স বা ওই জাতীয় কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘচ্ছন্দ হওয়া কি খুব কঠিন? মোটেই নয়। বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বাক্স সমেত অন্তর্ধান করাও নিছক অভ্যাসের ব্যাপার।

আর-একটা দুরন্ত সন্দেহ অকস্মাৎ দানা বেঁধে ওঠে। বড় ভয়ানক সন্দেহ। ক্ষুদ্রকায়া নূরজাহান উচ্চতায় কিশোরীর মতই। অন্ধকারে কিশোরী বলে ভ্রম হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

নিকষ অন্ধকারে ফসফরাসের দ্যুতিতে জ্যোতির্ময়ী ময়না বক্সীর ভূমিকা অভিনয় করাও মোহিনী নূরজাহানের পক্ষে এমন কিছু দুরূহ কাজ নয়। ময়নার মতো চুল খুলে কাঁধের ওপর এলিয়ে দিলে, মুখের আদলে যেটুকু তফাত আছে, তাও ঢাকা পড়ে যায়।

তবে কি রাতের পর রাত ছলনাময়ী নূরজাহান একাই আসর মাতিয়ে গেছে? মনে পড়ে ল্যাভেন্ডারের সৌরভ। ফরাসি ল্যাভেন্ডারের মদির সুগন্ধে শুধু ইন্দ্রনাথ রুদ্রই বিভ্রান্ত হয়নি, বিক্রম বক্সীও হয়েছেন।

নাঃ, আর দেরি করা সমীচীন নয়। ডেভিড মাস্ত্রোয়ানির সঙ্গে এখুনি মোলাকাত হওয়া প্রয়োজন।

ঘণ্টাখানেক পরে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল ডেভিড মাস্ত্রোয়ানির বাড়ির সামনে।

পর-পর তিনবার কলিংবেল টেপা সত্ত্বেও সাড়া এল না। চতুর্থবার টিপতেই দরজার ফোকরে একটি মাত্র চোখ দেখা গেল। উধাও হল সেকেন্ড কয়েক পরেই।

মিনিট খানেক পরেই খুলে গেল পাল্লা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং ডেভিড মাস্ত্রোয়ানি। চিন্তাক্লিষ্ট ললাট। দুই চোখে উদ্বেগের ছায়া।

ব্যাপার কী? কুস্তিগীর লছমন সিং গেল কোথায়?

ধ্বনিত হল গমগমে অর্গান-কণ্ঠ, 'গুড মর্নিং, মিস্টার রায়।'

'ভেরি গুড মর্নিং। বিশেষ দরকারে সকালেই ছুটে আসতে হল।'

'একশোবার আসবেন। আমরা সবাই বন্ধু। ভেতরে আসুন।'

চৌকাঠ ছেড়ে সরে দাঁড়াল ডেভিড। সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে ঝাঁঝালো একটা গন্ধ ভেসে এল নাকে।

হুইস্কির গন্ধ।

সকাল না হতে-হতেই হুইস্কি-পান? ডেভিড মাস্ত্রোয়ানির কথাগুলোও কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া—অথচ তা মদ্যপের অসংলগ্নতা নয়। সৌজন্যতার অভাব নেই, কিন্তু নেই

সেই গালভরা বচনবিন্যাস।

অলিন্দ পেরিয়ে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে ইন্দ্রনাথ, পিছন থেকে শশব্যস্তে ছুটে এল ডেভিড।

'ও-ঘর নয়, ও-ঘর নয়! ও-ঘরে মিসেস মাস্রোয়ানি বিশ্রাম নিচ্ছেন। আপনি পাশের ঘরে চলুন।'

কিন্তু পলকের মধ্যেই দৃশ্যটা চোখে পড়েছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্রর। মাঝখানের ছোট টেবিলে মুখোমুখি বসে মুকরি আর লছমন সিং। দুজনেই ঝুঁকে রয়েছে টেবিলের ওপর রক্ষিত ছোট একটা বস্তুর ওপর।

এতটুকু একটা কালো বস্তু। আকারে দেশলাইয়ের মতো।

পাশের ঘরে বসে দুই হাত কোলের ওপর রেখে শুধোল ডেভিড, 'বলুন?'

'আমার এক অবিশ্বাসী বন্ধুকে আজ রাতে নিয়ে আসতে চাই।'

'আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু?'

'হ্যাঁ, আমার বাল্যবন্ধু। সেদিনের অভিজ্ঞতা বলছিলাম। ঠাট্টা করতে লাগল। সবই নাকি বুজরুকি। ওর টিটকিরি আমি বন্ধ করতে চাই।'

তক্ষুনি কোনও জবাব দিল না ডেভিড। ললাটের বিন্দু-বিন্দু স্বেদ হাতের উলটো দিক দিয়ে মুছে নিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

অবশেষে বলল, 'অনেক দিন তো হল, তাই ভাবছিলাম এবার দিল্লি ছেড়ে অন্য কোনও অঞ্চলে প্রেতচর্চা করা যায় কি না। যাওয়ার আগে আপনার বন্ধুর অবিশ্বাস যদি দূর করতে পারি, সে তো ভালোই।'

বটে! পাততাড়ি গুটোনোর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন ডেভিড মাস্রোয়ানি। কিন্তু অকস্মাৎ এ সিদ্ধান্ত কেন?

'হোলিচার্চে কত দান করতে হবে?'

'কিছু না। ওঁকে কোনও সার্ভিস যখন দিচ্ছি না, তখন দানের প্রয়োজন নেই।' ড্রয়ার থেকে বেরোল একটা কার্ড। 'বন্ধুর নাম?'

'জলন্ধর দাস।'

খসখস করে নাম লিখে কার্ডটা ইন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ডেভিড মাস্রোয়ানি।

বিদায় নেওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। অগত্যা গাত্রোত্থান করতে হল ইন্দ্রনাথকেও।

সদর দরজা পেরিয়ে অনুচ্চ তিনতলা বাড়িটার ওপরতলায় চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ডেভিড।

ভ্রস্ত চাহনি চোখ এড়ায় না ইন্দ্রনাথ রুদ্রের। তবে কি টেলিস্কোপিক লেন্স লাগানো গোপন ক্যামেরার খবর মাস্রোয়ানি-মহলেও পৌঁছেছে?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ে দুটি ক্যামেরার গোলমুখ। মাথার ওপর দেওয়ালের জাফরির ফাঁক থেকে বেরিয়ে শুধু দুটি তার। বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে, বসবার ঘরে কালো দেশলাইয়ের বাক্সর মতো একটি বস্তুর ওপর ঝুঁকে রয়েছে মুকরি আর লছমন সিং।

ইনফ্রা-রেড আলোর উৎস আবিষ্কার করে ফেলেছে মাস্রোয়ানি-মহল।

ঠিক সেই সময়ে পুরোনো দিল্লির ঘিঞ্জি গলির মধ্যে ঘটল বিচিত্রতর এক ঘটনা।

সেই আস্তাবল। ভেতরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে টাঙা। টাঙার পিছন দিকটা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। অন্ধকারাচ্ছন্ন পিছনের আসনে আড় হয়ে বসে এল পীত মূর্তি। থ্যাবড়া নাক। তির্যক চোখ। ঘাড়ে-গর্দানে সমান।

পীত মানবের নিবাস হিমালয়ের ওধারে—চীন দেশের এক গণ্ডগ্রামে। ঘরে আছে সুন্দরী বউ, দুই ছেলে, এক মেয়ে। সুখের সংসার। বউ তাকে ভালোবাসে এমন সহৃদয় স্বামী হয় না বলে। ছেলেমেয়েরা বাপ বলতে অজ্ঞান, এমন স্নেহময় পিতা সচরাচর দেখা যায় না বলে।

কিন্তু ঘরের বাইরে বাসিন অন্য মানুষ। তখন সে নির্দয়, নিষ্ঠুর, নির্মম। করুণ দিয়ে-তেরা ছুরির মতো নির্বিক চোখে মায়া-মমতার বাষ্পও দেখা যায় না, ভাবলেশহীন মুখে আবেগের রেখাও ফোটে না। হাসতে-হাসতে মানুষ খুন করার প্রবাদটাও তার ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ, বাসিন যখন মানুষ খুন করে, তখন সে হাসে না, মুখের একটা রেখাও কাঁপে না। মানুষের প্রাণের কানাকড়িও দাম নেই তার কাছে।

খুন করাই বাসিনের পেশা, খুন করাই তার নেশা।

বাসিনকে ভয় করে না এমন লোক বেশি দিন বেঁচে থাকে না। তাই তার সামনে এলে কেঁচোর মতো কুঁচকে যায় দুর্ধর্ষ খোদাবক্স। নুরজাহানের তো কথাই নেই।

এ হেন বাসিনই সেদিন বসেছিল ঢাকা টাঙার পিছনের সিটে। সামনের সিটে পাশাপাশি বসে খোদাবক্স আর নুরজাহান।

পিছনের অন্ধকারে জ্বলছিল একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ।

প্রশ্নটা এল অন্ধকারের ভেতর থেকেই।

'লোকটার আসল মতলব কী?'

'এখনও ধরা যাচ্ছে না।' গলা কেঁপে ওঠে নুরজাহানের। 'আরও একদিন খেলাতে হবে।'

'খেলাতে হবে, না খেলবে?' অন্ধকারের কণ্ঠ এবার শ্লেষতীক্ষ্ণ।

'কত অনেক ঘুরেছি, কিন্তু সুযোগ তেমন পাইনি।'

'বাজে কথা। আমি খবর পেয়েছি, অনেক সুযোগ পেয়েছিলে, কিন্তু বাজে লাগাওনি। মোমের হাত নিয়ে তার কী দরকার?'

'আলমারিতে সাজিয়ে রাখবে। প্র্যাকটিক্যাল জোক করে বন্ধুবান্ধবদের তাক লাগাবে।'

'দিল্লি এসেছে কী উদ্দেশ্যে?'

'বেড়াতে।'

'আজকে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?'

'হবে।'

'মাস্রোয়ানিদের বৈঠকে?'

'হ্যাঁ।'

'প্রথম দিন কীভাবে ওকে ছুঁয়েছিলে?'

'দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরেছিলাম।' অধরস্পর্শের প্রসঙ্গ ইচ্ছে করেই চেপে যায় নুরজাহান।

'আজকেও তাই করবে। ডানহাতের আঙুলে এই আংটিটা পরে থাকবে। এই নাও।'

পিছন থেকে এগিয়ে এল একটা বিচিত্র আংটি। পাথরের জায়গায় একটা সোনার ছিপি। কিছু একটা গেঁথে রয়েছে ছিপির অভ্যন্তরে।

'আংটিটা আঙুলে পরে ঘরে ঢুকবে। জড়িয়ে ধরার আগে ছিপিটা খুলে ফেলবে। খুব সাবধান, ছুঁচের খোঁচা যেন নিজের গায়ে না লাগে। ডানহাতটা কাঁধের ওপর রেখে চট করে বিঁধিয়ে বার করে নেবে। কিছু টের পাবে না। টের পেলেও কিছু করার আগেই এলিয়ে পড়বে।'

শুনতে-শুনতে দেহের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমা হয় নূরজাহানের। অন্ধকারের কণ্ঠ নীরব হতেই আর্ত চাপা কণ্ঠে বলে, 'কী আছে ছুঁচে?'

'অবান্তর প্রশ্ন।' শীতল কণ্ঠ পীতমানবের।

'না, অবান্তর নয়। আমি জানতে চাই এতে তার মৃত্যু হবে কি না—'

'জানার অধিকার তোমার নেই। তা হলেও শোন, ছুঁচ ঘাড়ে বেঁধার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যাবে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। সঙ্গে-সঙ্গে তুমি ঘর ছেড়ে—বাড়ি ছেড়ে পালাবে। মাড়োয়ারিরা ওকে পাশের ঘরে বয়ে নিয়ে যাবে—বাকি যা করবার আমি করব।'

শিউরে ওঠে নূরজাহান। বাসিনের একটা কথাও বিশ্বাস করা চলে না। সারা ভারত জুড়ে এদের জাল ছড়ানো! কোথাও প্লেন উধাও হচ্ছে, কোথাও মিলিটারি অফিসার সমেত জিপ খাদে গড়িয়ে পড়ছে, এই দিল্লি শহরেই কতবার সুস্থ মানুষ সকালবেলা আর ঘুম থেকে ওঠেনি, বাসযাত্রীকে বাসেই মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। সবাই ভেবেছে নিছক দুর্ঘটনা। কিন্তু আর কেউ না জানুক, নূরজাহান জানে, অস্বাভাবিক এসব মৃত্যুর পিছনে কার বা কাদের অদৃশ্য হস্ত আছে।

কে জানে, হয়তো প্রেতাবতরণ বৈঠকেও ঘটবে অনুরূপ ঘটনা। ডাক্তার বলবে, হার্টফেল। প্রেয়সীকে বাহুবন্ধনে বেঁধে উদ্বেলিত-হৃদয় কাঞ্চনী রায় আর এত উত্তেজনা সহ্য করতে পারেনি—চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে হৃদপিণ্ড।

আর, প্রেতবিশ্বাসীরা ভয়ে-বিস্ময়ে বলাবলি করবে, ওপার হতে এসে আইভি মল্লিকই নিয়ে গেল তাকে।

একদিক দিয়ে সত্যিই তাই হবে। জীবনের বাকি কটা দিন লক্ষ বিষাক্ত ছুঁচের ঘায়ে ঝাঁজরা হয়ে যাবে নূরজাহানের বিষ-নীল হৃদয়। হত্যাকারী! হত্যাকারী! হত্যাকারী!

'না, না, না!' যেন বিকারের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠে নূরজাহান।

'এ কাজ আমি পারব না।'

ক্ষণকাল সব চুপ।

তারপর—

'আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী মেয়ে বলে তোমার সুনাম আছে। তোমার রেকর্ড ভালো। সেই জন্যেই এ দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তোমাকে। আপত্তি জানিয়ে কোনও লাভ নেই, তা জানো। এক কথা দুবার বলা আমি পছন্দ করি না।'

বুনো বেড়ালের মতো ফোঁস করে উঠল খোদাবক্স, 'যা বলা হচ্ছে, তাই করো।'

বরফ-ঠান্ডা গলা ভেসে এল অন্ধকারের ভেতর থেকে, 'খোদাবক্স, ওকে কথা বলতে দাও।'

সঙ্গে-সঙ্গে জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো চুপ করে গেল খোদাবক্স।

নূরজাহান জানে অবাধ্য হওয়ার কী পরিণাম। নিজে তো বাঁচবেই না, ইন্দ্রনাথ রুদ্রকেও বাঁচানো যাবে না। তার চাইতে বরং—

'আমি রাজি।'

'চমৎকার। কাজ শেষ করে সিধে বাড়ি চলে যাবে। কাল সকাল দশটায় ফোন পাওয়ার আগে বাড়ি থেকে নড়বে না। আংটিটা কালই ফেরত দেবে।'

'আচ্ছা।'

'এখন তুমি যাও। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিধে যাবে। প্রথম গলি ছেড়ে দ্বিতীয় গলির মধ্যে দিয়ে বড় রাস্তায় পড়বে। একটা টাঙা নিয়ে সোজা উত্তরমুখো যাবে। চৌমাথায় টাঙা ছেড়ে দেবে। ঠিক তখনি যদি অল ক্লিয়ার সিগনাল পাও আমার লোকের কাছ থেকে, তবেই ট্যাক্সি নেবে—নইলে নয়। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকবে, পিছন ফিরবে না।'

স্তব্ধ হল হিম-কণ্ঠ। টাঙা দুলে উঠল, সরে গেল পেছনের তেরপল। উধাও হল পীতমানব।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ বিষাক্ত ছুঁচের বিষলীলা

হোটেল। ইন্দ্রনাথ রুদ্রের কক্ষ।

কফিপান শেষ। 'কাঁচি'-তে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। বলল, 'আপনাদের ক্যামেরার কীর্তি ফাঁস হয়ে গেছে। ছেঁড়া তার আর ইনফ্রা-রেড ল্যাম্প নিজের চোখেই দেখে এলাম।'

তিক্তমুখে জবাব দিলেন মিঃ আচাও, 'জানি। রাত্রের ফোটো তোলা আজ থেকে বন্ধ হল।'

'ক্যামেরার সন্ধান পায়নি বুঝি?'

'না। ক্যামেরা আছে একটু দূরেই। ল্যাম্পটাও কি ছাই চোখে পড়ত? কপাল আর কাকে বলে।'

'হয়েছিল কী?'

'আরে মশাই মূলে ওই চড়ুইটা।'

'চড়ুই!'

'হ্যাঁ, চড়ুই। বাটাদের তার, খড়কুটো দেখলেই টানাটানি করা চাই। তাই করতে গিয়েই জাফরি আর তারের ফাঁকে আটকা পড়ে। সে কী পরিত্রাহি চিৎকার! প্রথমে এল লছমন সিং। তারপর সকাই। মুখের ভাবগুলো যদি দেখতেন, বাঁধিয়ে রাখার মতো। মুভিতে পুরো দৃশ্যটাই তোলা আছে। পরে দেখবেন'খন।'

রিস্টওয়াচের ওপর চোখ বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

'চলুন, পৌঁছতে ন'টা বেজে যাবে।'

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল প্রেতভবনের সামনে।

সামনেই দাঁড়িয়ে আর একটা ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে নিচ্ছেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী।

নিম্নকণ্ঠে মিঃ আচাওকে জিগ্যেস করে ইন্দ্রনাথ, 'প্রফেসর আপনাকে চেনেন?'

'না।'

'বাঁচিয়েছেন। মনে রাখবেন, আপনার নাম জলন্ধর দাস। পেশায় অর্ডার সাপ্লায়ার। আমার বাল্যবন্ধু।'

'যথা আজ্ঞা।'

ফাল্গুনী রায়কে এগিয়ে আসতে দেখে 'স্মিতমুখে অভ্যর্থনা' জানালেন প্রফেসর, 'ভালো তো? সঙ্গে কাকে আনলেন?'

'আমার বাল্যবন্ধু, জলন্ধর দাস। প্রফেসর বিক্রম বক্সী।' নমস্কার প্রতি-নমস্কারের পর, 'জলন্ধরের ভূতপ্রেতে বড়ই অবিশ্বাস। তাই কিঞ্চিৎ বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্যে—'

'বেশ করেছেন, এ ব্যাপারে মাস্ত্রোয়ানিরা সাচ্চা আদমি।'

সদর দরজা পেরোতেই বাজল অগ্নি-কণ্ঠ, 'সুস্বাগতম! সুস্বাগতম। ইনিই জলন্ধর দাস?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক মিনিট আলাপচারির পর সিঁয়াস-রুমে প্রবেশ করল সকলে। চেয়ার সংস্থা পূর্বদিনের মতোই। অভ্যাগতদের মধ্যে নেই শুধু গতদিনের এক বিধবা ভদ্রমহিলা।

যথারীতি বাগাড়ম্বর এবং দীর্ঘ ভনিতার পর হাত-পা বাঁধা হল মুকরি মাস্ত্রোয়ানির। বাঁধল রঘুনাথ পোদ্দার। আলকাতরার মতো কালো আঁধারে সব কিছু অদৃশ্য হয়ে যেতেই বাজল সুমিষ্ট জলতরঙ্গ। সুরের মাদকতা সবার শিরায়-শিরায় যখন রিমঝিম অনুরণন বাড়িয়ে চলেছে, ঠিক তখনি আচম্বিতে একঝলক কনকনে ঠান্ডা হাওয়া রোমাঞ্চের শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে গেল জলন্ধর দাসের প্রতিটি লোমকূপে।

পরক্ষণেই কার হিমশীতল করস্পর্শে চমকে উঠল জলন্ধর। দু-দিক থেকে তার দু-হাত ধরে বসে ডেভিড মাস্ত্রোয়ানি আর রঘুনাথ পোদ্দার। প্রবল ইচ্ছে হল হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার এবং অন্ধকারের প্রেতমূর্তি লক্ষ করে একটি বিরাশি-সিক্কার চপেটাঘাত করার। কিন্তু মুঠি আরও শক্ত করে ফিসফিস করে উঠল ডেভিড, 'নড়বেন না। ভয় পাবেন না। কোনও ক্ষতি হবে না আপনার।'

অগত্যা নিশ্চুপ হয়ে বসে থেকে চালক প্রেতাত্মার হাসাকর বক্তিমে, বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ঝনঝনানি এবং একাধিক প্রেতাত্মার ফিসফিসানি শোনা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। এরই মধ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি হিসেবে মুকরির কাতরানি সবিশেষ ফলদায়ক হল।

তারপর এল আইভি মল্লিক।

পর্দার অন্তরাল থেকে ভেসে এল বীণাকণ্ঠ, 'শুনছ, কোথায় তুমি?'

'এই যে আমি! এই যে আমি!'

ঠিক এই সময়ে গাঢ় তমিস্রা পাতলা হয়ে এল লালাভ দ্যুতিতে। দেখা গেল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ফাল্গুনী রায়ের আবছা দেহরেখা।

'ফাল্গুনী! আমার ফাল্গুনী! আমার জন্ম-জন্মান্তরের ফাল্গুনী!'

'আইভি, আমার হৃদয়কমলের রাঙা কমল।'

'ভালোবেসে সুখ যত না পেলাম, তার চাইতে দুঃখই বেশি পেলাম, তাই না গো?'

'দুঃখের কষ্টিপাথরেই যাচাই হয়ে গেল, খাদ নেই এ প্রেম খাঁটি হেম।'

'কাছে এসো, ফাল্গুনী, তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্যেই এত কষ্ট করে দেহধারণ করা।'

লালাভ আঁধারের মধ্যে এগিয়ে যেতে দেখা গেল, অপচ্ছায়ার মতো ফাল্গুনী রায়ের দীর্ঘ মূর্তি।

পর্দার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াল কৃষ্ণমূর্তি। কয়েক সেকেন্ড সব চুপ। তারপরেই যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ফাল্গুনী রায়। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'না, না, না। আমি পারব না!'

'কী পারবে না?'

'এভাবে তোমাকে কষ্ট দিতে পারব না। জানি, আমার জন্যেই পৃথিবীর স্তরে নেমে আসতে হচ্ছে তোমাকে। মায়ায় বেঁধে আর তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না, আইভি।'

'ছিঃ ফাল্গুনী, অবুঝ হয়ো না। আমি যে তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।'

'আইভি, আমার কথা রাখো, আমাকে আর ডেকো না—সইতে পারব না। তুমি ফিরে যাও। যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই ফিরে যাও। ভুলে যাও অতীত, মায়ামুক্ত হও। আমাকে আর কষ্ট দিও না। শান্তিলাভ করো। চিরশান্তি!'

'ফাল্গুনী, ফাল্গুনী, এ কী বলছ তুমি!'

'ঠিকই বলছি। জানি, আমার অসহ্য কষ্ট হবে, কিন্তু তুমি তো শান্তি পাবে। তোমার আত্মার মঙ্গল হোক, এই প্রার্থনাই করি। যাও, মিথ্যে মায়ায় ভুলো না।'

'ফাল্গুনী!'

'আইভি!'

পরমুহূর্তেই ধপ করে একটা শব্দ শোনা গেল।

রোমাঞ্চিত কলেবরে নাটক শুনতে-শুনতে মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যায় মিঃ আচাওর। এ কী সংলাপ? এরকম তো কথা ছিল না? এত অর্থব্যয় করে বৈঠকে এসেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র, কেবল পর্দার ওদিকে গিয়ে আইভি মল্লিকের প্রতারণা হাতে-নাতে ধরার জন্যে।

কিন্তু কেন এই আকস্মিক অনিচ্ছা?

ধাঁধার মধ্যে ধাঁধা; প্রহেলিকার গোলোকধাঁধা! ঘটনাপ্রবাহের বিস্ময়কর ঘাতপ্রতিঘাতে হতবুদ্ধি হয়ে যান জলন্ধর দাস ওরফে মিঃ আচাও।

অনুভব করেন, সহসা কঠোর হয়ে উঠেছে ডেভিড মাস্ত্রোয়ানির মুঠি। শুধু তাই নয়, ঘামে ভিজে গেছে তার করতালু। হাত ঠান্ডা।

টাম্বুরিনের ঝনঝন বাজনা দূর হতে দূরে সরে যাচ্ছে। আর যেন বাতাসের কানাকানির মতো অস্ফুট বিলাপধ্বনি ক্ষীণ হয়ে মাথাকুটে মরছে বন্ধ-ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে :

'ফাল্গুনী! ফাল্গুনী! ফাল্গুনী!'

অশরীরীর কান্না। কিন্তু মানবীর হৃদয়াশ্রুও বুঝি রক্ত হয়ে ঝরে পড়ছে সেই অপসৃয়মান হাহাকারের মধ্যে।

গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায় জলন্ধর দাসের।

আস্তে-আস্তে কার অদৃশ্য হস্তপ্রয়োগে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে লালাভ দ্যুতি। আবার নিকষ অন্ধকারে ভরে উঠছে ঘর।

ছায়ালোকের মধ্যে দেখা গেল, একটা দীর্ঘ কৃষ্ণচ্ছায়া পায়ে-পায়ে পিছিয়ে এসে বসে পড়ল ফাল্গুনী রায়ের চেয়ারে।

আচম্বিতে শাঁখ বেজে উঠল।

শঙ্খ-নিনাদ না বলে তাকে শঙ্খ-সংগীত বলা উচিত।

যেন শব্দব্রহ্মের অন্তস্থল থেকে উঠে এল সে শব্দ। উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠে অকস্মাৎ থেমে গেল মাঝপথে।

নৈঃশব্দ। অসহ্য উৎকণ্ঠায় ফেটে পড়তে চাইছে ঘরের বাতাস।

আস্তে-আস্তে শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে ওঠে উপস্থিত প্রত্যেকের।

বজ্রগর্ভ এ নীরবতা আর বুঝি সহ্য হয় না।

এরকম কাণ্ড তো এর আগে এ-বৈঠকে কখনও ঘটেনি!

অনেক...অনেকক্ষণ পরে যেন ঘরের রহস্য অন্ধকারই কথা কয়ে উঠল কুণ্ঠিত স্বরে...

স্ফুট কণ্ঠে কথা বলছে চালক প্রেতাত্মা রুক্মিনী।

'প্রফেসর বিক্রম বক্সী...প্রফেসর বিক্রম বক্সী।'

'আমি...আমি।'

সবেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর।

দূরাগত বর্ষাসংগীতের মতই বিষণ্ণ কণ্ঠ রাজকুমারীর, 'প্রফেসর...দুঃসংবাদ আছে।'

'কী? কী?'

'ময়না কাঁদছে...আসতে পারছে না...আর বোধহয় কোনওদিন পারবে না।'

'কে? কে একথা বলেছে? আসতে হবেই ময়নাকে। মিডিয়াম! মিডিয়াম! ময়নাকে আসতে দিন—একে যেতে বলুন!'

নিজের কর্ণকুহরকেও বিশ্বাস করতে পারেন না মিঃ আচাও। এ কী উন্মত্ত প্রলাপোক্তি! বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক একজন তৃতীয় শ্রেণীর প্রতারক চীনেলোকের কাছে ব্যাকুল আবেদন জানাচ্ছেন তাঁর মরা মেয়ের প্রেতাত্মাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে!

কিন্তু শুধু একটা যন্ত্রণা-বিকৃত গোঙানি ছাড়া আর কোনও সাড়া এল না মিডিয়ামের দিক থেকে।

নূপুর-নিক্কণের মতো টাম্বুরিনের ঝনক-ঝনক বাজনা আবার দূরে সরে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের মতই মিলিয়ে যাচ্ছে প্রেতিনী কণ্ঠ—

'আমি যাই...আমি যাই...ময়না কাঁদছে। হয়তো একদিন সে আসবে...হয়তো আর আসবে না...'

'ময়না...ময়না কোথায় তুই?' দ্বিতীয়বার মেয়ে হারানোর শোকে যেন হাহাকার করে ওঠেন বৃদ্ধ বিক্রম বক্সী। বুকফাটা কান্না ঝরে পড়ে আকুলকণ্ঠে।

মিঃ আচাও কল্পনাপ্রবণ মানুষ নন। কিন্তু সেই মায়াময়ী প্রেতকক্ষে আবেগঘন এই রহস্য-নাটিকার ক্লাইমাক্সে পৌঁছে মানসচক্ষে ভেসে উঠল জলভরা মেঘের মতই

বেদনায় টলমল ঘনকালো আয়ত দুটি চোখ, থরথর কম্পিত পদ্মকোরকের মতো ঠোঁট, আর স্ফুরিত নাসারন্ধ্র; ময়না বক্সী কাঁদছে;

ফুঁপিয়ে উঠল মিডিয়াম।

'আলো!' গর্জে উঠল ডেভিড।

দপ করে জ্বলে উঠল বিদ্যুৎবাতি। অদৃশ্য হল জমাট অন্ধকার।

দু-হাত দু-পাশে রেখে প্রস্তর মূর্তির মতো বসে ফাল্গুনী রায়। মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। দুই চোখের শূন্য দৃষ্টি যেন পার্থিব জগতের গণ্ডি ছাড়িয়ে অপার্থিব লোক পর্যন্ত বিস্তৃত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রেতাত্মার হুঁশিয়ারি

'আরে মশায়, নাটক করার একটা সময়-অসময় আছে।' ক্রোধকরুণ মুখে বললেন মিঃ আচাও, 'মাথার ওপর খাঁড়া নিয়ে প্রেমালাপ করার মেজাজ আসে? কাজ তো হল ঘেঁচুর ডিম, সময় গেল, টাকা গেল—'

'আর আমার প্রাণ বাঁচল।' খাটের ওপর চিতপটাং হয়ে শুয়ে পা নাচাতে-নাচাতে বলল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

কথা হচ্ছিল ইন্দ্রনাথের হোটেল কক্ষে। মায়ামানিভবন থেকে ফিরেই।

'তার মানে?'

'তার মানে এইটা—' বলে, পাট-করা একটা রুমাল এগিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ।

ভাঁজ খুলতেই দেখা গেল ছোট্ট একটুকরো কাগজ আর মেয়েলি হরফে দ্রুত হস্তে লেখা শুধু একটি লাইন ঃ

'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, ক্যাবিনেটের মধ্যে আর যেও না।'

চোয়ালের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে মিঃ আচাওর ঃ 'এই জন্যেই ভেতরে গেলেন না আপনি?'

প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু গায়ে মাখল না ইন্দ্রনাথ। বলল, 'প্রিমনিশন বলে ইংরেজিতে একটা কথা আছে জানেন তো? অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়ে আমি আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করেছিলাম। এ ছাড়াও ছিল লজিক্যাল অ্যানালিসিস। তারপরেই এল এই চিরকুট। সবগুলোর যোগফল হল আমার প্রাণরক্ষা।'

'হেঁয়ালি ছাড়ুন!'

'সিঁয়াঁস সবে শুরু হয়েছে, ঠিক তখনি কে যেন আমার পিছন থেকে এসে বুক পকেটে গুঁজে দিয়ে গেল খড়মড়ে একটা জিনিস। অনুভূতি দিয়ে বুঝলাম কাগজ। দুটো হাতই জোড়া। কাজেই সবুর সইতে হল। অতিথির ডাক আসতেই প্রেমালাপের ন্যাকামি করে হাতে সময় নিলাম। বুক পকেট থেকে বেরোল কাগজটা আর পাশপকেট থেকে স্নিপারস্কোপ—অন্ধকারে দেখার যন্ত্র—যা কোরিয়ার যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত করা হয়েছে। কালো পর্দার সামনে গিয়ে দেখলাম, আমার অনুমানই সত্যি। ইনফ্রা-রেডের অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ছাওয়া ওদিকটা। স্নিপারস্কোপ চোখে লাগিয়ে এক সেকেন্ডেই পড়ে ফেললাম

চিরকুটের হুঁশিয়ারি। তারপর, আপনার ভায়ায় নাটক করলাম। সবশেষে দপ করে হাটু গেড়ে বসে পড়লাম।

'ক্যাবিনেটের মধ্যে গেলেই যে আপনার মরণ হবে, এ ধারণা আপনার মাথায় এল কী করে? পাছে আপনি ওদের বুজরুকি ধরে ফেলেন, এই আশঙ্কা করেই আপনাকে ওরা আটকাল। আর ভয়ের চোটে আপনি—ছি ছি ছি!'

মৃদু হাসল ইন্দ্রনাথ। রহস্য করে বলল, 'এমনও হতে পারে, আমার এক ভূত-বন্ধুই সাবধান করে দিয়ে গেল আমাকে। কাগজে আঙুলের ছাপের ছবি তুললেই ভূতের পরিচয় পাবেন।'

'তা তো তুলবই। এ নষ্টামি কার, তা ধরব বলেই। কিন্তু প্রিমনিশন, সাইকিক্যাল অ্যানালিসিস—কী সব যেন বলছিলেন না, সেগুলো কী?'

মুখ টিপে হেসে বলল ইন্দ্রনাথ, 'ওটা আমার মন্ত্রগুপ্তি!'

এর বেশি আর কিছু বলা যায় না। কারণ, সুলতানের জাদুমহলের বৃত্তান্ত মিঃ আচাও জানেন না। জানেন না, নূরজাহানের সঙ্গে তার প্রণয়াভিযানের কাহিনি। চুম্বন-রহস্য উদ্ঘাটনের বর্ণনায় হিতে বিপরীত হতে পারে। কেননা, শুধু অধরের ছোঁয়া অনুভব করে বহুরূপিনীর লীলাখেলা যে ধরা যায়, তা রসকষহীন আচাও বুঝবেন না—মাঝখান থেকে উপহাসই জুটবে। বাস্তবিকই, আইভি আর নূরজাহান যে এক ও অভিন্ন—তার বাস্তব কোনও প্রমাণ যখন নেই—

তা ছাড়া, প্রথম দর্শনেই নূরজাহানের অধরপ্রান্তের সেই প্রেমের হাসি ভুলতে পারে না ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ঘরে ঢুকেই তাকে চিনেছে ক্ষীণতনু মোহিনী। তবুও ধরা দিয়েছে। সে কি বিনা উদ্দেশ্যে?

নিশ্চয় নয়। গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথের অভিপ্রায় যখন তাদের অজানিত নয়, তখন প্রথম সুযোগেই যে তাকে ধরাধাম ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে, এ সিদ্ধান্ত কি অযৌক্তিক?

কখনও না। তাই তৈরি ছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। কিন্তু পকেটে চিরকুট আসতেই সব গোলমাল হয়ে গেল। এ হুঁশিয়ারি কার? নূরজাহানের? কিন্তু তার তো লেখা উচিত ছিল ক্যাবিনেটের মধ্যে 'এসো' না—'যেও' না লিখল কেন?

শত্রুপুরীতে কে এই অজ্ঞাত বন্ধু?

বিদ্রুপ-তরল কণ্ঠে বললেন মিঃ আচাও, 'কী মশাই, আবোল তাবোল ভাবতে শুরু করে দিলেন যে! সব কথা পেটে না রেখে খুলে বললে ভালো করতেন। ভুলে যাবেন না বিপদের আর দেরি নেই। ময়না বক্সীর লাস্ট মেসেজটা মনে আছে? প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এমব্যাসিতে যাওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে তার মধ্যে। আজ রাতেই প্রফেসর জানলেন, ময়না আর আসবে না।'

'সে জন্যে দায়ী আপনার চড়াই আর নিয়ন-রেড ল্যাম্প। মাস্তানিরা বুঝেছে, পুলিশের নজর চব্বিশ ঘণ্টা রয়েছে ও-বাড়ির ওপর। তাই চটপট জাল গুটোবার মতলব এঁটেছে।' 'কাঁচি'-তে অগ্নিসংযোগ করে বলল ইন্দ্রনাথ।

কঠিন কণ্ঠে মিঃ আচাও বললেন, 'য' হওয়ার তা হয়ে গেছে। দোষের ভাগ আমি নিচ্ছি। কিন্তু আপনিও নিস্তার পাবেন না। সব কথা চেপে রাখছেন। অথচ কাল সকাল নটায় পাকিস্তান এমব্যাসি খুললেই প্রফেসর বিক্রম বক্সী সেখানে হাজির হতে পারেন।

অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে তারা তৈরিই হয়ে আছে। সেখান থেকে পিন্ডিতে খবর পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে খেয়াল আছে?'

'সুতরাং কী করতে চান?' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল ইন্দ্রনাথ।

'তার আগেই মাস্তানি থেকে শুরু করে প্রফেসর পর্যন্ত—সবাইকে খাঁচাকে পুরতে চাই।'

'অপারেশন নটরাজ?'

দৃষ্টি বিনিময় করে চোখ নামালেন মিঃ আচাও।

হঠাৎ গলার স্বর খাদে নামিয়ে এনে বললেন, 'আমি এ সমস্যার কূল কিনারা দেখছি না। আপনিও কোনও সাহায্য করছেন না। কিন্তু সমস্ত দায়িত্বই আমার। কাজেই আর নয়, আর দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি ওপরওলার সঙ্গে কথা বলব।'

'ভাবছেন যে আপনি হালে পানি পাচ্ছেন, এই তো?' চোখ নাচিয়ে মোক্ষম বাণ নিক্ষেপ করে ইন্দ্রনাথ।

খোঁচাটা লাগতেই অকস্মাৎ রাগে, উত্তেজনায় ফেটে পড়েন আচাও, 'তা ছাড়া, আর কী করতে পারি বলতে পারেন?'

'আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন।' শান্ত কণ্ঠে বলল ইন্দ্রনাথ।

'এর পরেও?'

'হ্যাঁ। আরও চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিন আমাকে। প্রফেসরকে আমি আটকাব।'

অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আচাও বলেন, 'গ্যারান্টি দিচ্ছেন?'

হেসে ফেলল ইন্দ্রনাথ, 'গ্যারান্টি কি কেউ দেয়, না দেওয়া সম্ভব? তবে কি জানেন, আপনি দেশকে কতটা ভালোবাসেন জানি না, আমি বাসি। সুতরাং এ-সমস্যা শুধু আপনার চাকরির মানসম্মান দায়িত্বের সমস্যা নয়, সমস্ত দেশের সমস্যা, আমারও সমস্যা।'

যেন চাবুক খেয়ে সোজা হয়ে বসলেন মিঃ আচাও।

'ঠিক আছে। আপনার কথাই মানলাম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যখন খুশি, এমনকী রাতেও যদি আমাকে দরকার হয়, আমার পি. এ.-কে বলবেন আপনার নাম।'

নমস্কার না করেই বিদায় নেন গোয়েন্দা-অধিকর্তা মিঃ আচাও।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ঃ নিশীথ অভিযান

নিশুতি রাতে প্রফেসর বিক্রম বক্সীকে টেলিফোন করল ইন্দ্রনাথ।

মিনিট খানেক রিং হয়ে গেল, কোনও সাড়া নেই।

তারপরেই ভেসে এল রুক্ষ সিংহ নিনাদ, 'কে?'

'প্রফেসর! প্রফেসর! আমি ফাল্গুনী...ফাল্গুনী রায়।'

'ফাল্গুনী রায়?' পূর্বপরিচয়ের বাষ্পটুকুও নেই কণ্ঠস্বরে। সদ্য নিদ্রোত্থিত মানুষের ক্ষেত্রে অবশ্য তাই হয়। কিন্তু প্রফেসরের স্বরে ঘুম ভাঙার তো কোনও চিহ্ন নেই।

আজকের প্রেতবৈঠকের নাটকীয় পরিসমাপ্তির পর প্রফেসরের চোখে যে ঘুম আসবে না, তা জেনেই তো এই ফোন-কল।

'ফাল্গুনী রায়: মন্ত্রেয়ানিদের নির্দেশে আপনার সঙ্গে আলাপ।'

'ও।' নিরুত্তাপ কণ্ঠ।

'প্রফেসর: বিরাট খবর আছে...আপনাকে না বলা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না...ঘুমোতে পারছি না...তাই—' নিদারুণ উত্তেজনায় এলোমেলো হয়ে যায় ফাল্গুনী রায়ের কথা।

'তাই এই রাত দেড়টার সময়ে টেলিফোনে!' নিরুণ বিদ্রূপে কঠিন হয়ে ওঠে প্রফেসর বিন্দ।

'প্রফেসর! প্লিজ! লাইন কাটবেন না! সুসংবাদ! নব সুসংবাদ! ময়না এসেছিল।'

'কী!' বজ্র হুঙ্কারে ঝনঝন করে কেঁপে ওঠে বিসিভারের বাতব ডায়াফ্রাম।

এর পরের অভিনয়টুকুর জন্যে বাঙালি মাত্রই ইন্দ্রনাথ রুদ্রের প্রতিভায় গর্ব অনুভব করতে পারেন।

প্রেসিডেন্টের গোল্ডমেডেল পাওয়ার মতোই অভিনয় করল ইন্দ্রনাথ রুদ্র ওরফে ফাল্গুনী রায়। প্রেতাত্মা বৈঠক থেকে ফিরে আসার পর থেকে অপরিসীম আত্মনিগ্রহে অস্থির হয়ে পড়েছিল ফাল্গুনী রায়। সমস্ত শরীর মন যখন ঝিমঝিম করছে বিচ্ছেদ বেদনায়, চেতনার দিগদিগন্ত জুড়ে যখন আহিভি মল্লিক ছাড়া আর কেউ নেই, ঠিক তখনি যেন হঠাৎ কীরকম হয়ে গেল ফাল্গুনী। কুহক-বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল ভাবনা-চিন্তা, মাথায় ডাঙস মারার মতো অকথ্য যন্ত্রণায় স্নায়ুমণ্ডলী যেন ঝালাফালা হয়ে গেল। তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

কতক্ষণ...কতক্ষণ পরে শ্রবণেন্দ্রিয়ে আছড়ে পড়ল অতি ক্ষীণ, কিন্তু অতি স্পষ্ট একটি কণ্ঠ...কান্নায় ভেজা স্বর :

'ফাল্গুনী...ফাল্গুনী!'

আহিভি মল্লিক ডাকছে!

খেপুরো বিকট গলায় চিৎকার করে উঠেছিল ফাল্গুনী রায়, 'আহিভি আহিভি! ডাকছ?' 'হ্যাঁ গো, আমি।'

'আহিভি! আহিভি! আমি তোমাকে যেতে বলিনি। কী বলতে কী বলেছি, মাথার ঠিক ছিল না! তুমি যেও না! তুমি যেও না!' আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটল ঠিক তখনি।

কে যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আহিভি বলল, ময়না কাঁদছে! বাবার জন্যে মন-কেমন করছে!

বলতে-বলতে টেলিফোনের মধ্যেই অঝোরে কেঁদে ফেলল ফাল্গুনী রায়। ফোঁপানির শব্দ ভেসে গেল ও-প্রান্তে প্রফেসরের শিহরিত কর্ণে।

'ময়না! মা আমার! সে এসেছিল!' নিমেষে বিপুল আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন বিক্রম বক্সী।

এই দুর্লভ 'মুড' সৃষ্টির জন্যেই এত আয়োজন। ইন্দ্রনাথ জানে, এই মুহূর্তে প্রফেসর বিক্রম বক্সী ভুলে গেছেন তাঁর বিশ্বজোড়া বিজ্ঞানখ্যাতি, ভুলে গেছেন তাঁর ওরুদায়িত্ব, ভুলে গেছেন জগৎসংসার—বিহ্বল মানসপটে ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করছে শুধু একটি

মুখ...কিশোরী ময়না বক্সীর মুখ...যার এককণা সুখের জন্যে ইহলোকের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত তিনি।

'ময়না এসেছিল, প্রফেসর। আহিভির সঙ্গেই আছে সে। আবার আসবে বলেছে। এ আমার কী হল, প্রফেসর?'

'জয়গুরু! ফাল্গুনীবাবু, আপনার ক্ষমতা আছে, মিডিয়াম হওয়ার শক্তি আপনার আছে! আর ভাবনা নেই। আপনি চলে আসুন।'

'আপনার বাড়ি?'

'হ্যাঁ। এখুনি।'

'কিন্তু আমি যে এখন পারছি না। মাথা ঘুরছে, গা-হাত-পা কাঁপছে...নার্ভের ওপর এত চাপ...' ফুঁপিয়ে ওঠে ইন্দ্রনাথ, 'আজ না...পরে...প্লিজ...আপনি ছাড়া কেউ বুঝবে না আমার কষ্ট...'

'কাল?'

'কখন?'

'এখন সকালে?'

'কটায়?'

'নটায়?'

'হ্যাঁ, নটায়।'

'কাঁটায়-কাঁটায়?'

'কাঁটায়-কাঁটায়।' যন্ত্রচালিতের মতোই একই সুরে পুনরাবৃত্তি করে ইন্দ্রনাথ।

লাইন কেটে যায়।

কপালের ঘাম মোছে ইন্দ্রনাথ। এরকম অভিনয় সে জীবনে করেনি। সমস্ত সত্তার মধ্যে যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল এই কটা মিনিটের মধ্যেই।

রাইটিং প্যাডটা টেনে নিয়ে প্ল্যান করে পরবর্তী প্রোগ্রামের

আজ রাতে বিশ্রাম নেই তার।

এসপার কি ওসপার, কিস্তিমাৎ করতে হবে ভোরের আলো ফোটবার আগেই।

রাত তখন আড়াইটে।

কালো সরীসৃপের মতো নিঃশব্দ সঞ্চারে সুলতানের জাদুমহলের সামনে এসে দাঁড়াল একটি কৃষ্ণমূর্তি।

পরনে তার কালো পুলওভার, কালো ট্রাউজার, কালো জুতো—তলায় পুরু ক্রেপসোল, হাতে কালো দস্তানা।

নিশাচর মূর্তির দুই হাত দু-পকেটে ঢোকানো। এক পকেটে স্বর্গত ম্যাজিশিয়ান হ্যারি হুডিনির সবখোল-চাবিগুচ্ছের নকল, এ গোছার পাঁচটি মাত্র চাবি দিয়েই যে-কোনও সেকেলে তালা খোলা যায়, ছোট্ট কিন্তু শক্তিশালী পেন্সিলটর্চ, স্টেথোস্কোপ আর কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস।

বোমরে গোঁজা নিকষ অটোমেটিক।

আর কেউ চিনতে না পারুক, রহস্যময় এই মূর্তিকে পাঠক নিশ্চয় চিনেছেন। নিশীথ রাতের অভিযানে বেরিয়েছে দুঃসাহসী গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

তিন মাইল দূরে ট্যাক্সি ছেড়েছে হুঁশিয়ার ইন্দ্রনাথ। ফেরবার পথে অন্যত্র স্ট্যান্ড থেকে নেবে নতুন ট্যাক্সি।

জাদুঘরের সব আলো নেভানো।

প্রথম দিনেই দেখে নিয়েছিল ইন্দ্রনাথ, খাঁড়ার আকারের বিঘতখানেক লম্বা লোহার ছিটকিনি দিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ থাকে। সুতরাং পকেট থেকে বেরুল পাতলা, নমনীয় অথচ শক্ত একটুকরো সেলুলয়েড। দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে সামান্য কসরত করতেই ওপর দিকে খুলে গেল ছিটকিনি। সেলুলয়েডটি আস্তে-আস্তে নামিয়ে বার করে আনতেই খট করে ছিটকিনি দুলতে লাগল দরজার গায়ে।

উৎকর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ইন্দ্রনাথ।

তারপর জনহীন পথের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঠেলা দিল পাল্লায়। একইঞ্চি-একইঞ্চি করে ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। পাল্লা টেনে ছিটকিনি দিতে ভুলল না।

দোকানের ভেতর গাঢ় অন্ধকার। সামান্যতম শব্দও ভেসে আসছে না বাড়ির ভেতর থেকে।

এবার পকেট থেকে বেরোল স্নিপারস্কোপ। চোখে লাগাতেই তরল হয়ে এল কালির মতো কালো তমিস্রা। কাঠপেন্সিল দিয়ে আঁকা ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল আসবাবপত্রের আবছা রেখা। জিনিসপত্র ঠাসা চতুর্দিকে। তারই মধ্যে দিয়ে সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত মোটামুটি একটা পথ মনের পটে এঁকে নিল ইন্দ্রনাথ। অন্ধকারেই এগুতে হবে, টর্চ জ্বালানো চলবে না।

রিস্টওয়াচের রেডিয়াম-ডায়াল অন্ধকারে জ্বলছে। অতএব ঘড়ির ওপর পুলওভার টেনে নামিয়ে দিল। নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল আরও কিছুক্ষণ। সূচিভেদ্য নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে গোটা যাদুঘরে।

মার্জারের মতো নিঃশব্দ সঞ্চরণে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। কাঠের সিঁড়ি। ফাঁকা জায়গা থাকলেই মচমচ শব্দ হতে পারে। কাজেই প্রতিটি ধাপ পেরোবার আগে পরখ করে নিলে পা দিয়ে টিপে-টিপে।

চাতাল। অন্ধকার এখানে ততটা গাঢ় নয়। কারণ রাস্তার আলো। তাতে দেখা গেল দু দিকে দুটি ঘরের দরজাই খোলা। জানলার মরা আলোর আভা তাই চাতালেও পৌঁছেছে।

ডানদিকের ঘরটা বৃদ্ধ সুলতানের। বাঁ দিকের ঘরটা সম্ভবত নূরজাহানের।

ডানদিকেই মোড় নিল ইন্দ্রনাথ। কারণ তার প্রয়োজন সুলতানের সঙ্গেই। নূরজাহানের ঘুম ভেঙে গেলে অবশ্য আলাদা কথা।

আজ রাতেই জানতে হবে মোমের হাতের বিচিত্র রহস্য। এবং এ রহস্যের চাবিকাঠি যে সুলতানের হাতে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই ইন্দ্রনাথের। মোক্ষম প্রস্তাব এনেছে সে। মোমের হাতের রহস্য যদি ফাঁস করে, তো বিনিময়ে যা চাইবে তাই পাবে। এমনকী, পুলিশ যাতে পিতাপুত্রীর কেশাগ্র স্পর্শ না করতে পারে, সে ব্যবস্থাও ইন্দ্রনাথ করবে মিঃ আচার্যকে বলে।

কিন্তু তাতেও যদি রাজি না হয় সুলতান? তখন ভীতি প্রদর্শন তো রইলই। টেলিফোনের রিসিভার তুলে পুলিশদপ্তরে ডায়াল করলেই টনক নড়বে বৃদ্ধের।

চৌকাঠে পা দিয়ে আবার যন্ত্রচক্ষু স্নিপারস্কোপের শরণ নিল ইন্দ্রনাথ। আবার

কাঠকয়লায় আঁকা স্কেচের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল ঘরের আসবাবপত্র। সেই বিশাল আয়না। একটা টেবিল। কতকগুলো পালিশচটা চেয়ার। সবটাই প্রায় একই ধরনের মোগলাই ফার্নিচার। ইজিচেয়ারের ডান দিকে বাথরুমের দরজা। বাঁদিকে [illegible]।

এদিকে গেল ইন্দ্রনাথ। দরজার কোণ থেকেই চোখে পড়ল মস্ত পালঙ্ক

নিশুতি রাত। সুতরাং ঘুমন্ত সুলতানকেই দেখবার আশা করেছিল ইন্দ্রনাথ। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা গেল, খাটের ওপর স্থির হয়ে বসে এক প্রস্তরমূর্তি—মুখ ফেরানো দরজার দিকে।

ধ্বক করে ওঠে বুকটা! নিঃসীম আতঙ্কে অবশ হয়ে আসে সর্বশরীর। কে জানে, হয়তো তার নৈশ অভিযান অজ্ঞাত নয় সুলতানের। তাই সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে অটোমেটিক বাগিয়ে বসে আছে বৃদ্ধ। যে-কোনও মুহূর্তে তপ্ত সীসের বুলেটে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যেতে পারে উত্তাল হৃদপিণ্ড।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘেমে ওঠে ইন্দ্রনাথ! শয্যায় মর্মরমূর্তিও অনড়। নিষ্পন্দ। নিঃশব্দ।

আস্তে-আস্তে, অতি সন্তর্পণে, ইন্দ্রনাথ ডানহাতে টেনে নেয় রিভলবারটা। তারপর, আচমকা বাঁ হাতের টর্চের আলো ফেলে মূর্তির মুখের ওপর।

তীব্র সার্চলাইটের মতো আলোকবৃত্তের মধ্যে ঝকঝক করে ওঠে সুলতানের দুই চোখ। নিষ্পলক দৃষ্টি আলোর দিকেই ফেরানো। সারা মুখে হঠাৎ বিস্ময়ের ছাপ।

স্থির লক্ষ্যে অকম্পিত হাতে ধরা থাকে রিভলভার আর পেন্সিলটর্চ।

কিন্তু কই? বৃদ্ধের চোখের পাতা তো পড়ছে না! মুখের পেশিও কাঁপছে না। পলকহীন চোখের শূন্য দৃষ্টি যেন ইন্দ্রনাথের দেহ ফুঁড়ে অন্তহীন পথে বিস্তৃত।

শিউরে ওঠে ইন্দ্রনাথ। হিমশীতল স্রোত নেমে যায় মেরুদণ্ড বেয়ে। বিদ্যুৎরেখার মতই একটা নিষ্ঠুর সত্য ঝলসে ওঠে মাথার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত।

সুলতানের দেহে প্রাণ নেই।

বিস্ফারিত ওই চোখের পাতা আর পড়বে না, বিস্মিত ওই মুখের বিস্ময়-চিহ্নও আর মুছে যাবে না।

টর্চের কাঁপা আলো এবার ছুঁয়ে যায় বৃদ্ধের সর্বাঙ্গ। খাটের বাজুতে বালিশ সাজিয়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন সুলতান। হাতে রিভলভার নেই, আছে একটা বই। পড়তে-পড়তে যেন হঠাৎ উলটো করে রেখেছেন খাটের ওপর।

পুরো এক মিনিট কাঠের পুতুলের মতো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। তারপরেও যখন চোখের পাতা পড়ল না, পা টিপে-টিপে ঢুকল ভেতরে। পালঙ্কের পাশে গিয়ে খুব কাছ থেকে চেয়ে রইল বৃদ্ধের চোখের তারার দিকে। ডানহাত থেকে দস্তানা খুলে নাড়ি টিপে ধরল। নিস্পন্দ ধমনী। দেহে এখনও উত্তাপ রয়েছে। রাইগার মর্টিসও শুরু হয়নি।

অল্পক্ষণ হল মারা গেছেন সুলতান।

কিন্তু কীভাবে?

নিরাবরণ হাত এখন বিপজ্জনক। যা ছোঁবে, তাতেই থেকে যাবে আঙুলের ছাপ। কাজেই চট করে দস্তানাটা পরে নেয় ইন্দ্রনাথ।

মৃতের ঠোঁট যেন নীল হয়ে গেছে। নীলিমা ছড়িয়ে পড়েছে গালে আর কপালে।

শ্বাসরুদ্ধ হলেই অক্সিজেনের অভাবে দেখা যায় এ চিহ্ন। এক ধরনের হার্ট অ্যাটাকেও অনেকটা এরকম নীলচে আভা ফুটে ওঠে সারা মুখে।

তবে কি আলো নিভে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রফেশনালের আক্রমণে গতায়ু হয়েছেন সুলতান? মৃত্যুর অতর্কিত আক্রমণে বিস্মিত হয়েছেন, কিন্তু পাশের ঘরে ঘুমন্ত মেয়েকে ডাকবারও সুযোগ পাননি?

মোনালিসা ঘুমোচ্ছে? শিরশির করে ওঠে সর্বাঙ্গ, বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে যায় ললাটে! চারদিক নিথর নিস্তব্ধ। ঘুমন্ত মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ নেই, ঘুমের ঘোরে পাশ ফেরার সময়ে খাটের মচমচানির শব্দ নেই। আশ্চর্য শব্দহীন ঘুম ঘুমোচ্ছে রূপসী নুরজাহান।

হেঁট হয় ইন্দ্রনাথ। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে মৃতদেহ। চিবুকের ঠিক নিচে, বুকের ওপর একটা অস্পষ্ট দাগ। বিবর্ণ। কিন্তু তবুও চোখ এড়ায় না। আরও হেঁট হয় ইন্দ্রনাথ। অত্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে মৃতব্যক্তির মুখের ঘ্রাণ নেই।

বিশেষ একটা বিষ-বাদামের গন্ধ, না, মনের ভ্রম?

সিধে হয়ে দাঁড়ায় ইন্দ্রনাথ। বুক চিরে বেরিয়ে আসে মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস। টর্চ নিভিয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে—নুরজাহানের শয়নকক্ষের সন্ধানে। পকেটে ট্রিগারকোঁটা যখন আছে, তখন জানা না থাকলেও ঘরের হদিশ ঠিক মিলবে এবং সে-ঘরে যে কী দৃশ্য দেখতে হবে, সে সম্বন্ধেও আর কোনও সন্দেহ নেই তার মনে

তেতালের অপরপ্রান্তের খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিতেই চোখে পড়ল পালঙ্কের ওপর ঘুমোচ্ছে সুন্দরী নুরজাহান। পায়ে-পায়ে পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ইন্দ্রনাথ। নুরজাহানের এক হাত বুকের ওপর—অপর হাত বিছানায়। মেঘের মতো কালো চুল ছড়ানো বালিশের ওপর।

পটাসিয়াম সায়ানাইডের মরণ-ক্রিয়ায় নীলবর্ণ অধরোষ্ঠ আর নীলাভ কপোল। মুদিত চোখ। প্রশান্ত মুখচ্ছবি।

পলকহীন চোখে স্থির চক্ষু-পল্লবের দিকে তাকিয়ে থাকে ইন্দ্রনাথ।

মরণ-ঘুম ঘুমিয়েছিলে মোনালিসা! ঘুমের মধ্যেই প্রাণ হরে নিয়ে গেল তোমার, তুমি জানতেও পারলে না। ধবধবে চাদরে আর বালিশের ওয়াড়ে ওই যে বিবর্ণ দাগ—ও দাগের অর্থ আর কেউ না জানুক, ইন্দ্রনাথ রুদ্র জানে।

মাদকতা ছিল তোমার সর্পিনীর মতো ক্ষীণতনুতে, মাদকতা ছিল সূচালো চিবুকটির হেট্টি ওই তিলে—হাফিজ কবি বোখারা সমরখন্দ বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন প্রিয়ার গণ্ডের এমনি একটা তিলের জন্যেই। তোমার ওই টানা [illegible] ভঙ্গির মদির দৃষ্টি পতঙ্গের মতো কতশত মোহমত্ত পুরুষকেই না আকর্ষণ করেছে। মোনালিসা, মহুয়া-ফুলের গন্ধে যে মাদকতা, তোমার রূপেও ছিল সেই নেশা। সেইসঙ্গে ছিল খুরের ধারের ইঙ্গিত, হিংস্র, তীক্ষ্ণ উগ্রতার আভাস। ছিলে বোরখা-বন্দিনী, হলে বে-আব্রু অভিনেত্রী, তনুরুচির কুহকবাষ্পে মোহাচ্ছন্ন করলে [illegible] পুরুষকে।

কিন্তু কিছুই রইল না। আগুন নিয়ে খেলতে নেমেছিলে, তাই আগুনেই পুড়ে ছাই হয়ে গেলে।

হেঁট হয় ইন্দ্রনাথ। নাসিকারন্ধ্রে ভেসে আসে সেই বিচিত্র গন্ধ—বিশেষ এক বিষ-বাদামের গন্ধ। এবার আর মনের ভ্রম নয়।

জোড়া খুন! চোখের সামনে লাফিয়ে উঠল আগামী কালের সংবাদপত্রের বড়-

বড় শিরোনাম। সেইসঙ্গে চকিতে মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার একটা খবর। গ্যাস-পিস্তল মার্ডারের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এক গুপ্তচরের কাহিনি। ঘটনাটা ঘটে পশ্চিম জার্মানিতে।

স্প্রিং পিস্তল দিয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড স্প্রে করে দু-দুটো খুন করা হয়েছিল একজন মরে সিঁড়ির ওপরেই। আচমকা নাক মুখের ওপর সায়ানাইড স্প্রে-র কার্তুজ ফাটতেই জোরে নিশ্বাস নেয় আক্রান্ত ব্যক্তি—সঙ্গে সঙ্গে সায়ানাইড পৌঁছয় ফুসফুসে। দেহ লুটিয়ে পড়ার আগেই প্রাণ বিয়োগ ঘটে।

চোখের সামনেই যেন সমস্ত দৃশ্যটা ভেসে ওঠে। নিশুতি রাত্রি। ঘুম আসছিল না বলে খাটে বালিশে হেলান দিয়ে বই পড়ছেন বৃদ্ধ সুলতান! আচম্বিতে সামনে এসে দাঁড়াল আগন্তুক—হাতে কিম্ভূতকিমাকার হাতিয়ার

অবাক হয়ে সুলতান বই নামিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু চিৎকার করবার অবসর পাননি। তার আগেই মুখের ওপর ফেটেছে সায়ানাইড-কার্তুজ—হিস্ শব্দের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাণ হারিয়েছেন।

তারপর পালা এসেছে মেয়ের। ঘুমন্ত অবস্থাতেই আর একটা কার্তুজ ফাটানো হয়েছে নাকের ওপর। চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে তার ছোট্ট হৃৎপিণ্ড।

দুটো মৃত্যুই যে ঠান্ডা মস্তিষ্কের নৃশংস হত্যা, তার একমাত্র প্রমাণ এই সায়ানাইড স্বাক্ষর!

কিন্তু কেন এই হত্যা? কেন? কেন? একদিন এরাও তো চক্রী ছিল, প্রফেসর বিক্রম বক্সীর মন আর জ্ঞানকে মুঠোয় আনার ষড়যন্ত্রে এরাও লিপ্ত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, নখদর্পণ কাঁটার মতো কেন এদের সরিয়ে দেওয়া হল ধরার বুক থেকে? চিৎকারের বালাই নেই—নিঃশব্দে হানা দিল নিষ্ঠুর জল্লাদ নিভিয়ে দিল দু-দুটো প্রাণ-প্রদীপ।

কিন্তু কেন?

সেই মুহূর্তে যেন একটা বিদ্যুৎ মগজের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়ে গেল

সেই চিরকুটটা!

প্রেত-বৈঠকের অন্ধকারে বুক পকেটে অদৃশ্য বন্ধু গুঁজে দিয়ে গেছিল একটা চিরকুট। হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল। ক্যাবিনেটের ভেতরে গেলেই প্রাণহানির ইঙ্গিত দিয়েছিল। কে সেই অদৃশ্য বন্ধু? লেখাটা মেয়েলি হাতের—তবে কি স্বয়ং নুরজাহানই নিজের জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে গেল তার জীবন? নুরজাহান কি জানত, অন্ধকারের সুযোগে ক্যাবিনেটের মধ্যে তাকে খুন করার ষড়যন্ত্র-বৃত্তান্ত? এমনও হতে পারে, নিধন-পর্বের জল্লাদের ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল তার ওপরেই! অবাধ্য হওয়ার উপায় ছিল না—কেননা সে তো যন্ত্র মাত্র—যন্ত্রী যারা তাদের কাছে মানুষের প্রাণের দাম কানাকড়িও নয়! তাই আতঙ্কিত নুরজাহান চিরকুট লিখে তাকে সাবধান করেছে—অনুরোধ জানিয়েছে ক্যাবিনেটের মধ্যে যেন না যায়—গেলেই যন্ত্রীদের নির্দেশ অনুযায়ী খুন তাকে করতেই হবে। কিন্তু সে যদি স্বেচ্ছায় না যায়, তা হলে আর রোষের ভাগী হচ্ছে না নুরজাহান!

পঞ্চমবাহিনীর ওপরওলা কোনও উপায়ে জানতে পেরেছিল, ব্যর্থ হয়েছে নুরজাহান। আদেশ ছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে হত্যা করার। সে আদেশ অমান্য করা হয়েছে।

সুতরাং নূরজাহানকে বাঁচিয়ে রাখা মানেই এখন মারাত্মক ঝুঁকি নেওয়া। সুলতানও সমান বিপজ্জনক। অবাধ্যতা তাদের কাছে অমার্জনীয় অপরাধ। সুতরাং...!

নূরজাহানকে হত্যা করার আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। এমনও হতে পারে, চক্রীরা হয়তো টের পেয়েছিল দু মুখো সাপের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে তৈরি হচ্ছে বাপ আর মেয়ে

কিন্তু ইন্দ্রনাথের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে বারবার কে যেন বলতে লাগল—তা নয়, তা নয়, তোমাকে বাঁচাতে গিয়েই বেঘোরে প্রাণ হারাল বেচারি নূরজাহান আর তার বাবা।

সেই নিরেট অন্ধকারে সদ্য-নিহত নূরজাহান ওরফে অহিভি মল্লিকের পাশে দাঁড়িয়ে যেন সম্মোহিত হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। নিশীথ-চিন্তার একটা নিজস্ব রূপ আছে, বৈচিত্র আছে, গভীরতা আছে। স্তব্ধ প্রহর শুধু তন্দ্রার নীড় নয়, অন্তর্দৃষ্টির উন্মোচকও বটে।

টর্চের আলোয় প্রাণহীন সেই লাবণ্যের দিকে তাকিয়ে তাই উদাস হয়ে যায় ইন্দ্রনাথ। নূরজাহান যে কেন ব্যর্থ হল, সে কারণটুকুও ভাববার প্রয়োজন বোধ করল না হৃদয়হীন চক্রীরা। ইন্দ্রনাথ রুদ্র মরেনি, সুতরাং—

ইন্দ্রনাথ রুদ্র মরেনি! ভয়ঙ্কর একটা সম্ভাবনা উদ্যত-ফণা সর্পের মতোই সহসা পেঁচিয়ে ধরল শিহরিত অন্তরকে। ইন্দ্রনাথ রুদ্র এখনও মরেনি! চক্রীদের পয়লা নম্বর শত্রু এখনও জিন্দা হ্যায়। মূল টার্গেট তো সে-ই। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। যে হত্যাকারী পোকার মতোই এই মাত্র দু-দুটো মানুষকে খতম করেছে, জাদুমহলের অন্ধকারে প্রেতচ্ছায়ার মতই সে ওত পেতে নেই তো?

এই প্রথম অপরিসীম আতঙ্কে দরদর করে ঘেমে ওঠে ইন্দ্রনাথ। ভয়ে কাঠ হয়ে যায় সর্বশরীর। যে-কোনও...যে-কোনও মুহূর্তে সায়ানাইড-পিস্তলের কার্তুজ বিস্ফোরিত হতে পারে মুখের ওপর!

নিদারুণ উদ্বেগে টান-টান হয়ে যায় প্রতিটি স্নায়ু। নড়াচড়ার খসখস শব্দ অথবা পটাসের মচমচানি শোনার আশায় পাওয়ারফুল মাইক্রোফোনের মতোই সজাগ হয়ে ওঠে কর্ণকুহর!

বিপদ যে-কোনও মুহূর্তে আসতে পারে। না-ও আসতে পারে। আততায়ী যদি জাদুমহলেই ঘাপটি মেরে থাকে, তবে সম্ভবত ইন্দ্রনাথ রুদ্রের জীবনে এ শর্বরী আর পোহাবে না, দিবা-বিভাবরীও জাগবে না।

কিন্তু কর্তব্য ভুললে চলবে না। চকিতে টর্চের আলোয় ঘরের চারপাশ দেখে নেয় ইন্দ্রনাথ। মোমের হাতের রহস্য তাকে জানতেই হবে।

ড্রেসিং-টেবিলের ওপর থরে-থরে সাজানো বিদেশি বিলাস সামগ্রী। উজ্জ্বল আলোয় ঝকমক করে উঠল একটা ক্রিস্টাল-আধার। ফরাসি ল্যাভেন্ডার!

সুদৃশ্য লেবেলে প্যারিসের একটা বিখ্যাত পারফিউম ব্যবসায়ীর নাম। ছিপি খুলে ঘ্রাণ নেয় ইন্দ্রনাথ—ঝিমঝিম করে ওঠে শিরা-উপশিরা, প্রতিটি রক্তকণিকা—চকিতে মন উধাও হয়ে যায়...মনে পড়ে প্রেত-বৈঠক দৃশ্য...অহিভি মল্লিকের অন্তর্ধানের পর মন মাতানো সুগন্ধ...প্রফেসর বিক্রম বক্সীর পোশাকেও তার রেশ!

ময়না বক্সী...অহিভি মল্লিক...নূরজাহান! একই ক্ষীণাঙ্গী নারীর বিভিন্ন রূপ। এই ল্যাভেন্ডার তার প্রমাণ।

চোখ-কান সজাগ রেখে আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে ইন্দ্রনাথ। বৃথা তল্লাশ। মোমের হাতের রহস্য লেখা কোনও গ্রন্থ চোখে পড়ে না।

পরক্ষণেই মনে পড়ে, নিহত সুলতানের হাতে রাখা কেতাবটি। প্রেতিনী-তন্ত্রের চাবিকাঠি সেখানে নেই তো?

ক্ষিপ্র চরণে হাজির হয় শয্যাপার্শ্বে। বইটা পকেটস্থ করে। পাশাপাশি দুটো ঘরই তন্নতন্ন করে দেখে উল্লেখযোগ্য কিছুর আশায়। কিন্তু বৃথাই।

লাইব্রেরিতে গেলে হয়তো... কিন্তু পণ্ডশ্রম হবে। কেননা, যে বই এত মূল্যবান, তা কেউ লাইব্রেরিতে ফেলে রাখে না—শোবার ঘরেই রাখে।

পা টিপে-টিপে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। শেষ ধাপে পা দিয়েই দারুণ চমকে ওঠে।

সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায় স্থাণুর মতো।

কয়েক হাত দূরেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক মনুষ্য-মূর্তি!

কুলকুল করে ঘেমে ওঠে ইন্দ্রনাথ। জমাট অন্ধকারের মতো নিশ্চল-দেহ ছায়ামূর্তি কিন্তু একটুও নড়ল না। কিন্তু আতঙ্কশিহর ইন্দ্রনাথের নড়বার ক্ষমতা লোপ পেল মৃত্যু আসন্ন জেনে।

বিশ সেকেন্ড...চল্লিশ সেকেন্ড...এক মিনিট। ছায়ামূর্তি তবুও অনড়।

ডানহাতে অটোমেটিক তৈরি হল। এবার অন্ধকার বিদীর্ণ করে বাঁ-হাতের টর্চরশ্মি গিয়ে পড়ে ছায়ামূর্তির মুখের ওপর।

সুতীব্র আলোকবলয়ের মধ্যে জেগে ওঠে একটা ডামিমূর্তি—স্টোর্স আর শিরাশালের যা হামেশাই প্রয়োজন হয়।

অট্টহাস্য করার প্রবল বাসনা হয় ইন্দ্রনাথের। অন্ধকার চিরকালই মানুষের সাহস কেড়ে নেই। আজকের ঘটনাই তার প্রমাণ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাস্তায় এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। সদর দরজাটা ইচ্ছে করেই ফাঁক করে রাখে—যাতে পুলিশের নজরে পড়ে। শুরু হল নতুন চিন্তা।

হোটেলে ফেরার পথ বন্ধ। সায়ানাইড-পিস্তল নিয়ে যে জল্লাদ আজ নিশীথ অভিযানে বেরিয়েছে, তার কাজ এখনও শেষ হয়নি। দুটো হত্যা হয়েছে বটে, কিন্তু পথের কাঁটাই এখনও দূর হয়নি। বিশ্বাসঘাতিনীকে যারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়, আসল দুশমনকে তারা সারা রাত জিইয়ে রাখার পাত্র নয়।

সুতরাং হোটেল নিরাপদ নয়। সায়ানাইড পিস্তল এতক্ষণে হাজির হয়ে গেছে ইন্দ্রনাথ রুদ্রের শয্যাপার্শ্বেও!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : প্রেতাবিষ্ট ইন্দ্রনাথ রুদ্র

দরিয়াগঞ্জের ছোট্ট একটা হোটেল। নাম খালসা হিন্দু-হোটেল।

এবারের দৃশ্যপট এই হোটেলেরই পাঁচ নম্বর কক্ষে। দোতলায়।

সকালের সূর্য শার্শির কাচ ভেদ করে এসে পড়েছে বিছানার ওপর। কালো

পুলওভার আর কালো ট্রাউজার পরেই অঘোরে ঘুমোচ্ছে এক ব্যক্তি। পাঠক তাকে চেনেন। কাল রাতে এরই পিছু-পিছু ছদ্মবেশে হানা দিয়েছিলেন।

সারা রাত বড়ই কষ্ট পেয়েছে বেচারি ইন্দ্রনাথ। একে তো সায়ানাইড পিস্তলের ভয়, তার ওপর মাথা গোঁজার আস্তানার অভাব। অনেক খুঁজে যাওয়া না পাওয়া। শেষে খালসা হিন্দু হোটেল, শুরু হল দাঁতের যন্ত্রণা। হিমেল হাওয়ায় দাঁত কনকনানি ছাড়া দিতেই শুধু ত্রাহি-ত্রাহি চিৎকার করতে বাকি রাখল বেচারি। সমস্ত রাত ছটফট করার পর চোখের দু-পাতা এক হয়েছে ভোররাত্রে।

সূর্যের আলো সরতে-সরতে চোখের ওপর এসে পড়ল এবং কিছুক্ষণ পরেই চোখ মেলল ইন্দ্রনাথ। একহাতে রোদ্দুর আড়াল করে অপর হাতের রিস্টওয়াচ ধরল চোখের সামনে এবং পরমুহূর্তে স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো প্রচণ্ড লাফ মেরে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

সাড়ে আটটা বাজে। প্রফেসর বিক্রম বক্সীর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নটার সময়ে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চোখে মুখে জল ছিটিয়ে, বিল মিটিয়ে বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে রাস্তায় বেরিয়ে এল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

তারপরেই শুরু হল ট্যাক্সি পাওয়ার সমস্যা।

কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া গেল না, এবং দিল্লির পথে দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এ-পথ সে-পথ মাড়িয়ে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছে এক যুবক। চুল উস্কোখুস্কো। চোখ বিস্ফারিত। হাপরের মতো হাঁপাতে-হাঁপাতে সর্বশেষ মোড়ে যখন পৌঁছল ইন্দ্রনাথ, তখন ঘড়িতে বাজে নটা বিশ মিনিট

মোড় ঘুরতেই দেখা গেল প্রফেসরের বিশাল সৌধ। এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই গাড়ি-বারান্দায় বেরিয়ে এলেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী। এক হাতে একটা ভারী কিটব্যাগ। অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ।

ফটকে এসে দাঁড়ালেন প্রফেসর। তৎক্ষণাৎ যেন সদ্য-আরোহী-নেমে-যাওয়া একটা খালি ট্যাক্সি আস্তে আস্তে এগিয়ে এল তাঁর দিকে। টুংটাং করে সাইকেলের ঘণ্টি বাজাতে-বাজাতে কার্কে বাঁধা দুধের বালতি নিয়ে সামনে এসে পড়ল এক গোয়ালা। ফুটপাতে ঝাড়ু দিতে-দিতে আবির্ভূত হল এক ঝাড়ুদার। কাঁধে থলি নিয়ে ছেঁড়া কাগজ কুড়োতে-কুড়োতে এগোল তালিমারা আলখাল্লা পরা এক বুড়ো, পোস্টব্যাগ কাঁধে ঠিকানা খুঁজতে লাগল ডাকপিওন, আর-একটা ভাঙা-বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে মহাতর্ক জুড়ে দিল এক রাজমিস্ত্রি আর রঙের মিস্ত্রি।

অত্যন্ত সাধারণ দৃশ্য। কিন্তু ইন্দ্রনাথ রুদ্রের চোখে তা অসাধারণ। এত সহজে এ-চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ইন্দ্রনাথের ওপর ভরসা নেই মিঃ আচার্যর—তাই এতগুলি লোক লাগিয়েছেন প্রফেসরকে চোখে-চোখে রাখার জন্যে। হাজার টাকা বাজি ফেলে ইন্দ্রনাথ রুদ্র বলতে পারে, ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে শুরু করে রঙের মিস্ত্রি পর্যন্ত, প্রত্যেকেই তাঁর মাইনে-করা চর। প্রত্যেকেরই দৃষ্টি একটি মাত্র লোকের ওপর। যে মুহূর্তে প্রফেসর বিক্রম বক্সী ট্যাক্সিতে পা দেবেন আর ড্রাইভারকে হুকুম দেবেন, 'পাকিস্তান এম্বাসি'—সেই মুহূর্তেই যবনিকা পড়বে অপারেশন নটরাজ-এর ওপর।

কারণ, এ ট্যাক্সি পাকিস্তান এম্বাসি যাবে না, যাবে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে।

মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল ইন্দ্রনাথ রুদ্রের। এরকম সঙ্কটমুহূর্তের সম্মুখীন সে জীবনে হয়নি। কাল রাতে টেলিফোনের মাধ্যমে প্রফেসরের মনে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করা গেছিল—এখন তা কেটে গেছে। দ্বিধাহীন চিত্তে রওনা হচ্ছেন পাকিস্তান-এম্বাসি অভিমুখে। প্রকাশ্য দিবালোকে সেখানে শুধু এই কটি কথা বলার জন্যেই মনকে তৈরি করেছেন সারা রাত ধরে :

'এই কিটব্যাগে আছে আমার রিসার্চ রেকর্ড। এশিয়ার প্রতিটি দেশের বৈজ্ঞানিকরা এ সম্পর্কে একযোগে কাজ করুক—এই আমার একান্ত ইচ্ছে। আমি চাই এশিয়ার শক্তি, তথা বিশ্বের শান্তি।'

'প্রফেসর বক্সী! প্রফেসর বক্সী!' কে যেন চিৎকার করে ওঠে আর্তকণ্ঠে এবং পরক্ষণেই ইন্দ্রনাথ বোঝে বিকট স্বরটা বেরোচ্ছে তার নিজেরই গলা থেকে। চেঁচাতে-চেঁচাতে ক্ষিপ্তের মতো দৌড়োচ্ছে আর হাত নাড়ছে বাংলার বিখ্যাত গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্র, 'প্রফেসর বক্সী! প্রফেসর বক্সী!'

এক পা ট্যাক্সির ভেতরে রেখে সবে ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকেছেন প্রফেসর, এমনসময়ে পিলে-চমকানো চিৎকার শুনে সিধে হয়ে দাঁড়ালেন।

গলদঘর্ম মুখে সামনে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। কিন্তু প্রফেসর তাকে চিনতে পেরেছেন বলে মনে হল না।

'প্রফেসর, আমি ফাল্গুনী রায়। দেরি হয়ে গেল...ট্যাক্সি পেলাম না...ছুটে আসছি।'

মোহাচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী। যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখছেন ফাল্গুনী রায়কে। তার চেহারা, তার কথা মগজে কোনও সাড়াই জাগাতে পারছে না।

'ফাল্গুনী রায়? কী ব্যাপার?'

'মেসেজ। ময়নার মেসেজ।'

স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যাচ্ছে। ধীরে-ধীরে আলো জ্বলে উঠছে ভাবলেশহীন চোখে।

'ময়না' খবর পাঠিয়েছে?'

তুবড়ির মতো কথা বলে চলল ইন্দ্রনাথ। আর ধীরে-ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল প্রফেসরের মুখ : 'কাল রাতে আপনি বলেছিলেন আজ সকালে আসতে। চেষ্টা করলে হয়তো ময়নাকে আনা যাবে। কাল রাতে হঠাৎ আমার tranco হয়, আইডি এসেছিল। ময়নার গলাও শুনেছিলাম। আপনাকে টেলিফোনে বলতেই আপনি বললেন আজ সকালে আসতে।'

ঘড়ির দিকে তাকালেন প্রফেসর, 'এখন সাড়ে নটা। কাঁটায়-কাঁটায় নটায় আপনার আসার কথা ছিল। আপনি না আসাতে ভাবলাম ধাপ্পা মেরেছেন। ময়নাকে আনতে পারবেন? বিশ্বাস আছে নিজের ওপর?'

'পারব। কাল রাতেও তো পেরেছিলাম।'

ট্যাক্সি ছেড়ে দিলেন প্রফেসর। কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে পিছন ধরল ইন্দ্রনাথ। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেলে এমনি ক্লান্তি বোধহয় নিজেকে। সঙ্গে বুকে আবার আরম্ভ হয়ে গেল অসহ্য দন্ত-যন্ত্রণা।

জাদুমন্ত্রবলে সিনেমার 'ডিজল্ভ'-এর মতো রাস্তার একদৃশ্য মুছে গিয়ে ফুটে উঠল আর একদৃশ্য। অদৃশ্য হয়ে গেল ট্যাক্সি টুংটাং শব্দে রাস্তার মোড়ে উধাও হল দুধওলা

সাইকেল ছোকরা, ঝাড়ুদার অন্তর্হিত হল পাশের গলিতে, ছেঁড়া কাগজের অভাবে হনহন করে হাঁটতে লাগল বুড়ো, ঠিকানা খুঁজে না পেয়ে চিঠির তাড়া হাতেই এগোল ডাকপিওন এবং তর্ক করতে-করতেই আবার পথচলা শুরু করল রাজমিস্ত্রি আর প্রবেশ মিস্ত্রি।

যেন ক্ষণেকের জন্যে আটকে গিয়েই আবার চলতে শুরু করেছে প্রজেক্টর—স্থিরচিত্র আবার রূপান্তরিত হয়েছে চলচ্চিত্রে।

প্রফেসরের পিছু-পিছু সেই ঘরে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। এককোণে টেপায়ার ওপর কাচের কেসে ধাতুখানি নিচ্ছে মৃতাত্মা ময়না বক্সীর মোমের হাত।

ইশারায় ইন্দ্রনাথকে বসতে ইঙ্গিত করলেন প্রফেসর। হাতের কিটব্যাগটা আলমারির মধ্যে রেখে চাবি বন্ধ করে দিলেন। তারপর সোফায় বসে দু'হাতের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে ঝিম মেরে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ।

স্নায়ু নিপীড়নের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী—আকস্মিক অব্যাহতিতে তাই এই বিহ্বলতা।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে বললেন ভাঙা-ভাঙা গলায়, 'এখনি শুরু করা যাক?'

'নিশ্চয়।'

'কী-কী চাই বলুন।'

'যন্ত্রসঙ্গীত আর অন্ধকার।'

অঙ্গুলি সঙ্কেতে এক কোণে রক্ষিত অটোমেটিক রেকর্ড-চেঞ্জার দেখিয়ে আর্দ্রকণ্ঠে বললেন প্রফেসর, 'ময়নার শখের জিনিস। রেকর্ডগুলোও ওর প্রিয়। এ রেকর্ড বাজলে না এসে ও পারবে না।'

কড়ি আর কোমলের কী অপূর্ব সমাবেশ। একই কণ্ঠে অশনি-সঙ্কেতের পরেই বারিসিঞ্চন। স্নেহ-স্নিগ্ধ আবেগকোমল এই মুহূর্তটাকেই কাজে লাগাতে চায় ইন্দ্রনাথ রুদ্র। এই মুহূর্তে নিরস্ত্র লোপ পায় বিক্রম বক্সীর এবং এই মুহূর্তেরই পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে শক্তিশালী পক্ষবাহিনী।

জানলা-দরজা বন্ধ করে দিলেন প্রফেসর। পুরু পর্দা টেনে দিতেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঘর ভরে গেল।

'ধূপ আছে। জ্বালব?' শুধোলেন প্রফেসর।

'নিশ্চয়।'

অচিরেই চন্দন-সুরভিতে ম ম করে উঠল গোটা ঘর।

প্রফেসর বললেন, 'আমরা বিজ্ঞানীরা দেহের মধ্যে মনকেই সব চাইতে বিস্ময়কর শক্তি বলে মনে করি। এবার তা হলে সেই মনের শক্তিকেই কেন্দ্রীভূত করা যাক। কী বলেন?'

'তা ঠিক। মস্তিষ্কটা আসলে যন্ত্র, আত্মিক শক্তিকে এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়েই ফোকাস করা যাক একদিকে। আপনি ভাবুন ময়নার কথা। আমি ভাবি আইভিকে। গতরাত্রে আইভিকে ভাবতে গিয়েই ময়নাকে এনেছিলাম। একটা কথা, মিডিয়াম হিসেবে আমি একেবারেই আনাড়ি। কাজেই কী ঘটবে, তা জানি না। দয়া করে আপনি সোফা ছেড়ে নড়বেন না। আমি না-বলা পর্যন্ত আলো জ্বালবেন না। হয়তো তাইতেই সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে আমার। নতুন তো, আত্মা পারব কি না, তাও বলা যায় না। তবে চেষ্টা করব।'

'একবার যখন পেরেছেন, তখন আবার পারবেন।'

'ভালো কথা প্রফেসর, এ সময়ে এদিকে কেউ আসবেন না তো?'

'না, না। আমার স্ত্রী এখন নিচে নামে না।'

'আলোটা একটু জ্বালুন।' টেবিলল্যাম্প জ্বলল। 'দড়ি আছে?'

'আছে। কিন্তু কেন?'

'চেয়ারের সঙ্গে বাঁধুন আমাকে।'

'জয়গুরু! আমি কি আপনাকে অবিশ্বাস করছি?'

'তা নয়, প্রফেসর। একবার প্রেতাবেশ ঘটলে আমি কী করব, তা আমি নিজেই জানতে পারব না। কিন্তু চেয়ারে বাঁধা থাকলে বুঝব, যাই ঘটুক না কেন, আমার তাতে কোনও হাত নেই। আপনিও নিশ্চিন্ত হবেন।'

'বেশ, তবে তাই হোক।'

দরজা খুলে বাইরে গেলেন প্রফেসর। ক্ষণকাল পরেই ফিরে এলেন বেশ খানিকটা নাইলনের দড়ি নিয়ে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনাথ। সরু সুতো আনলেই হয়েছিল আর কী!

বন্ধন-পর্ব সাঙ্গ হতেই আলো নিভল। অন্ধকারেই চালু হল রেডিওগ্রাম। ভিভিক বজ্রের মতো গুরুগম্ভীর যন্ত্রসঙ্গীত গমগম করে উঠল ঘরের মধ্যে।

ভারী গলায় ঈশ-উপনিষদের একটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন প্রফেসর।

'অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্‌,

বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্‌;

যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণ মেনো,

ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিম্‌ বিধেম।'

ধূপের গন্ধ, যন্ত্রসঙ্গীত আর উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ম্যাজিকের মতো পালটে যায় ঘরের পরিবেশ।

বেশ কিছুক্ষণ আর কোনও শব্দ নেই। তারপরেই কাঠের ওপর টোকা মারার জোরালো আওয়াজ ভেসে এল ঘরের বাঁ-দিক থেকে, পরক্ষণেই ডানদিক থেকে। সেই সাথে মশকগুঞ্জনের মতো উচ্চগ্রামের অদ্ভুত গোঙানি, কপিকের তলা কড়িকাঠের কাছে জ্বলে উঠল আলেয়ার আলোর মতো একটা নরম আভা—সাদা নয়, লালাভ। পরক্ষণেই আভা দেখা গেল দরজার কাছে। তারপরেই গেল মিলিয়ে। চেয়ারে বাঁধা ফাল্গুনী রায়ের দিক থেকে ভেসে এল কাতরানি, ছটফটানি আর বিড়বিড় বকুনি : 'আইভি, আইভি!' আবার সব চুপ। তৃতীয় রেকর্ডটা যখন মাঝামাঝি পৌঁছেছে, ঠিক তখনি রক্ত-জল-করা একটা চিৎকারের পরেই ফিসফিস করে কে যেন ডাকল : 'ফাল্গুনী! ফাল্গুনী!'

অপরিসীম বেদনায় ককিয়ে উঠল ফাল্গুনী রায়, 'আইভি! তুমি এসেছ? তোমাকে আমি মন থেকে যেতে বলিনি আইভি। আমাকে ক্ষমা করো। আমাকে ছেড়ে যেও না। আইভি, আইভি, আমার আইভি!'

তারপরেই যেন হতবুদ্ধি হয়ে যায় মিডিয়াম। বিস্মিত কণ্ঠে শুধোয়, 'ময়না? না, না, আইভি? ময়না, আবার এসেছ? আইভি কোথায়? একটু আগেই তো ছিল। আবার আসছে?'

অনর্গল কথা বলে যেতে থাকে ফাল্গুনী রায়। একটা কথা শেষ হতে-না-হতেই আবার শুরু করে। মাঝে মাঝে নামমাত্র বিরতি—প্রশ্ন শোনার বিরাম। পরমুহূর্তেই, প্রশ্নটা নিজেই আউড়ে নিয়ে দেয় উত্তর। সমস্ত জিনিসটাই এমন ঝড়ের বেগে এগোয় যে, রোমাঞ্চিত কলেবরে বসে থাকে ঘরের দ্বিতীয় ব্যক্তি।

'আমি তোমায় চিনি, ময়না। আমি জানি তুমি কে। অহিভির সঙ্গেই থাকো? সেই জন্যেই বুঝি অহিভিকে ডাকলে তুমি এসে পড়ো? ও, বাবাকে দেখতে চাও! উনি তো এখানেই আছেন। এই ঘরেই আছেন। ময়না, উনি তোমাকে যে কী ভালোবাসেন, তা বলে বোঝানো যায় না। তুমিও বাসো? বেশ, বেশ! হ্যাঁ, উনি তা জানেন। শতবার তুমি আর আসবে না শোনার পর থেকে মন ভেঙে গেছে ওঁর। কী বললে? বাজে কথা বলেছে? কারা বাজে কথা বলছে? 'কিন্তু তারা কারা'? বাজে লোক? খারাপ লোক? ওরা ছাড়া আর সবাই ভালো? তারা এখানে আছে? বাবার কাছে তোমাকে আসতে দেবে তারা?'

ঘরের ওপর দিক থেকে আবার রক্ত-হিম-করা বিকৃত গলায় কে যেন কেঁদে ওঠে।

'ময়না! ময়না!'

আবার শোনা যায় ফাল্গুনী রায়ের কণ্ঠ, 'ও কী? দাঁড়াও, দাঁড়াও। শুনতে পাচ্ছি না। কে, বিভূতি? তোমাকে তো চিনি না, বিভূতি? কথার মধ্যে এসো না। আর-একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম যে। কে? হরিশবাবুর ছেলে? আমার দূর সম্পর্কের ভাইপো? ও, বিভূতি, বিভূতি, এখন নয়, পরে এসো। ময়না আর অহিভির সঙ্গে আগে কথা বলতে দাও। ওরা আছে, না চলে গেছে? ময়না, ময়না, এত আস্তে কথা বলছ কেন? শোনা যাচ্ছে না। আবার আসবে তো? বুঝেছি—পরে। যাবার আগে বাবাকে কিছু বলবে? বলেছ? কখন বললে? সব কথা মুখে বলার দরকার হয় না? চিহ্ন রেখে গেছ? এই ঘরের মধ্যে? খুঁজে নিতে হবে? ময়না, ময়না, কোথায় গেলে?'

আবার নীরবতা। শেষ হল একটা রেকর্ড—শুরু হল নতুন বাজনা। হঠাৎ আবার বাতাসের সুরে ডাকল অহিভি, 'ফাল্গুনী! ফাল্গুনী!'

পরক্ষণেই বিকট গলায় চিৎকার করে উঠল ফাল্গুনী রায়। সে কী গোঙানি! চেয়ারটা মচ্‌মচ্‌ করে উঠল হটেনটোনির ধাক্কায়। ক্ষীণ হয়ে এল কাতরানি—যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার। দেহের শেষবিন্দু শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল ফাল্গুনী রায়, 'বাঁচাও! বাঁচাও! আলো!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে আলো জ্বেলে দিলেন প্রফেসর।

অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় চেয়ারে এলিয়ে পড়েছে ফাল্গুনী রায়। মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো বহির্মুখ ঘূর্ণিত চক্ষুতে অপরিসীম আতঙ্ক। মুখ লাল। কামারশালার হাপরের মতো বুকটা উঠছে নামছে।

রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে প্রফেসর তাড়াতাড়ি মাথাটা সিধে করে দিলেন। সোরাই থেকে খানিকটা জল এনে ছিটিয়ে দিলেন চোখে-মুখে।

আস্তে-আস্তে খিঁচ খাওয়া ভাবটা কেটে গেল ফাল্গুনী রায়ের—সহজ হয়ে এল শ্বাসপ্রশ্বাস। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল প্রফেসরের পানে।

কাঁপা স্বরে ডাকলেন প্রফেসর, 'ফাল্গুনীবাবু! ফাল্গুনীবাবু!'

পরিষ্কার হয়ে আসে বিমূঢ় দৃষ্টি: 'প্রফেসর, কী হল বলুন তো? মনে হল যেন অহিভি...আপনার মেয়ে ময়না...আমার দূর সম্পর্কের ভাইপো বিভূতি...পনেরো বছর বয়সে জলে ডুবে মারা যায় বিভূতি...কিন্তু ও এল কেন? ও, আমিই তো বলেছিলাম...'

দ্রুত হাতে টিপ খুলে দিলেন প্রফেসর। অভিভূত কণ্ঠে বললেন, 'ফাল্গুনীবাবু! আপনি পারবেন। ঈশ্বর আপনাকে শক্তি দিয়েছেন। ময়না এসেছিল। ওর গলা শুনেছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে ঢিলে দড়ি ঝুলতে-ঝুলতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ইন্দ্রনাথ। সাইক্লোন ঝড়ের মতো প্রশ্নোত্তরের বেগে যে খেই হারিয়ে ফেলবেন প্রফেসর এবং প্রবল বিশ্বাসের দরুণই মনে-মনে কল্পনা করে নেবেন ময়নার কণ্ঠকে—এ বিষয়ে একরকম নিঃসন্দেহই ছিল সে। ভয়মিশ্রিত অদ্ভুত চোখে তখনও একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে ইন্দ্রনাথ, 'ময়না কিছু বলল?'

'একটা চিহ্ন এ ঘরে রেখে গেছে ময়না। কিন্তু কোথায় বলুন তো?'

'সে তো বলতে পারব না। কিছু মনে পড়ছে না।'

'ময়না বলল, এ ঘরেই আছে। খুঁজে নিতে হবে।'

সোফার তলায়, আলমারির খাঁজে খুঁজে আসে ইন্দ্রনাথ। সবশেষে তাকায় কাচিকাটের দিকে।

এমন সময়ে দারুণ চিৎকার করে ওঠেন প্রফেসর, 'ফাল্গুনীবাবু! পেয়েছি! জয়গুরু! জয়গুরু!'

তেপায়ার ওপর রাখা কাচের শো-কেসের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্রফেসর। জ্বলজ্বলে চোখ মেলে তাকিয়েছিলেন ভেতরের মোমের হাতটার দিকে। সিঁয়াস শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত হাতটার আঙুলগুলো ছিল দক্ষিণমুখো, ওপর দিকে ঈষৎ বক্র, যেন হাতছানি দিচ্ছে।

কিন্তু এখন সে-হাত ঘুরে গেছে উত্তর দিকে। করতল উপুড় করা—যেন বরাভয় দিচ্ছে!

'ফাল্গুনীবাবু! ময়না এসেছিল, ময়না এসেছিল!'

বলতে-বলতে পকেট থেকে একগোছা চাবি বার করে কাচের আধারে লাগালেন প্রফেসর। ক্লিক করে একটা শব্দ হল। আধার এখনও চাবিবন্ধ!

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ইন্দ্রনাথ, 'হাতটা ঘুরে গেছে দেখছি। কেসটা আপনি খোলেননি তো?'

'আরে, না মশাই, না। কেউ খোলেনি। চাবি আমার পকেটেই থাকে। প্রমাণ চায় অবিশ্বাসীর দল? এসে দেখে যাক তারা। কিন্তু মানেটা কী বলুন তো?'

আচ্ছন্ন কণ্ঠে স্বগতোক্তি করে ইন্দ্রনাথ, 'বিপরীত ভঙ্গিমা নিয়েছে হাতটা। যা ছিল, ঠিক তার উলটো—'

'জয়গুরু! বুঝেছি, ময়না কী বলতে চায় বুঝেছি! ফাল্গুনীবাবু, আপনি যে আমার কী উপকার করলেন...ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন!' দু-হাতে ইন্দ্রনাথের হাত চেপে ধরেন প্রফেসর। মিনতি করুণ কণ্ঠে বলেন, 'ফাল্গুনীবাবু, ময়নাকে আবার এনে দিতে হবে। আর-একবার।'

যেন নেশার ঘোর কাটাবার জন্যে মাথা ঝাঁকায় ইন্দ্রনাথ: 'আজ আর না...আজ আমি শেষ হয়ে গেছি...'

'কাল?'

'কথা দিতে পারছি না। যখনি বুঝব, আপনাকে খবর দেব।'

'টেলিফোনে?'

'হ্যাঁ।'

বিশ মিনিট পরেই ডেন্টিস্টের চেয়ারে বসে গোঙাতে দেখা গেল ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ গড়ুর ব্যানার্জির অবিস্মরণীয় সাহায্য

আর, এই ডেন্টিস্টের চেয়ারে বসেই বিচিত্র মোমের হাতের ভয়ঙ্কর রহস্যের আশ্চর্য সমাধান করল তীক্ষ্ণধী ইন্দ্রনাথ রুদ্র!...

দিল্লি শহরে ডাঃ জি. ব্যানার্জিকে চেনে না এমন লোক নেই। আমেরিকা ফেরত ডেন্টিস্ট। কিন্তু একসময়ে ছিল ইন্দ্রনাথের সহপাঠী ও পরম সুহৃদ। সখ্যতার সেই রাখীবন্ধন শিথিল হয়নি সময় ও দূরত্বের ব্যবধানে।

জি. ব্যানার্জির পিতৃদত্ত নাম গদাধর ব্যানার্জি। কিন্তু যেহেতু তার নাকটি পক্ষীর চঞ্চুকেও হার মানায়, সহপাঠিনীরা তাকে গড়ুর নামে ডাকাই সিদ্ধান্ত করে। ইন্দ্রনাথ আদর করে ডাকত রামগড়ুর।

বর্ণিল পরে দেখা। সুতরাং উল্লাসের প্রাথমিক উগ্রতা স্তিমিত হওয়ার পর সাংঘাতিক বেদনা উপশম করার জন্যে একটা নভোকেন ফুঁড়ে দিল গড়ুর। তারপর দাঁত পরীক্ষার পর দেখা গেল অবস্থা খুবই শোচনীয়। কষদাঁত, কাজেই গোড়া খুব শক্ত। এদিকে হানাদার পোকাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে দাঁতের বেশ খানিকটা অংশ উধাও। যেটুকু আছে, সেইটুকুই দুপাশের মজবুত দাঁতের সঙ্গে বেশ শক্তভাবে বেঁধে রাখা দরকার। এ-জন্যে অবশ্য খুব উন্নত ধরনের ডেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং জানা প্রয়োজন। তবে আমেরিকা-ফেরত গড়ুর ব্যানার্জি সে আর্টে পাকা আর্টিস্ট।

'তোমাদের ওই কলকাতারই ডাক্তারদের কিলিং এখন সেকেলে হয়ে গেছে। মডার্ন ট্রিটমেন্ট—'

'লেকচার থামিয়ে চটপট হাত চালা!' প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে ইন্দ্রনাথ।

'ছটফট করিসনি। এসব ব্যাপারে সাধারণ মোমের ছাপ একেবারেই অচল। দুটো খুব নিখুঁত ছাঁচ চাই। একটা নিরেট, আর-একটা ফাঁপা—পোকায় খাওয়া গর্তের।'

বলতে-বলতে ক্যাবিনেট থেকে একটা পলিথিন বোতলজাতীয় বস্তু বার করল গড়ুর ব্যানার্জি। ডগায় সূচালো নলমুখ। ভেতরে উচ্চচাপে রাখা তরল পদার্থ।

বোতলের ওপরে বড়-বড় অক্ষরে লেখা ট্রেড নেম—

INSTANTOPLAST

পাতলা ফিনফিনে একজোড়া সার্জিক্যাল রবার দস্তানা হাতে পরে নেয় গড়ুর ব্যানার্জি। কষদাঁতের ওপর কী একটা পদার্থ লাগায়। তারপর সরুমুখ নলটা হাঁ করে মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বোতাম টিপতেই হিস-হিস শব্দে স্প্রে বেরিয়ে আক্রান্ত দাঁতটাকে ঢেকে দেয়।

স্প্রেটা নামিয়ে রেখে সঙ্গে-সঙ্গে দাঁতের দু-দুটো ছাঁচ মুখের ভেতর থেকে বার

করে আনে গড়ুর। বলে স্মিতমুখে, 'দেখলি তো, কটা সেকেন্ডও বা গেল। তোদের কলকাতার ওল্ড চার্লসের আমলের ডাক্তাররা হলে গালের মধ্যে গাদা ঠেসে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে শক্ত করত মোমের ছাঁচ। আরাম এতে না তাতে? ম্যাজিকের মতো কাজ হয় ইনস্ট্যানটোপ্লাস্টে।'

কৌতূহলী চোখে মুখগহ্বরের উপকৃত অঞ্চলের নিখুঁত দুটো ছাঁচের দিকে তাকিয়েছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। ঘড়ির কারিগরদের মতো চোখে ঠুলিলেন্স লাগিয়ে গড়ুর ব্যানার্জি তীক্ষ্ণমুখ ইস্পাতশলাকা দিয়ে উলটে-পালটে পরীক্ষা করতে থাকে ক্ষুদ্র ছাঁচ দুটিকে।

ইন্দ্রনাথ শুধোয়, 'রবার গ্লাভস পরিস কেন?'

'তা না হলে আঙুলের যেখানে লাগবে, সেখানেই সেঁটে যাবে। টানলে চুল সমেত উঠে যাবে। একটা কম্পাউন্ড লাগিয়ে নিলে অবশ্য আর তা হয় না, যেমন তোর দাঁতে লাগালাম।'

'স্প্রে করার সঙ্গে-সঙ্গে শুকিয়ে যায় নাকি?'

'তা না হলে বলছি কী? শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়। এমন শক্ত হয়ে যায় যে, তখন এর ওপর যা খুশি খোদাইও করা যায়, ফুটো করা যায়—যা তোর মন চায়। ঠিক এইভাবে—'

বলে, প্রথমে দস্তানার ওপর একটা তৈলাক্ত পদার্থ লাগিয়ে নেয় গড়ুর। তারপর ডান হাতটা সামনে ছড়িয়ে দিয়ে স্প্রে করে তর্জনির চারধারে। সঙ্গে-সঙ্গে ফুটে ওঠে একটা সাদা স্তর। বোতলটা রেখে সন্তর্পণে আঙুল বার করে নেয় দস্তানার ভেতর থেকে। সবশেষে, সাদা স্তরের ভেতর থেকে দস্তানাটা টেনে বার করে নিতেই দেখা যায় কাগজের মতো পাতলা একটা ছাঁচ—আকার অবিকল তর্জনীর মতই। তীক্ষ্ণমুখ শলাকা দিয়ে কয়েকটা আঁচড় টেনে ছাঁচটা ইন্দ্রনাথের হাতে তুলে দেয় গড়ুর।

কাঠের পুতুলের মতো সিধে হয়ে বসেছিল ইন্দ্রনাথ। ধারালো শলাকাটা নিয়ে নিজেই কয়েকটা দাগ টানে ছাঁচটার ওপর। পরিষ্কার খোদাই চিহ্ন—প্লাস্টার ছাঁচের মতো চটা উঠে যাওয়ার কোনও চিহ্নই নেই।

যেন ভূত দেখেছে, এমনিভাবে বিস্ফারিত চোখে ছাঁচটার দিকে তাকিয়ে থাকে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

'দেখি তোর গ্লাভসটা।' অতর্কিতে গড়ুরের হাত থেকে রবার দস্তানা ছিনিয়ে নেয় ইন্দ্রনাথ। নিদারুণ উত্তেজনায় লাল হয়ে যায় চোখ-মুখ। থরথর করে কাঁপতে থাকে দশ আঙুল।

নার্ভাসনেস! কিন্তু কারণটা কী? অবাক হয়ে যায় গড়ুর ব্যানার্জি।

ইন্দ্রনাথ ততক্ষণে শক্ত ছাঁচটা রবার-দস্তানার তর্জনীর অভ্যন্তরে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে। শামুকের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে ফাঁপা আঙুলটা।

পাতলা রবারের ওপর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছাঁচের গায়ে আঁচড় চিহ্ন।

'উঃ কী বোকা, কী বোকা আমি!' পাগলের মতো আপন মনে বিড়বিড় করে ওঠে ইন্দ্রনাথ।

চোখ নাচিয়ে বলে গড়ুর ব্যানার্জি, 'এরপর কি ইউরেকা বলবে আর্কিমিডিস?'

'চললাম।' ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো একলাফে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে ইন্দ্রনাথ, এবং পরমুহূর্তে দৌড়োয় দরজার দিকে।

'আরে, আরে, চললি কোথায়?' হাঁ-হাঁ করে ওঠে গড়ুর ব্যানার্জি 'নভোকেনের এফেক্ট কেটে গেলেই যে যন্ত্রণায় চিৎকার পারবি না।'

'সময় নেই, সময় নেই।' বলতে-বলতে চৌকাঠের ওপর থমকে দাঁড়ায় ইন্দ্রনাথ। পলকের জন্যে কী ভেবে নিয়ে ফিরে আসে চেয়ারের কাছে—ছোট্ট কাঠের টেবিলের ওপর থেকে ইনস্টান্টোপ্লাস্টের বোতলটা আর রবারের দস্তানাটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে একলাফে পৌঁছয় দোরগোড়ায়।

সেখান থেকেই হেঁকে ওঠে, 'ধার নিলাম চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে।'

'কেন, তা বলবি তো?'

বোঁ করে চৌকাঠের ওপর ঘুরে দাঁড়ায় ইন্দ্রনাথ। গলার স্বর হঠাৎ খাদে নামিয়ে ফিসফিস স্বরে বলে, 'ময়না বক্সী অনেক দিন মারা গেছে—কাল রাতে মরেছে তার প্রেতমূর্তি। আর আজ তৈরি করব তার অশরীরী হাতের মোমের ছাঁচ—এই ইনস্টান্টোপ্লাস্ট দিয়ে। রামগড়ুর আজ থেকে ভারতের ইতিহাসে তোর নাম উঠে গেল!'

পরমুহূর্তেই কালবৈশাখী ঝড়ের মতোই উধাও হয় ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

হোটেল।...

সশব্দে একটা ট্যাক্সি ব্রেক কষে ফটকের সামনে। ভেতর থেকে দমদমানো কামান-নিক্ষিপ্ত গোলার মতোই ছিটকে বেরিয়ে আসে ইন্দ্রনাথ।

ফটকের দুপাশে দাঁড়িয়ে পুলিশ কনস্টেবল। একজন তার ট্যাক্সির নাম্বার টুকে নিলে। কিন্তু সেদিকে নজর দেওয়ার মতো তখন মনের অবস্থা নেই ইন্দ্রনাথের। কাউন্টারে চিঠিপত্রের খোঁজে যেতেই ছুটে এল ম্যানেজার।

'মিঃ রুদ্র!'

ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ।

'কী?'

'পুলিশ আপনাকে খুঁজছে। আপনি বরং আগে ঘরে যান, জলদি!' ত্রাস-কম্পিত স্বর মৈথিলী ম্যানেজারের।

পুলিশ! তবে কি...

মিঃ আচাওই বটে। ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে চুরুট কামড়ে, চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছিলেন শয্যার দিকে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট, ফোটোগ্রাফার এবং আরও কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী ব্যস্ত যে-যার কাজ নিয়ে।

লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকল ইন্দ্রনাথ। চোখ তুললেন মিঃ আচাও। চোখাচোখি হতেই লাফিয়ে উঠলেন পদমর্যাদা ভুলে।

'কোথায় ছিলেন সারারাত?' যেন বুক থেকে একটা বিশমণি বোঝা নেমে গেছে, এমনি স্বস্তির সুর আচাওর কণ্ঠে।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ইন্দ্রনাথ, 'কেন?'

'কাল রাত্রে আপনার ঘরে দুশমন চড়াও হয়েছিল।'

'বটে!' নির্বিকার থাকার চেষ্টা করে ইন্দ্রনাথ। হিসেবে তা হলে ভুল হয়নি তার। ফর্দে ইন্দ্রনাথ রুদ্রের নামও উঠেছে!

'নাইট ডিউটি দিচ্ছিল হোটেল-দারোয়ান। করিডর বেয়ে আপনার ঘরের দিকে আসছে, এমন সময়ে খুট করে একটা শব্দ শুনতে পায়। কে যেন সাঁৎ করে ঢুকে পড়ে আপনার ঘরের মধ্যে। লোকটার পিছন দিকটাই দেখেছিল দারোয়ান। চেহারাটা মোটেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালিবাবুর মতো নয় দেখে সন্দেহ হয়। দরজার সামনে এসে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে তীব্রবেগে একটা লোক ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। মাথায় চোট লাগতেই অজ্ঞান হয়ে যায় বেচারা।'

'লোকটাকে দেখতে কীরকম?' উৎকণ্ঠা আর বুঝি চাপা থাকে না।

'গাঁট্টাগোট্টা, ঘাড়ে-গর্দানে একজন। এর বেশি আর কিছু দেখা যায়নি।'

'হাতে পিস্তলের মতো একটা বিদ্‌ঘুটে কিছু ছিল কি?'

সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন মিঃ আচাও, 'আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

'সেটা পরে শুনলেও চলবে। তা হলে ছিল?' অসহিষ্ণু কণ্ঠ ইন্দ্রনাথের।

'ছিল। অটোমেটিক নয়—অনেকটা সেকেলে গাদা পিস্তলের মতো নাকি দেখতে। তবে খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ পায়নি দরোয়ান।'

কপালের বিন্দু-বিন্দু ঘাম মুছে আস্তে-আস্তে একটা চেয়ারে বসে পড়ে ইন্দ্রনাথ। মৃত্যুর সঙ্গে এর আগেও সে বহুবার পাঞ্জা লড়েছে। কিন্তু এ যেন নতুন জীবন পাওয়া। কেউটের সঙ্গে লড়াই আর সায়ানাইড-পিস্তলধারীর সঙ্গে টক্কর দেওয়ায় কোনও পার্থক্য আছে কি?

উদ্বিগ্ন চোখে তাকান মিঃ আচাও, 'কী ব্যাপার বলুন তো মিস্টার রুদ্র? অনেক খবরই রাখেন মনে হচ্ছে—'

ক্লান্ত কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ, 'তা রাখি। গোটা তিনেক, নিদেন পক্ষে দুটো খুনের খবর আপনাকে এক্ষুনি দিতে পারি।'

চোয়ালের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে মিঃ আচাওর : 'যথা?'

'ময়না বক্সী আর তার বাবা।'

'হোয়াট!'

ছাড়া-ছাড়া কণ্ঠে শুধরে নেয় ইন্দ্রনাথ, 'ময়না বক্সী আর আরতি মল্লিক—এই দুই ভূমিকায় অভিনয় করেছে যে মেয়েটি, সেই নুরজাহান আর তার বাবাই খুন হয়েছে গতরাত্রে।' জাদুমহলের ঠিকানাটাও দিয়ে দেয় ইন্দ্রনাথ।

দাঁতে দাঁত পিষে শুধোন মিঃ আচাও, 'আরও একজন খুন হয়েছে বললেন না?'

'আমার তাই বিশ্বাস।'

'কে সে?'

'খুব সম্ভব একজন এনগ্রেভার। ব্লক কারখানার এনগ্রেভিং এক্সপার্টদের মধ্যে কেউ হতে পারে।'

আর-একটি কথাও না বলে রিসিভার তুলে নেন মিঃ আচাও।

'পুলিশ হেডকোয়ার্টার—হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট—'

মিনিট কয়েক পরেই রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়ালেন গোয়েন্দা-অধিকর্তা মিঃ আচাও। নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার খবর সত্যি। সবসুদ্ধ তিনটে লাশ পাওয়া গেছে। আব্দুমহল নামে একটা মার্কিন-শপের মালিক সুলতান আর তার মেয়ে নূরজাহানকে এক বাড়িতেই বিছানায় মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আর পাওয়া গেছে আবদুল্লার লাশ। আবদুল্লা দাগি আসামি। দশ টাকার জাল নোটের ব্লক এনগ্রেভ করে ঘানি টেনেছিল কয়েক বছর। আজ ভোরে তাকে বিছানায় মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। পোস্টমর্টেম চলছে।'

নিজেকে হঠাৎ বড় অবসন্ন মনে হয় ইন্দ্রনাথের। মৃত্যু জিনিসটা প্রথমে মনকে নাড়া দেয়, তারপর গা-সওয়া হয়ে যায়। ইন্দ্রনাথের অঙ্ক যদি সঠিক হয়, তবে এনগ্রেভারের মৃত্যুই শেষ নয়—আরও আছে।

সম্বিৎ ফেরে মিঃ আচাওর ধারালো কণ্ঠে, 'মৃত্যুর কারণটাও জানা আছে নাকি?'

প্রশ্নের বক্রতাটুকু ধর্তব্যের মধ্যে আনে না ইন্দ্রনাথ। বলে, 'আছে। সায়ানাইড পয়জনিং।'

'নূরজাহানই যে ময়না কল্লী আর আইভি মল্লিক, তা আপনি জানলেন কী করে?'

এবারেও প্রশ্নটা এড়িয়ে যায় ইন্দ্রনাথ, 'একটা প্রমাণ দিচ্ছি। মাস্তোয়ানিদের প্রেত-বৈঠকে যে কাগজটা আমার পকেটে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল, তার ওপরে আঙুলের ছাপের সঙ্গে নূরজাহানের আঙুলের ছাপ মেলালে দেখবেন দুটোই এক।'

দু-পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন মিঃ আচাও। দাঁতের ফাঁকে চুরুট রেখে বললেন চিবিয়ে-চিবিয়ে, 'মাই ডিয়ার হোমস্ সত্যিই অবাক করলেন আমাকে। আমার ধারণা ছিল, প্রাইভেট ডিটেকটিভ কেবল উপন্যাসেই সম্ভব। সেকথা থাকুক, আপনার উদ্ভ্রান্ত চেহারা দেখে বেশ বুঝছি, মারাত্মক শক পেয়েছেন কাল রাত্রে। আমি সব শুনতে চাই, গোড়া থেকে এখন পর্যন্ত।'

'সেসব পরে হলেও চলবে। কিন্তু এখুনি মাস্তোয়ানিদের বাড়ি যাওয়া দরকার।'

'কেন বলুন তো?'

'লিস্টে ওদেরও নাম আছে।'

যেন ইলেকট্রিক শক খেলেন মিঃ আচাও।

'তাও তো বটে।'

'লিস্টে আমার নামও ছিল। কপাল-জোরে বেঁচে গেছি। ভালো কথা, টেলিফোনে বলে দিন, নূরজাহানের দু-হাতের পামপ্রিন্ট আর ফোটোগ্রাফ দরকার।'

'আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছে। তবুও ছাপ কী হবে?'

'দরকার আছে।'

উল্কা গতিতে পুলিশ-জিপ এসে দাঁড়াল মাস্তোয়ানিদের প্রেতপুরীর সামনে। লাফ দিয়ে নিচে নামলেন সানুচর মিঃ আচাও আর ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

সদর দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত। ঠেলা দিতেই ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল করিডর আর শূন্য বসবার ঘর।

'পাখি উড়েছে।' অস্ফুট কণ্ঠে বলল ইন্দ্রনাথ।

সত্যিই পাখি উড়েছে—শূন্য পিঞ্জর যেন মৌন ভাষায় ব্যঙ্গ করে উঠল জাঁদরেল পুলিশ অফিসারদের। ঘরে-ঘরে দ্রুত গৃহত্যাগের চিহ্ন। টেবিলের ড্রয়ার আধখানা খুলছে, ভেতরকার জিনিসপত্র কিছু রয়েছে কিছু ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে। আলমারিরও সেই অবস্থা—পাল্লা বন্ধ করারও অবসর হয়নি—লন্ডভন্ড সবকিছু। একেরকম এক বস্ত্রেই গৃহত্যাগ করেছে অতর্কিত বাসিন্দারা।

প্রতিটি ঘরে সেই একই দৃশ্য।

'কাল রাত্রেই সটকেছে। সিয়াঁস শেষ হওয়ার পরেই। পালাবার মতলব ছিল বলেই নমো-নমো করে বৈঠক শেষ করেছে।' বলল ইন্দ্রনাথ।

'কিন্তু পালাল কোন পথে? সদর দরজা দিয়ে নিশ্চয় বেরোয়নি। বেরোলেই খবর পেতাম।'

'যে পথ দিয়ে নূরজাহান যাতায়াত করেছে—সেইপথেই।'

'কোথায় সেটা?'

'চলুন, সিয়াঁস-রুমেই সব প্রশ্নের উত্তর পাবেন।'

দিনের আলোতেও টর্চ জ্বালতে হল প্রেত-বৈঠক কক্ষে। সুইচবোর্ডের কয়েকটা সুইচ পর-পর টিপে দিতেই জ্বলে উঠল বিদ্যুৎবাতি।

লাথি মেরে কার্পেট সরিয়ে দিলেন মিঃ আচাও। পরিষ্কার মেঝে। কাঠের পাটাতন দিয়ে বাঁধানো। চোরা দরজার চিহ্ন নেই।

ইন্দ্রনাথ বলল, 'সাধারণত এসব ঘরের ঠিক নিচেতেই আর-একটা ঘর থাকে। চোরা দরজা খুলতে হয় নিচ থেকেই। কাজেই হতাশ হবেন না। ওপর থেকে দেখে কিছু বোঝা যাবে না।'

বলে, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সিলিংয়ের অলঙ্করণের দিকে।

সমস্ত সিলিং জুড়ে কাশ্মীরি আখরোট কাঠের অপরূপ সুন্দর কারুকাজ। শ্রীনগরের টুরিস্ট-অফিসে অথবা হাউসবোটের সিলিংয়ে যেমন দেখা যায়—অবিকল তেমনি।

'দেখেছেন?' চোখ না নামিয়েই জিগ্যেস করে ইন্দ্রনাথ।

'কী?'

'ইনফ্রা-রেড আলোর উৎস। সোনার পাতার ওই যে ছোট-ছোট ফুটোগুলো, সাধারণ চোখে ওগুলো অলঙ্করণ। কিন্তু টর্চ দিয়ে দেখবেন, ইনফ্রা-রেড বেরোচ্ছে ওই ছিদ্রপথেই। স্নিপারস্কোপ চোখে লাগিয়ে ভুতুরি মাস্তোয়ানির চলাফেরার সুবিধের জন্যেই এই ব্যবস্থা।'

সেখান থেকে গোয়েন্দাবাহিনী আসে বসবার ঘরে।

ইন্দ্রনাথ বলে, 'এ ঘরটা একটু ভালো করে সার্চ করবেন। লুকোনো মাইক্রোফোন এখানেই কোথাও আছে। আরে, এ কী!'

হেঁট হয়ে চেয়ারের তলা থেকে অদ্ভুত একটা বস্তু তুলে নেয় ইন্দ্রনাথ। অনেকটা চশমার মতো দেখতে, কিন্তু চশমা নয়। ঠিক যেন একটা অসম্ভব চ্যাপ্টা বাইনোকুলার। একদিকে স্বচ্ছ কাচ, অপর দিকে কালো কাচ। দু-পাশে চশমার মতো ডাঁটি। চক্ষু পরীক্ষার জন্যে চোখের ডাক্তাররা যেমন কিম্ভুতকিমাকার চশমা লাগায় নাকের ডগায়, অনেকটা সেইরকম বিদঘুটে চেহারা।

সহর্ষে বলে ইন্দ্রনাথ, 'ইউরেকা! ইউরেকা!'

থতিয়ে যান মিঃ আচাও, 'কী ওটা?'

'নিশারস্কোপ। অনেক উন্নত ধরনের। চশমার মতোই চোখে লাগিয়ে অন্ধকারে ভূতের অভিনয় করত মুকরি মাস্তোয়ানি। তাড়াতাড়িতে আসল জিনিসটাই ফেলে গেল।'

বিচিত্র চশমাটাকে পকেটে রাখে ইন্দ্রনাথ। মুচকি হেসে বলে, 'আপাতত আমার কাছেই থাকুক। কেমন?'

আরও কিছুক্ষণ খোঁজার পরেই পাওয়া গেল সেই গুপ্তকক্ষ।

প্রেতবৈঠক-কক্ষের ঠিক নিচের তলাতেই ছোট্ট একটা ঘর মাটির তলার ঘর। পাথরে বাঁধানো। ভ্যাপসা গন্ধ। পরপর কয়েকটি বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটল এই ঘরেই।

ঘরের সিলিং পর্যন্ত একটা কাঠের মই। মইয়ের ডগায় উঠে মাথার ওপর সিলিংয়ে ঠেলা দিতেই বাক্সের ডালার মতো ওপর দিকে খুলে গেল চোরা দরজা। দু-পাশে দুটো হুক আর ছিটকিনি; ওপরে তুলে আটকে রাখার জন্যে। ফোকর দিয়ে মাথা বাড়াতেই দেখা গেল, প্রেতবৈঠক-কক্ষের ক্যাবিনেট আর সাজসজ্জা।

এই হল ময়না বক্সী—ওরফে আইভি মল্লিক—ওরফে নুরজাহানের আবির্ভাব-পথ।

ভূগর্ভ কক্ষের এককোণে একটা বড় কাঠের আলমারি। ভেতরে থিয়েটারের ড্রেসের মতো বহু পোশাক। পেশোয়ারি সাজ থেকে শুরু করে বাঙালি বাবুয়ানি—কিছুই বাকি নেই।

বিভিন্ন প্রেতের ছদ্মবেশ। জাহাজ ডুবি হয়ে মারা গেছে নাবিক পুত্র? আছে নেভি-ইউনিফর্ম। কারগিল-ফ্রন্টে নিহত হয়েছে সৈনিক পৌত্র? আছে, মিলিটারি ইউনিফর্ম।

আর-এক প্রান্তের দেয়ালের মধ্যে মস্ত কুলুঙ্গির মতো একটা গহ্বর। টর্চের আলোয় দেখা গেল, একটা অপরিসর সুড়ঙ্গ। মোগলাই আমলের বাড়ি—কাজেই অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অবাক হতে হল তখুনি, যখন দেখা গেল সুড়ঙ্গ-পথ শেষ হয়েছে একটা রেস্তোরাঁর পাকশালার মধ্যে। রাস্তার ওপরেই দোকান। বাড়ির ঠিক পেছনের রাস্তা।

জনমানবশূন্য দোকানঘর। বাইরে থেকে বন্ধ দরজা।

এই পথেই রাতের অন্ধকারে পুলিশের সদাজাগ্রত চোখকে ফাঁকি দিয়ে যাতায়াত করেছে কুচক্রীরা।

পাতালকক্ষে পাওয়া গেল আরও কয়েকটি জিনিস। কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত ইলেকট্রিক বাতির নিচেই সস্তা কাঠের টেবিলে ছড়ানো অনেকগুলো যন্ত্রপাতি। দেওয়ালের তাকে সাজানো বিস্তর বোতল। লিকুইড স্প্রে-র বোতলও আছে তার মধ্যে। লেবেল তুলে ফেলা হয়েছে প্রতিটি বোতলের গা থেকে। পাশে একটা খুদে ইলেকট্রিক কুকার। বাক্সের মতো গড়ন। ভেতরে উনুন। ওপরে বসানো একটি মাত্র মৌলিক পদার্থ।

তাকের ওপর থেকে একরোল অ্যাডেসিভ টেপ তুলে নিলে ইন্দ্রনাথ। খুব মসৃণ আর পাতলা টেপ—হাসপাতালে যেরকম ব্যবহৃত হয়, সেরকম নয়। এক টিউব ফসফরাস রং রয়েছে তাকে—অন্ধকারে জ্যোতির্মূর্তি হওয়ার জন্যে।

কয়েকটা বোতলের নালিমুখের ঘ্রাণ নিয়ে হৃষ্টচিত্তে ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

'মিস্টার আচাও, একটা কথা আপনাকে এখনও বলা হয়নি। আজ সকালেই ময়না বক্সীর মোমের হাত তৈরির কৌশল আমি শিখেছি।'

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। হতবাক হয়ে গেল উপস্থিত সবাই।

'কোথায়?' অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করলেন মিঃ আচাও—দুই চোখ তাঁর সূচাগ্র ইস্পাতের মতো তীক্ষ্ণ।

'ডেন্টিস্টের কাছে। হাতটা তৈরি হয়েছে এই ঘরেই।'

এরপর পাঁচ মেগাটন বোমার মতোই ফেটে পড়া উচিত ছিল মিঃ আচাওর। কিন্তু একদম অপ্রত্যাশিত সংযমের পরিচয় দিলেন ভদ্রলোক। সিগারটা ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন কড়িকাঠের পানে। মিনিটখানেক পরে যখন চোখ নামালেন, তখন সে দৃষ্টিতে শ্লেষ-বিদ্রূপের বাষ্পও নেই।

'মিস্টার রুদ্র,' আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠ মিঃ আচাওর। 'ডক্টর চন্দ্রচূড় মহলানবীশ যখন আপনার নাম সুপারিশ করেছিলেন, আমি খুশি হতে পারিনি। আমি জানি, আপনি সেটা উপলব্ধি করেছেন এই ক'দিনে। আপনার ওপর আমার কোনও আস্থাই ছিল না। আজ আমি ক্ষমা চাইছি আমার দুর্ব্যবহারের জন্যে। এত বড় পুলিশবাহিনী নিয়ে আমি যা করতে পারিনি, আপনি একা তাই করেছেন। কী কৌশলে করেছেন, তা জানি না। কিন্তু মোমের হাত যদি তৈরি করতে পারেন, যদি পারেন অপারেশন নটরাজকে বাঁচাতে, তা হলে জানবেন অন্তত একজন আই-পি-এস অফিসারের সমস্ত দম্ভ আপনি ধুলোয় লুটিয়ে দেবেন।'

'ওসব কথা এখন থাকুক, মিস্টার আচাও। একটা ফর্দ আপনাকে দিচ্ছি। দু-ঘণ্টার মধ্যে ফর্দমাফিক সমস্ত জিনিস আমাকে জোগাড় করে দিন।'

বলে, তৎক্ষণাৎ কয়েকটা পুরোনো খামের পিছনে নকশা এঁটে দিলে ইন্দ্রনাথ। কয়েকটা জিনিসের নাম লিখে দিলে, সেই সঙ্গে বিশেষ কয়েক ব্যক্তির বৃত্তান্ত—মোমের হাত তৈরি করতে এদের প্রত্যেককে প্রয়োজন।

শিস দিয়ে উঠে বললেন মিঃ আচাও, 'সর্বনাশ! এবার চাঁদটাই না চেয়ে বসেন।'

'দরকার হলে তাও চাইব। আর-একটা কথা, এখন প্রায় একটা বাজে—রাত ন'টায় আজ এখানে প্রেত-বৈঠক বসবে। এর মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সারতে হবে। ডক্টর মহলানবীশকেও আজ হাজির থাকতে হবে—তাঁকে আনবার ব্যবস্থা করুন। প্রফেসরকে খবর দেব আমি।'

'কাল রাতে প্রফেসর নিরাপদে ছিলেন। কিন্তু আজ রাতে অ্যাটাকের সম্ভবনা আছে কি?'

'খুব সম্ভব নয়। ওরা ওঁর জ্যান্ত মগজ চায়, মরা মাথা নয়। তা হলেও কড়া পুলিশ পাহারা যেন থাকে—সাদা পোশাকে।'

'আর-একটা প্রশ্ন। মোমের হাতের ভাঁওতা আপনি ফাঁস করার পর প্রফেসর অপারেশন নটরাজে থাকবেন তো?'

মৃদু হাসল ইন্দ্রনাথ।

বলল, 'সে দায়িত্ব আপনাদের।'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ আবার বিষ-ছুঁচ

রাত ন'টা।

আসুন মাক্রোয়ানিদের প্রেতপুরীতে। সেই কক্ষ, সেই আসবাব, সেই পরিবেশ। টেবিলের ওপর সাজানো বিবিধ বাদ্যযন্ত্র। রেডিওগ্রামও তৈরি। লছমন সিংয়ের বদলে সুইচবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ছোটখাটো অশ্বত্থামার মতো এক পুরুষ। প্রফেসর বিক্রম বক্সী তাকে না চিনলেও পাঠক অনায়াসেই তার পরিচয় জানতে পারেন। খুদে অশ্বত্থামা সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের একজন অকুতোভয় অফিসার।

আজকের আসরে উপস্থিতের সংখ্যা কম। কারণ, আজ মঙ্গলবার। এ দিনে মাক্রোয়ানিরা প্রেত আহ্বান করে না। কাজেই অবাঞ্ছিত বহু বৈঠকীদের উপস্থিতি বিনা চেষ্টাতেই রোধ করা গেছে।

ডক্টর চন্দ্রচূড় মহলানবীশ প্রায় আসেন দিল্লিতে। সেদিনও বন্ধুকে হঠাৎ দেখে বিলক্ষণ খুশি হয়েছিলেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী। প্রেতবৈঠকে স্বয়ং হাজির থেকে চন্দ্রচূড় স্বচক্ষে মোমের হাত তৈরি দেখবেন শুনে রীতিমতো উল্লসিতই হয়েছিলেন।

কিন্তু অবাক হয়েছিলেন মাক্রোয়ানিদের পলায়ন-বার্তা শুনে।

চন্দ্রচূড় মহলানবীশ বলেছিলেন, 'কিছু-কিছু বেআইনী ব্যবসা আরম্ভ করেছিল ডেভিড মাক্রোয়ানি। পুলিশের টনক নড়ে। কিন্তু তাদের হস্তক্ষেপের আগেই রাতারাতি পিঠটান দেয় বুজরুকের দল।'

'বাজে বোকো না। মুকরি মাক্রোয়ানিকে ভগবান যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা অনেকে সাধনা করেও অর্জন করতে পারে না। ওরা বুজরুক নয়।' গরম হয়ে বলেছিলেন বিক্রম বক্সী।

চন্দ্রচূড় আর কথা বাড়াননি। মাক্রোয়ানিদের বাড়িতেই ফাল্গুনী রায় মিডিয়াম হচ্ছে শুনে খুঁতখুঁত করেছিলেন প্রফেসর। বলেছিলেন, 'আমার বাড়িতেই তো করা যেত।'

চন্দ্রচূড় বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'ময়না যে জায়গায় দেহধারণ করতে অভ্যস্ত, সে জায়গায় গেলে মিডিয়ামের ওপর চাপ কম পড়বে—তাই।'

ফাল্গুনী রায় আজ কথা দিয়েছে, অশরীরী ময়না বক্সীকে শরীরী করে তুলবে। প্রমাণস্বরূপ সৃষ্টি করবে আর-একটি মোমের দস্তানা।

প্রথম মোমের দস্তানার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার জন্যে প্রফেসরের বাড়ি থেকে কাচের কেস সমেত মোমের হাতটা এনে রাখা হয়েছে প্রেতবৈঠক কক্ষে।

এবারে আয়োজনে এইটাই একমাত্র বাড়তি সামগ্রী নয়। আছে একটা ইলেকট্রিক প্লেট। তরল মোমভর্তি একটা পাত্র বসানো প্লেটের ওপর। প্লেটের তাপমাত্রা খুবই কম। কাজেই, তরল মোম হাওয়ায় জমতে পারছে না। অথচ হাতে লাগলেও ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা নেই। পাশেই রয়েছে ডেকচি বোঝাই ঠান্ডা জল।

অভ্যাগতদের মধ্যে হাজির আছেন জলন্ধর দাস, সরকারি মহলে যিনি ধুরন্ধর আই-পি-এস মিঃ আচাও নামেই খ্যাত। প্রফেসরের চোখের আড়ালে আছেন জেনারেল বরকাকতি, আর সেন্ট্রাল কিম্বা রেভিনিউ ব্যুরোর ডিরেক্টর মিঃ রায়বাহাদুর কদম। এঁরা দুজনে ইন্দ্রনাথ রুদ্রের অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ করেন না। এ সম্পর্কে ডক্টর চন্দ্রচূড় মহলানবীশের সঙ্গে দারুণ কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে সন্ধ্যায়। ইন্দ্রনাথ রুদ্রের

গাফিলতির জন্যেই নাকি মাক্রোয়ানিরা পাততাড়ি গুটিয়েছে এবং অপারেশন নটরাজকে ভেস্তে দিতে বসেছে।

সুতরাং সাফল্য নিশ্চিত জেনেও উদ্বেগমুক্ত হতে পারছিল না ইন্দ্রনাথ। জীবনে অনেক সমস্যাসঙ্কুল মামলায় মাথা ঘামিয়েছে সে, কিন্তু এরকম বিপজ্জনক ঝুঁকি কখনও নেয়নি। মাত্র আট ঘণ্টার মধ্যে মোমের হাত তৈরি করতে গিয়ে প্রথমে ব্যর্থ হয়েছে, সফল হয়েছে শেষমুহূর্তে।

মাথা নিচু করে এই সব কথাই ভাবতে ভাবতে প্রেত-কক্ষে প্রবেশ করল ইন্দ্রনাথ। অপরিসীম গাম্ভীর্যে থমথমে চোখ-মুখ দেখে একটু অবাকই হয়ে যান জলন্ধর দাস ওরফে মিঃ আচাও।

এ যেন আর-এক ইন্দ্রনাথ রুদ্র। সমাধিস্থ। আত্মমগ্ন।

মন্থর মেঘমন্দ্র কণ্ঠে বলল ইন্দ্রনাথ, 'আপনারা জানেন, মিডিয়াম হওয়ার ব্যাপারে আমি অনভিজ্ঞ। কিন্তু আমার ভেতরে যে একটা শক্তি আছে, তা আমি হঠাৎ আবিষ্কার করেছি সাহিত্য মল্লিকের কথা ভাবতে গিয়ে। যতবার আমার চিন্তার আকর্ষণে নেমে এসেছে তার আত্মা, ততবার আর-একটি মৃতাত্মা কথা বলবার চেষ্টা করেছে তার বাবার সঙ্গে। আমার আজকের চেষ্টা হবে সেই ময়না বক্সীকেই দেহধারণ করানোর। পারব কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করব সেই দিকেই।'

দম নেয় ইন্দ্রনাথ। সম্মোহিতের মতো বসে থাকেন চেয়ারে বসেন চন্দ্রচূড়—বিক্রম—জলন্ধর।

প্রেতকক্ষের হিপনোটিক পাওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

শুরু করে ইন্দ্রনাথ, 'আপনাদের সমবেত প্রচেষ্টাও প্রয়োজন। আপনারা সকলে ভাবুন ময়না বক্সীকে। ক্যাবিনেটের ভেতরেও যাবেন না। সাহায্য করতে গিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবেন না। সময় যখন হবে, তখন আমি নিজেই আসব আপনাদের কাছে। প্রফেসর, আমাকে বাঁধুন, প্লিজ।'

বন্ধনপর্ব সাঙ্গ হতেই আলো নিভল, এবং শুরু হল প্রেততত্ত্ব অধিবেশন

রেডিওগ্রামের গমগমে জলতরঙ্গ শেষ হওয়ার আগেই বাঁধন খুলে ফেলল ইন্দ্রনাথ। আজকের ঝামেলা অনেক কম। দড়ির প্রতিটি প্যাঁচ আজকে মনে রাখবার দরকার হয়নি—কারণ বৈঠক শেষে বন্ধন-দশায় নিজেকে দেখানোর প্রয়োজন আজ আর নেই। শুধু যা শরীরের বিশেষ-বিশেষ কয়েকটি স্থান ফুলিয়ে রাখতে হয়েছিল। এখন আলগা দিতেই শিথিল হয়ে পড়ল বন্ধন। মিনিটখানেকের মধ্যেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে বার করল ইস্পাতের ডাঁটিওলা যন্ত্রচক্ষু—মুকরি মাক্রোয়ানির অত্যাধুনিক স্নিপারস্কোপ-চশমা। ইনফ্রা-রেড ফোকাস থেকে ঝরে পড়ছে অদৃশ্য আলো—সে আলো দৃশ্যমান হবে শুধু স্নিপারস্কোপের মাধ্যমেই।

কানের পাশে ডাঁটি দুটো গলিয়ে দেয় ইন্দ্রনাথ।

এবং পরক্ষণেই ধ্বক করে ওঠে বুকটা।

ক্যাবিনেটের মধ্যে ইন্দ্রনাথ রুদ্র ছাড়াও উপস্থিত রয়েছে আর একজন পুরুষ!

পর্দার দিকে পিঠ দিয়ে ইন্দ্রনাথের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সে। নির্নিমেষ দৃষ্টি। অচঞ্চল দেহ। ডান হাত পকেটে ঢোকানো।

দুজনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র চার ফুট!

বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পড়তে থাকে ইন্দ্রনাথের। নিদারুণ আতঙ্কে অসাড় হয়ে আসে হাত-পা। লোকটাকে সে দেখেনি। কিন্তু চেনে। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। ঘাড়ে-গর্দানে। এই লোকটাই না কাল রাতে হোস্টেলের দারোয়ানকে আক্রমণ করেছিল?

স্ফীত নাসারন্ধ্র আর নরুণ-দিয়ে-চেরা তির্যক চোখ দেখে আর কোনও সন্দেহই রইল না। ঘাতকই বটে। গুপ্তঘাতক। কাল রাত্রে এর ওপরই ভার ছিল তাকে প্রেতলোকে পাঠিয়ে দেওয়ার। কিন্তু পারেনি। তাই আজ এসেছে অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে—ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে যমালয়ে পাঠাতে।

আগে থেকেই নিশ্চয় বাড়ির মধ্যে অথবা পাতালঘরে কোথাও ঘাপটি মেরে বসেছিল চৈনিক ঘাতক। অন্ধকার হতেই দাঁড়িয়েছে পথ আগলে। আজ আর নিস্তার নেই।

অমন শীতেও ঘেমে ওঠে ইন্দ্রনাথ। অপরিসীম ভয়ে স্নায়ুমণ্ডলীও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। সায়ানাইড-পিস্তলের সামান্য হিস শব্দ ডুবে যাবে যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজে—গাঢ় অন্ধকারে কেউ বুঝতেও পারবে না মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে ইন্দ্রনাথ রুদ্রের প্রাণহীন দেহ।

লোকটা তখনও পাথরের মূর্তির মতো অনড়। দৃষ্টিও অনিমেষ। হাতটা তখনও পকেটে ঢোকানো।

এত দেরি করছে কেন?

সেই মুহূর্তে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায় মাথার এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। ঝলসে ওঠে প্রতিটি স্নায়ুকোষ।

লোকটা তাকিয়ে আছে অন্ধের মতো। কিছুই দেখছে না, দেখতে পাচ্ছে না নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে। শুধু শুনছে, কান পেতে শুনছে, কখন শব্দ করবে ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

অর্থাৎ ইন্দ্রনাথের যা আছে, চীনে-ঘাতকের তা নেই। ইন্দ্রনাথের আছে স্নিপারস্কোপ—অন্ধকারে দেখার যন্ত্র। ঘাতকের তা নেই—সুতরাং সে অন্ধপ্রায়!

কথাটা মাথায় আসতেই আবার সাহস ফিরে পায় ইন্দ্রনাথ। অন্ধকারে মানুষ মাত্রই অসহায়। সুতরাং—

ইচ্ছে করেই খুক করে কাশে ইন্দ্রনাথ। চেয়ার টেনে একটু শব্দও করে...

সঙ্গে সঙ্গে যেন চনমনে বিদ্যুৎস্রোত বয়ে যায় লোকটার সর্বাঙ্গে। প্রখর হয়ে ওঠে দৃষ্টি। ডান হাতটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে পকেটের বাইরে।

এ কী! এ তো সায়ানাইড-পিস্তল নয়। লোকটার আঙুলে একটা আংটি। আংটির মাথায় একটা ছিপি।

আস্তে-আস্তে ছিপিটা খুলে নেয় অন্ধকারের আততায়ী। ইনফ্রা-রেড আলোকে স্পষ্ট দেখা যায় একটা ছুঁচ।

বিষ-ছুঁচ। চকিতে যেন বায়স্কোপের ছবির মতো মনের পর্দায় ভেসে ওঠে না-দেখা কতকগুলো দৃশ্য। সম্ভবত এই ছুঁচ নিয়েই ভয়ঙ্কর সেই রাতে এ ঘরে এসেছিল নূরজাহান। সে ছুঁচ আর ব্যবহার করা হয়নি—

তাই আজ এসেছে ঘাতক স্বয়ং। অন্ধকারে এর চাইতে অমোঘ অস্ত্র আর নেই। আবার লোমকূপে-লোমকূপে শিহরণ অনুভব করে দুঃসাহসী ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

এবং ঠিক সেই মুহূর্তে দু-হাত সামনে বাড়িয়ে চেয়ারের দিকে ধেয়ে এল চীনে-জল্লাদ...

সঙ্গে-সঙ্গে পাশে সরে যেতে গিয়ে দড়িতে পা বেধে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

একটার-পর-একটা যন্ত্রসঙ্গীত বেজে চলল। ক্যাবিনেটের মধ্যে থেকে ভেসে এল দুমদাম শব্দ। ছিটকে পড়ল চেয়ার। ঝনঝন করে গড়িয়ে পড়ল টাম্বুরিন। বাজনা ছাপিয়ে শোনা গেল ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ—যেন অসুরে প্রেতে লড়াই লেগেছে অন্ধকারের কন্দরে।

পড়ে গিয়েই পাশে গড়িয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত স্থানে ঝাঁপিয়ে পড়ল গুণ্ডামার্কা লোকটা। সাঁৎ করে গলার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বিষাক্ত ছুঁচ—এক চুলের জন্য বেঁচে গেল প্রাণটা।

পরমুহূর্তেই পিঠের ওপর উঠে বসল ইন্দ্রনাথ। দু-পা আততায়ীর দু-বগলের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে নিয়ে কাঁচি মারল ঘাড়ের ওপর। হাত দিয়ে চকিতে চেপে ধরল আংটি সমেত কব্জি।

মুষ্টিযুদ্ধের মোক্ষম প্যাঁচ। যত কাঁচি এঁটে বসতে থাকে, ততই অসহায়ভাবে পা ছুঁড়তে থাকে চীনেম্যান। লাথি লেগে উলটে পড়ে চেয়ার, টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ে টাম্বুরিন।

আস্তে-আস্তে হাতটাকে কনুইয়ের কাছ থেকে মোচড় দিয়ে পিছন দিকে নিয়ে আসতে থাকে ইন্দ্রনাথ। প্রাণের ভয়ে সে তখন মরিয়া। একবার হাত ফসকালেই—

লোকটা যেন ক্রমশ নেতিয়ে পড়ছে। আশ্চর্য নয়। সায়ানাইড আর বিষ নিয়ে যারা চোখের পলকে মানুষ খুন করে, তাদের শক্তি সাধনার দরকার হয় না। দেখতেই গাঁট্টাগোট্টা, শরীর তো মেদভর্তি...

হঠাৎ হ্যাঁচকা টান মারে লোকটা...আর ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। প্রচণ্ড মোচড় দেয় ইন্দ্রনাথ...খট করে খুলে যায় কনুইসন্ধি এবং প্যাঁট করে ছুঁচ ফুটে যায় আংটিধারীর পেটে!

সঙ্গে-সঙ্গে একটা পাঁজর-খালি-করা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলিয়ে পড়ে চৈনিক ঘাতক।

উঠে দাঁড়ায় ইন্দ্রনাথ। মেঝে থেকে ছিপিটা কুড়িয়ে নিয়ে আগে ঢেকে দেয় ছুঁচের মুখ। তারপর টেনে-হিঁচড়ে লাশটাকে তুলে এনে চেয়ারে বসিয়ে বাঁধে দড়ি দিয়ে।

শুরু হয় প্রোগ্রামমাফিক ভূতের অভিনয়!

বিংশ পরিচ্ছেদ : মোমের হাতের রহস্য উদঘাটন

'আলো'!

চড়া গলার হুকুম ভেসে এল ক্যাবিনেটের ভেতর থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে সুইচবোর্ডে হাত রাখল খুদে অশ্বত্থামা। দপ করে জ্বলে উঠল বিদ্যুৎবাতি।

চোখ ধাঁধিয়ে যায় চক্রবৈঠকীদের। একঘণ্টারও ওপর হল আবলুশ-অন্ধকারে ভৌতিক কাণ্ডকারখানা দেখতে হয়েছে। কাজেই চোখ মিটমিট করা স্বাভাবিক।

আলো সয়ে যেতেই চমকে উঠলেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী। ঠিক পিছনেই দুটি ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আরও দুটি মূর্তি।

জেনারেল বরককাতি আর রাজবাহাদুর কদম পূর্বব্যবস্থা মতো অন্ধকারের সুযোগে দুজনে আসন নিয়েছে ভৌতিকচক্রে।

যতটা অবাক হলেন, তার চাইতেও বেশি বিরক্ত হলেন প্রফেসর। সিংহমুখে ভ্রুকুটি গোপন করার কোনও চেষ্টাই করলেন না।

কালো পর্দা ঠেলে ক্যাবিনেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ইন্দ্রনাথ।

সফল অভিনয়ের শেষে অভিনেতার মুখে যে আত্মপ্রসাদের অভিব্যক্তি দেখা যায়, ইন্দ্রনাথের চোখে-মুখে সে ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু কপালটা কাটা কেন? গালেও সুস্পষ্ট রক্ত-আঁচড়।

ক্যাবিনেটে যাওয়ার আগে তো এ দাগ ছিল না মুখে। ভাবনায় পড়েন মিঃ আচাও।

বড় টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়ায় ইন্দ্রনাথ। ভৌতিকচক্র শুরু হওয়ার আগে এ টেবিলে ছিল শুধু ইলেকট্রিক প্লেট আর ঠান্ডা জলের ডেকচি। এখন দেখা গেল দুইয়ের মধ্যে সাদা কাপড়-ঢাকা আরও দুটি বস্তু।

একটির কাপড়ের ঢাপায় হাত দেয় ইন্দ্রনাথ। তৎক্ষণাৎ উত্তেজনায় সটান দাঁড়িয়ে পড়েন প্রফেসর। একটানে কাপড়টা সরিয়ে নিতেই লাফিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ান। বড়-বড় চোখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকেন গুণ্ঠনমুক্ত বস্তুটির দিকে।

জিনিসটা একটা ফাঁপা মোমের হাত। আঙুলগুলো ঈষৎ বাঁকা—যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কাঁদরেখা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে প্রতিটি আঙুলের ডগায়।

'জয়গুরু!' আবেগে উত্তেজনায় গলা ভেঙে যায় প্রফেসরের। 'জয়গুরু!'

তখনও শিশিরবিন্দুর মতো জল ঝরে পড়ছিল হাতটার গা থেকে। কাঁপা হাতে মোমদস্তানা তুলে নেন প্রফেসর। রেখে যান কাচের বাক্সে-রাখা বস্তুটার সামনে। বাক্স খুলে আসল মোমের হাত বার করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেন। তাতেও সন্তুষ্ট হন না। পকেট থেকে বেরোয় শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মিলিয়ে নেন আঙুলের রেখাগুলো। তারপর বাক্স বন্ধ করে ছুটে আসেন ইন্দ্রনাথের সামনে। বিস্ফারিত চোখে লৌহমুষ্টিতে হাত চেপে ধরেন ইন্দ্রনাথের। চেঁচিয়ে ওঠেন অবরুদ্ধ কণ্ঠে, 'ফাল্গুনীবাবু! ফাল্গুনীবাবু! আপনি পেরেছেন! আপনার শক্তি আছে! আবার ফিরিয়ে এনেছেন আমার মেয়েকে। ময়না এসেছিল। এ তারই হাত।'

'না, আমি পারিনি। কেউ আসেওনি।' থেমে-থেমে, প্রতিটি শব্দে অসম্ভব জোর দিয়ে বলল ইন্দ্রনাথ। কথা তো নয়, যেন একটি তাজা টাইম বোমা হাজির করল ঘরের মধ্যে। নিদারুণ উৎকণ্ঠায় টান-টান হয়ে উঠল উপস্থিত বাকি চারজনের স্নায়ুমণ্ডলী।

আর, নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন ডক্টর চন্দ্রচূড় মহলানবীশ।

কথাটা তখনও মগজে ঢোকেনি প্রফেসরের। ইন্দ্রনাথের হাত ছেড়ে দিয়ে ঝলজ্বলে চোখে চেয়েছিলেন হাতে-ধরা মোমদস্তানার পানে—এমনভাবে চেয়েছিলেন, যেন এ হাত রক্তমাংসের হাত—মোমের নয়।

তারপরেই সম্বিৎ ফিরে পেলেন প্রফেসর, 'কী—কী বললেন?'

'বললাম যে আমার কোনও শক্তিই নেই। আপনার মেয়েকেও আমি ফিরিয়ে আনিনি। ময়না এখানে আসেনি। এ হাত ময়না বক্সীর হাত নয়।'

শুনতে-শুনতেই রক্ত ঠেলে উঠতে থাকে প্রফেসরের সিংহমুখে, মশালের মতো জ্বলে ওঠে দুই চোখ।

'কী বলতে চান আপনি? এ হাত আমার মেয়ের হাত নয়, একথা বললেন কীসের জন্যে?'

'কারণ, এ হাত আমিই বানিয়েছি। প্রফেসর বক্সী, দয়া করে বসবেন? আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই আমি।'

গনগনে চোখে ইন্দ্রনাথকে যেন ভস্ম করে ফেলতে চাইলেন প্রফেসর। কিন্তু প্রতিবাদ করলেন না। নিঃশব্দে পিছু হটে গিয়ে বসলেন চেয়ারে। কোলের ওপর রইল মোমের ফাঁপা হাত।

শুরু করল ইন্দ্রনাথ, 'আমার নাম ফাল্গুনী রায় নয়। কোনওকালেই ছিল না। বিশেষ কারণে নাম ভাঁড়াতে হয়েছিল, সে জন্যে ক্ষমা করবেন আমাকে। আমার আসল নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র। নিবাস, কলকাতা। পেশা, গোয়েন্দাগিরি। আজ রাতে ময়না বক্সীর যে হাত আপনাকে উপহার দিয়েছি, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, সে হাত আমিই তৈরি করেছি আপনাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে—আপনাকে ঠকাবার জন্যে। আর ওই যে হাতটা কাচের বাক্সের মধ্যে সযত্নে রেখে দিয়েছেন এতদিন ধরে, ও হাতটাও আপনাকে উপহার দিয়েছে একদল ভণ্ড, বদমাশ, জঘন্য রকমের প্রতারক আর জালিয়াত। মাসের পর মাস বুজরুকেরা এই ভাঁওতা দিয়েই ভুলিয়ে রেখে দিয়েছে আপনাকে।'

সমস্ত চুপ। প্রফেসরের ভয়াল মুখের দিকে বারেক তাকিয়ে ভয়ে চোখ নামিয়ে নেন ডক্টর মহলানবীশ।

'ডক্টর মহলানবীশ,' এবার তাঁকেই উদ্দেশ করে ইন্দ্রনাথ, 'আমাকে আপনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন দুটি কারণে। প্রথম, ময়না বক্সীর মোমের হাতের রহস্য জানতে হবে। দ্বিতীয়, অবিকল ওইরকম আর একটা হাত তৈরি করতে হবে। দুটোই আমি পেরেছি। সেই কারণেই যে কথাটা আপনাদের প্রথম দিনেই বলব ভেবেছিলাম, তা এখন বলছি। আপনারা প্রত্যেকেই কর্তব্য এড়িয়ে গেছেন। অত্যন্ত বিপজ্জনক মোহে দিনের-পর-দিন বুঁদ হয়ে থেকেছেন প্রফেসর, অথচ বন্ধুকৃত্য করেননি। প্রফেসরকে হুঁশিয়ার করেননি। পাছে অপারেশন নটরাজ ত্যাগ করেন, এই ভয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেননি ঠকে যাওয়া ছেলের মতোই দেশের কতখানি অনিষ্ট তিনি করতে চলেছেন। শত্রুদের ফাঁদ থেকে প্রফেসরকে উদ্ধার করে আনার জন্যে কোনওরকম সাহসই আপনারা দেখাতে পারেননি।'

অস্ফুট কণ্ঠে মিস্টার আচাও কী যেন বলে উঠলেন, শোনা গেল না। বুনো বেড়ালের মতো গরগর করে উঠলেন জেনারেল বরককাতি। চোখ নামিয়ে নিলেন রাজবাহাদুর কদম। আর 'ধরিত্রী, দ্বিধা হও' জাতীয় ভাব করে ফ্যাল-ফ্যাল করে শিষ্যের ভর্ৎসনা হজম করতে লাগলেন চন্দ্রচূড় মহলানবীশ।

হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন প্রফেসর, 'আমি ঠকে-যাওয়া ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'কী যেন নাম বললেন আপনার?'

'ইন্দ্রনাথ রুদ্র।'

'ইন্দ্রনাথ রুদ্রই হোন আর ফাল্গুনী রায়ই হোন, তা নিয়ে আমার দরকার নেই। আপনার ঈশ্বরদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা আছে। আমার সম্বন্ধে যা বললেন, তা নিয়ে আমি

মাথা ঘামাই না। কিন্তু আমার মরা মেয়েকে আমি দেখেছি, তার সঙ্গে কথা বলেছি, তার ছোঁয়া অনুভব করেছি। দুবার দুটো মোমের হাত রেখে গেছে তার আসার প্রমাণস্বরূপ। আজ সকলেই আমার বাড়িতে গলা শুনেছি তার। একটু আগেও শুনেছি।'

'না, আপনি শোনেননি।'

এরপর সিংহবিক্রমেই বিক্রম বক্সীর হুঙ্কার ছাড়া উচিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেলেন প্রফেসর। ঠান্ডা চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কি আমাকে মিথ্যেবাদী বলছেন?'

'না। ময়না বক্সীর গলা আপনি কল্পনায় শুনেছেন। আমি নিজেই প্রশ্ন করেছি, নিজেই উত্তর দিয়েছি। কিন্তু আপনি যার গলা শুনেছেন, তা আপনার অতি বিশ্বাস আর ভাবনার ফল।'

'বাজে কথা বলবেন না। কাচের বাক্সে চাবি দেওয়া ছিল। আপনি চেয়ারে বাঁধা ছিলেন, তা সত্ত্বেও উলটে গেছিল হাতটা। সেটাও কী আপনার ম্যাজিক?'

'হ্যাঁ, সেটাও আমার ম্যাজিক। দড়ির বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল মিডিয়াম মাত্রই জানে। বিলেতে একজন ভৌতিক মিডিয়ামের বেনামে লেখা একটা বই বেরিয়েছিল। বইটার নামের বাংলা তর্জমা করলে এইরকম দাঁড়ায় : একজন ভৌতিক মিডিয়ামের গুপ্ততথ্য প্রকাশ, অথবা ভৌতিক রহস্য ফাঁস—ধাপ্পাবাজ মিডিয়ামদের ব্যবহৃত ফাঁকির কৌশলগুলি বিশদ ব্যাখ্যা।

'বইটাতে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বোঝানো আছে, দড়ির বাঁধন আর অন্যান্য বিভিন্ন রকমের বন্দিদশা থেকে কী কৌশলে মুক্তি পেয়ে ফাঁকিবাজ পেশাদার মিডিয়ামরা অন্ধকারে নানারকম ভৌতিক কাণ্ড করে ভৌতিক চক্রে উপবিষ্ট সবাইকে কীভাবে ঠকায়। আলো জ্বলবার আগেই আবার বন্ধনদশাতে ফিরে যায়।

'লোকান্তরিত আত্মীয়-স্বজনের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে প্রিয়বিয়োগবিধুর অনেকেই শরণ নেয় এই মিডিয়ামদের। তাঁদের এই ব্যথাবিধুরতার সুযোগ নিয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৌশলী ধাপ্পাবাজ মেকি মিডিয়ামরা প্রত্যেক ভৌতিক চক্রবৈঠকের জন্যে ভালো দক্ষিণা নিত। যে ব্যাপারগুলোকে মিডিয়ামরা অলৌকিক, অতীন্দ্রিয় বা ভৌতিক বলে চালাত, আসলে সেগুলো ভেলকি, ভোজবাজি বা জাদুর খেলামাত্র। আপনি ম্যাজিক শব্দটা বললেন বলেই এত কথা বলতে হল আমাকে।

'১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে বইখানা বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো ঘা দিল পেশাদার মিডিয়ামদের। টলমল করে উঠল মিডিয়াম ব্যবসায়। শোনা যায়, পেশাদার মিডিয়ামরা যতদূর পেরেছিল পাইকারি হারে এ বই কিনে গোপনে পুড়িয়ে ফেলেছিল।

'শুনে অবাক হবেন, বিশ্বের অবিস্মরণীয় পলায়নী জাদুকর হ্যারি হুডিনির পলায়নী বিদ্যায় হাতেখড়ি এই বই থেকেই। দড়ি দিয়ে, হাতকড়া দিয়ে, ইটের দেওয়াল দিয়ে, লোহার খাঁচা দিয়েও তাঁকে আটকে রাখা যেত না। ডিটেকটিভ শার্লক হোমসের স্রষ্টা, স্যার আর্থার কোনান ডয়েল স্বচক্ষে হ্যারি হুডিনির পলায়নী জাদুর খেলা থেকে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে, হুডিনি বিস্ময়কর অলৌকিক অতীন্দ্রিয় গুপ্ত শক্তির অধিকারী। কোনান ডয়েল বোকা ছিলেন না। কিন্তু প্রেততত্ত্বের চর্চায় অনেকদূর এগিয়ে ছিলেন তিনি। অনেক মিডিয়ামের চক্রে বসে অনেক ভুতুড়ে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন।'

'প্রফেসর বক্সী, আপনারও যুক্তিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মনকে ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছে বিশ্বাস সৃষ্টি করে। অলৌকিক খেলা আমাদের দেশেও কি হয়নি? জাদুকর গণপতির 'ইলিউশন বক্স' আর 'জাদুগাছ'-এর খেলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই বলেছেন, গণপতি তন্ত্রসিদ্ধ হয়ে অলৌকিক ভুতুড়ে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। দড়ি, বাক্স, থলির মধ্যেও গণপতিকে আটকে রাখা যেত না। গণপতির খেলা আপনি না দেখলেও তাঁর কাহিনি নিশ্চয় শুনেছেন, তবুও ম্যাক্রোয়ানিদের জালিয়াতি আপনি ধরতে পারলেন না। মানুষের গভীর বেদনার সুযোগ নিয়ে ভাঁওতা দিয়ে ভুলিয়ে লাভবান হওয়ার চেষ্টা অতি জঘন্য কাজ। এর তুল্য পাপ আর নেই। অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে এই মহাপাপকেই প্রশ্রয় দিলেন আপনি।'

তীব্র তিরস্কারে ঝনঝনিয়ে ওঠে ইন্দ্রনাথ রুদ্রের কণ্ঠ। পাকা বক্তার মতই আবেগকম্পিত গলায় হিপনোটাইজ করে ফেলে ঘরসুদ্ধ সবাইকে।

নীরবতা।

পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চুপ প্রফেসর বিক্রম বক্সী—শুধু দু-টুকরো অঙ্গারের মতো জ্বলছে দুই চোখ।

'আপনি কি ম্যাজিশিয়ান?'

'না। তবে বাংলার বহু ম্যাজিশিয়ান আমার বন্ধু। পলায়নী বিদ্যা কিছু-কিছু শিখেছি তাদের কাছে। ভালো গোয়েন্দা হতে গেলে হাত-সাফাইয়ের বিদ্যেও জানতে হয়। সেই কারণেই, আজ সকালে দড়ির বাঁধন খুলে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। সবখোল চাবি দিয়ে কাচের বাক্স খুলে হাতটা উল্টে রেখে আবার চাবিবন্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপর ফিরে গেছিলাম বন্ধনদশায়।'

অবরুদ্ধ আবেগে থরথর করে কেঁপে ওঠেন প্রফেসর, 'গত হপ্তায় ময়না আপনাদের সামনেই এসেছিল—এই ঘরেই। কথাও বলেছিল—আপনিও শুনেছেন। সেটাও কি ম্যাজিকে সম্ভব?'

'সম্ভব। ময়নার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল যে মেয়েটি, একসময়ে সে ম্যাজিশিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। কিছুদিন স্টেজে অভিনয়ও করেছে। অত্যন্ত ছোট্ট চেহারা তার—কিশোরীর মতোই। নাম নূরজাহান। ক্যাবিনেটের একটা চোরাদরজা দিয়ে এসেছিল সে। গলার স্বর নকল করতেও জুড়ি ছিল না নূরজাহানের।'

'নিয়ে আসুন তাকে আমার সামনে।' ঘরের চার-দেওয়ালও বুঝি কেঁপে ওঠে প্রফেসরের হুঙ্কারে।

'পারব না। নূরজাহান আর বেঁচে নেই।'

অট্টহাস্য করে ওঠেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী। হাসির দমকে কেঁপে-কেঁপে ওঠে সর্বাঙ্গ। কিন্তু আস্তে-আস্তে ঝিমিয়ে আসে তাঁর উল্লাস—যেন বায়ুশূন্যতার মধ্যে টুকরো-টুকরো হয়ে মিলিয়ে যায় তাঁর অট্টহাসি। অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্য আবার চেপে বসে ঘরের মধ্যে।

প্রথমে কথা বলে ইন্দ্রনাথ, 'পরলোকে গেলেও হাতের তালুর ছাপ রেখে গেছে নূরজাহান।'

'তালুর ছাপে কী দরকার?'

তর্জনী-সংকেতে কাচের বাক্স দেখিয়ে বলে ইন্দ্রনাথ, 'মোমের হাতে আপনি নূরজাহানের তালুর ছাপই দেখতে পাবেন।' পরক্ষণেই ফেরে রাজবাহাদুর কদমের দিকে, 'মিস্টার কদম, আপনি সেন্ট্রাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরোর ডিরেক্টর। নিজেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট। পামপ্রিন্টগুলো প্রফেসরকে কাইন্ডলি দেখাবেন?'

চেয়ারের তলা থেকে একটা ব্রিফকেস তুলে নিলেন মিঃ কদম। কতকগুলো শিল্প বাই টেন ফোটোগ্রাফিক এনলার্জমেন্ট বার করে এগিয়ে দিলেন ইন্দ্রনাথের দিকে।

প্রতিটি আলোকচিত্রেই একই নারীর তালুর ছাপ। ছোট্ট হাত। অথচ সুস্পষ্ট কররেখা।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'প্রফেসর, দয়া করে গ্লাসকেসের সামনে আসুন। বেশ, এবার আর ম্যাগনিফাইং গ্লাসের দরকার হবে না। শুধু চোখেই মিলিয়ে নিন। কোনও তফাত দেখতে পাচ্ছেন? মোমের হাতে এই ক্রশচিহ্ন, ফোটোতেও রয়েছে। মোমের হাতের ফাঁস, ফোটোতেও রয়েছে। এই দেখুন, আয়ুরেখা কত ছোট। ফোটোতেও তাই।'

বলেই চমকে ওঠে ইন্দ্রনাথ! সত্যিই তো, আয়ুরেখা এত ছোট না হলে অকালে মারা যাবে কেন নূরজাহান?

সম্বিৎ ফিরল প্রফেসরের বজ্রকণ্ঠে, 'কিন্তু আঙুলের ছাপ আমার মেয়ের। আমার কাছে ফোটো আছে, মিলিয়ে দেখতে পারেন।'

'তা ঠিক, আঙুলের ছাপ আপনার মেয়েরই বটে। পামপ্রিন্ট নূরজাহানের, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ময়না বক্সীর। স্টেজ ম্যাজিকের পুরোনো চাল—দর্শকদের ভুলপথে চালিয়ে দেওয়ার কৌশল।'

'তার মানে?'

'আঙুলের রেখা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর কেউ আর কররেখা মিলিয়ে দেখে না। দেখবার উপায়ও অবশ্য ছিল না। কারণ, ময়না বক্সীর পামপ্রিন্ট কেউ রাখেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধরবার উপায় ছিল। কাঁচা বয়েসিদের কররেখা প্রাপ্তবয়স্কদের মতো এত সুস্পষ্ট হয় না। আঙুলের রেখা দেখে সবাই এমন মোহিত হয়ে গেলেন যে, এ জিনিসটা চোখ এড়িয়ে গেল প্রত্যেকের।'

'অসম্ভব! মোমের হাতের কব্জি কত সরু দেখেছেন? রক্তমাংসের পুরো মুঠো কি ওই সরু কব্জি দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে? ভেঙে যেত সবাই, মোম ভেঙে যেত!' প্রত্যয়ের শিখায় জ্বলজ্বল করে ওঠে প্রফেসরের চোখ।

'রক্তমাংসের হাতে মোমের এ দস্তানা তৈরি হয়নি।'

যেন ধাক্কা খেলেন প্রফেসর বক্সী। ইন্দ্রনাথের শেষ কথার রহস্য ঠিক ধরতে পারেন না। মস্করা করছে নাকি ছোকরা?

বিমূঢ় দৃষ্টি নামান হাতে-ধরা দ্বিতীয় দস্তানার ওপর। সঙ্গে-সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চোখ।

দস্তানাটি ইন্দ্রনাথের নাকের ডগায় নাড়তে নাড়তে বলেন সোল্লাসে, 'এ পামপ্রিন্ট কার? সে মেয়ে তো বললেন পরলোকে গেছে, তবে তার তালুর ছাপ এল কোত্থেকে? পরলোক থেকে?'

'না, ইহলোক থেকে।' শান্ত কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ, 'মিলিয়ে দেখলেই দেখবেন, তালুর ছাপ দুই দস্তানায় দু-রকম। আজ রাতে যে হাত আমি তৈরি করলাম, তার কররেখা এসেছে শান্তা আচাওর হাত থেকে। শান্তা আচাওর বয়স মাত্র দশ। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ মিঃ আচাওর একমাত্র মেয়ে সে। মিঃ আচাওকে আপনি চেনেন। অলঙ্কর দাস নামে আজকের আসরে হাজির আছেন তিনি।'

ক্রোধে রক্ত ফেটে পড়ার উপক্রম হয় প্রফেসরের মুখে। দমামা বেজে ওঠে ভয়ালকণ্ঠে। 'আর আপনার অহিভূ মল্লিক?'

'মাপ করবেন, অহিভূ মল্লিক বলে আমার কোনও পরিচিত নেই, কোনওকালেই ছিল না। ও নামে কেউ মার্ডার হয়নি। সে রাতে আমি ক্যাবিনেটে গেলে মস্তোয়ানিরা যে মেয়েটিকে অহিভূ মল্লিকের ভূমিকা অভিনয় করার জন্যে আমার কাছে পাঠিয়েছিল, সে-ই আবার আপনার মেয়ে ময়না বক্সী হয়ে আদর করে গেছিল আপনাকে। একই মেয়ে, নাম তার নূরজাহান—এখন সে পরলোকে।'

আর থাকতে পারেন না, বোমার মতো ফেটে পড়েন প্রফেসর, 'আপনি একটা পয়লা নম্বরের জালিয়াত, ধাপ্পাবাজ, পাজি, ঠগ! কী ভেবেছেন আমাকে? মিথ্যেবাদী, রাস্কেল কোথাকার! বাঁদরামো হচ্ছে আমার সঙ্গে? শয়তানি তোমার জন্মের মতো ঘুচিয়ে দিতে পারি জানো?'

অবর্ণনীয় রাগে বেতের পাতার মতো থরথর করে কাঁপতে থাকেন প্রফেসর নির্মম বক্সী।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন উপস্থিত চারজনে। ভাবখানা, 'এই ভয়ই করেছিলাম'!

কিন্তু অপরিসীম সংযম ইন্দ্রনাথের। প্রফেসরের কণ্ঠ উদারা মুদারা ছাড়িয়ে যেতেই সুর আরও নিচে নামিয়ে আনল সে। আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে বললে, 'প্রফেসর, একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের জালে আপনি কীভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, তা হাতেনাতে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যেই আজ আমরা মিলিত হয়েছি। আশ্চর্যের বিষয়, সাঙ্ঘাতিক এই চক্রান্তের বিন্দুমাত্র আজও আঁচ করতে পারেননি আপনি। আমার কথা শেষ হলে কতকগুলো দলিল আপনাকে আমি দেব। ডকুমেন্টগুলো পর-পর পড়লেই আপনি বুঝবেন, কীভাবে দিনের পর-দিন প্রেতাত্মার বার্তার নামে বিপজ্জনক একটা ধারণাই আপনার মনে বদ্ধমূল করে তোলার চেষ্টা হয়েছে।'

মানুষ প্রচণ্ড রেগে গেলে আস্তে কথা বলে তার অন্তর স্পর্শ করতে হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রফেসর বুদ্ধিমান পুরুষ, স্মরণশক্তিও তাঁর প্রখর। মুহূর্তে ময়না বক্সীর শকটা বাওইই ফিল্মের মতো চলে গেল মাথার মধ্যে দিয়ে।

বললেন কড়া গলায়, 'কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিথ্যে নয়। আপনি নিজেও স্বীকার করেছেন ময়নার আঙুলের ছাপের সঙ্গে এ ছাপের কোনও প্রভেদ নেই। অসম্ভব! মরা মানুষের আঙুলের ছাপ নকল করা জ্যান্ত মানুষের পক্ষে সম্ভব কি?'

'তা-ও সম্ভব।'

'প্রমাণ করতে পারেন?'

'সুযোগ দিলে নিশ্চয় পারব। বৈজ্ঞানিক প্রমাণও হাজির করব।'

ওষুধ ধরল। বৈজ্ঞানিক প্রমাণের নাম শুনে আর দ্বিরুক্তি করলেন না প্রফেসর। গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। 'যুদ্ধং দেহি' ভাব নিয়ে চিবুক উঁচিয়ে কটমট করে চেয়ে

রইলেন ইন্দ্রনাথের পাশে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাকি চারজন।

শুরু করল ইন্দ্রনাথ : 'আজ পর্যন্ত অন্ধকারে ছাড়া মোমের হাত তৈরির কোনও নজির আমরা পাইনি। প্রতিটি হাত সৃষ্টি হয়েছে গাঢ় অন্ধকারে—ভৌতিকচক্রের সময়ে। প্রফেসর, প্রথম যেদিন মোমের হাত তৈরি করে দেয় মাস্ত্রোয়ানিরা, সেদিনও ছিল অন্ধকার। আজকের হাতটাও বানিয়েছি অন্ধকারেই। এবার আপনাদের সামনেই বানাব আরও একটা হাত—তবে অন্ধকারে নয়—আলোয়।'

সবাই নিস্পন্দ।

পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হল ইন্দ্রনাথ। ফিরে এল মিনিট কয়েক পরেই। হাতে একটা ট্রে। ট্রে-র ওপর সাজানো দুটো প্রেশার স্প্রে বোতল, একরোল অ্যাডেসিভ টেপ, অল্পবয়েসি মেয়ের গোটা হাতের একটা ছাঁচ—সরু কব্জি দেখেই বোঝা যায় হাতের অধিকারিণী ক্ষীণাঙ্গী। এ ছাড়াও আছে রুপোর কফিপট ভর্তি জল। কয়েকটা রবারের দস্তানা। একহাতের বুড়ো আঙুল আর আঙুলের ছাপের অনেকগুলো বড় করা ফোটো।

বলা বাহুল্য, জিনিসগুলোর চালান এসেছে চোরা দরজার মধ্যে দিয়ে পাতালকক্ষ থেকে।

আবার আরম্ভ করে ইন্দ্রনাথ : 'প্রফেসর বক্সী ঠিকই বলেছেন। ছাঁচ না ভেঙে মোমের দস্তানার মধ্যে থেকে হাত বার করে নেওয়া রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে অসম্ভব। মরা মানুষের আঙুলের ছাপ নকল করাও জ্যান্ত মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এই দুটো অসম্ভবই সম্ভব হতে পারে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি আর সাধনায়। যেমন হয়েছিল ময়না বক্সীর মোমের হাত সৃষ্টির আগে। বহুদিনের অধ্যবসায়ের ফল এই মোমের হাত। সব ম্যাজিকের মতোই পাকা হাতের কারসাজিতে তা অলৌকিক হয়ে উঠেছে দর্শকদের সামনে।'

টেবিল থেকে একটা স্প্রে-বোতল তুলে নেয় ইন্দ্রনাথ : 'নতুন ধরনের এই কম্পাউন্ডটা দাঁতের ডাক্তারদের খুবই কাজে লাগে। ছাঁচ তৈরির প্লাস্টিক স্প্রে। স্প্রে করার সঙ্গে-সঙ্গে ছাঁচ শুকিয়ে যায়। তারপর সে-ছাঁচে ফুটো করা যায়, আঁচড় কাটা যায়, এমনকী খোদাইও করা যায়।'

ইঙ্গিতে দ্বিতীয় স্প্রে-বোতলটা দেখাল ইন্দ্রনাথ : 'এর ভেতরে আছে তরল রবার। ছোটখাটো জিনিসে ওয়াটারপ্রুফ স্তর দেওয়া, কি জোড়মুখ বন্ধ করে দেওয়া জাতীয় কাজে এর জুড়ি নেই।

নূরজাহানের হাত থেকেই তৈরি হয়েছিল প্রথম ছাঁচটা। প্রেত-বৈঠকে ভূতের অভিনয় করার আগেই সে চাকরি পেয়েছিল মাস্ত্রোয়ানিদের সংস্থায়। তারপর টাকার লোভ দেখিয়ে অন্য কাজে লাগানো হয় তার প্রতিভাকে। নূরজাহান মাথায় খুব খাটো। শীর্ণ। সরু-সরু হাড়গোড়। প্রথমেই পাতলা অ্যাডেসিভ টেপ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল আঙুলের ডগাগুলো। তারপর হাতে, তালুতে, আঙুলে, কব্জিতে মাখানো হল তেল জাতীয় একটা পদার্থ। সবশেষে ইনস্টান্টোপ্লাস্ট স্প্রে করে দেওয়া হল গোটা হাতে।

ছাঁচ থেকে হাত বার করে নেওয়ার সমস্যার সমাধান হল অতি সহজেই। মণিবন্ধে যে সরু সরু রেখা দেখা যায়, সেই রকমই একটা রেখা বরাবর করাত দিয়ে কেটে ফেলা হল ছাঁচটা নূরজাহান হাত বার করে নেওয়ার পর দুটো টুকরোকে আবার জুড়ে দাগ

মিলিয়ে দেওয়া হল ইনস্টান্টোপ্লাস্ট স্প্রে করে।

'পাওয়া গেল একটা হাতের ছাঁচ। কাচের মতো স্বচ্ছ অথচ পোর্সিলেনের মতো কঠিন। পাতলা, ফাঁপা। স্বচ্ছ বলেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল করবেখা। কিন্তু টেপ দিয়ে মোড়া ছিল বলে আঙুলের রেখা অদৃশ্য। এরপর ডাকা হল আবদুল্লা নামে এক দাগি জালিয়াতকে। জাল নোটের ব্লক এনগ্রেভ করার জেল হয়েছিল তার।'

মুখ বেঁকিয়ে বললেন প্রফেসর, 'আশা করি, তাকেও আমার সামনে আনতে পারবেন না?'

'ঠিক ধরেছেন। আবদুল্লা আর বেঁচে নেই।'

এবার আর অট্টহাসি করলেন না প্রফেসর বক্সী।

'আঙুলের ছাপের ফোটোগুলো স্বচ্ছ ছাঁচের ভেতরে রাখল আবদুল্লা। পেন্সিল বুলিয়ে রেখাগুলো হুবহু নকল করল ছাঁচের ওপরে। ইনস্টান্টোপ্লাস্ট এমনই এক আজব আবিষ্কার, যার ওপর খোদাই করলে চাকলা উঠে যায় না, গুঁড়িয়ে যায় না। আমার দাঁতের মতোই শক্ত ছাঁচটার ওপর দাগ বরাবর টুকটুক করে এনগ্রেভ শুরু করে দিলে আবদুল্লা। জাল নোটের জটিল ডিজাইন ব্লক এনগ্রেভ যে করেছে, এ কাজ তার কাছে ছেলেখেলা। কাজেই অল্প সময়ের মধ্যেই ময়না বক্সীর আঙুলের রেখা খোদাই করা হয়ে গেল স্বচ্ছ ছাঁচের ওপরে—করবেখাও তাদের ওপর এনগ্রেভ করে দিলে আবদুল্লা।'

'অসম্ভব-অসম্ভব! ময়নার আঙুলের ছাপ পাবে কোথায় ওরা? খ্রিস্টান নয় যে কবর খুঁড়ে তুলে আনবে। চিতায় ছাই হয়ে গেছে ওর দেহ!' শ্লেষভরে বললেন প্রফেসর।

'ভুলে যাচ্ছেন, নিরাপত্তার খাতিরে সপরিবারে আঙুলের ছাপ দিতে হয়েছিল আপনাকে।'

'কিন্তু সে তো আছে গভর্নমেন্ট-ফাইলে—'

'তা ঠিক। কিন্তু সরকারি দপ্তরে বহু রকম চরিত্রের লোক থাকতে পারে। সুতরাং অগুন্তি ফাইলের মধ্যে থেকে একটি ফাইলের কয়েকটি ফোটো যদি কয়েক দিনের জন্যে নিখোঁজ হয়—কপি হয়ে যাওয়ার পর আবার ফিরে আসে ফাইলের মধ্যে—তা হলে তা ধরা আর খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা এক নয় কি?'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন প্রফেসর।

ইন্দ্রনাথ বলে, 'আগাগোড়া খোদাই হয়ে যাওয়ার পর তরল রবার স্প্রে করে দেওয়া হল গোটা হাতটার ওপর। ছোট্ট একটা ইলেকট্রিক উনুনে শুকোনো হল—আস্তে-আস্তে উড়ে গেল কেমিক্যাল উপাদানগুলো। তারপর ছাঁচের ওপর থেকে খুলে নেওয়া হল রবারের দস্তানা—এমন ভাবে খোলা হল যে দস্তানার ভেতরটা এল বাইরে আর বাইরেটা গেল ভেতরে। ফলে, আঙুলের প্রতিটি রেখা, ফাঁস, করবেখা উঠে এল রবারের দস্তানার বাইরে।

এরপর এল শেষ পর্যায়। সিলিন্ডারের মতো একটা কাঠের ছিপি আঁটা হল রবারের দস্তানার কব্জির মুখে। ছিপির মধ্যে রইল একটা ফুটো। ফুটো দিয়ে গরম জল ঢালা হল দস্তানার ওপরে।

মুকরি মাস্ত্রোয়ানির কাজ শুরু হয়েছে এর পর থেকেই। চোরা দরজা দিয়ে জল-ভোলা দস্তানাটা তুলে দেওয়া হল তার হাতে। জলের তাপমাত্রা তরল মোমের তাপমাত্রার

চাইতে কম রাখা হয়েছিল। কাজেই মোমের পাত্রে দস্তানাটা ডুবিয়ে রাখতেই আস্তে-আস্তে মোমের একটা স্তর জমে গেল রবারের ওপর।

'প্রফেসর বক্সী, আপনাকে পরে দেখাব, অন্ধকার হলেই এ ঘরে ইনফ্রা-রেড আলো হলে। স্নিপারস্কোপ লাগানো বিশেষ ধরনের চশমা পরে মুকরি মাস্তোয়ানি সবকিছুই দেখতে পেত আর সহজভাবে চলাফেরা করত ঘরের মধ্যে। এই সেই চশমা।'

বলে, পকেট থেকে কিম্ভুতকিমাকার চশমাটি বার করে দেখিয়ে টেবিলে রেখে দিল ইন্দ্রনাথ।

'মোমের স্তর পুরু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল মুকরি। তারপর মোমের পাত্র থেকে দস্তানাটি তুলে নিয়ে ডুবিয়ে দিলে ঠান্ডা জলে। সঙ্গে-সঙ্গে খুলে দিলে কব্জির শেষে লাগানো কাঠের ছিপি। বেরিয়ে গেল উষ্ণ জল—মোমের ফাঁপা হাতের মধ্যে চুপসে গেল রবারের দস্তানা। তখনও গরম থাকায় নরম রয়েছে মোমের হাত। কাজেই হাতে করে ইচ্ছে মতো আঙুলগুলো এমন ভাবে বেঁকিয়ে দিল মুকরি যে দেখলেই মনে হবে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ময়না। জীবন্ত হাতের আকার পেল মোমের হাত। ডুবিয়ে রাখা হল ঠান্ডা জলে জমে শক্ত না হওয়া পর্যন্ত। এরপর সরু কব্জির মধ্যে দিয়ে, মোমের ছাঁচ না ভেঙে, চুপসোনো রবার দস্তানা বার করে নেওয়া খুব কঠিন নয়। সবশেষে রবার দস্তানা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে চেয়ারে বন্ধনদশায় ফিরে গেল মুকরি। আলো জ্বলে উঠল। দেখা গেল, টেবিলের ওপর রয়েছে প্রেতিনী ময়না বক্সীর মোমের হাত—আঙুলের ডগায় রেখাগুলোও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—আর তখনও জল ঝরে পড়ছে মোমের গা বেয়ে। এই সেই হাত।'

বলে, কাচের বাক্সে কালো ভেলভেটের ওপর রাখা মোমের হাতের দিকে ফেরাল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

ঘরসুদ্ধ সকলের দৃষ্টি ঘুরল সেই দিকেই। প্রফেসর বিক্রম বক্সীর এক চোখে অবিশ্বাস, অপর চোখে বিস্ময়—ললাটের হন্ব সুপরিস্ফুট কপালের রেখায়-রেখায়।

ট্রে-র ওপর থেকে একহাতে সাদা ছাঁচ, অপর হাতে একটা রবারের দস্তানা তুলে বলল ইন্দ্রনাথ, 'যেভাবে বললাম, ঠিক সেই প্রক্রিয়া অনুসারে এই ছাঁচ আমরা বানিয়েছি। আর এই রবার দস্তানাও তৈরি করেছি ছাঁচ থেকেই।

'এ হাত তৈরির সময়ে মিঃ আচাও আর মিঃ কাব্য দুজনেই হাজির ছিলেন। কিন্তু আরও তিনজন এক্সপার্ট সাক্ষীকে আমরা হাজির করছি আপনার সামনে। মিঃ আচাও, প্লিজ!'

তৎক্ষণাৎ বাইরে গেলেন মিঃ আচাও—ফিরে এলেন তিন ব্যক্তিকে নিয়ে।

রোলকল করার মতো ডাক দিল ইন্দ্রনাথ, 'ইকবাল সিং!'

'জি হাঁ।' সামনে এগিয়ে এল এক শিখ ছোকরা।

'দিল্লি ব্রকমেকার্স কোম্পানিতে এনগ্রেভারের কাজ করো তুমি, তাই না?'

'জি হাঁ।'

'আজ বিকেলে এই ছাঁচ এবং আরও-একটা ছাঁচ তুমি মাঝখান থেকে কেটে দু-ভাগ করেছিলে—হাত বার করে নেওয়ার পর জুড়ে জোড়ের দাগ মিলিয়ে দিয়েছিলে। সবশেষে খোদাই করেছিলে। এ কথা সত্যি?'

'জি হাঁ।'

'ঠিক আছে। কুন্দন শা?'

'হুজুর।' এগিয়ে এল এক প্রৌঢ়।

'গভর্নমেন্ট প্রেসে আপনিও অনেক দিন ধরে এনগ্রেভিং করছেন, তাই না?'

'হাঁ, হুজুর।'

'এই যে ছাঁচটা দেখছেন, এর ওপর আঙুলের রেখাগুলো আমাদের দেওয়া ফোটোগ্রাফ থেকে প্রথমে হুবহু কপি, পরে খোদাই করেছিলেন আজ বিকেলে। এ কথা সত্য?'

'হাঁ, হুজুর।'

'যান। রুস্তম জোঙ্গানু?'

'জনাব?'

'তুমি রবার ফ্যাক্টরিতে কদিন কাজ করছ?'

'দশ সাল।'

'আজ বিকেলে এই ছাঁচের ওপর পাতলা রবার ঢেলে দস্তানা তৈরির ব্যাপারে তুমি তদারক করেছ, সত্যি?'

'বিলকুল সচ বাত।'

'ঠিক আছে। যাও। বাইরের ঘরে গিয়ে বসো।'

তিন মূর্তি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেই ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। রবারের দস্তানার কব্জিপ্রান্তে সছিদ্র কাঠের ছিপি এঁটে জল ভরে নিলে। তারপর নিজের হাতে একজোড়া রবার দস্তানা গলিয়ে জলভর্তি দস্তানাটা ডুবিয়ে দিলে তরল মোমের পাত্রে।

মিনিট দেড়েকের মধ্যেই সবার সামনেই ময়না বক্সীর তৃতীয় প্রেতহস্তের আবির্ভাব ঘটল টেবিলের ওপর।

'ষড়যন্ত্র! ঘোর ষড়যন্ত্র!' যেন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটল প্রেতকক্ষে। ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো চেয়ার থেকে ছিটকে গিয়ে প্রফেসর দমাস করে দু-হাতের বাড়ি বসিয়ে দিলেন সদ্যপ্রস্তুত মোমের হাতের ওপর।

গুঁড়িয়ে গেল হাতটা। একটানে টুকরোগুলো ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। আরক্ত মুখে অগ্নিগর্ভ চোখে চিৎকার করে উঠলেন বজ্রকণ্ঠে, 'চক্রান্ত করে আপনারা আমাকে বেইজ্জত করছেন। আমাকে, মেয়েকে সরিয়ে দিতে চাইছেন। আপনাদের বুজরুকি, আপনাদের শঠতা ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে মেয়ে আমার আর কোনওদিনই আসবে না জেনে এত সাহস হয়েছে আপনাদের। ঠগ, জোচ্চোরের দল—বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান আমার সামনে থেকে!'

শেষের দিকে গলা ধরে আসে প্রফেসরের।

চেয়ার ছেড়ে যন্ত্রবৎ দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন বাকি চারজনে। এই আশঙ্কাই করেছিলেন এঁরা। রফারফা হয়ে গেল অপারেশন নটরাজের।

কাগজের মতো সাদা-মুখে বললেন চন্দ্রচূড় মহলানবীশ, 'ইন্দ্রনাথ, যা ভয় করেছিলাম, শেষে তাই করলে? তুমি যে এত আহাম্মক, তা তো জানতাম না।'

অপলক চোখে প্রফেসরের দুর্বাসা-মূর্তির দিকে তাকিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। আবেগে,

রগের ঠকঠক করে কাঁপছিল প্রফেসরের আপাদমস্তক।

সহানুভূতিকোমল সুরে বলে ইন্দ্রনাথ, 'প্রফেসর, আপনি ঠিকই বলেছেন। ময়না আর ইহজগতে নেই। কিন্তু আপনি তো আছেন। তাই আরও-একটা জিনিস দেখাতে চাই আপনাকে।'

লাল কাপড়ের দ্বিতীয় ঢাকাটা সরিয়ে নিল ইন্দ্রনাথ। দেখা গেল, আরও একটা মোমের ছাঁচ। নতুন। তবে এবার আর পাতলা মেয়েলি হাত নয়। বড় আকারের বলিষ্ঠ পুরুষ হাত। হাতের পেছনে মোটা-মোটা লোমের চিহ্নও সুপরিস্ফুট। কররেখা আর আঙুলের রেখা অত্যন্ত স্পষ্ট।

'এটা কী? কার হাত?' হকচকিয়ে যান বিক্রম বক্সী।

'আপনার।' প্রশান্ত কণ্ঠে বলে ইন্দ্রনাথ, 'আপনি মৃত নন, জীবিত। কাজেই আঙুলের রেখাগুলো আপনার কি না, তা এখানেই মিলিয়ে দেখতে পারেন। কররেখা অবশ্য মিস্টার আচাওর।'

আবার দপ করে জ্বলে উঠল প্রফেসরের দুই চোখ, আবার কঠিন হয়ে উঠল চোয়ালের রেখা, ফুলে উঠল নাসারন্ধ্র।

এবার কিন্তু আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিলেন প্রফেসর। নিমেষে সংযত করে নিলেন নিজেকে। বড় মোমের হাতটা তুলে নিয়ে প্রথমে উলটে করে ধরলেন। তারপর সিধে করে ধরে পাশাপাশি নিজের আঙুল রেখে নিঃশব্দে মিলিয়ে দেখতে লাগলেন অনেকক্ষণ ধরে।

ঘরের মধ্যে ছুঁচ পড়লেও শব্দ শোনা যায়, এমনি নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে শেয়ালের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন জেনারেল বরকাকতি, 'গোড়া থেকেই বলছি, পরলোক-ফরলোক বলে কিস্সু নেই। মরা মানেই মরা।'

চকিতে বিদ্যুৎ খেলে যায় ইন্দ্রনাথের চোখে, 'কী বললেন?'

রসিয়ে-রসিয়ে প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে জবাবটা আবার শুনিয়ে দিলেন জেনারেল বরকাকতি, 'বললাম যে, প্রেতলোক-ফ্রেতলোক মানেই হল আফিংখোরের স্বপ্নলোক। আপনিই তা প্রমাণ করে দিলেন।'

'আজ্ঞে না, আমি তা প্রমাণ করিনি।' তৎক্ষণাৎ মুখের ওপরেই জবাবটা ছুঁড়ে দিল ইন্দ্রনাথ—বরকাকতির মতোই রসিয়ে-রসিয়ে, প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে।

চিলের মতো চিৎকার করে উঠলেন বরকাকতি, 'তার মানে? কী বলছেন মশায়? এতক্ষণ ধরে তা হলে করলেন কী...?'

'আমি আবার বলছি, আপনি যা ইঙ্গিত করছেন, আমি তা প্রমাণ করিনি, বা করবার চেষ্টা করিনি। আমি শুধু দেখিয়েছি প্রতারক মাক্রেয়ানিরা কীভাবে মোমের হাত বানিয়েছিল। কিন্তু আমি যা বলিনি, প্রমাণ যা করিনি, জেনারেল বরকাকতি, দয়া করে তা আমার নামে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।'

মোমের দস্তানা পর্যবেক্ষণ স্থগিত রেখেছিলেন প্রফেসর বিক্রম বক্সী। অপলকে তাকিয়েছিলেন ইন্দ্রনাথের মুখপানে। দুই চোখে তাঁর বিচিত্র কৌতূহলী দৃষ্টি।

চাবুক-কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ, 'পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনও

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি—এ-কথা সত্যি। কিন্তু পরলোকের অস্তিত্ব যে নেই, এ সম্বন্ধেও কি কোনও প্রমাণ পাওয়া গেছে? যায়নি। সুতরাং তা গবেষণাসাপেক্ষ, সময়সাপেক্ষ। যতদিন না সে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন পরলোক ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের বস্তু।'

ধীরকণ্ঠে জিগ্যেস করলেন প্রফেসর, 'ইয়ং ম্যান, এটা কি তোমার নিজস্ব মত?'

'হ্যাঁ। এ শুধু আমার মত নয়, এ আমার বিশ্বাস। জড়বিজ্ঞান কতকগুলো বাস্তব পদার্থ আর ক্রিয়াশক্তির বিকাশ ছাড়া বুদ্ধি, মন, আত্মা বলে কোনও স্বতন্ত্র বস্তু স্বীকার করেন না। যে বিজ্ঞান মৃত্যুর রহস্যভেদ করতে পারেনি, জীবন কী, তা বলতে পারেনি—আত্মার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে সে বিজ্ঞান কতটুকু জানে? কিন্তু গত ষাট-সত্তর বছর ধরে বৈজ্ঞানিকরা সাইকিক দুনিয়া সম্বন্ধে যে গবেষণা শুরু করেছেন, তা কি বিফলে যাবে? না। একদিন আসবে যেদিন হাজার-হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা যা জেনেছেন, তা নতুন করে আবিষ্কার করবে আধুনিক বিজ্ঞান।'

সবাই নীরব, নির্বাক নিস্পন্দ।

নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন প্রফেসর। বললেন মৃদুকণ্ঠে, 'তোমার দেওয়া এ প্রমাণ আমি মেনে নিলাম।' বলে মোমের হাতটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর।

তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। কাঠের পুতুলের মতো দণ্ডায়মান চারজনের দিকে তাকিয়ে বললেন মর্যাদা-গম্ভীর কণ্ঠে, 'কাল সকালে ল্যাবরেটরিতে দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে।'

বলে, ধীরপদে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। যাওয়ার সময়ে পাশে পড়ল কাচের শো-কেসে রাখা ময়না বক্সীর মোমের হাত।

কিন্তু সেদিকে ফিরেও তাকালেন না প্রফেসর বিক্রম বক্সী।

পরের দিন দুপুরে ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন ডক্টর চন্দ্রচূড় মহলানবীশ।

মিঃ আচাও শুধোলেন, 'মিস্টার রুদ্র, একটা জিনিস বুঝলাম না। নিজের মেয়ের হাতের প্রমাণই যদি মেনে নিলেন প্রফেসর তো ময়নার মোমের হাতটার ওপর অত মেজাজ দেখালেন কেন?'

'কারণ, তাঁর অগাধ বিশ্বাস আর মেয়ে সম্বন্ধে তাঁর সীমাহীন দুর্বলতা। অন্তরের টনটনে এই জায়গাটিতে কেউ খোঁচা দিলেই আত্মবিস্মৃত হয়ে যান উনি।'

'ধরুন, শেষ প্রমাণটাও যদি ছুড়ে ফেলে দিতেন? পঞ্চমবাহিনীর প্রসঙ্গ তুললেন না কেন?'

'সেটা আপনার কাজ। আমার কাজ মোমের হাত তৈরির কৌশল ফাঁস করা—আমি তা করেছি। সে যাই হোক, শেষ প্রমাণেও কাজ না হলে আরও একটা তাস হাতে ছিল।'

'যথা?'

'আপনি আর জেনারেল বরকাকতি যদি ক্যাবিনেটের ভেতরে আসেন তো দেখাতে পারি।'

ইঙ্গিতটা অনুধাবন করে বাইরে গেলেন মিঃ রাজবাহাদুর বন্দন। অশ্বত্থামা-অফিসার

অনেক আগেই আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার পর বেরিয়ে গেছিল। ঘরে রইল শুধু আচাও, বরকাকতি আর রুদ্র।

একটানে ক্যাবিনেটের পর্দা সরিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ।

'দেখুন।'

চেয়ারে বাঁধা চীনেম্যানের চিবুক ঝুলে পড়েছিল বুকের ওপর। দড়ির মতো ফুলে উঠেছে কাঁধের মাংসপেশী। শ্বাসপ্রশ্বাসের চিহ্নমাত্র নেই। এক নজরেই বোঝা যায় প্রাণহীন সে দেহ।

কঠিন চোখে তাকিয়ে রইলেন জেনারেল বরকাকতি। শিস দিয়ে উঠলেন মিঃ আচাও, 'মার্ডার!'

'হ্যাঁ।' বলল ইন্দ্রনাথ, 'আমিই করেছি।'

'আপনি?'

'করতে বাধ্য হয়েছি। নইলে ও জায়গায় আমাকেই বসে থাকতে দেখতেন।'

সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনাটা বর্ণনা করল ইন্দ্রনাথ। বলল, 'আমার বিশ্বাস, নুরজাহানের আঙুলেও এই বিষ-আংটি পরিয়ে পাঠানো হয়েছিল আমাকে খুন করার জন্যে। কিন্তু আমাকে জ্যান্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ক্ষেপে যায় ওরা। নুরজাহানকে কৈফিয়ত দেওয়ার অবকাশ না দিয়েই খুন করে সেই রাতে।' একটু থেমে, 'মিস্টার আচাও, প্রতিদিনই দিল্লিতে অনেকরকমভাবে অনেক লোকই তো মরা যাচ্ছে। নামগোত্রহীন এই চীনেম্যানও যদি সেভাবে মারা যায়, বরুন হাতিআটিতেই লাশটা সরিয়ে ফেলাই মঙ্গল।'

নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে মিঃ আচাও বললেন, 'এইভাবেই বুঝি কলকাতায় কাজ করেন আপনারা?'

'কাগজের শিরোনামা থেকে প্রফেসর বিক্রম বক্সীর নাম যদি দূরে রাখতে চান তো এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।' বলে জিনিসপত্র গুছোতে শুরু করল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

এ কাহিনিও শেষ হল এইখানেই।